বিশ্বভারতী পত্রিকা

নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ ১৯৪২-২০০৬

প্রসঙ্গ শিল্প ও সংগীত

বিশ্বভারতী পত্রিকা

নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ ১৯৪২-২০০৬

প্রসঙ্গ শিল্প ও সংগীত

সম্পাদনা

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কলকাতা

প্রাক্‌কথন

১৯৪২ থেকে ২০০৬ অবধি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় শিল্প ও সংগীত বিষয়ে বিখ্যাত শিল্প-সংগীতসমালোচক ও বিশেষজ্ঞ গুণিজনের যে সকল মূল্যবান প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার একটি নির্বাচিত সংকলন এই সংগ্রহ-গ্রন্থ। বেশ কয়েকজন চিত্রশিল্পী ও চিত্রচিন্তকের দুর্লভ রচনা এই সংগ্রহের অন্তর্গত হয়েছে। ২০০৫ সালে আমরা প্রকাশ করেছিলাম বিশ্বভারতী পত্রিকা নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ। ওই গ্রন্থটি ছিল প্রথমাবধি বিশ্বভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রবিষয়ে যত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে চয়ন করে একটি নির্বাচিত সংকলন। এবারের বিষয় ছবি আর গান। মোট ২৫টি রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। নিবন্ধাবলীর অনেকগুলি লেখাই এখনো অগ্রন্থিত—এই প্রথম পত্রিকার পাতা থেকে উদ্ধার করা হল।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

সূচি

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলী

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

১

গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের গোত্রবিচার

তর্কের খাতিরে বলা যাইতে পারে চিত্র বা চিত্রকরের পরিচয় অনাবশ্যক। ছবি চোখে দেখিবার জিনিস; চোখে ভালো লাগিলে দেখিব, ভালো না লাগিলে দেখিব না; ব্যাপারটা সংক্ষেপে চুকিয়া গেল। কিন্তু কার্যত তাহা ঘটে না। প্রথমত, চোখকেও দেখিতে শিখাইতে হয়, অশিক্ষিতপটুত্বই যথেষ্ট নয়। ইহার উপর চোখের দুর্বলতা ছাড়া চরিত্রের দুর্বলতাও আছে। ছবির বা যে কোনো আর্টের নিদর্শনের মূল্যবিচার আমরা শুধু উহার নিজস্ব গুণাগুণ দিয়া করি না, জাতিকুলশীলের সংবাদ লই, বিদগ্ধসমাজে প্রতিষ্ঠা-অপ্রতিষ্ঠার খোঁজ করি, এমন-কি সামাজিক এবং আর্থিক মর্যাদারও হিসাব লইয়া থাকি। বৈষয়িক দিক হইতে আমাদের অপেক্ষা সব দিকে গণ্যমান্য ব্যক্তি একটা জিনিস দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন, উহাকে অনাদর করিবার সাহস কোন্ ইতরজনের হয়? অমুকের ছবি লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে, এই হৈম-লগুড়াঘাত কয়জন কাটাইয়া উঠিতে পারে? তাই পরিচয়ের চাহিদা। আর্ট-ক্রিটিকের মতো বাক্‌সর্বস্ব ব্যক্তির পক্ষে ইহা লাভেরই কথা। তাহার অস্তিত্বের, তাহার পেশার উচ্চতর সাফাই না থাকিলেও শুধু ইহারই জোরে সে কলিকা পাইয়া থাকে।

গগনেন্দ্রনাথের চিত্র আমাদের কাছে দুইটি পরিচয় লইয়া উপস্থিত হইত, এবং এখনো সম্ভবত হয়। উহার একটি নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার তরফ হইতে, অপরটি নব্য পাশ্চাত্ত্য 'কিউবিজম্' হইতে। দুইটি সমীহ উদ্রেক করিবার মতো পরিচয়পত্র। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা, যাহাকে ঘরোয়া কথায় 'ইন্ডিয়ান আর্ট' বলা হয়, তাহার সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির আসল মনের ভাব যাহাই হউক মুখের কথা আর অশ্রদ্ধাসূচক নয়। গেল বছর চল্লিশের মধ্যে এই চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি কায়েমী হইয়া বসিয়াছে, সমস্ত ভারতবর্ষ উহাকে গ্রহণ করিয়াছে, চিত্রসমালোচকমাত্রেই উহার অবিশ্রাম প্রশংসা করিতেছেন। এমন-কি সাহেবরা পর্যন্ত উহার বাহবা দিতেছেন। প্রতিষ্ঠার এতগুলি লক্ষণ ও প্রমাণ যাহার পিছনে রহিয়াছে তাহাকে কে শ্রদ্ধা না করিয়া পারে? কিউবিজম্-এর সম্ভ্রম আরো বেশি। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলার একেবারে হালের খবর রাখেন না, তাঁহাদের ধারণা কিউবিজম্ একটা অত্যন্ত অভিনব ও ফ্যাশন-দোরস্ত জিনিস। একে ফ্যাশন, তার ওপর প্যারিসের ফ্যাশন, তাই কিউবিজম্-ও নমস্য।

এই দুই সুপারিশের জোরে গগনেন্দ্রনাথের চিত্র সমাদর পাইয়া আসিয়াছে। এই জিনিসটা কিন্তু খুবই আশ্চর্যকর, কারণ নব্যবঙ্গীয় চিত্র ও 'কিউবিষ্ট' চিত্র, এ দুই-এর মধ্যে পার্থক্য এত বেশি, শুধু পার্থক্য বলি কেন, দুটি এত বিপরীতধর্মী যে গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের পক্ষে একসঙ্গে দুই-এরই সুপারিশ পাওয়া ততটুকুই সম্ভব, কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে সমবেতভাবে মুসলীম লীগ ও হিন্দু-মহাসভার অনুমোদন পাওয়া যতটুকু সম্ভব। যাহা আমাদের কাছে লাল ও বৃত্তাকার বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহা একই সঙ্গে নীল ও চতুষ্কোণ বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে না। তেমনই গগনেন্দ্রনাথের চিত্র নব্যবঙ্গীয় হইলে উহা 'কিউবিষ্ট'-ধর্মী হইতে পারে না। কিউবিষ্ট-ধর্মী হইলে নব্যবঙ্গীয় হইতে পারে না। আসল কথা এই, গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের আর যে গুণ বা লক্ষণই থাকুক না কেন, তাঁহার তরফ হইতে নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা ও কিউবিজমের অযাচিত সুপারিশের কোনো মূল্য নাই। দুটিই অবান্তর। এ দুটির কোনোটির সহিতই তাঁহার নাড়ীর যোগ নাই।

গগনেন্দ্রনাথ ও নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা

গগনেন্দ্রনাথ নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথের ভাই না হইলে, ঠাকুর-বংশীয় না হইলে, তাঁহার চিত্রগুলি বরাবরই নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার প্রদর্শনীতে বিন্যস্ত না হইলে, এক কথায় নব্যবঙ্গীয় চিত্রের সহিত তাঁহার কয়েকটা কাকতালীয় সংযোগ না থাকিলে, কেহ তাঁহার চিত্রকে নব্যবঙ্গীয় 'স্কুলে'র অন্তর্ভুক্ত করিবার কল্পনাও করিত কিনা সন্দেহ। বরঞ্চ এটাই আশ্চর্য কথা নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার এত কাছে থাকিয়াও, নব্যবঙ্গীয় চিত্রের অনুপ্রেরণা যিনি জোগাইয়াছেন সেই রবীন্দ্রনাথের ও এই অনুপ্রেরণাকে যিনি চিত্ররূপ দিয়াছেন সেই অবনীন্দ্রনাথের সাহচর্যে সারাজীবন কাটাইয়াও, কি করিয়া গগনেন্দ্রনাথ নিজেকে নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার সম্পর্ক হইতে এতটা মুক্ত রাখিতে পারিয়াছেন।

নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার সহিত তাঁহার পার্থক্য বিবেচনা করিলে কয়েকটা জিনিস চোখে পড়ে। প্রথমত, তাঁহার সব ছবি এক ধরনের নয়। অঙ্কনরীতি, বিষয়বস্তু, চিত্রধর্ম, যেদিক হইতেই দেখা যাক না কেন, গগনেন্দ্রনাথের চিত্রে স্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে। এই শ্রেণীগুলি বিবেচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, তাঁহার একার চিত্রে যতটা বৈচিত্র্য সমগ্র নব্যবঙ্গীয় 'স্কুলে'র মধ্যেও ততটা বৈচিত্র্য নাই। অবনীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া নব্যবঙ্গীয় 'স্কুলে'র হালের নবীন চিত্রকর পর্যন্ত সকলের কাজের মধ্যে নানা পার্থক্য সত্ত্বেও বেশ একটা আদল পাওয়া যায়। গগনেন্দ্রনাথের একশ্রেণীর চিত্র ও অন্য শ্রেণীর চিত্রের মধ্যে ততটুকুও আদল নাই।

আরো আশ্চর্যের কথা, এই বহুমুখিনতা তিনি একই সঙ্গে বজায় রাখিয়াছেন। আধুনিক চিত্রকর এক ধরন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটা ধরনে অতিসহজেই যে আসিয়া পৌঁছিতে পারেন তাহার সবচেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত, পাবলো পিকাসো। কিন্তু চিত্রধর্মের এই পরিবর্তন সাধারণত চিত্রকরের বিভিন্ন বয়সে দেখা দেয়। উহা ধর্মান্তর গ্রহণের

মতো, এক ধর্ম গ্রহণের পর কেহ আর পুরাতন ধর্মে ফিরিয়া যায় না। গগনেন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁহার ধরনগুলি একসঙ্গে চালাইয়াছেন, তথাকথিত রূপক চিত্রের সঙ্গে একই প্রদর্শনীতে একেবারে অন্যধরনের পূর্ববঙ্গের দৃশ্য দেখাইয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছেন। এই যে বৈচিত্র্য ও বহুদেশদর্শিতা উহা নব্যবঙ্গীয় চিত্রে একেবারে বিরল।

দ্বিতীয়ত, কি বিষয়বস্তুতে কি অঙ্কনপদ্ধতিতে গগনেন্দ্রনাথ নব্যবঙ্গীয় স্কুল হইতে একেবারে বিভিন্ন। পৌরাণিক কাহিনী তিনি সাধারণত বর্জন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার বর্ণবিন্যাস এবং রেখাপাতও সম্পূর্ণ নিজস্ব। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকরেরা যে 'প্যালেট' ব্যবহার করিয়াছেন, গগনেন্দ্রনাথ সেই 'প্যালেট' ব্যবহার করেন নাই। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকরেরা নির্ভর করিয়াছেন প্রধানত রেখার উপর, গগনেন্দ্রনাথ নির্ভর করিয়াছেন 'ছোপে'র উপর। তাহা ছাড়া আলো-ছায়ার সংঘাত তাঁহার চিত্রে খুবই বেশি, যাহা সাধারণত নব্যবঙ্গীয় চিত্রে নাই-ই বলা চলে। জায়গায় জায়গায় আলো-ছায়ার সংঘাতের তীব্রতায় তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর ইটালিয়ান চিত্রকর কারভাদ্‌জোকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সময়ে সময়ে তাঁহার এই তীব্রতাকে অত্যন্ত 'সেন্সেশ্যনাল', এমন-কি কৃত্রিম বলিয়াও মনে হয়। কিন্তু সে যাহাই হউক, আলো-ছায়ার খেলা সম্বন্ধে গগনেন্দ্রনাথের এই যে অতিজাগ্রত অনুভূতি, উহাও নব্যবঙ্গীয় স্কুলে অবর্তমান।

সবচেয়ে বড়ো কথা গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের যে কোনো শ্রেণীর কথাই ধরি না কেন, প্রত্যেকটিরই একটা বিশিষ্ট চিত্রধর্ম আছে। নব্যবঙ্গীয় স্কুল সম্বন্ধে তাহা বলা চলে না। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা অনেকটা নব্যবঙ্গীয় শিক্ষিত ব্যক্তির মতো, ধর্ম সম্বন্ধে ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা বর্জিত। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকরদের মধ্যে একদল আছেন যাঁহারা গোঁড়া গুরুবাদী। তাঁহারা ধর্ম কি জানিতে চাহেন না, কিন্তু মন্ত্র লইয়াছেন; গন্তব্যস্থানের পরোয়া রাখেন না, শখের বাহ্যিক নির্দেশ লইয়াছেন। গুরু বলিয়া দিয়াছেন, সেই পথ ধরিয়া চলিতে হইবে যাহা শহরের বহুদূর দিয়া বুড়ো শিবতলা, পদ্মদীঘি, দ্বাদশ দেউল, ভাঙা ঘাট ইত্যাদির পাশ ধরিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ সর্বপ্রকার বাস্তব সম্পর্ক বর্জন করিয়া রাধাকৃষ্ণ, রামলক্ষ্মণ, পঞ্চপাণ্ডবের মূর্তি স্মরণ করিতে করিতে মোগল বা রাজপুত 'কলমে'র অনুকরণ করিতে হইবে, পুরাতন পট আঁকড়াইয়া থাকিতে পারিলে আরো ভালো।

আর-একদল আছেন, যাঁহারা এত গোঁড়া নন, বরঞ্চ একটু বেশি উদার বা 'এক্লেক্টিক'ই বটেন। কিন্তু তাঁহারাও লক্ষ্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত নন। তাঁহাদের ধরন দেখিয়া অনেক সময়ে অ্যালিসের সহিত চেশায়ার পুসের কথা কাটাকাটির কথা মনে পড়ে।

> অ্যালিস জিজ্ঞাসা করিল— কোন রাস্তা ধরে যাওয়া উচিত আমায় অনুগ্রহ করে বলে দিন না?
> চেঃ পুঃ— তা নির্ভর করছে তুমি কোথায় যেতে চাচ্ছ তার ওপর।
> অ্যাঃ— যেখানেই হোক না, বিশেষ কিছু এসে যায় না আমার।
> চেঃ পুঃ— তা হলে যে কোনো রাস্তা ধর না কেন তাতেও কিছু এসে যাবে না।

অ্যাঃ— না, আমি বলছি কি কোনো একটা জায়গায় পৌঁছলেই হল।

চেঃ পুঃ— তা নিশ্চয়ই পৌঁছবে, শুধু যদি খানিকটা পথ হাঁটতে পার।

এইভাবে বহু নব্যবঙ্গীয় চিত্রকর ভারতীয়, চিনা, জাপানি, পারসিক, নানা বা যে কোনো একটা পথ ধরিয়া, বিশেষ কোনো জায়গায় পৌঁছিবার সংকল্প না রাখিয়াও একটা-না-একটা জায়গায় পৌঁছিবার আনন্দ পাইতেছেন।

গগনেন্দ্রনাথের পথচলা অন্য রকম। তিনি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিষ্কার একটা লক্ষ্য লইয়া বাহির হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অন্ততপক্ষে তাঁহার চিত্রের ধর্মনির্ণয় খুব কঠিন কাজ নয়।

গগনেন্দ্রনাথ ও কিউবিজম্

'কিউবিষ্ট' চিত্রকলার সহিত গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের পার্থক্য আরো বেশি। প্রকৃতপ্রস্তাবে দুটি জিনিস বিপরীতধর্মী। গগনেন্দ্রনাথ 'কিউবিষ্ট' চিত্রকর, এরকম একটা ভুয়ো কথা শিক্ষিতসমাজে প্রশ্রয় কি করিয়া পাইল তাহা একটা হেঁয়ালি। গগনেন্দ্রনাথের এ বিষয়ে মতামত কি ছিল তাহা প্রকাশ নাই, কিন্তু আসল 'কিউবিষ্ট'রা এই কথা শুনিলে যে ক্রোধে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিউবিজম্ চিত্রজগতের একরোখা পাগলামি, উহাকে লইয়া অকারণ রহস্য করিতে যাওয়া বিপজ্জনক। গগনেন্দ্রনাথ চতুষ্কোণ 'মোটিফ' ব্যবহার করিবার ইঙ্গিত কিউবিজম্ হইতে পাইয়াছেন, তাহা মানা যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়াই তিনি 'কিউবিষ্ট' চিত্রকর, এ-কথা যুক্তিসংগত নয়। তন্তু তাঁতিতেও বোনে মাকড়সাতেও বোনে, সেজন্য দুজনেই 'তন্তুবায়' নয়।

প্রথম আপত্তি, গগনেন্দ্রনাথ তাঁহার চিত্রে চতুষ্কোণ 'মোটিফ' যতটা ব্যবহার করিয়াছেন বৃত্তাংশ তাহার অপেক্ষা কিছুমাত্র কম ব্যবহার করেন নাই। 'কিউবিষ্টে'র কাছে কিউবই এক ও অদ্বিতীয়, কিউব ভিন্ন রূপ নাই। দৃশ্যজগতের যাবতীয় বস্তুকে চতুষ্কোণে অনুবাদ করিতে হইবে, এই সংকল্প লইয়াই কিউবিষ্টরা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দৃশ্যজগতে— অনন্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যের জগতে— বিশুদ্ধ সরলরেখা বা বিশুদ্ধ চতুষ্কোণ বলিয়া কোনো পদার্থ নাই, পক্ষান্তরে সব জিনিসই অল্পবিস্তর বৃত্তাংশ। এই অসমন্বয়ের সমন্বয় করিবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় 'কিউবিষ্ট'রা দৃশ্যজগতের স্বাভাবিক রূপকে ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার করিয়াছেন। তাঁহাদের আচরণের আসল তাৎপর্য বুঝাইবার জন্য গণিত হইতে একটা কাল্পনিক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ধরুন, কোনো গণিতজ্ঞের খেয়াল জন্মিল সব অখণ্ড সংখ্যাকে তিন দিয়া ভাগ করিলে ফল অখণ্ড সংখ্যাই হইবে, অর্থাৎ ছয় বা নয়ের মধ্যে তিন যেমন যায় আট ও দশের মধ্যেও তিন তেমনই যায়, যদি কার্যত না যায়, তাহা হইলে যেখানে যত অবশিষ্ট থাকিবে, সব ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে কারণ অঙ্কশাস্ত্রে তিনের 'মাল্টিপ্‌ল্' ভিন্ন সংখ্যা নাই। এই রকমের গোঁড়ামি গগনেন্দ্রনাথ কখনো দেখান নাই। তিনি জ্যামিতিক

ডিজাইন অবলম্বন করিয়াছেন বটে, কিন্তু শুধু কিউবও অবলম্বন করেন নাই, সকল দৃশ্যরূপকে চতুষ্কোণ ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টাও করেন নাই। এটা মনে রাখা উচিত।

ইহার উপরও আর-একটা গুরুতর আপত্তি আছে। কিউবিজমের লক্ষ্য ও গগনেন্দ্রনাথের লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিউবিজম্ ষোলো আনা 'ফর্ম-বাদী' অর্থাৎ 'কিউবিষ্ট' চিত্রকরেরা চিত্রে মানস আবেগের সামান্য একটু স্থান আছে বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছেন একেবারে নিভাঁজ দৃষ্টিগ্রাহ্য ডিজাইন তৈরি করিতে। ভাবে মনে হয়, তাঁহাদের মতো এই যে চিত্রের ডিজাইন যত জ্যামিতি ও জড়ঘেঁষা হইবে ততই ভালো, কারণ তাহা হইলে বাস্তবজগতের প্রায় প্রত্যেকটি জিনিসের আশ্লেষ হইতে মানুষের মন যে আবেগ সঞ্চয় করে দ্রষ্টা চিত্রে তাহা খুঁজিবে না, শুধু জ্যামিতিক (আসলে জ্যামিতির একটিমাত্র রূপ অর্থাৎ চতুষ্কোণ রূপের প্রয়োগের দ্বারা সৃষ্ট) সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য দেখিয়াই তৃপ্ত হইবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে 'কিউবিষ্ট' চিত্র দেখা দাবার ছককে চিত্র হিসাবে দেখার মতো সৌন্দর্যানুভূতি। কিন্তু মনে রাখিবেন এই নূতন রকম দাবার ছকে চাল-বেচালের উত্তেজনা নাই, উহা রাজা-মন্ত্রী গজ-নৌকাহীন হিমশীতল ডিজাইন মাত্র।[১]

পক্ষান্তরে গগনেন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন, মানস আবেগ সৃষ্টি করিতে। সুন্দর ও নিখুঁত ডিজাইন সৃষ্টি করিতে তিনি সুপটু, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি ডিজাইনেই পর্যবসিত নয়। ডিজাইন জ্যামিতিকই হউক কিংবা অন্য ধরনেরই হউক, চতুষ্কোণই হউক কিংবা বৃত্তাংশই হউক, গগনেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য স্বভাব-সম্পর্কবর্জিত নিভাঁজ 'কর্ম' সৃষ্টি নয়। তিনি ডিজাইনের দ্বারা নানা শ্রেণীর চিত্রে নানা ধরনের মানস অনুভূতি ও আবেগ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন, মানস আবেগ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু ডিজাইনকে বিশুদ্ধ ডিজাইন হিসাবেই আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন নাই। ফলে তাঁহার চিত্র দেখিয়া দ্রষ্টার মন কোনো ক্ষেত্রে কৌতূহলী হয়, কোনো ক্ষেত্রে বিচার ও বিতর্ক মুখীন হয়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু পর্যাকুল হইয়া উঠে, যে পর্যাকুলতার কথা কালিদাস রাজার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

> "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
> পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।"

---

১ বাস্তবানুকারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জ্যামিতিক ডিজাইনের প্রতি ঝোঁক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ইতিহাসে এই প্রথম নয়। গ্রীকোরোমান সভ্যতার শেষ পর্বে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে উহা দেখা গিয়াছিল। পঞ্চম শতাব্দী হইতে এই আন্দোলন হেলেনিস্টিক আর্টের ন্যাচরালিজ্‌মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। যাহা কিছু স্বভাবানুযায়ী মনুষ্য ও জীবদেহের অবিকল প্রতিচ্ছবি তাহাও তখন নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। ইহার ফলে পঞ্চম হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ার শিল্পে সুগঠিত মনুষ্য বা জীব মূর্তি অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কে জানে, অতি আধুনিক ইউরোপীয় আর্টের বাস্তববিরোধিতা রোমান সাম্রাজ্যের শেষযুগের বাস্তববিরোধিতার মতো একটা সংস্কৃতির (অর্থাৎ ক্ল্যাসিকাল ইউরোপীয় সভ্যতার) সায়ংকালের ছায়া কিনা?

২
চিত্রকলা ও বাস্তব

আমার বিশ্বাস এই ভাবপ্রবণতাই গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুতরাং তাঁহার চিত্রাবলীর লক্ষণ বিশ্লেষণ, স্টাইল ও পদ্ধতির আলোচনা, দোষগুণ বিচার, ভাবকে মুখ্য প্রসঙ্গ করিয়া ও ভাবকে কেন্দ্র ধরিয়াই করিতে হইবে। কিন্তু শুধু এই কথা বলিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না, কারণ তাহা হইলে একেবারে গোড়াকার সূত্রই অস্ফুট থাকিয়া যাইবে। ভাবপ্রবণ চিত্র কি, অন্য ধরনের চিত্র হইতে উহার প্রভেদ কোথায়, ভাব বলিতে চিত্রকলায় ঠিক কোন জিনিসটা বোঝায়, চিত্রে ভাবের স্থান কি, ভাবেতর অন্য জিনিসেরই বা স্থান কি, চিত্রকলায় ভাব নানারকমের হইতে পারে কিনা, তাহা হইলে ভাবের শ্রেণীবিভাগই বা কি, চিত্রসমালোচনা করিতে নামিয়া এই-সকল প্রশ্ন এড়াইবার উপায় নাই, অথচ উত্তর দেওয়া সহজ কাজ নয়। সকল কথা পরিষ্কার করিবার স্পর্ধা রাখি না, কিন্তু মোটের উপর যে প্রস্তাবের উপর গগনেন্দ্রনাথের চিত্রবিচার খাড়া করিতে যাইতেছি, উহার একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

একটি ফ্যাশনেবল্ থিওরি

চিত্রকলায় ভাবের অবলম্বন যাহা চিত্রকলার মুখ্য অবলম্বনও তাহাই— অর্থাৎ বাস্তববস্তুর প্রতিচ্ছবি। স্বভাবানুকৃতিকে বাদ দিয়া, অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের রূপকে বর্ণে রেখায় অনুকরণ করিবার চেষ্টা না করিয়া, কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে পটের উপর বাস্তব বস্তুর ভ্রম জন্মাইবার চেষ্টা না করিয়া চিত্রকলা সম্ভব, এই কথাটা হালে পাশ্চাত্ত্যে, সুতরাং পাশ্চাত্ত্যের দেখাদেখি আমাদের দেশেও, চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ভদ্রতার খেলাপ করিয়াও বলিতে হইবে— এই ফ্যাশনেবল্ থিওরিটি নির্জলা ধাপ্পাবাজী। এই ফ্যাশনেবল্ থিওরিটি মানিয়া লইলে আর দুইটি প্রস্তাবও বিনা বাক্যব্যয়ে মানিয়া লইতে হইবে। সে দুটি এই— (১) নকশা বা অলংকারই চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন; (২) পুরাতন প্রস্তরযুগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যাহা চিত্র বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে তাহা মোটেই চিত্র নয়।

স্বভাবানুকারিতা বা বাস্তবের প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি যদি চিত্রে নিষ্প্রয়োজন বা দূষণীয় হয় তাহা হইলে শাল কিংখাব বিদ্রির কাজ, মন্দির মসজিদে ও মকবরার দেয়ালের কারুকার্য, চিনামাটির উপর রঙ ও রেখার অদ্ভুত খেলা, এই-সকলকে চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিতে বাধা কি? মোগল ছবির ছবিটুকু বাদ দিয়া হাঁসিয়াটুকু লইয়া মাতামাতি করিবার বিপক্ষেই বা কি যুক্তি আছে? বাস্তব বস্তুর বিকৃত বা অবিকৃত প্রতিচ্ছবির সহায়তায় চিত্রকর যত সুন্দর 'কম্পোজিশ্যন'ই সৃষ্টি করুন না কেন, তাহা কি কখনো বিশুদ্ধ অলংকার বা কারুকার্য হিসাবে পূর্বোক্ত জিনিসগুলির সমান হইয়াছে, না হইতে

পারে? অথচ কোনো যুগে কেহই কারুকার্যকে চিত্র বলিয়া স্বীকার করে নাই, কারুকার্য শত মনোরম হইলেও উহাকে চিত্রের সম্মান দেয় নাই। বিশুদ্ধ অলংকার সর্বদাই অন্য বড়ো কোনো সৃষ্টির মণ্ডন বলিয়া গণ্য হইয়াছে, উহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে আসল চিত্র ও ভাস্কর্যের নীচে।

উপরোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া শুধু এইটুকু মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মামুলি চিত্রকলাতেও 'কম্পোজিশ্যন' বলিতে যাহা বুঝায় তাহারো নামগন্ধ অজন্তার বড়ো চিত্রগুলিতে নাই। এগুলি ফঁ দ্য গোম বা আলতামিরার গুহাগাত্রে প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানবের দ্বারা চিত্রিত বাইসন, অতিকায় হস্তী প্রভৃতির ছবির মতোই যথাতথা বিন্যস্ত। তাই বলিয়া কি অজন্তার ছবি চিত্রকলার নিদর্শন নয়?

অবশ্য এ-কথা ঠিক যে, আধুনিক আর্ট-ক্রিটিকরা পুরাতন চিত্রকলার নূতন তাৎপর্য বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা পুরাতন চিত্রকে বিশুদ্ধ ডিজাইন হিসাবে, 'সিগ্‌নিফিক্যান্ট ফর্ম' বা 'অর্থপূর্ণ রূপ' হিসাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন। ইঁহাদের মতে চিত্রে বিষয়বস্তুর স্থান নাই, উহার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় স্থানগত সম্পর্ক (স্প্যাশিয়াল রিলেশ্যন্‌স্)। কিন্তু এই প্রসঙ্গে দার্শনিক স্যামুয়েল আলেকজান্ডার একটি যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,

> "এক ধরনের চিত্র থাকা সম্ভব যাহার উদ্দেশ্য নিছক 'অর্থপূর্ণ রূপ', যাহাকে বিশ্লেষণ করিলে স্থানগত সম্পর্ক ও রঙ ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু 'অর্থপূর্ণ রূপ' কোনো না কোনো জিনিসের অর্থ প্রকাশ নিশ্চয়ই করে। এমন-কি সংগীত যে-সকল আর্টের তুলনায় সব চেয়ে বেশি বস্তুগন্ধহীন, যে সংগীতের সহিত এই নবীনপন্থীরা চিত্রকলাকে লীন করিতে চান, হান্‌স্‌লিকের সুবিখ্যাত উক্তি অনুযায়ী সেই সংগীতের বিষয় গতির ধারণা। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে 'কিসের রূপ', 'কিসের অর্থ এই দুইটি প্রশ্ন চিত্রকলা কি করিয়া এড়াইতে পারে তাহা বোঝা কঠিন।" (স্যামুয়েল আলেকজান্ডার— "আর্ট অ্যান্ড ইন্‌স্টিন্‌ক্ট" শীর্ষক প্রবন্ধ, "ফিলসফিক্যাল অ্যান্ড আদার পিসেজ", পৃ. ২৫৫)

পাশ্চাত্ত্য চিত্রকরদের সাক্ষ্য

কিন্তু আধুনিক দার্শনিকের কথা বাদ দিলেও চিত্রকলার বিষয়বস্তু বর্জিত ব্যাখ্যার জড় বড়ো বড়ো চিত্রসমালোচক ও চিত্রকররাই মারিয়া রাখিয়াছেন। চিত্রকলা বাস্তব বা স্বভাবের অনুকরণের উপরই যে প্রতিষ্ঠিত এই কথাটা লেওনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁহার সুবিখ্যাত নোটবুকের বহু স্থলে একেবারে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। এখানে তাঁহার দুই একটি মাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। কবি ও চিত্রকরের তুলনা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন,

> "আকৃতি, কর্ম ও দৃশ্যকে কাব্য বর্ণনা করিবার চেষ্টা করে, চিত্রকর এই সকল দৃশ্যবস্তুকে পুনরাবির্ভূত করিবার উদ্দেশ্যে উহাকে অবিকল প্রতিচ্ছবি উপস্থাপিত করে। মানুষের পক্ষে

কোন্ জিনিসটা বেশি আবশ্যক— মনুষ্যনাম না মনুষ্যমূর্তি, তাহা বিবেচনা কর। দেশ পরিবর্তনের সঙ্গে নাম পরিবর্তন হয়; কিন্তু এক মৃত্যু ভিন্ন অন্য উপায়ে রূপ পরিবর্তিত হয় না।" [ম্যাক্‌কার্ডি সম্পাদিত ইংরেজি সংস্করণ, ২য় খণ্ড পৃ. ২২৭]

একটু পরেই তিনি আবার বলিতেছেন,

"চিত্রকলা প্রকৃতির চক্ষুগোচর সকল সৃষ্টির একমাত্র অনুকরণকারী।" (উপরোক্ত পুস্তক, পৃ. ২২৯)

ইহার অপেক্ষাও সাংঘাতিক একটা কথা লেওনার্দো বলিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার মতে "দর্পণই চিত্রকরদের গুরু!" (উপরোক্ত পুস্তক, পৃ. ২৫৪)

আর-এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন,

"যুগে যুগে চিত্রকলার পতন ও অধোগতি হইয়াছে তখনই যখন চিত্রকরেরা পূর্ববর্তী চিত্রকরদের চিত্র ভিন্ন অন্য আদর্শ পায় নাই। অন্যের সৃষ্টিকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়া চিত্রকর যে চিত্র সৃষ্টি করিবে উহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর হইবে কিন্তু সে যদি স্বাভাবিক বস্তু হইতে শিক্ষালাভের চেষ্টা করে তাহা হইলে সুফল লাভ করিবে।"

ইহার পর রোমান আর্ট ও জোত্তোর দৃষ্টান্ত দিয়া লেওনার্দো আবার বলিতেছেন,

"তাঁহার অর্থাৎ জোত্তোর পরও চিত্রকলার আবার অবনতি হয়, এবং ফ্লোরেন্সবাসী তম্মাসো, যাঁহার জনপ্রচলিত নাম মাসাচ্চো, তাঁহার কাল পর্যন্ত শত শত বৎসর ধরিয়া এই অবনতি চলিতে থাকে। মাসাচ্চো, তাঁহার চিত্রের উৎকর্ষের দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, সকল চিত্রগুরুর শ্রেষ্ঠ গুরু প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কোনো আদর্শ যাঁহারা অবলম্বন করেন তাঁহারা বৃথা শ্রম করিতেছেন।" (উপরোক্ত পুস্তক, পৃ. ২৭৬)

এই উক্তির মধ্যে নব্যভারতীয় চিত্রকলার জন্য কি কোনো নির্দেশ নাই? লেওনার্দো চিত্রকর হিসাবে যাহা বলিয়াছেন জর্জো ভাজারি চিত্রকর ও চিত্রকলার ইতিহাস লেখক হিসাবে ঠিক তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। লেওনার্দোর সুবিখ্যাত 'মোনা লিজা' সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,

"চিত্রকলা কত অবিকলভাবে স্বভাবকে অনুকরণ করিতে পারে তাহা যদি কেহ দেখিতে চায় তাহা হইলে এই মাথাটি হইতে সে সহজেই বুঝিতে পারিবে, কারণ অঙ্কন-কৌশলের দ্বারা যতটুকু সম্ভব সেই সবটুকু সূক্ষ্মতাই ইহাতে অনুকৃত হইয়াছে। দেখ, জীবন্ত মানুষে যাহা দেখা যায় এই চোখেও সেই জ্যোতি ও তারল্য, আর চক্ষুর চারিদিকে সেই গোলাপ ও মুক্তার বর্ণ, আরো দেখ অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত আঁকা পক্ষযুগ্ম।"

তার পর ভ্রূ, নাসা, মুখ ও ওষ্ঠাধরের স্বাভাবিকতার প্রশংসা করিয়া ভাজারি বলিতেছেন,

"গলদেশের নিম্নাংশের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলে মনে হইবে যেন ধমনীর স্পন্দন দেখিতে পাইতেছি।" (ডি. ভিয়ার কর্তৃক অনূদিত ও লি-ওয়ার্নার কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০০-১০১)

প্রাচ্য ধারণা

কেহ এ-কথা বলিতে পারিবেন না যে, চিত্রে বাস্তবানুকারিতা ও স্বাভাবিকতার এই প্রশংসা শুধু পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলা ও চিত্রসমালোচনারই লক্ষণ, প্রাচ্যে উহা নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রাচ্যে এই ব্যাপারটা আরো বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্য, ইতিহাস ও কলাসমালোচনা হইতে যতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়, চিত্রকলায় প্রাচ্য দেশেও সকলেই স্বভাবানুকারিতা এবং বাস্তব জগতের প্রতিচ্ছবি খুঁজিয়াছে। 'আদর্শ' বা 'ভাব' বলিয়া যে ধোঁয়াটে জিনিসটা আধুনিক লেখকরা প্রাচ্য আর্টের উপর চাপাইতে চাহিতেছেন উহার আসল অস্তিত্ব নাই। দৃষ্টান্ত হিসাবে ভারতীয় চিত্রের কথাই প্রথমে ধরা যাক।

ভাজারি 'মোনা লিজা' চিত্রের যে ধরনের প্রশংসা করিয়াছেন, শকুন্তলা নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে বিদূষককে দিয়া কালিদাস কি শকুন্তলাচিত্রের বা চিত্রগতা শকুন্তলার (দুই-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য কবি করেন নাই) ঠিক সেই ধরনের প্রশংসা করান নাই? বিদূষক বলিতেছে,

> "সাধু বয়স্য, মধুরাবস্থানদর্শনীয়ো ভাবানুপ্রবেশঃ। স্খলতি এব মে দৃষ্টিনিম্নোন্নত প্রদেশেষু।[২] কিং বহুনা সত্ত্বানুপ্রবেশশঙ্কয়া আলপন কৌতূহলং মে জনয়তি।" (বুঝিবার সুবিধার জন্য মূল প্রাকৃত না দিয়া বিদূষকের উক্তির সংস্কৃত ভাষান্তর উদ্ধৃত করিলাম।)

ইহার কিছু পরে বিদূষক আবার বলিতেছে,

> "ভোঃ কিং নু তত্রভবতী রক্তকুবলয়শোভিনা অগ্রহস্তেন মুখমাবার্য্য চকিতচকিতা ইব স্থিতা। (সাবধানং নিরূপ্য) আঃ এষ দাস্যাঃ পুত্র কুসুমরসপাটচ্চরস্তত্রভবত্যা বদনকমলমভিলঙ্ঘতে মধুকরঃ।"

রাজাও উত্তর দিয়া বসিলেন,

> "ননু বার্য্যতামেষ ধৃষ্টঃ।"

শুধু একটি নয়, চিত্র বাস্তবেরই ভ্রম— এই ধারণা সূচনা করে এরূপ বহু প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত করা যায়। নাটকের মধ্যে মালবিকাগ্নিমিত্র, রত্নাবলী, নাগানন্দ, মালতীমাধব, উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, কর্পূরমঞ্জরী ও অন্যত্র চিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। সর্বত্রই চিত্র সম্বন্ধে বক্তব্য ও মনোভাব এক— চিত্র বাস্তবজগতের

---

২ 'নিম্নোন্নত প্রদেশে'র উল্লেখ শকুন্তলার অঙ্গলাবণ্যের প্রতি বিদূষকসুলভ শ্লেষ নয়, রাজার চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা বলিয়া মনে হয়। 'নিম্নোন্নত' কথাটি সম্ভবত পারিভাষিক। বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণের চিত্রসূত্রেও উহা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হইয়াছে "নিম্নোন্নত বিভাগং চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ।" ৩য় খণ্ড, ৪৩ অধ্যায়, ২৯ শ্লোক) এই কথার অর্থ কি 'প্ল্যাস্টিসিটি' বা 'রিলিফ' হইতে পারে না? উচ্চতানীচতা বা বস্তুর তিন ডাইমেনশ্যন দেখানই চিত্রকলার সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা। বিদূষক সম্ভবত বলিতে চাহিতেছে রাজা উহাতে খুব কৃতকার্য হইয়াছেন।

প্রতিচ্ছবি। চিত্রসংক্রান্ত বিধিনির্দেশেও এই একই কথা। বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণের চিত্রসূত্রে বলা হইয়াছে, চিত্রের আটটি গুণের মধ্যে একটি গুণ— "সাদৃশ্য"। আরো সবিস্তারে বলা হইতেছে—

> "শূন্যদৃষ্টিং চেতনারহিতং বা স্যাত্তদশস্তং প্রকীর্ত্তিতম," "হসতীব চ মাধুর্য্যং সজীব ইব দৃশ্যতে।"

আরো পরিষ্কার কথা—

> "সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম্।" (বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণ ৩য় খণ্ড, ৪৩ অধ্যায়, ১৯-২২ শ্লোক)

ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্যের ব্যাপার স্বভাবানুকৃতি সম্বন্ধে চিনা চিত্রকরদের মনোভাব। প্রাচ্য চিত্রকলার মধ্যে চিনা চিত্রকলাই বেশি 'ভাব'-ঘেঁষা। এমন-কি একজন চিনা চিত্রকর (নি-জান, চতুর্দশ শতাব্দী-য়ুয়ান যুগ) বলিয়াছেন,

> "আমি যাহাকে চিত্র বলি তাহা তুলির অযত্নকৃত খেয়াল ছাড়া কিছু নয়, সাদৃশ্য উহার লক্ষ্য নয়, উহার উদ্দেশ্য চিত্রকরের চিত্তবিনোদন।" (আর্থার ওয়েলি, "অ্যান্ ইন্‌ট্রোডাকশ্যন টু দি ষ্টাডি অফ চাইনিজ পেন্টিং", পৃ. ২৪৩)

এই চিনারাও বাস্তবানুকরণকে চিত্রকলার প্রধান অবলম্বন বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। শিয়ে হো (পঞ্চম শতাব্দী, "ছয়-বংশ" যুগ)— যিনি চিত্রকলার ষড়ধর্মের প্রণেতা হিসাবে বিখ্যাত— তাঁহার ষড়ধর্মের বেশির ভাগই স্বভাবের অনুকরণ সম্বন্ধে। এই প্রসঙ্গে ওয়েলি বলিতেছেন,

> "প্রথম ধর্মটি না থাকিলে আমরা সিদ্ধান্ত করিতাম শিয়ে হো'র আদর্শ সবর্ণ ফোটোগ্রাফির আদর্শ।" (উপরোক্ত পুস্তক, পৃ. ৭৩)

শুধু একটি ধর্মে তিনি 'ভাব-সামঞ্জস্য' ও 'জীবন্ত গতি'র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহার অর্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতরা সুনিশ্চিত নন।

আর-একজন 'ভাব'-প্রধান চিনা চিত্রকরের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া চিনা নজির সমাপ্ত করিব। ইনি ওয়াং-লি (চতুর্দশ শতাব্দী)। ওয়াং-লি বলিতেছেন,

> "যদিও চিত্রকলা আকৃতির প্রতিচ্ছবি তবু 'ভাব'ই (অর্থাৎ চিত্রিত বস্তুর 'ভাব') উহাতে প্রাধান্য পায়। ভাবকে অবহেলা করিলে, শুধু প্রতিচ্ছবি-সৃষ্টির সার্থকতা নাই। কিন্তু এই 'ভাব' আকৃতির ভিতর দিয়াই প্রকাশ পায়, এবং আকৃতি ভিন্ন প্রকাশ্য নয়। আকৃতির প্রতিচ্ছবি-সৃষ্টিতে সাফল্য লাভ যে করিয়াছে সে দেখিবে ভাব আসিয়া এই আকৃতিকে পূর্ণ করিবে। কিন্তু আকৃতির প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করিতে যে অক্ষম সে দেখিবে শুধু ভাবই নয়, সবই গিয়াছে।"

ইনিও লেওনার্দোর মতো চিত্রকরকে প্রাকৃতিক বস্তু দেখিতে ও প্রকৃতি হইতে আঁকিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের সহিত লেওনার্দোর উপদেশের সাদৃশ্য কতটুকু দেখুন। তিনি বলিতেছেন,—

"কেহ যখন কোনো জিনিস আঁকিতে আরম্ভ করে তখন সে চায় বস্তুটার সহিত তাহার চিত্রের সাদৃশ্য থাকিবে। কিন্তু জিনিসটার সহিত চাক্ষুষ পরিচয়ও যদি তাহার না থাকে তাহা হইলে কি করিয়া উহা সম্ভব হইতে পারে? পুরাতন চিত্রগুরুরা কি অন্ধকারে হাতড়াইয়া কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন? এই যে লোকগুলি নকল করিয়া সময় কাটায়, নির্বাচিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাহাদের অনেকেরই পরিচয় শুধু অন্যের ছবির ভিতর দিয়া, উহারা ইহার অপেক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয় না। প্রত্যেকটি নকলেই সত্য আরো দূরে সরিয়া পড়ে। ক্রমশ আকৃতি নষ্ট হয়, আকৃতির বিলোপের পর ভাবের অস্তিত্বও সম্ভব নয়।

"এক কথায় বলিব, হুয়া পর্বতের আকৃতি না জানা পর্যন্ত আমি কি করিয়া উহার ছবি আঁকিতাম? উহাকে দেখিবার এবং বাস্তব হইতে উহাকে আঁকিবার পরও উহার 'ভাব' অপরিণত ছিল? পরে আমার গৃহে নির্জনে বসিয়া উহার ধ্যান করিতে লাগিলাম; বাহিরে বেড়াইবার সময়েও তাহাই করিতাম; শয়নে, ভোজনে, সংগীত শুনিবার সময়ে, কথাবার্তা ও রচনার অবকাশেও তাহাই করিতাম। একদিন বিশ্রাম করিতেছি এমন সময়ে শুনিলাম বাঁশী ও মৃদঙ্গ বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছে। পাগলের মতো লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম, 'পাইয়াছি'। তারপর পুরাতন খসড়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার আঁকিলাম। এবারে একমাত্র হুয়া পর্বতই আমার পথনির্দেশক। 'স্কুল' ও 'ষ্টাইলে'র যে ভাবনা সাধারণত চিত্রকরের মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে আমি তাহার কথা চিন্তাও করিলাম না।" (উপরোক্ত পুস্তক, পৃ. ২৪৫)

ওয়াং-লি'র এই উক্তি পড়িবার সময়ে প্রণিধান করিতে হইবে তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন, চিত্রের আকৃতি ও 'ভাব' দুই-এরই প্রেরণা মূল প্রাকৃতিক বস্তু হইতে আসে।

চিনাদের পর মুসলমান চিত্রকরদের বহু নজির দিতে পারিতাম। স্থানাভাবে ও বাহুল্যভয়ে ক্ষান্ত হইলাম। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পারস্যের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বিহ্‌জাদের যশের একটি কারণ ইহাই যে, তাঁর তুলিকাস্পর্শে জড় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

চিত্রে প্রধান অবলম্বন

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্ত্যে কোথাও চিত্রকর, চিত্রসমালোচক, ও চিত্রের সমঝদারদের মধ্যে এই ধারণা কখনো ছিল না যে, স্বভাবানুকৃতি বা দৃশ্যমান জগতের প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি বাদ দিয়া ছবি আঁকা যাইতে পারে— বা, এমন-কি, দেখা পর্যন্ত যাইতে পারে। সুতরাং বাস্তবের অনুকরণই যে চিত্রের প্রধান অবলম্বন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রতিচ্ছবি-বর্জিত চিত্র শুধু যে ডেনমার্কের যুবরাজবর্জিত হ্যামলেট নাটক তাহাই নয়, সকল পাত্রপাত্রী বর্জিত নাটক। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে উহা চিত্রই নয়— কারুকার্য হইতে পারে, কিন্তু কারুকার্য হিসাবেও আসল কারুকার্য যাহাকে বলে তাহার অপেক্ষা নিম্নস্তরের ব্যাপার।

এই প্রসঙ্গে অনেকে বলিয়া থাকেন, চিত্রকলা ফোটোগ্রাফি নয়। কথাটা অনাবশ্যক, অবান্তর, এমন-কি অর্থহীন। কাব্য উপন্যাস সমালোচনা করিতে গিয়া আমরা কখনো বলি, কাব্য ইতিহাস নয়, উপন্যাস খবরের কাগজ নয়? সাহিত্যবোধযুক্ত ব্যক্তির কাছে এই প্রশ্ন উঠেই না। বাস্তব জীবনের উপাদান ও কাব্য উপন্যাসের উপাদান যে একই জিনিস এ-কথা সে সহজভাবে মানিয়া লয়, নিরর্থক তর্ক করে না। প্রকৃত প্রস্তাবে এক স্থাপত্য ও সংগীত ছাড়া [৩] সব আর্টই বাস্তব জীবনের এক বা অন্য উপাদানের অনুকরণ। চিত্রকলাও তাহাই, বরঞ্চ সাহিত্য অপেক্ষাও চিত্রের ক্ষেত্রে কথাটা বেশি সত্য। বাস্তব জীবনের দৃষ্টিগ্রাহ্য উপাদানই চিত্রকলার প্রধান অবলম্বন ও একমাত্র উপজীব্য।

৩
আর্টে সৃষ্টি

বাস্তবানুকারিতা চিত্রকলার প্রধান অবলম্বন হইলেও চিত্রকলা শুধু বাস্তবানুকারিতাতেই পর্যবসিত নয়। [৪] বাস্তবের প্রতিচ্ছবি উহার আশ্রয় বটে, কিন্তু চিত্রকলাতে প্রতিচ্ছবি বা অনুকৃতির উপর আরো কিছু আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। এই নূতন উপাদান জোগায় চিত্রকরের মন। এদিক হইতে কবিতা বা উপন্যাসের সহিত চিত্রকলার কোনো প্রভেদ নাই। তিনটি আর্টই বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত, তিনটিই বাস্তবাতিরিক্ত কিছু, বাস্তবের রূপান্তর— সুতরাং সৃষ্টি।

---

৩ সংগীতেও বাস্তব জীবনের অনুকরণ যে নাই তাহা নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেতোফেনের ষষ্ঠ সিম্‌ফনিতে নদীর কলকল মেঘের গর্জন ও পাখির ডাকের অনুকরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সিম্‌ফনিটির দ্বিতীয় মুভমেন্টে ফ্লুটে বুল্‌বুলের, ওবয়ে তিতিরের ও ক্ল্যারিনেটে কোকিলের ডাকের অনুকরণ রহিয়াছে। কিন্তু সংগীত এবং স্থাপত্য মূলত একেবারে বাস্তব গন্ধহীন বা 'অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট' আর্ট। বেতোফেন নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, ষষ্ঠ সিম্‌ফনিতে পাখির ডাকের অনুকরণ তামাশামাত্র।

৪ এই সূত্রে একটা কথা বলিয়া রাখা ভালো মনে করি। চিত্রকলার প্রধান অবলম্বন বাস্তবের অনুকরণ বলিলাম বটে, কিন্তু অনুকরণ ব্যাপারটা সাধারণ লোকে যত সহজ বলিয়া মনে করে চিত্রকরের কাছে তত সহজ নয়, সাধারণে যত সহজবোধ্য মনে করে দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিকের কাছে তত সহজবোধ্যও নয়। প্রথমত, বাস্তবের অনুভূতি বা জ্ঞান নানা জনের নানাপ্রকার। দ্বিতীয়ত, বাস্তবকে নানা উপায়ে অনুকরণ করা যাইতে পারে; তৃতীয়ত, সমগ্র বা অখণ্ড বাস্তবকে চিত্রে অর্পণ করা সম্ভব নয়, নানাদেশে নানা জনে বাস্তবের নানা অংশ বাছিয়া লইয়া থাকে; চতুর্থত, চিত্রে বাস্তবকে অনুকরণ করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই সকল কারণে চিত্র বাস্তবানুকারী হইয়াও নানা রকমের হইতে পারে, এমন-কি সাধারণের চক্ষে অবাস্তব বলিয়াই মনে হইতে পারে। এই বড়ো প্রশ্নের আলোচনা গগনেন্দ্রনাথের সূত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু জিনিসটার জটিলতা ও সূক্ষ্মতার কিছু ধারণা যাঁহারা করিতে চান তাঁহারা হাইনরিশ ভোয়েল্‌ফলিন প্রণীত "প্রিন্সিপল্‌স্‌ অফ্‌ আর্ট হিষ্টরি" পুস্তকটি পড়িয়া দেখিতে পারেন।

নূতন ইমার্জেন্ট

চিত্রকলা যে সৃষ্টি, তাহা দুইটি চিত্রবিরোধী মত হইতে যেমন চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে অন্য কোথাও এত স্পষ্ট হইয়া উঠিতে আমি দেখি নাই। দুটি মতই উদ্ধৃত করিব। বিখ্যাত ফরাসি বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক-ধর্মসাধক-লেখক পাস্কাল চিত্রকলার প্রতি বিমুখ ছিলেন, অন্ততপক্ষে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি লিখিবার সময়ে তাঁহার বিরাগ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল সন্দেহ নাই। তিনি বলিতেছেন,

> "কি অসার মোহ চিত্রকলা! যে জিনিসকে মূলে দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই না, সেই জিনিসের সহিত সাদৃশ্যের বলে সে আমাদের প্রশংসা আকর্ষণ করে!" ('লে গ্রাঁজেক্রিভেঁ দ্য লা ফ্রাঁন্স', গ্রন্থমালা সংস্করণে পাস্কালের গ্রন্থাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫০)

মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে চিত্রকলা নিষিদ্ধ। কেন নিষিদ্ধ, তাহার সংবাদ লইলে মুসলমান ধর্মশাস্ত্রকারদের দ্বারা নরকবাস দণ্ডে দণ্ডিত চিত্রকরও সান্ত্বনা পাইবে। পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেয় বলিয়া নয়, ঈশ্বরের সৃষ্টির স্পর্ধিত অনুকরণ করিতে যায় বলিয়াই মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশে চিত্রকর মহাপাপী। চিত্রকর ঈশ্বরের শত্রু। বুখারীকৃত সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক হদিস সংগ্রহে আছে—

> "আল্লাহ্ বলেন আমার সৃষ্টির মতো সৃজন করিতে যায় যে ব্যক্তি তাহার অপেক্ষা অধিক জালেম আর কে হইতে পারে?" (অল-বুখারী সংকলিত শাহী বুখারীর যুইনবল -কৃত সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.১০৪ ৯০ নং)

তার পর আরো কথা আছে। বুখারী ধৃত আর-একটি হদিস এইরূপ,

> "ছবি অঙ্কন করে যাহারা, কেয়ামতের দিনে তাহারা দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা যাহা সৃষ্টি করিয়াছ, তাহাকে জীবন দান কর'।" (উপরোক্ত পুস্তক, পৃ. ১০৬ ৯৭ নং)

কিন্তু চিত্রকর তাহা পারিবে না ও উদ্ধত স্পর্ধার জন্য দণ্ডিত হইবে।

চিত্রকরকে মুসলমান সমাজ সৃষ্টিকর হইবার স্পর্ধায় স্পর্ধিত বলিয়া যে মনে করে তাহার আরো একটি প্রমাণ আছে। আরবি ভাষায় চিত্রকরের প্রতিশব্দ "মুস্ববি্বর"— অর্থাৎ "যে গঠন করে বা আকৃতি দেয়।" এই শব্দটি কোরানে স্বয়ং ভগবান সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। "তিনি ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা, নির্মাণকর্তা, গঠনকারী।" (কোরান, ৫৯ সুরা ২৪ আয়ৎ)

পাস্কাল ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রকার চিত্রকলার যে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন, উহার অপেক্ষা উচ্চ সার্টিফিকেট পাইবার ভরসা কোন্ চিত্রকর রাখে?

আর্ট যে সৃষ্টি মোটের উপর দার্শনিকরা তাহা মানিয়াই লইয়াছেন। যদিও আর্টকে বিশ্বসৃষ্টির অবিকল প্রতিরূপ মনে করা ভুল হইবে, আর আর্টিস্ট কর্তৃক আর্ট সৃষ্টিকে ভগবান বা ঐ প্রকার কোনো অনৈসর্গিক শক্তি কর্তৃক বিশ্বসৃষ্টির সমর্থক যুক্তি হিসাবে

গ্রহণ করা আরো ভুল হইবে, তবু মোটা কথায় বলা যাইতে পারে, বিশ্বসৃষ্টি যে "প্রোসেস্" আর্টকেও তাহার অন্তর্ভুক্ত করা যায় অথবা সেই 'প্রোসেস্' হইতে উদ্ভূত বলিয়া মানা যায়। এই প্রসঙ্গে আলেকজান্ডারের একটি কথা আমার নিকট অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও মূল্যবান বলিয়া মনে হইয়াছে। তিনি বলেন,

> দেশ-কালের ('স্পেস-টাইমে'র) সৃষ্টিপ্রেরণা ('নিসাস্') বিশ্বের নানাস্তরের ও নানাধরনের যে-সব অস্তিত্বের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, আর্ট সেই সৃষ্টিরই একটা ফল, জীবনের উচ্চতম রূপ বলিয়া যাহা আমাদের নিকট জ্ঞাত আর্ট উহারই একটা 'ঘটনা'। ("আর্টিষ্টিক ক্রিয়েশ্যন অ্যান্ড কস্‌মিক ক্রিয়েশ্যন" শীর্ষক প্রবন্ধ, আলেকজান্ডার প্রণীত ইতিপূর্বে উদ্ধৃত পুস্তক, পৃ. ২৭৮)

অধ্যাপক ল্যয়ড মরগ্যানের কথায় বলা যাইতে পারে আর্ট একটা নূতন "ইমার্জেন্ট"—বা আবির্ভাব।

আর্ট সৃষ্টি সন্দেহ নাই, কিন্তু কি সৃষ্টি? এটাই সব চেয়ে গুরুতর প্রশ্ন। সাধারণ লোকে যখন ছবি দেখে এই জিনিসটাই তাহার কাছে সব চেয়ে ঝাপসা ঠেকে। ছবি দেখিয়া উহারা যে-সকল মন্তব্য করে তাহা হইতে স্পষ্টতই মনে হয়, একটা ভাষা তাহাদের কানে যাইতেছে বটে, কিন্তু সে ভাষা তাহাদের অজানা। স্বভাবতই উহারা জানা ভাষার সাহায্যে অজানা ভাষার অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আর্টের ভাষায় ও তাহাদের জানা ভাষায় গুরুতর প্রভেদ থাকায় উহাদের কৃত অর্থ অনেক সময়ে চিত্রের আসল অর্থের বিকারে গিয়া দাঁড়ায়। কি সাধারণভাবে চিত্রের অর্থ বুঝিবার জন্য, কি গগনেন্দ্রনাথের চিত্র বুঝিবার জন্য, এই প্রশ্নটার একটা পরিষ্কার উত্তর খোঁজা প্রয়োজন।

চিত্র ডিজাইন নয়

চিত্রকরের সৃষ্টি ডিজাইন মাত্র নয় তাহা এরকম জোর করিয়াই বলা চলে। শুধু ছন্দ যেমন কবিতা নয়, শুধু তাল যেমন সংগীত নয়, শুধু স্টাইল যেমন উপন্যাস নয়, তেমনই শুধু ডিজাইনও চিত্র নয়, তা সে ডিজাইন যাহারই আঁকা হউক না কেন। ডিজাইন বা অলংকারজাতীয় বস্তু যত মনোরমই হউক না কেন, তাহা কখনো আমাদের মনকে চিত্রের মতো জোরে ঘা দেয় না, আমাদের সমস্ত সত্তাকে সে রকম উদ্বেলিত এবং আলোড়িত করিয়াও তুলে না। এই ধরনের মানসিক উত্তেজনার জন্য বাস্তবের প্রতিচ্ছবির আবশ্যক হয়। অবশ্য ইহা সত্য, দুই ডাইমেন্শ্যনে আবদ্ধ ডিজাইনের তুলনায় মনকে আকৃষ্ট ও বিচলিত করিবার শক্তি তিন ডাইমেনশ্যন যুক্ত ডিজাইনের বেশি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ-কথা বলিবার উপায় নাই যে, তিন ডাইমেনশ্যন যুক্ত ডিজাইনও মানুষের মনকে চিত্রের মতো আলোড়িত করিতে পারে। তাহার জন্য ডিজাইনের সহিত বাস্তবের প্রতিচ্ছবি যোগের আবশ্যক। দুই-এর সংযোগ, কাব্যে ধ্বনি,

অর্থ, ব্যঞ্জনা ও ছন্দের সংযোগের মতো মানুষের মনের মধ্যে একটা বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে। এই রসায়নের সূত্র এখন বাহির হয় নাই, কিন্তু চিত্র যে বিষয়সাপেক্ষ, শুধু ডিজাইন নয় তাহা সুনিশ্চিত।

প্রকৃতপ্রস্তাবে চিত্রের ডিজাইনের বিচার সমগ্র চিত্রের বিচার নয়। অবশ্য ডিজাইনের বিচার করিতে বাধা নাই, যেমন বাধা নাই কবিতার ছন্দের বিচার করিতে। আমরা ত কবিতার ব্যাকরণ লইয়াও আলোচনা করি। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক চিত্রের ডিজাইনের বিচার শুধু উহার অংশবিশেষের বিচার।

এমন-কি ইহাও বলা যাইতে পারে, 'ডিজাইন' সৃষ্টি চিত্রাঙ্কনের লক্ষ্য নয়, উহা উপায় মাত্র। কবিতায় কবির 'বক্তব্য' ছন্দের সাহায্যে তীব্রতর হইয়া উঠে। ছন্দের জন্য কবিতা মানুষের মনকে অপেক্ষাকৃত সহজে অভিভূত করিতে পারে। ছন্দ না থাকিলে শ্রোতার চিত্তে প্রবেশলাভ কবির পক্ষে আরো দুরূহ হইত। তেমনি চিত্রকরের 'বক্তব্য'— অর্থাৎ উপপাদ্য ডিজাইনের সহায়তায় আমাদের মনে আরো সহজে প্রবেশ করে, এবং আমাদিগকে আরো বেশি অভিভূত করে। অবশ্য এ-কথা বলিতেছি না যে, ডিজাইন চিত্রের বহির্ভূত বস্তু, নিঃসম্পর্কিত সহায়কমাত্র। যেমন স্বামীস্ত্রীর মিলন ভিন্ন দাম্পত্যজীবন নাই, ছাদ ভিত্তি দেয়ালের যোগাযোগ ভিন্ন গৃহ নাই, তেমনই ডিজাইন ও বিষয়বস্তুর সংযোগ ভিন্ন চিত্র নাই। দুই-ই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তবু দুইটিকে বিশ্লেষণে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে, এবং ইহাও অনুভব করা যায় যে, চিত্রের চিত্রসত্তা আর ডিজাইনের মধ্যে সম্পূর্ণ একাত্মতা নাই।

চিত্রকলা ও দৃষ্টিগ্রাহ্য জগৎ

তাহা হইলে চিত্রকলায় সৃষ্টি কোন্ জিনিসটা, কাহাকেই বা চিত্রের 'বক্তব্য', 'উপপাদ্য', বা 'বিষয়' বলিব? সংগীতের কারবার যেমন ধ্বনি লইয়া চিত্রকলার কারবার তেমনিই দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু লইয়া,— চিত্রকলা দ্রষ্টব্য আর্ট, এই কথা বলিয়া অনেকে চিত্রকলাকে বিশিষ্ট ও অন্য আর্ট হইতে পৃথক করিতে যান। অবশ্য ইহা সত্য যে, চিত্রকলার একমাত্র অবলম্বন দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু, কিন্তু এই সংজ্ঞাই যথেষ্ট নয়, কেন-না চিত্রকলা ভিন্ন সাহিত্যেরও আংশিক উপাদান দৃশ্যবস্তু; তাহা ছাড়া দৃশ্যবস্তু প্রথমত নানাপ্রকারের, দ্বিতীয়ত আমাদের মনকে নানাদিক হইতে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে। ইহার জন্য শুধু দৃশ্যবস্তুর আর্ট বলিলে চিত্রকলার ধর্মকে বিশিষ্ট করা হয় না।

সাহিত্যের উপাদান দৃশ্যবস্তু এই যুক্তি অনেকের কাছে অদ্ভুত ঠেকিতে পারে। কিন্তু বর্ণনামূলক রচনা ও চিত্রের মধ্যে তফাত কোথায়? "বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী"— এই ভাষাচিত্র এবং রঙে ও রেখায় সম্বন্ধ দৃশ্যচিত্রের মধ্যে মূলত প্রভেদ কোথায়? আর-একটা দৃষ্টান্ত ধরুন।

—ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,

ঝলিতেছে জল তরল অনল
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছল ছল আঁখি
অশ্রুজলে,—

এই ছবি ও টার্নারের আঁকা সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের দৃশ্য কি অনেকটা একধর্মী নয়? একটা বড়ো পার্থক্য অবশ্য আছে। চিত্রকলা দৃশ্যবস্তুকে একেবারে সাক্ষাৎভাবে না পারিলেও অন্য পর্যায়ের দৃশ্যবস্তু হিসাবেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে, ভাষাচিত্র তাহা পারে না, ভাষাচিত্রকে দৃশ্যে পরিণত করে আমাদের মন— কল্পনা ও ভাবসংশ্লেষের সহায়তায়। এই কথা ভাষার দ্বারা সৃষ্ট সকল আর্ট সম্বন্ধেই খাটে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল অভিজ্ঞতাকে কমবেশি পুনরাবির্ভূত করিবার ক্ষমতা ভাষার আছে। সেজন্য ভাষার দ্বারা সৃষ্ট আর্ট ও বর্ণরেখার দ্বারা সৃষ্ট আর্ট খানিকটা সমানাধিকারযুক্ত অর্থাৎ ইংরেজিতে যাহাকে বলে 'ওভারল্যাপিং'। বর্ণনার সাহায্যে দৃশ্যবস্তুর সৃষ্টি ভাষা যতটুকু করিতে পারে সেই অনুপাতে ভাষা চিত্রধর্মী। দৃশ্যবস্তুকে সাক্ষাৎভাবে ও গৌণভাবে উপলব্ধির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা চিত্রগত বর্ণনা ও ভাষাগত বর্ণনার মধ্যে অবশ্য বাহ্যত না থাকিয়া পারে না, কিন্তু আমাদের মনে রসসৃষ্টির দিক হইতে ভাষাচিত্র ও আসল চিত্রের মধ্যে প্রভেদ খুব বেশি নাই। দুই-ই আমাদের মনে একই পর্যায়ের ভাব সৃষ্টি করে।

তেমনি চিত্র আবার ভাষার নিজস্ব এলাকায় আসিয়া প্রভেদও করিতে পারে। ঘটনাবর্ণন বা আখ্যান ভাষার বিশিষ্ট ক্ষমতা। চিত্র তাহা অহরহ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ধরুন, বাইবেলে যীশুর শেষ ভোজনের কাহিনী। "আসবাব যুক্ত একটি বড়ো খাইবার ঘর... যীশু বারো জন শিষ্য লইয়া ভোজনে বসিলেন..." ইত্যাদি। এই আখ্যান ও লেওনার্দোর 'লাস্ট সাপারে'র মধ্যে তফাত কি? নিছক বর্ণনা হিসাবেই বা কি, আমাদের মনে ভাবাবেশের দিক হইতেই বা কি? অবশ্য দৃশ্য সৃষ্টি করিবার ব্যাপারে ভাষার যেমন খানিকটা অসুবিধা আছে তেমনই আখ্যানের ব্যাপারে চিত্রেরও একটা অক্ষমতা আছে। চিত্র ঘটনাপরম্পরা দেখাইতে পারে না, কালক্ষেপকে প্রকাশ করিতে পারে না, চিত্রের বর্ণনা কালমুহূর্তের মধ্যে আবদ্ধ স্থানু অবস্থার বর্ণনামাত্র। কিন্তু শুধু এইটুকুই একটা আখ্যান হইতে পারে, এবং একটি মুহূর্তব্যাপী আখ্যানাংশ আখ্যানের বাকি অংশটুকুকে ভাবসংশ্লেষের সাহায্যে আমাদের মনে আনিয়া দিতে পারে। এইখানেও ভাষাগত আর্ট ও বর্ণরেখাগত আর্টের মধ্যে সমানাধিকার রহিয়াছে।

দৃশ্যবস্তুর বৈচিত্র্য

চিত্রকলায় দৃশ্যের লক্ষণ ও প্রকার ভেদের কথা ধরিলে, এবং এই দৃশ্যবৈচিত্র্যের প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মনে যে ভাববৈচিত্র্য হয় উহার বিশ্লেষণ করিলে, ব্যাপারটা আরো অনেক জটিল হইয়া দাঁড়ায়। প্রথমত চিত্র মনুষ্যসম্পর্কবর্জিত ও মনুষ্যসম্পর্কযুক্ত হইতে

পারে। আমাদের মনকে মনুষ্যসম্পর্কযুক্ত ছবি যেভাবে প্রভাবান্বিত করে মনুষ্যসম্পর্কবর্জিত ছবি ঠিক সেভাবে করে না। মনুষ্যসম্পর্কবর্জিত চিত্র দেখিবার সময়ে আমরা মানুষের জীবনের আনুষঙ্গিক আবেগ, উচ্ছ্বাস, নৈতিক ধারণাকে, সংক্ষেপে বলা চলে আমাদের মনের সাধারণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে অনেকটা কাটাইয়া উঠিতে পারি, ছবিটিকে প্রধানত দৃষ্টিগ্রাহ্য জিনিস হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি। মনুষ্যসম্পর্কযুক্ত ছবিকে আমরা সাধারণত এইভাবে দেখিতে পারি না। উহা দেখিবার সময়ে চিত্রগত বিষয়বস্তু আমাদের মনে এমন সব ভাব আনিয়া দেয় যাহা বাস্তব জীবনে অনুরূপ দৃশ্য দেখিলেও আমাদের মনের মধ্যে উদয় হয়।

তার পর মনুষ্যসম্পর্কযুক্ত চিত্রও নানাধরনের হইতে পারে। উহা ঐতিহাসিক পৌরাণিক ধর্মবিষয়ক বা সাহিত্যিক কোনো উপাখ্যানের ছবি হইতে পারে, লৌকিক জীবনের কোনো ঘটনা হইতে পারে অর্থাৎ মিলন, বিরহ, শোক, বীরত্ব, ইত্যাদি সূচক কোনো দৃশ্য হইতে পারে, কিংবা ঐতিহাসিক বা অখ্যাত ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকৃতি হইতে পারে। এই প্রত্যেকটি ধরনের চিত্র দেখিবার সময়ে আমাদের মনের ভাব বিভিন্ন ধরনের হয়। উপাখ্যানের ছবিতে আমরা মূল উপাখ্যানের রস পাই বা খুঁজি। এক্ষেত্রে আমাদের মন ছবি দেখা আর গল্প পড়ার মধ্যে কোনো তারতম্য করে না; তারতম্য হয় শুধু উপলব্ধির উপায়ের মধ্যে; একটির উপলব্ধি হয় ভাষার সহায়তায়, আর-একটির হয় বাস্তবের প্রতিচ্ছবির সহায়তায়। লৌকিক জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখিলে আমাদের মনে যে আবেগ হয় তাহাও প্রায় অবিকল লৌকিক জীবনের বাস্তব ঘটনার দ্বারা উদ্রিক্ত আবেগেরই মতো। আবার ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকৃতি দেখিলে সেই ব্যক্তির চরিত্র, মানসিক ধর্ম, এই ধরনের ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের মন কৌতূহলী হইয়া উঠে।

চিত্রপ্রসূত এই-সকল মনোভাব এবং বাস্তব জীবনের ঘটনা ও দৃশ্যের দ্বারা প্রসূত মনোভাবের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। বড়ো জোর সূক্ষ্মতা, তীব্রতা ও বিশুদ্ধতার কম বেশি হইতে পারে। কিন্তু চিত্রগত দৃশ্যকে আমরা অন্য চোখেও দেখিতে পারি, উহাদের দ্বারা অন্য বৃত্তিকেও তৃপ্ত করিতে পারি। চিত্রকলার যে-সব বিষয়বস্তুর কথা এইমাত্র বলা হইল উহাদের প্রায় সবগুলিকেই আমরা উপাখ্যান হিসাবে দেখা ছাড়া শুধু চোখে দেখিবার সুসমঞ্জস এবং সুসম্বদ্ধ দৃশ্য হিসাবেও নিতে পারি। তখন উহার দ্বারা আমাদের মানসিক বৃত্তি— অর্থাৎ আবেগ ইত্যাদির— উত্তেজনা না হইয়া শুধু সৌন্দর্যবোধের তৃপ্তির হয়। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে মনুষ্যসম্পর্কযুক্ত হইলেও একই ছবিকে আমরা একাধিক উপায়ে উপভোগ করিতে পারি।

আবার এমন সব ছবিও আছে যাহা হইতে লৌকিক জীবনের আবেগ সংগ্রহ করা কঠিন, যদিও অসম্ভব না হইতে পারে। ফলের ছবি দেখিয়া অত্যন্ত নির্বোধ না হইলে আমাদের রসনা সরস হইয়া উঠে না, আমরা চিত্রকরের নিপুণতায় মুগ্ধ হই। কিন্তু নৈসর্গিক দৃশ্যের চিত্র দেখিলে উহার লক্ষণ অনুযায়ী আমাদের মনে একদিকে যেমন শুদ্ধ সৌন্দর্যানুভূতি হইতে পারে, অন্যদিকে তেমনই ভয়, আনন্দ বা বিস্ময়ের উদ্রেক

হইতে পারে। এক্ষেত্রে মন মনুষ্যসম্পর্কের অপেক্ষা রাখে না। মোটের উপর দেখা যাইতেছে, চিত্র হইতে গৃহীত রস বা মনোভাব চিত্রগত বিষয়ের মতোই বহুবিচিত্র, বহুমুখীন, এমন-কি সময়ে সময়ে বিপরীতধর্মী। এর কোন্‌টা চিত্রকরের আসল লক্ষ্য? সে কি আঁকিবে? বিষয়বস্তু নির্বাচনে তাহার স্বাধীনতা কতটুকু? কি ধরনের মনোভাব উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টা তাহার পক্ষে সংগত, আর কোন্‌টা অসংগত? তাহার সৃষ্টি বিচিত্রতায় বাস্তবের মতোই ব্যাপক ও বিভ্রান্তিকর হইতে পারে কি, না উহার একটা গণ্ডী ও নিয়ম আছে?

৪
চিত্রের বিচিত্র ধর্ম

চিত্রসমালোচকের পক্ষে এইগুলি গুরুতর প্রশ্ন, কিন্তু তর্ক এবং গণ্ডগোলও পাকাইয়া উঠিয়াছে এই-সব প্রশ্ন লইয়াই। বিতর্কটা সাধারণ চিত্রদ্রষ্টা এবং আর্ট-ক্রিটিকের মধ্যে নয়, আর্ট-ক্রিটিকে আর্ট-ক্রিটিকে। সাধারণ চিত্রদ্রষ্টা, চিত্রকরের বা চিত্রসমালোচকের বক্তব্য বা উদ্দেশ্যের কোনো তোয়াক্কা রাখে না, তাহার মন যাহা চায় চিত্র হইতে যে উহাই বাছিয়া লয়, প্রেমের দৃশ্য দেখিলে কল্পনায় প্রেমাভিভূত হয়, বাৎসল্যের দৃশ্য দেখিলে বাৎসল্য অনুভব করে, গল্প পাইলে তাহাকেই ধরিয়া বসে। অপরপক্ষে বর্তমান যুগে চিত্রকর এবং সমালোচকও ধরিয়া লইয়াছেন, সাধারণের দ্বারা বোধ্য ও সমাদৃত হইবার প্রয়োজন তাঁহাদের নাই, প্রচলিত জনমত ও আদর্শের মধ্যে তাঁহাদের কাজের অবলম্বন পাইবার উপায় নাই, সুতরাং তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য সমব্যবসায়ী-চিত্রকর বা চিত্রসমালোচক, বড়োজোর চিত্রানুরাগী সমঝদার ব্যক্তি।

এই-সকল "বিশেষজ্ঞ"দের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধের একটা দিক পুরাতন ও নূতন থিওরির সংঘাত, আর-একটা দিক নব্য থিওরিস্টদের মধ্যে মতানৈক্য।

বিশেষজ্ঞদের গৃহযুদ্ধ

বহু প্রাচীনকাল হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কাহারো মনে এই ধারণাটা জাগে নাই যে, চিত্রসৃষ্ট রসের ধর্ম এবং সাহিত্যসৃষ্ট রসের ধর্ম একই পর্যায়ের বস্তু নয়,—এ দুটি জিনিসের প্রকাশোপায় যতই বিভিন্ন হউক না কেন। সুতরাং চিত্রার্পিত উপাখ্যান বা ঘটনা, বা বস্তুর মধ্যেই সকল চিত্রের রস খুঁজিয়াছে। ইহাও কাহারো মনে জাগে নাই যে, চিত্র বা সাহিত্যের দ্বারা সৃষ্ট রস বাস্তব জীবনে অনুভূত মানসিক আবেগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটা জিনিস। অবশ্য একটা ব্যাপার রসজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই অনুভব করিয়াছে যে, আর্টসৃষ্ট জগতের রস এবং বাস্তব জীবনের রস হুবহু এক ধরনের নয়—প্রথমটা দ্বিতীয়টার অপেক্ষা অনেক বেশি সংস্কৃত, ঘনীভূত, একত্রীকৃত ও স্পষ্ট। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই দুইটি জিনিসকে মনের দুইটি স্বতন্ত্র এলাকায় ফেলিয়া দিবার কল্পনা

কাহারো মনে উঠে নাই; এই দুইটি জিনিসের উপভোগ যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক বৃত্তির দ্বারা হয় এ-কথাও কেহ বলে নাই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের প্রাচীন আর্ট-ক্রিটিকদের কথাই ধরা যাক। এ বিষয়ে বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণকার একেবারে স্পষ্ট কথা বলিয়া খালাস, "শৃঙ্গারহাসকরুণবীররৌদ্র ভয়ানকাঃ বীভৎসাদভুতশান্তাশ নব চিত্ররসাঃ স্মৃতা।" এখানে চিত্র ও সাহিত্যের রসের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় নাই। চিত্ররস সম্বন্ধে এই পুরাণের দুই একটা ব্যাখ্যা উক্ত পুরাণ হইতেই দিতেছি। "যৎ কান্তিলাবণ্যলেখামাধুর্যসুন্দরম্ বিদগ্ধবেশাভরণং শৃঙ্গারে তু রসে ভবেৎ" (দৃষ্টান্ত— অজন্তার প্রসাধনচিত্র, ১৭নং গুহা— গ্রিফিথ, প্রথম খণ্ড, ৫৫নং চিত্র)। "যৎ কুব্জবামণপ্রায়মীষদ্‌বিকটদর্শনম বৃথা চ হস্তং সংকোচ্য তৎ স্যাদ্‌ধাস্যকরং রসে।" (এই ধরনের ছবিও অজন্তায় আছে।) "যদ্‌যৎ সৌম্যাকৃতি ধ্যান ধারণাসন বন্ধনম্ তপস্বিজনভূয়িষ্ঠং তত্তুশান্তে রসে ভবেৎ।" (অজন্তায় বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব ইত্যাদির চিত্র, ১নং ও ১৯নং গুহা, গ্রিফিথ, ২য় খণ্ড, ১৫১নং চিত্র ও ইয়াজদানি ১ম খণ্ড ও ২৪নং চিত্র)। ইহার পর বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে কোথায় কোন্ রসের চিত্র আঁকা সংগত বা অসংগত তাহাও বলা হইয়াছে— যেমন, "শৃঙ্গারহাস্যশান্তাখ্যা লেখনীয়া গৃহেষু তে।" (বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণ ৩য় খণ্ড, ৪৩ অধ্যায়, ১-১৭ শ্লোক)।

সংস্কৃত সাহিত্যেও যেখানে যেখানে চিত্রের উল্লেখ আছে সেখানেও কোথাও ইঙ্গিতমাত্রও নাই যে, চিত্রের অনুভূতি বাস্তবের অনুভূতি হইতে স্বতন্ত্র। উত্তর-রামচরিতের প্রথম অঙ্কে চিত্রদর্শন উপলক্ষে রাম সীতার কথাবার্তা উহার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

সমসাময়িক কয়েকজন সমালোচক এতদূর না গেলেও মোটের উপর এই ধরনের মতেরই পক্ষপাতী। ইহাদের মধ্যে আই. এ. রিচার্ডস্ ও হাওয়ার্ড হ্যানের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে। চিত্রের বিষয়বস্তুকে চিত্র হইতে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যাইতে পারে, এ-কথা ইঁহারা জানেন না, একটা বিশিষ্ট 'এস্‌থেটিক' বোধের অস্তিত্বও ইঁহারা স্বীকার করিতে চান না। মোটের উপর ইঁহাদের মতামত অনেকটা প্রাচীনপন্থী।

ইঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন ক্লাইভ বেল, রজার ফ্রাই প্রমুখ। ইঁহারা চিত্রকলার সুলতান মহম্মদ গজনভী— পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইহাদের মূলকথা দুইটি— (১) চিত্ররস চিত্রার্পিত বিষয়বস্তু সাপেক্ষ নয়, (২) চিত্ররসের উপলব্ধি আমাদের হয় বিশিষ্ট একটা বোধশক্তির দ্বারা অর্থাৎ বিশুদ্ধ 'এস্‌থেটিক' বোধ বা আবেগের সহায়তায়।[৫] দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্লাইভ বেলের হালের রচনা হইতে একটা জায়গা

৫ রিচার্ডস্, হ্যানে, বেল, ফ্রাই প্রমুখ সমালোচকদের মতামতের বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। রিচার্ডস্-এর "প্রিন্সিপল্‌স্ অফ্ লিটারারী ক্রিটিসিজম্", হ্যানের "রজার ফ্রাই অ্যান্ড আদার এসেজ", ক্লাইভ বেলের "আর্ট" ও রজার ফ্রাই-এর "রিশ্যন অ্যান্ড ডিজাইন" এবং "ট্রান্‌স্‌ফর্মেশ্যন" এই কয়েকটি বই পড়িলেই এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া যাইতে পারে।

উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিতেছেন,— "চিত্রকলা (পেন্টিং) মনকে দৃষ্টিগ্রাহ্য সামঞ্জস্যের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে প্রভাবান্বিত করে। চিত্রাখ্যান (ইলাস্ট্রেশ্যন) চায় বাস্তবের প্রতিচ্ছবির দ্বারা উদ্রিক্ত ভাবসংশ্লেষ ও ধারণার সহায়তায় আমাদিগকে শিক্ষা দিতে, তৃপ্ত করিতে, মার্জিত করিতে, আমোদ দিতে, ভয় দেখাইতে বা কষ্ট দিতে : আমার মতে এই কাজ ভাষার সাহায্যে আরো সুসম্পন্ন হইতে পারে। ("নিউ স্টেটস্‌ম্যান অ্যান্ড নেশ্যন" পত্র, ১০ই অক্টোবর, ১৯৪২ সন, পৃ. ২৩৭)

এই যুক্তির তাৎপর্য বড়োই গুরুতর। সুতরাং উহাকে ভালো করিয়া যাচাই করা দরকার।

নূতন মত অগ্রাহ্য

প্রথমত, ছবিকে ক্লাইভ বেল দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতেছেন— একটি আসল চিত্রকলা (পেন্টিং) যাহার উদ্দেশ্য শুধু "দৃষ্টিগ্রাহ্য সামঞ্জস্য" (ভিজিব্‌ল্ হার্মনি) সৃষ্টি করা, অপরটি "চিত্রাখ্যান" (ইলাস্ট্রেশ্যন)। দৃষ্টিগ্রাহ্য সামঞ্জস্য এবং আখ্যান বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা ক্লাইভ বেল পূর্বোদ্ধৃত বাক্যগুলিতে পরিষ্কার করিয়া দেন নাই। কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার সহিত একমত অন্য সমালোচকদের রচনা পড়িয়া ইহাই মনে হয় যে, চিত্রে দৃষ্টিগ্রাহ্য সামঞ্জস্য অর্থরেখা ও বর্ণের সাহায্যে দৃষ্ট 'ডিজাইন' বা 'কম্পোজিশ্যন' আর আখ্যানের অর্থ ছবিতে গল্প ঘটনা, প্রতিকৃতি বা বাস্তবজীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট যাহা কিছু আছে সবই। ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মিকেল এঞ্জেলোর 'পুরুষ ও নারী সৃষ্টি'কে কোন্ পর্যায়ে ফেলিব? রাফায়েলের 'সিস্টাইন ম্যাডোনা'কে, রেমব্রান্টের 'চিত্রকর ও তাহার পত্নী'কে, ভেল্যাস্‌কুয়েথের 'ব্রেডার আত্মসমর্পণ'কে কোন্ পর্যায়ে ফেলিব? অজন্তার জাতকের চিত্র, ওস্তাদ মন্‌সুরের অঙ্কিত জাহাঙ্গীর ও কৃষ্ণসারের চিত্র, ফুকাইচির অঙ্কিত "উপদেশ ও শিক্ষা" চিত্রকেই বা কোন্ পর্যায়ে ফেলিব? এমন-কি ইম্প্রেশ্যনিস্ট স্কুলের 'ল্য দেজোনের স্যুর লর্ব', 'ল্য বঁ বক', 'বাকে নর্তকী' প্রভৃতি চিত্রকেই বা কোন্ পর্যায়ে ফেলিব? এই কয়টি বিখ্যাত ছবির উল্লেখ শুধু দৃষ্টান্ত হিসাবে করিলাম। চিত্রকলার নিদর্শন অল্পই আছে যাহার সম্বন্ধে এই প্রশ্নটা উঠিবে না। ক্লাইভ বেলও পূর্বোল্লিখিত চিত্রগুলিতে 'চিত্রাখ্যানে'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া আসল চিত্রকলার পর্যায় হইতে বাহির করিয়া দিতে সাহস পাইবেন না, অথচ তাঁহার সংজ্ঞানুযায়ী এগুলির কোনোটাই চিত্রশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চিত্রকলার ক্লাইভ বেল-কৃত শ্রেণী-বিভাগ যুক্তিসঙ্গত নয়। চিত্রের বিষয়বস্তুকে চিত্রকলার মধ্যে অবান্তর ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান করাও কখনো সম্ভব নয়।

ক্লাইভ বেলের দ্বিতীয় কথা— প্রকৃতচিত্র আমাদের মনে সৌন্দর্যানুভূতির উদ্রেক করে, 'ইলাস্ট্রেশ্যন' শিক্ষা দেয়, আমোদিত করে, ভয় বা কষ্টের উদ্রেক করে, চিত্তসংস্কার করে। চিত্রের ধর্মনির্ধারণে এই যুক্তিও ভিত্তিহীন। প্রথম আপত্তি, সৌন্দর্যানুভূতি আমাদের শুধু চিত্র হইতেই হয় না, সাহিত্য হইতে হয়, ভাস্কর্য হইতে

হয়, স্থাপত্য হইতে হয়, সংগীত হইতে হয়, তাহার উপর বাস্তব জগত হইতেও হয়। সৌন্দর্যানুভূতি একমাত্র কলাজগতেই আবদ্ধ নয়। এখানে হয়তো বলা হইবে, ক্লাইভ বেল শুধু দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্যের কথাই বলিতেছেন। কিন্তু দৃষ্টিগ্রাহ্য সুন্দর বস্তু চিত্রকলায় যেমন আছে তেমনই ভাস্কর্যে এবং স্থাপত্যেও আছে, বাস্তবজীবনে তো আছেই। বাস্তব নারীদেহ আমরা যেমন লৌকিক চক্ষে দেখিতে পারি, তেমনই নিছক সুন্দর বস্তু হিসাবেও দেখিতে পারি। সুতরাং সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে চিত্রকলার একটা বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিবার সপক্ষে কোনো যুক্তি নাই।

দ্বিতীয় আপত্তি, একই চিত্র আমাদের মনে সৌন্দর্যবোধের উদ্রেক করিতে পারে, সেই সঙ্গে লৌকিক আবেগের উদ্রেক করিতে পারে, আবার নীতিমূলক চিন্তাও জাগাইতে পারে। ধরুন মিকেল এঞ্জেলোর "শেষবিচার"। উহাতে সৌন্দর্যসৃষ্টি যতটুকু আছে, ভয়বিস্ময় প্রভৃতি আবেগ উহার অপেক্ষা কম নাই, মানুষের শেষগতি স্মরণ করাইয়া তাহাকে ধর্মানুবর্তী করিবার উদ্দেশ্যও নয়। কিংবা ধরুন ফুকাইচি অঙ্কিত পূর্বোল্লিখিত চিত্রমালার তৃতীয় চিত্র। ইহাতে হানবংশীয় সম্রাট ইয়ুয়ানের উপপত্নী ফেং-এর বীরত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। একটি ভালুক তাঁহার (প্রকৃত) স্বামীকে আক্রমণ করিতে যাইতেছে, ফেং নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়া স্বামীকে কি করিয়া বাঁচাইলেন তাহাই দেখানো হইয়াছে। এই চিত্রটির মূল উদ্দেশ্যই তো নীতিমূলক। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

আবার এমন কোনো ছবি নাই যাহা দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্যবর্ধিত। ব্যঙ্গচিত্র একান্তভাবে উপদেশমূলক, কিন্তু এমন কোনো ব্যঙ্গচিত্র আছে কি যাহাতে দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্য নাই? যে ব্যঙ্গচিত্র ডিজাইন হিসাবে সুন্দর নয়, তাহাকে কেহ সার্থক ব্যঙ্গচিত্র বলেই না। সুতরাং একদিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্যকে ও অন্যদিকে আবেগ ও উপদেশকে কষ্ঠিপাথর হিসাবে ধরিয়া চিত্রকলার ধর্ম নির্ণয় সম্ভব নয়।

ক্লাইভ বেলের তৃতীয় কথা— যাহা ভাষায় প্রকাশ্য তাহা চিত্রকলায় ন্যায্য ও নিজস্ব অবলম্বন হইতে পারে না। এই কথাও মানা যায় না। ভাষাশ্রয়ী আর্ট ও চিত্রকলা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে সমানাধিকার যুক্ত তাহা আগেই বলা হইয়াছে। লেওনার্দোর মন এবিষয়ে একেবারে নিঃসংশয় ছিল। তিনি বলিতেছেন,

> "কবি! তুমি আখ্যান বর্ণন কর লেখনীর সহায়তায়, চিত্রকর করে তাহার তুলিকার সাহায্যে এবং এমনভাবে সে তাহা করে যে উহা আরো সহজে আনন্দদান করে এবং বুঝিতে কম শ্রম হয়। তুমি যদি চিত্রকে 'মূক কাব্য' বল, চিত্রকর বলিতে পারে কবির কাব্যকলা 'অন্ধচিত্র'। বিবেচনা কর কোনটা অধিকতর দুর্ভাগ্য— দৃষ্টিহীনতা অথবা বাক্যহীনতা। কবির এবং চিত্রকরের বিষয়বস্তু নির্বাচনের স্বাধীনতা সমবিস্তীর্ণ, কিন্তু কবির সৃষ্টি মানবজাতিকে চিত্রের সমতুল্য তৃপ্তি দিতে অক্ষম।' (লেওনার্দোর নোটবুক, পূর্বোল্লিখিত সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৭)।

আর-একটি নজির দেওয়া যাক। একজন চিনা চিত্রকর তাঁহার চিত্রের জন্য নিম্নোদ্ধৃত বিষয়টি বাছিয়া লইয়াছেন—

> "নিসর্গে এমন কিছু নাই যাহা উন্নতস্থান হইতে অধঃপতিত না হয়... সূর্য মধ্যাহ্নের পর নিম্নগামী হয়; চন্দ্র পূর্ণ হইবার পর ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করে। গৌরবের শীর্ষস্থানে উঠা ধূলিকণা দিয়া পর্বত গড়ার মতোই কঠিন; কিন্তু দুর্দৈবগ্রস্ত হওয়া সংকুচিত ধনুর পুনঃপ্রসারণের মতোই সহজ।" (ওয়েলি প্রণীত পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃ. ৫১)।

এই বিষয়টা একান্তভাবে ভাষার প্রকাশের বিষয়— উহাকে চিত্রে কি করিয়া দেখানো যাইতে পারে? চিত্রকর কিন্তু নির্ভয়। তিনি একটি খাড়া পাহাড় আঁকিলেন, তার ডানদিকে বসাইলেন একটি কাক— সূর্যের প্রতীক; বাঁদিকে বসাইলেন একটি খরগোস— চন্দ্রের প্রতীক; পাহাড়টি মহাশূন্য পাখি, অদ্ভুত জন্তু, গাছ ইত্যাদিতে পূর্ণ; একটা মানুষ হাঁটু গাড়িয়া ধনু টানিয়া তীর নিক্ষেপে উদ্যত। এই ছবিটি আমি দেখি নাই, সুতরাং ছবি হিসাবে উহা সুন্দর কি অসুন্দর বলিতে পারিলাম না, না হইবার কোনো কারণ দেখি না। কিন্তু আসল বক্তব্য এই, চিত্রকর এইস্থলে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সহিত ভাষাশ্রয়ী আর্টের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়াছেন।

ভাষাশ্রয়ী সাহিত্য ও বর্ণরেখাশ্রয়ী চিত্রকলা পরস্পরের অস্পর্শ্য, চিত্রকলার ইতিহাস হইতে উহা কোনোক্রমেই প্রমাণ হয় না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ক্লাইভ বেল চিত্রকলার যে সংজ্ঞা দিতে গিয়াছেন, উহা না লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রকরদের মতামত ও কর্মপদ্ধতি, না চিত্রকলার ইতিহাস, না বিচারবিশ্লেষণ— কাহারো দ্বারাই সমর্থিত হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা একটা অনুদার গোঁড়ামি, শুধু তাই নয় ব্যক্তিগত গোঁড়ামিকে সাধারণের উপর চাপাইবার চেষ্টা। কেহ যদি ভাষার মুখাপেক্ষী বলিয়া গানকে বা অপেরাকে সংগীতের পর্যায় হইতে বাহির করিয়া দিতে চায়, তাহা হইলে যে সংকীর্ণতা দেখানো হইবে, ক্লাইভ বেল প্রমুখ সমালোচকদের পক্ষ হইতে চিত্রকলাকে বিষয়বস্তুনিরপেক্ষ করিবার চেষ্টাও সেই ধরনের সংকীর্ণতা।

এই সংকীর্ণতা এড়াইয়া চিত্রকলার ধর্ম নির্ণয় করিতে হইবে। এমন কোনো থিওরি আঁকড়াইয়া থাকিলে চলিবে না যাহার ফলে আবহমানকাল হইতে যাহা চিত্র বা চিত্রকলার লক্ষণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে উহাকে চিত্রকলা বা চিত্র হইতে নির্বাসিত করিতে হয়। এই সংকীর্ণ পথ ধরিলে চিত্রকলার থিওরি আর চিত্রসাপেক্ষ থাকিবে না, চিত্র থিওরি-সাপেক্ষ হইয়া উঠিবে এবং অবশেষে এই সংজ্ঞাহীন সংজ্ঞায় আসিয়া পৌঁছিতে হইবে যে, চিত্রকলা উহাই যাহাকে চিত্র-সমালোচকেরা চিত্র বলেন। বর্তমানকালে এই তামাশা যে না চলিতেছে তাহা নয়, কিন্তু উহাকে তামাশা ভিন্ন আর-কিছু জ্ঞান করিবার কারণ দেখি না।

চিত্রকলা মিশ্র আর্ট

এই পথ ছাড়িয়া চিত্রকলার ধর্মান্বেষণ 'ইন্‌ডাক্টিভ' বিশ্লেষণের দ্বারা করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা দুইটি জিনিস দেখিতে পাইব। প্রথমটি এই যে, চিত্রকলার ধারা সব যুগে এক ছিল না, সব দেশেও এক নয়, দেশে দেশে কালে কালে পরিবর্তনশীল। চিত্রকলার উদ্দেশ্য বা প্রেরণাও সব যুগে এক ছিল না। এই যে আমরা এখন চিত্রকে ব্যক্তিগত সৌন্দর্যভোগের উপকরণ এবং গৃহসজ্জা বলিয়া মনে করি উহা তিন চারশো বছরের বেশি পুরাতন ধারা নয়। যে নৈসর্গিক চিত্রকে এখন সকলেই চিত্রকলার একটা অবর্জনীয় অংশ বলিয়াই গণ্য করেন, উহাও ইউরোপীয় চিত্রকলায় সপ্তদশ শতাব্দীর আগে চিত্রের আখ্যানাংশ হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারে নাই, এমন-কি ইহাও বলা যাইতে পারে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে মাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমাদের চোখে পড়ে তাহা এই চিত্রের রূপ যেমন বিচিত্র, রসও তেমনই বহুধা। গান একটা 'কম্পোজিট' বা মিশ্র আর্ট, এ-কথা সকলেই জানেন; কারণ গানে কবিতা ও সুর দুইই আছে, দুটিই অবর্জনীয়, অথচ দুইটির পরস্পর সম্পর্ক কি তাহা এ পর্যন্ত কেহ নিশ্চিতরূপে আবিষ্কার করিতে পারে নাই, এমন-কি গানে কাব্য বা কথার স্থান কতটুকু, সুরেরই বা স্থান কতটুকু, উহা লইয়া ঝগড়া মিটে নাই, মিটিবারও নয়। তবু গান উপভোগে এই মিশ্রতার জন্য আমাদের কোনো বাধা জন্মে না। তেমনই চিত্রকেও মিশ্র আর্ট বলিয়াই মানিতে হইবে— মানিতে হইবে উহাতে দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্যের যেমন স্থান আছে, আখ্যান বা বর্ণনা এমন-কি নীতিপ্রচারের পর্যন্ত তেমনই স্থান আছে; উহার দ্বারা সৌন্দর্যবোধের তৃপ্তি যেমন ন্যায্য, আবেগের তৃপ্তিও তেমনই ন্যায্য। শুধু তাই নয়, উহাতে আখ্যান বহু প্রকারের হইতে পারে; বর্ণনা বহু প্রকারের হইতে পারে, নীতিপ্রচার বহু প্রকারের হইতে পারে; উহার সৌন্দর্য বিশ্বের সৌন্দর্যের মতোই বহু বিচিত্র হইতে পারে; সুতরাং চিত্রোদ্ভূত মানসিক প্রতিক্রিয়াও বহু প্রকারের হইতে পারে।

এত বৈচিত্র্যের উপরেও আর-একটা বিচিত্রতার সম্ভাবনা মানিতে হইবে, তাহা এই— একটি চিত্রেই একাধিক রস ও একাধিক লক্ষণ মিলিতে পারে। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। সেটি অতি পরিচিত। লেওনার্দোর মোনা লিজা।

ভাজারি উহাকে কি চক্ষে দেখিয়াছেন তাহা পূর্বোদ্ধৃত একটি বিবরণ হইতেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। উহা রিনেসেন্সের যুগের ফ্লোরেন্টাইন চিত্রকরের চোখ। তাঁহার দৃষ্টির পিছনে রহিয়াছে, দৃষ্টিগ্রাহ্য জগৎকে একান্তভাবে, মনেপ্রাণে উপলব্ধি করিবার আশঙ্কা। এই উপলব্ধি শুধু চোখের দ্বারা হয় না, উহার জন্য স্পর্শেরও প্রয়োজন। তাই পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ফ্লোরেন্টাইন চিত্র আমাদের স্পর্শানুভূতিকে এতটা সজাগ করিয়া তুলে। ফ্লোরেন্টাইন চিত্রকলার এই ধর্ম মোনা লিজায় পূর্ণভাবে বর্তমান। ভাজারি মোনা লিজার যে-সব অবয়বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ছাড়িয়া দিয়া শুধু চুলের দিকে চাহিলেই এই জিনিসটা অনুভব করা যায়। মনে হয় ঐ উন্মুক্ত চিক্কণ কেশভার ত্বকে

ঠেকিয়া সর্বাঙ্গে শিহরণ তুলিতেছে। এইজন্যই ইটালিয়ান চিত্রকলার বিচক্ষণ সমালোচক বেরেনজন বলিয়াছেন, "মোনা লিজাতে স্পর্শরস যেমন তীব্র ও সত্য হইয়া উঠিয়াছে, এক ভেল্যাসকুয়েথ ভিন্ন অন্যত্র, কিংবা রেমব্রান্টের ও দ্যগার শ্রেষ্ঠ চিত্র ভিন্ন অন্যত্র, তাহার তুলনা খোঁজা বৃথা।" ("দি ফ্লোরেন্টাইন পেন্টার্স অফ্ দি রেনেসন্স", তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬৫। ৬৬)

কিন্তু ওয়াল্টার পেটার কি চক্ষে মোনা লিজাকে দেখিয়াছেন এখন তাহা স্মরণ করুন। পেটারের "রিনেসেন্স" লেওনার্দো দা ভিঞ্চি প্রবন্ধের সেই বিখ্যাত বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের অবমাননা করিব না, অনুবাদ করিতে গিয়া পেটারের লাঞ্ছনা করিব না, শুধু এইটুকু বলিব, উহা ভাজারির অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অনুভূতি, কবির অনুভূতি, রোমান্টিক কবির অনুভূতি। এই অনুভূতিকে বেরেনজন সাহিত্যিক অনুভূতি বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন, একটু ব্যঙ্গও করিয়াছেন।[৬] তবু মানিতে হইবে, ওয়াল্টার পেটারের অনুভূতিও সংগত, তাঁহার ব্যাখ্যাও একদিক হইতে ঠিক। মোনা লিজা চিত্রে মোনা লিজার প্রকৃতির কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু পিছনের শ্যামধূসর প্রস্তরমালা ও বিসর্পিত জলপ্রবাহের কথা ধরিলেও পেটারের মনে যে ভাব জাগিয়াছে উহার যাথার্থ্য অনুভব করা যায়।

চিত্রের যুগ্মধর্ম

চিত্রকলার রূপ ও রস যে বিচিত্র (অন্তত একাধিক) তাহা মানিতেই হইবে।[৭] তবে মোটের উপর এই বহু বিচিত্র রূপ ও রসকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমে রূপের কথাই ধরা যাক।

আমাদের আবেগ ও রসানুভূতি বর্জন করিয়া চিত্রকে শুধু যথাযথভাবে দেখিলে চিত্রকলায় আমরা দুইটা জিনিস পাই— (ক) বিশুদ্ধ দৃশ্য ও (খ) আখ্যানমূলক দৃশ্য। মনে রাখিতে হইবে, চিত্রমাত্রেই দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু, সুতরাং উহাদিগকে শুধু "আখ্যান" ও

---

৬ হ্যানে— পূর্বোদ্ধৃত পুস্তকের ৬৯ পৃষ্ঠায় 'দি ট্রাজেডি অফ্ মি. বেরেনজনস্ থিওরি অফ্ আর্ট" শীর্ষক প্রবন্ধে একটি স্থান দ্রষ্টব্য, ও বেরেনজন প্রণীত "থ্রী এসেজ ইন্ মেথড" পুস্তকে পৃ. ৯৫ দ্রষ্টব্য।

৭ না মানিলে কি কুযুক্তি ব্যবহার করিতে হয় উহার একটি কৌতুকজনক দৃষ্টান্ত স্বয়ং বেরেনজন দিয়াছেন। তিনি রাফায়েল এবং পেরুজিনোর অঙ্কিত স্ত্রীমূর্তির প্রতি অনুরাগ নানা জায়গায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই অতিকমনীয় উচ্ছ্বাসপ্রবণা সুন্দরীদের চিত্র তাঁহার মতো স্পর্শ-থিওরি প্রচারকের কাছে প্রীতিজনক হইতে পারে উহা আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু বেরেনজন বলেন, উহাতে অসংগতি কিছুই নাই, এই তৃপ্তি খুবই ন্যায্য, কিন্তু উহার সহিত আর্টের কোনো যোগ নাই, এই-সকল স্ত্রীমূর্তি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে, স্পর্শানুভূতিকে স্পর্শ করে না। (হ্যানে, পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃ. ৬৫)। চিত্রে আমাদের হৃদয়াবেগের পরিতৃপ্তিও হয়, সৌন্দর্যানুভূতির পরিতৃপ্তিও হয় এই কথা মানিলে চিত্রকলার একটি থিওরি প্রচার করিবার সার্থকতা থাকে না।

"দৃশ্য" এই দুই ভাগে ভাগ করিতে যাওয়া অযৌক্তিক। কিন্তু সব চিত্রই দৃষ্টিগ্রাহ্য হইলেও, একটু প্রণিধান করিলেই আমরা দেখিতে পাই, চিত্রার্পিত সব দৃশ্য এক পর্যায়ের নয়— উহাদিগকে পরিষ্কার দুইটি পর্যায়ে ফেলা যায়। কতকগুলি শুধু চোখে দেখিবার জিনিস, যেমন কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য, বা গৃহের অভ্যন্তর, বা ফলফুলের ছবি, উহাদের মধ্যে চোখে দেখিবার জিনিস ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু কতকগুলি ছবিতে দৃশ্যের অতিরিক্ত আরো কিছু থাকে, চিত্রার্পিত দ্রষ্টব্য বস্তুর সহায়তায় উহারা আমাদিগকে কিছু বলে। এই বক্তব্য কখনো-বা হয় কোনো গল্প, কখনো-বা হয় কোনো একটা ঘটনা, আবার ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের বর্ণনাও হইতে পারে। চিত্রের ভিতর দিয়া চিত্রকর যাহা বলিতে চায় এবং বলে, তাহা কোনো নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এই বিষয়ে চিত্রকরের সাহিত্যিকের মতোই অবাধ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু বক্তব্য বিষয় যতই বিচিত্র হউক না কেন, সবগুলিই "বক্তব্য", এই কারণে এই জাতীয় চিত্র একটা বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র পর্যায়ে পড়ে, উহাদিগকে বিশুদ্ধ দৃশ্য বলা যায় না। এই শ্রেণীর চিত্রে দৃশ্য ভাষার কাজ করে, অর্থাৎ ভাষাতে যেমন ধ্বনির অতিরিক্ত কোনো না কোনো অর্থ থাকে, তেমনই এই-সকল চিত্রে দৃশ্যবস্তুতে দৃশ্যাতিরিক্ত কোনো না কোনো অর্থ থাকে। বিশুদ্ধ দৃশ্যমূলক চিত্রে এই অর্থ থাকে না, উহা শুধু দেখিবার জিনিস।

এবারে চিত্রদ্রষ্টার মানসিক অনুভূতির কথা ধরা যাক। এখানেও আমরা দুইটি পর্যায়ে পাই— (অ) শুধু দ্রষ্টব্য বিষয়ের উপলব্ধি এবং এই উপলব্ধি হইতে জাত রসোপভোগ; (আ) দ্রষ্টব্য বিষয় হইতে কারুণ্য, হাস্য, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি মানস আবেগের এবং ভালো-মন্দ, সত্য-অসত্য, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি মানসিক ধারণার উপকরণ সঞ্চয়।

বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার (অ) পর্যায়ের উপলব্ধি চিত্রের ডিজাইনের উপলব্ধি নয়, চিত্রার্পিত বিশিষ্ট বস্তুটির বা বস্তুসমষ্টির উপলব্ধি। যেমন ধরুন, কোনো চিত্রকর একটি কলসি আঁকিলেন। ডিজাইন হিসাবে দেখিলে আমরা উহাকে শুধু সুসমঞ্জস বৃত্তাংশ বা গোলকাংশ হিসাবে দেখি, কিন্তু চিত্র হিসাবে দেখি কলসি হিসাবে— আমরা উহার আকৃতি, স্থূলত্ব, ধাতব ধর্ম, এমন-কি ভার পর্যন্ত অনুভব করি। 'ডিজাইন' এই অনুভূতিকে সহায়তা করে মাত্র। চিত্র যত উচ্চশ্রেণীর হয় চিত্রলিখিত বস্তুর অনুভূতিও আমাদের ততই তীব্র হয়, ততই আমাদের মনকে আলোড়িত করে। দৃশ্যবস্তুকে এইভাবে উপলব্ধি করার মধ্যে সাধারণ মানস আবেগ বা ধারণার কোনো স্থান নাই, দৃশ্যবস্তু সাক্ষাৎভাবে আমাদের সত্তার মধ্যে প্রবেশ করে। এই অনুভূতির যে একটা নিজস্ব রস আছে তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই বাস্তবজগতের যে কোনো জিনিস দেখিবার সময়েই অনুভব করিয়াছেন।

এই ধরনের অনুভূতির খুব ভালো দৃষ্টান্ত আমরা পাই রেমব্রান্টের একটি চিত্রে। চিত্রটির বিষয় অতি তুচ্ছ— একটি বালক একটি ডেস্কের পিছনে বসিয়া গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছে। এই চিত্রটি দেখিবার সময়ে বক্তব্য বিষয়ের কথা আমাদের মনে

উদয় হয়ই না— আমরা শুধু চিত্রার্পিত বস্তুগুলির বস্তুসত্তা অনুভব করি— কাঠকে কাঠের পরাকাষ্ঠা হিসাবে দেখি, অঙ্গুষ্ঠের চাপে বালকের গাল যেখানটাতে টোল খাইয়াছে, সেই জায়গাটাতে জীবন্ত ত্বক ও পেশীর উপর জড়শক্তির ক্রিয়া আমরা যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব করি। ভেরমিয়ারের "সংগীত-শিক্ষা"ও এই ধরনের চিত্রের আর-একটি অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই ছবিটি দেখিবার সময়ে উপাখ্যানভাগের কথা আমাদের মনে উঠে না, আমরা শুধু দেখি গৃহাভ্যন্তরের আয়তন, আলো-ছায়ার সমাবেশ, ভিত্তি দেয়াল ও ছাদের পরস্পর সম্পর্ক, ও আসবাবপত্র এবং পাত্রপাত্রীর সমাবেশ। তেমনই মিকেল এঞ্জেলার চিত্রে আমরা বিশেষ করিয়া অনুভব করি, মানবদেহের বস্তুসত্তা, টারবর্খের চিত্রে অনুভব করি রেশমী কাপড়ের বিশিষ্ট ধর্ম, বেরেনজন এই শ্রেণীর চিত্রের ধর্ম বুঝাইতে গিয়া এই কয়েকটি কথা ব্যবহার করিয়াছেন— "মেটেরিয়্যাল্ সিগ্‌নিফিক্যান্স্ অফ্ ভিজিবল্ থিংজ।" চিত্রদ্রষ্টার মানসিক অনুভূতির যে দিকটাকে (অ) পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি, উহার উপজীবও কি তাহা নির্দেশ করিবার জন্য আমিও এই কথাগুলিই ব্যবহার করিব। আমি বলিব, এই উপলব্ধি 'মেটেরিয়্যাল সিগ্‌নিফিক্যান্স অফ্ ভিজিবল্ থিংজে'র উপলব্ধি।

(আ) পর্যায়ের উপলব্ধি সম্বন্ধে বেশি কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, কারণ উহা অনেকাংশে বাস্তব জগতের লৌকিক উপলব্ধির অনুরূপ। বেরেনজনের কথা একটু বদলাইয়া বলিতে পারি (আ) পর্যায়ের উপলব্ধির প্রধান অবলম্বন— "ইমোশ্যনাল অ্যান্ড ইডিওলজিক্যাল সিগ্‌নিফিক্যান্স অফ্ ভিজিবল্ থিংজ।"

তাহা হইলে আমরা চিত্ররূপের দুটি পর্যায়ে পাইতেছি— উপরোক্ত (ক) এবং (খ); চিত্রোপলব্ধিরও দুটি পর্যায় পাইতেছি— উপরোক্ত (অ) এবং (আ)। এখন বলা প্রয়োজন, কোনো বিশেষ চিত্ররূপ কোনো বিশেষ চিত্রোপলব্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট নয়— অর্থাৎ (ক) পর্যায়ের রূপ যে (অ) পর্যায়ের উপলব্ধির উদ্রেক করিবে বা (খ) যে (আ)-রই করিবে তাহার কোনো অর্থ নাই। একই পর্যায়ের চিত্ররূপ দুই পর্যায়ের চিত্রোপলব্ধিরই উদ্রেক করিতে পারে বা যে কোনোটারই উদ্রেক করিতে পারে। ইহার অর্থ আরো একটু বিশদ করা প্রয়োজন। ধরুন, আমরা একটা বিশুদ্ধ নৈসর্গিক দৃশ্যের ছবি দেখিতেছি। চিত্ররূপের দিক হইতে উহা যে বিশুদ্ধ দৃশ্য তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু চিত্রোপলব্ধির দিক হইতে এই ছবি দেখিয়া চিত্রার্পিত বিষয়ের বস্তুসত্তা আমরা যেমন অনুভব করিতে পারি, তেমনই শান্তি, বিস্ময়, বা ভয়ও অনুভব করিতে পারি। (ক), (খ), (অ), (আ)-র মধ্যে সন্ধিবিচ্ছেদ কিভাবে হইবে তাহা নির্ভর করে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট চিত্র ও বিশিষ্ট দ্রষ্টার উপর। কিন্তু মোটের উপর ইহাই দেখা যায়, প্রত্যেক চিত্রকরেরই নিজস্ব একটা ঝোঁক আছে বর্ণনির্বাচন ও বর্ণসংযোগের বেলাতে যেমন প্রত্যেক চিত্রকরেরই নিজস্বতা পরিষ্কার বোঝা যায়, তেমনই চিত্ররূপ এবং চিত্রোপলব্ধির বেলাতেও আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাই, একজন চিত্রকরের একপ্রকার চিত্ররূপ ও চিত্রোপলব্ধির প্রতি ঝোঁক, অন্যের অন্য প্রকারের প্রতি ঝোঁক। প্রত্যেক

চিত্রকরই একটা বিশেষ চিত্ররূপের সঙ্গে বিশেষ চিত্রোপলব্ধির সমন্বয় করিয়া নিজস্ব একটা স্টাইল সৃষ্টি করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, রাফায়েলে আমরা উপরোক্ত দুই প্রকারের চিত্ররূপ ও চিত্রানুভূতি প্রায় সমান সমান পাই। কিন্তু সেজানের মধ্যে পাই (ক) ও (অ)-এর সংযোগ। আবার প্রি-রাফায়লাইটদের মধ্যে পাই প্রায় বিশুদ্ধ (খ) ও (আ)-র সংযোগ।

আর-একটা কথা বলিলেই, এই নীরস বিশ্লেষণ সমাপ্ত হয়। কথাটা এই— প্রত্যেক শ্রেণীর চিত্রেই চিত্রকর দুই প্রকার সৃষ্টির প্রয়াস করিতে পারেন। প্রথমত তিনি নিজেকে বাস্তব জগতের দৃশ্যের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে পারেন, এবং বাস্তব জগতের দৃশ্যকে মার্জিত ও সংস্কৃত করিবার ফলে বিশেষ অর্থপূর্ণ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারেন। কিংবা তিনি পারেন, কল্পনার সাহায্যে বাস্তব জগতের উপাদানকে এইভাবে রূপান্তরিত করিতে যাহাতে আমাদের মনে সম্পূর্ণ অসাধারণ ও অলৌকিক কতকগুলি দৃশ্যের বা সত্তার ধারণা জন্মে। রিয়্যালিস্টিক উপন্যাস ও রূপকথার মধ্যে যে তফাত এই দুই ধরনের চিত্রের মধ্যেও সেই তফাত। সাহিত্যে যেমন দুইই ন্যায্য, চিত্রেও তেমনই দুইই ন্যায্য।

৫
গগনেন্দ্রনাথের চিত্রধর্ম

এতক্ষণে প্রসঙ্গের অবতারণা হইল। সকলেই উপক্রমণিকার ভারে অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছেন নিশ্চয়। এই বাগ্‌বিস্তারের দুইটি কৈফিয়ত দিবার চেষ্টা করিব, হয়তো পাঠক সংগত মনে করিবেন। প্রথম কথা এই, গগনেন্দ্রনাথকে উচ্চশ্রেণীর চিত্রকর বলিয়াই আমি জ্ঞান করি, সুতরাং আমার বিশ্বাস তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনাও শ্রদ্ধা এবং অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক হওয়া উচিত। চিত্রকলা ও চিত্রকর সম্বন্ধে গোটাকতক ছেঁদো কথা বলিয়া দায়মুক্ত হওয়া অতি সহজ কাজ, কিন্তু গগনেন্দ্রনাথকে লইয়া এই প্রকার আলোচনা করিলে তাহার অবমাননা হইত।

দ্বিতীয় কৈফিয়ত এই, গগনেন্দ্রনাথের অভিনবত্ব, বহুমুখিনতা ও নিজস্বতা এত বেশি যে, তাহার চিত্রের আলোচনা পরিচিত সূত্র বা 'ফরমুলা'র সাহায্যে করা সম্ভব নয়। নব্যবঙ্গীয় ও 'কিউবিষ্ট'— এই দুইটি 'ফরমুলা' দিয়া এতদিন পর্যন্ত তাহার প্রতিভাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে— ইহাতেই তাহার প্রতি যৎপরোনাস্তি অন্যায় করা হইয়াছে। ইহার উপর আর-কোনো একটা উপমানের সঙ্গে উপমিত করিয়া তাঁহার চিত্রধর্ম নির্ধারণ করিতে গেলে, সম্ভবত— দুধ বকের মতো, বক কাস্তের মতো, সুতরাং দুধ কাস্তের মতো— এই ন্যায় অনুযায়ী সত্য অপেক্ষা অসত্যেরই প্রচার করা হইত। তাই তাঁহার চিত্রগুলিকে বিশেষ স্মরণে রাখিয়া চিত্রকলার সাধারণ ধর্ম ও লক্ষণের পর্যায়ভেদ বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে আমার ধারণা স্পষ্টতর হইয়াছে, সুতরাং আশা করি পাঠকের কাছেও আমার বক্তব্য বেশি পরিষ্কার হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, গগনেন্দ্রনাথ 'রোমান্টিক' চিত্রকর এই 'ফরমুলা' ব্যবহার করিয়া আমি সহজেই ত্রাণ পাইতে পারিতাম, এবং কথাটা অসংগতও হইত না। কিন্তু এও ঠিক, পাঠক আমার অর্থ বুঝিতেন না। 'রোমান্টিক' কথাটা সাহিত্যের বেলাতে একভাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু চিত্রকলার ইতিহাসে ব্যবহৃত হয় সম্পূর্ণ বিশিষ্ট একটা অর্থে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দ্যলাক্রোয়া, গেরিকো প্রভৃতি চিত্রকরের প্রসঙ্গেই এই কথাটি চিত্রকলার আলোচনায় প্রধানত ব্যবহৃত হয়। দ্যলাক্রোয়া ও গেরিকোর চিত্রধর্ম ও গগনেন্দ্রনাথের চিত্রধর্মের মধ্যে বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নাই। গগনেন্দ্রনাথের রোমান্টিক অনুভূতি অন্যপ্রকার। রূপকথার লেখক হ্যানস এন্ডারসন যে অর্থে রোমান্টিক, গগনেন্দ্রনাথকে বরঞ্চ অনেকটা সে অর্থে রোমান্টিক বলা যাইতে পারে। হ্যানস এন্ডারসন কি অর্থে রোমান্টিক তাহার ব্যাখ্যা না করিলে, এই মন্তব্যেরও কোনো সার্থকতা থাকে না। সুতরাং যাইতে হইবে গোড়াকার কথায়, একটা পরিচিত ও প্রচলিত সূত্রের অনুবৃত্তি করিলে চলিবে না।

পর্যায় নির্ণয়

প্রথমে গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের একটা হিসাব লওয়া যাক। বিষয়বস্তু বা চিত্ররূপ অনুযায়ী ভাগ করিলে তাঁহার চিত্র এই কয়েকটা শ্রেণীতে পড়ে— (১) ব্যঙ্গচিত্র, (২) প্রতিকৃতি, (৩) পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী, বিশেষ করিয়া চৈতন্যদেবের জীবন সংক্রান্ত চিত্র; (৪) ঘটনা বা ক্রিয়াত্মক চিত্র, যেমন "মন্দিরদ্বারে"; (৫) স্থানীয় দৃশ্য (কলিকাতা এবং পূর্ববঙ্গ দুই-এরই); (৬) সম্পূর্ণ কাল্পনিক দৃশ্য বা প্রতিকৃতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে গগনেন্দ্রনাথ উপরোক্ত (ক) অর্থাৎ "বিশুদ্ধ" দৃশ্য ও (খ) "আখ্যানমূলক" দৃশ্য দুইই আঁকিয়াছেন। কিন্তু সংখ্যায় তাঁহার চিত্রের মধ্যে (ক) পর্যায়ের চিত্র (খ) পর্যায়ের চিত্রের অপেক্ষা অনেক বেশি; শুধু চিত্ররূপের কথা ধরিলে গগনেন্দ্রনাথ দৃশ্যঘেঁষা চিত্রকর।

কিন্তু চিত্রোপলব্ধির দিক হইতে তাঁহার চিত্রে বস্তুসত্তা উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশ্য নাই বলিলেই চলে। বিশুদ্ধ দৃশ্যের ভিতর দিয়াও তিনি দ্রষ্টার মনে যে জিনিসটার উদ্রেক করিতে চাহিয়াছেন উহা উপরোক্ত (আ) পর্যায়ের রস— অর্থাৎ ভয় বিস্ময় প্রভৃতি মানস আবেগ ও ভালোমন্দ প্রভৃতি মানসিক ধারণা। ইহাকেই ইংরেজিতে আমি "ইমোশ্যনাল অ্যান্ড ইডিওলজিক্যাল সিগ্‌নিফিক্যান্স অফ ভিজিবল্‌ থিংজ" বলিয়াছি। সুতরাং চিত্ররূপ ও চিত্রোপলব্ধি যোগ করিলে গগনেন্দ্রনাথের মধ্যে প্রধানত (ক) ও (আ)র সমন্বয় দেখিতে পাই।

এই জিনিসটা কিন্তু খুব সহজপ্রাপ্য নয়। যদিও আগে বলিয়াছি, চিত্ররূপের যে কোনো পর্যায়ের সহিত চিত্রোপলব্ধির যে কোনো পর্যায়ের সংযোগ ঘটিতে পারে, তবু, সাধারণত, দ্রষ্টাকে বাদ দিয়া শুধু চিত্রকরের হিসাব লইলে দেখা যায়, যে চিত্রকর "বিশুদ্ধ দৃশ্য আঁকেন, তাঁহার নিজের চিত্রোপলব্ধি সাধারণত আবেগ বা ধারণামূলক

না হইয়া নির্ভাজ দৃষ্টিমূলক অর্থাৎ (অ) পর্যায়ের হয়। গগনেন্দ্রনাথ এই নিয়মের একেবারে সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। এ বিষয়ে তাঁহাকে সেজানের সম্পূর্ণ বিপরীত বলা যায়। সেজানের চিত্র যেখানে আখ্যানমূলক, সেখানেও উপলব্ধির সময়ে বিশুদ্ধ দৃশ্যাত্মক চিত্রে রূপান্তরিত হইয়া যায়। গগনেন্দ্রনাথের চিত্র যেখানে দৃশ্যমূলক সেখানেও আবেগাত্মক বা ধারণাত্মক হইয়া উঠে।

দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব। এই প্রবন্ধের সঙ্গে কয়েকটি কাকের ছবি ছাপা হইয়াছে। বিষয় হিসাবে এটি দৃশ্যাত্মক ছবি— কারণ একেবারে 'ষ্টিল্ লাইফ' জাতীয় না হইলেও পাখির ছবিতে আবেগ বা ধারণা ফুটাইবার অবকাশ খুবই কম। বিশুদ্ধ দৃশ্যের দ্বারা শুধু বস্তুসত্তা উপলব্ধি করাইবার ইচ্ছা থাকিলে চিত্রকর এই ছবিটিতে কাকের অবয়ব ও গতির বিশিষ্টতা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। কাকের শরীর ঘুঘু, পায়রা, চড়াই, এমন-কি চিলের শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের— অত্যন্ত আঁটসাঁট, শক্ত, বৃত্তাংশ হইয়াও যথাসম্ভব সোজা কাটা কাটা রেখার দিকে ঘেঁষা। বসিয়া থাকিলে এক শুকনো ডাল ও শুকনো ডাল দিয়া গড়া নিজের বাসা ভিন্ন সবুজ পাতাওয়ালা গাছের সহিত সে কখনো খাপ খায় না। কাকের গতি, কি শূন্যে কি মাটিতে, সম্পূর্ণ বিশিষ্ট। হাঁস যখন সাঁতার কাটে তখন সে জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়, চিল যখন উড়ে তখন সে-ও বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া যায়, কিন্তু কাক উড়িবার সময়ে কখনো বায়ুর সঙ্গে মিশে না। কাকের ওড়া দেখিলে মনে হয় যেন বায়ু অপেক্ষা ভারী একটা জিনিস বাহ্যিক কোনো 'মোটিভ ফোর্সের' জোরে বায়ু কাটিয়া চলিতেছে— ঠিক যেন একটা ঢিলের শূন্যে গতি। তৃতীয়ত, কাক সামাজিক বিহঙ্গ, কিন্তু তাহাদের সামাজিকতা ষ্টক একস্চেঞ্জ বা হাটের সামাজিকতার মতো, কাজের কথায় আবদ্ধ। কাকের দল পায়রার মতো দল বাঁধিয়া বসিয়া অসার আড্ডা দিতেছে তাহা কখনো দেখা যায় না।

কাকের বস্তুসত্তা ফুটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা থাকিলে চিত্রকর কখনো কাকের এই বস্তুধর্মগুলি উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। গগনেন্দ্রনাথ কিন্তু করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রে কাকের শরীর অত্যন্ত কোমল ও কমনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কাকের ওড়া ভাসিয়া থাকার সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কাকের সামাজিকতা পদ্মপত্রে জলের মতো সংযোগ ও বিয়োগের একেবারে নিক্তিধরা 'ইকুইলিব্রিয়াম' না হইয়া প্রায় প্রেমাবিষ্ট নরনারীর আলিঙ্গনের সমতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুলির টান, কালির ঘনতা-লঘুতা ও কম্পোজিশ্যনের ফলে গগনেন্দ্রনাথের কাক 'রিফর্মড' ও 'রোমান্টিক' কাকে পরিণত হইয়াছে— যেন গগনেন্দ্রনাথ কাকের ওকালতী করিয়া কাকের প্রতি আমাদের স্নেহ জন্মাইতে চাহিতেছেন। ইহার অর্থ— দৃশ্যে আবেগের প্রবেশ।

কিংবা 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম সংস্করণের সহিত প্রকাশিত তাঁহার দৃশ্যচিত্রগুলির কথা ধরুন। এই চিত্রগুলিতে আমরা যে শুধু চিত্রার্পিত বিষয়ের বস্তুসত্তা অনুভব করি তাহাই নয়— বরঞ্চ তাহা বড়ো একটা করিই না— আমাদের মন দৃষ্টিগ্রাহ্য জিনিসগুলির অতিরিক্ত একটা ভাবের আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। এই ভাবাবেশের স্বরূপ কি

তাহা পুস্তকের পৃষ্ঠাতে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা পড়িলেই বোঝা যায়। এই ছবিগুলিতে গগনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত দৃশ্যগুলি আঁকিয়া ক্ষান্ত হন নাই, চিত্রে যতটা সম্ভব রবীন্দ্রনাথের মনকেও আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ৯ পৃষ্ঠায় বটগাছের গোড়ার একটি ছবি আছে। প্রাচীন বৃক্ষের গোড়ার একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিগ্রাহ্য গুণ (সুতরাং গুণোপলব্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট রসও) আছে। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রে তাহা উপলব্ধি করাইবার চেষ্টা নাই, তিনি এই গাছটির সহিত জড়িত রবীন্দ্রনাথের মনোভাবকেই বিষয়বস্তু করিয়া লইয়াছেন।

> "পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কি রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বটকেই উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—
>
> নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট;
> ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট?"

গগনেন্দ্রনাথের আঁকা বটে, শুধু বট গাছ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের মনও আসিয়া পড়িয়াছে। ৯৮ পৃষ্ঠায় "একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে," ও ১৫৫ পৃষ্ঠায় "আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না" এই দুটি চিত্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের রচনা মিলাইয়া দেখিলে ব্যাপারটাও আরো স্পষ্ট হইবে।

অনেকেই বলিবেন, চিত্রকর, যদি কবির মনোভাবকেও এভাবে ধরিয়া দিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই তো তাঁহার চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। সার্থক একদিন হইতে হইয়াছে নিশ্চয়ই, কিন্তু কোন্ দিক হইতে হইয়াছে তাহা বোঝা দরকার। এক প্রকার দেখাও অন্য প্রকার দেখাতে সুগভীর পার্থক্য আছে। গগনেন্দ্রনাথের এই চিত্রগুলিতে যে দৃষ্টির পরিচয় পাই, উহার বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।" এই চৈতন্য মনস্তাত্ত্বিকের চৈতন্য নয়, কবির চৈতন্য— অর্থাৎ দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুর সহিত অন্য ভাব অর্থাৎ আবেগ বা ধারণার যোগ। শুধু এই ভাবে দেখিলেই যে আমাদের দেখা জীবন্ত ও তীব্র হইয়া উঠে তাহা নয়; রবীন্দ্রনাথ যাহাকে চৈতন্য বলিয়াছেন উহা বর্তমান না থাকিলেও আমাদের দৃষ্টি সমানভাবেই তীক্ষ্ণ, অর্থগ্রাহী ও আনন্দদায়ক হইতে পারে। তখন দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা অর্থগ্রাহিতা ও আনন্দসঞ্চার করিবার ক্ষমতা আসে দ্রষ্টা ও দৃষ্টবস্তুর একাত্মতা হইতে। এই দৃষ্টির কথাই ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার "টিটার্ন অ্যাবী" শীর্ষক বিখ্যাত কবিতার ৬৬-৮৫ পংক্তিতে বলিয়াছেন, এবং দৃষ্টির ফলে যে মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয় তাহা এই

কবিতারই ৩৭-৪৫ পংক্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন। এই দৃষ্টি চৈতন্যনিরপেক্ষ, সাধনার আনন্দের মতো। যে-সকল চিত্রকর বিশুদ্ধ দৃশ্যের সহায়তায় আমাদিগকে বস্তুসত্তা উপলব্ধি করান, তাঁহাদের চিত্র হইতে আমরা এই জাতীয় রসই উপভোগ করি। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের রস স্বতন্ত্র।

চিত্রকলায় কিউবিষ্ট 'মোটিফ' সর্বদাই বিশুদ্ধ নকশা সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার সাহায্যেও গগনেন্দ্রনাথ যে আবেগ উদ্রেক করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এই প্রবন্ধের প্রথম অংশেই বলা হইয়াছে। এই সংখ্যায় প্রকাশিত কালো-সাদায় কিউবিষ্ট ধাঁচে অঙ্কিত গৃহাভ্যন্তরের চিত্র হইতে এই গৃহাভ্যন্তর আমাদিগকে শুধু বস্তুসত্তা উপলব্ধি করাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, আমাদের মনে একটা অলৌকিক মায়াপুরীর ধারণা জন্মাইয়া ভয়, বিস্ময় ও কৌতূহলের সঞ্চার করে।

ব্যঙ্গচিত্র ও উপাখ্যানমূলক চিত্র স্বভাবতই আবেগ বা ধারণাত্মক, সুতরাং গগনেন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর যে-সব ছবি আঁকিয়াছেন উহারা যে আমাদের মনে এই ধরনের ভাবেরই সঞ্চার করে তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, গগনেন্দ্রনাথের সব চিত্রেরই প্রধান লক্ষণ— আবেগ ও ধারণার সংযোগ, ইংরেজিতে আমি যাহাকে বলিয়াছি— "ইমোশ্যনাল অ্যান্ড ইডিওলজিক্যাল সিগ্‌নিফিক্যান্স অফ থিংজ।" এই সকল 'ইমোশ্যন' ও "আইডিয়া" বা আবেগ ও ধারণাকে সংক্ষেপে "ভাব" বলা যাইতে পারে। এই ভাবেরই উপর গগনেন্দ্রনাথের চিত্রকলা প্রতিষ্ঠিত— এই কারণেই তাঁহার চিত্রধর্মকে আমি প্রথমেই ভাবাত্মক বলিয়াছিলাম।[৮]

ভাবের রোমান্টিকতা

গগনেন্দ্রনাথ চিত্রকর হিসাবে শুধু যে ভাবধর্মী তাহাই নয়, তাঁহার ভাবেরও একটা বিশিষ্ট নিজস্ব ধর্ম আছে। চিত্রের ভাব সাহিত্যের ভাবের মতোই নানাপ্রকারের হইতে পারে। উহাতে নৈতিক উপদেশ যেমন থাকিতে পারে, তেমনই নিছক তামাশাও থাকিতে পারে; করুণ বা বাৎসল্য রস যেমন থাকিতে পারে, তেমনই বীর বা রুদ্ররসও থাকিতে পারে। স্প্যানিশ চিত্রকর গোইয়া ভাবধর্মী, তাঁহার চিত্রে সাধারণত মানবজীবনের দুঃখ, গ্লানি, অবিচার, উৎপীড়ন, লালসা, হৃদয়হীনতা প্রকাশ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে ভাবের দিক হইতে রাফায়েল বা মুরিলোর চিত্র কখনো সাধারণ মানুষের স্নেহ মমতার

---

৮ একটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ নিতান্তই আবশ্যক মনে করি। "মন্দির-দ্বারে" চিত্রটি নামেও উদ্দেশ্যের দিক হইতে আখ্যানমূলক ও ভাবাত্মক, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে দৃশ্যমূলক ও বস্তুসত্তাবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিখুঁত ড্রয়িং ও কম্পোজিশ্যনের সহায়তায় এই চিত্রটি আমাদের দৃষ্টিকে মুহূর্তের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া ফেলে, এবং চিত্রার্পিত দৃশ্যটি বিশুদ্ধ দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু হিসাবে আমাদের চৈতন্যের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে প্রবেশ করে। এই ছবিটি ভাবের উদ্রেক করেই না বলা চলে। এই ধর্মের আভাস গগনেন্দ্রনাথের কোনো কোনো চিত্রে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আর কোথাও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।

স্তর ছাড়াইয়া উঠে নাই। গগনেন্দ্রনাথের ভাবের বিশেষ ধর্ম— উহা রোমান্টিক। তাঁহার এই রোমান্টিক ভাবের একটা নিজস্ব চেহারা ও সুর আছে। উহা ব্যক্তিগত সুতরাং অকপট। গগনেন্দ্রনাথ যে রোমান্টিক পথ ধরিয়াছেন উহা ছাঁচে ঢালা রোমান্টিকতা নয়, অনুকরণও নয়।

এই রোমান্টিকতার কয়েকটা বিশিষ্ট লক্ষণ ধরিতে পারা যায়। প্রথমত, উহাতে সুদূরের প্রতি একটা টান আছে, কালের দূরত্বের কথা বলিতেছি, দেশের সুদূরত্বের নয়। রোমান্টিক কবি বা চিত্রকর মাত্রেই সুদূর দেশের ঘটনাবলী বা দৃশ্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন। দ্যলাক্রোয়ার "কিয়সের হত্যাকাণ্ড", গেরিকোর "মেডুসা জাহাজের ভেলা" ও জেরারের "মিসেনাস অন্তরীপে করিনা"র কথা স্মরণ করুন। গগনেন্দ্রনাথ কিন্তু সুদূরের অন্বেষণে সুদূর দেশে একেবারেই যান নাই। তাঁহার সব চিত্রই তাঁহার নিজের চোখে দেখা জায়গার মধ্যে আবদ্ধ। বরঞ্চ চিত্রের ভিতর দিয়া দেশ সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা খুবই সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হয়— কলিকাতা, উত্তর-নদীয়া ও পাবনা অঞ্চল, এবং বীরভূম, ব্যস ঐ পর্যন্ত। কলিকাতার মধ্যেও আবার তিনি প্রায় সব ক্ষেত্রেই নিজেকে শ্যামবাজার, শোভাবাজার, জোড়াসাঁকো, পাথুরিয়াঘাটা, চোরবাগান অঞ্চলেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন। তাঁহার চিত্রে নূতন কলিকাতার নামগন্ধও নাই। এমন-কি তিনি যে স্ত্রী ও পুরুষের চেহারা আঁকিয়াছেন, তার সবগুলিই খানদানী কলিকাতাবাসীর মুখ। তাঁহার ব্যঙ্গচিত্রে যে মুখ দেখা যায়, তাহা কলিকাতার বাহিরে বাংলার কোথাও মিলিবে না।

দেশ সম্পর্কে এত সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও গগনেন্দ্রনাথ সুদূরত্বের ধারণা জন্মাইয়াছেন কালের ব্যবধান টানিয়া। পুরীর মন্দিরের দৃশ্য যে ছবিটিতে আছে, উহা বিবেচনা করুন। বর্তমানে পুরীর মন্দিরের যে রূপ দেখিতে পাওয়া যায় উহা চিত্রে সম্বন্ধ করিয়া গগনেন্দ্রনাথ অতিসহজেই এমন একটি দৃশ্য দেখাইতে পারিতেন যাহা আমাদিগকে মেরিয়োঁর এচিং-এর কথা স্মরণ করাইয়া দিত। তিনি কিন্তু উহার ধার ঘেঁষিয়াও যান নাই। শত শত বৎসর পিছাইয়া গিয়া নীলাচলের সেই রূপ দেখাইয়াছেন যাহা চৈতন্যদেবকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

অনেক সময় আবার গগনেন্দ্রনাথ এতদূরও যান নাই, "দূরত্ব-রস" ফুটাইবার ও উপভোগ করিবার জন্য অন্য একটা পথ ধরিয়াছেন। কাল গণনা করিলে বাল্যকাল পূর্ণবয়স হইতে বেশি দূর নয়, কিন্তু উপলব্ধির দিক হইতে বহু দূরে মনে হয়। ইহার কারণ বাল্যের চৈতন্য ও পূর্ণবয়সের চৈতন্যের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। এই চৈতন্যবৈষম্যের জন্যই বাল্যকালকে পৃথিবীর শৈশবের সমতুল্য সুদূর অতীতের মতো জ্ঞান হয়। চিত্রে বাল্যে দৃষ্ট দৃশ্য বা মুখচ্ছবি আঁকিয়া গগনেন্দ্রনাথ দূরত্বের ধারণা জন্মাইয়াছেন। যে কলিকাতার দৃশ্য তিনি আঁকিয়াছেন, উহা সমসাময়িক কলিকাতা নয়, সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর আগেকার কলিকাতা। ড্যানিয়েলের আঁকা ছবি দেখিলে মনে যেমন একটা রোমান্টিক ভাব জাগে, গগনেন্দ্রনাথের দৃশ্যচিত্র দেখিলেও তেমনই

বহুবিস্মৃত জিনিসকে স্মরণ করিলে যেমন হয় তেমনই একটা সকরুণ ব্যাকুলতা জাগে। গগনেন্দ্রনাথের অন্য চিত্রেও অবিরত পুরাতনের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়— ব্যঙ্গ চিত্রগুলিতেও ইহার অপ্রতুল নাই।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রোমান্টিকতার আর-একটা লক্ষণ— লোকোত্তর অনুভূতির প্রতি আসক্তি। লৌকিক জগতের লৌকিক অনুভূতিতে তাঁহার পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কোনো পরিচিত কাহিনী বা ঘটনাকে পরিচিত লক্ষণের দ্বারা ব্যক্ত করিয়া তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি সর্বদাই নূতন আশ্লেষ এবং বিশ্লেষের ("অ্যাসোসিয়েশ্যন" ও "ডিস্যাসোসিয়েশ্যন") সহায়তায় পরিচিত বস্তুকে অপরিচিত বা অপ্রত্যাশিতরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার "নবহুল্লোড়" শীর্ষক ব্যঙ্গচিত্রমালায় অপ্রত্যাশিত আশ্লেষের দুইটি চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে। একটি— জগদীশের ধ্যানভঙ্গ; অপরটি— বুড়োবাংলার গঙ্গাযাত্রা। দুটি ব্যঙ্গচিত্রেরই বিষয় নন-কোপারেশ্যন আন্দোলন। প্রথম চিত্রটিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের শ্রুতিকটু ধ্বনির সহিত জগদীশচন্দ্রকে যেভাবে যুক্ত করা হইয়াছে, ও দ্বিতীয়টিতে সমসাময়িক জনসভার প্যান্ডেলে বাংলার প্রাচীন আভিজাত্যকে যেভাবে টানিয়া আনা হইয়াছে, উহা যেমনই অপ্রত্যাশিত তেমনই অসংগতিপূর্ণ। এই সংযোগের সম্ভাবনা আগে আমাদের মনে জাগেও নাই বলিয়া যেন উহা আরো বেশি রসসঞ্চার করে। রেমি দ্য গুঁম্মো এই নূতন আশ্লেষকে বাহবা না দিয়া পারিতেন না।

অন্য চিত্রের মধ্যেও উহা খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে "বিজয়ার দৃশ্য", "অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা", এবং "উদয়-সাগরের তীরে পদ্মিনী", এই তিনটি ছবির উল্লেখ করা যায়। বিজয়ার দৃশ্য আমাদের যেমন পরিচিত, পদ্মিনীর উপাখ্যান এবং অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার কাহিনীও আমাদের কাছে তেমনই জানা। কিন্তু নাম না দেখিয়া এই ছবি তিনটি দেখিলে, অতিপরিচিত বিষয়ের ছবি দেখিতেছি তাহা সহজে মনে হইবে না। কিন্তু নাম দেখামাত্র মনে একটা বিস্ময়-উদ্দীপক ধাক্কা লাগিবে। তবে চিত্রকরের অভিনবত্ব অন্যায্য বলিয়া মনে হইবে না, শুধু মনে হইবে পুরাতন জিনিস রূপান্তরিত হইয়া নূতন রূপে দেখা দিয়াছে। এই নূতন রূপের মধ্যে পরিচিতকেই দেখিতেছি, কিন্তু উহা জলে-স্থলে যে আলো কেহ কখনো দেখে নাই তাহার রশ্মিপাতে বিভাময় হইয়া উঠিয়াছে।

গগনেন্দ্রনাথের রোমান্টিকতার তৃতীয় লক্ষণ— সূক্ষ্মতা। শুধু সূক্ষ্মতা বলি কেন— এই সূক্ষ্মতা সূক্ষ্মতার স্তর ছাড়াইয়া ছায়াজগতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। বায়রনের চাইল্ড হ্যারল্ড ও ডন জুয়ানের সহিত কীটসের "লা বেল দাম সঁ মেয়ার্সি" বা কোলরিজের "ক্রিস্টাবেলের" যে প্রভেদ, সাধারণ রোমান্টিসিজ্‌মের সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের রোমান্টিক অনুভূতিরও সেই প্রভেদ। এই ধরনের রোমান্টিক ব্যাকুলতাই পেটার মোনা লিজার বর্ণনায় ব্যক্ত করিয়াছেন, কালিদাসও উহারই আভাস দিয়াছেন। অদৃষ্টপূর্ব রূপ চাক্ষুষ করিবার যে প্রয়াস আমরা গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের মধ্যে পাই, তাহা সব সময়ই সফল হইয়াছে বলা চলে না, কিন্তু অন্তত ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়— গগনেন্দ্রনাথ— "চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।"

গগনেন্দ্রনাথ তাঁহার চিত্রাবলীতে দুইটি বিভিন্ন ধারায় এই রোমান্টিক অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমত, তিনি বাস্তব জগৎ ও জীবনের দৃশ্যের মধ্যে রোমান্টিক রস খুঁজিয়াছেন, এই-সকল দৃশ্যের রোমান্টিক রূপ দিয়াছেন। কিন্তু কিছুদিন পর বা কোনো কোনো মুহূর্তে তাঁহার রোমান্টিক মনোভাব এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, বাস্তব জগতের কাঠামোর মধ্যে তিনি আর উহাকে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। তখন এই রোমান্টিক অনুভূতি বাঁধন ছিঁড়িয়া নিজের জগৎ খুঁজিতে বাহির হইয়াছে, নিজের জগৎ সৃষ্টি না করিতে পারা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় নাই। এই কারণে গগনেন্দ্রনাথের চিত্রাবলীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে রহিয়াছে বাস্তব জগতেরই চিত্র, রোমান্টিক রসাশ্রিত; অন্যদিকে রহিয়াছে, একেবারে অবাস্তব ও কাল্পনিক একটা রোমান্টিক জগৎ। শেষোক্ত জগতে পৌঁছিয়া গগনেন্দ্রনাথ রোমান্টিক অনুভূতির স্রোতে একেবারে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন,— বাস্তবকে ভাঙিয়া চুরিয়া নিজের রোমান্টিক দৃষ্টির অনুকূল করিয়া লইয়াছেন; এবং বাস্তবের সহিত ততটুকুই সম্পর্ক রাখিয়াছেন যতটুকু না রাখিলে লোকের মনে প্রত্যয় জন্মানো যাইবে না।

কোনো রোমান্টিক ঔপন্যাসিক উপন্যাসে নিজের রোমান্টিক অনুভূতিকে তৃপ্ত করিতে না পারিয়া যদি রূপকথাও লিখিতেন তাহা হইলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমরা দেখিতে পাইতাম, চিত্রের ক্ষেত্রে গগনেন্দ্রনাথ তাহাই দেখাইয়াছেন। তাঁহার ছবিগুলি দুইটি শ্রেণীতে পড়ে— একদিকে "চিত্রোপন্যাস", আর-একদিকে "চিত্র-রূপকথা"। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই "দ্বিমুখীনতা" একেবারে বিরল নয়, কিন্তু চিত্রকলার ইতিহাসে উহার কথা পড়ি নাই।

১৩৫০ কার্তিক

ছবির কথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেলা বাড়িয়া চলিতেছে— বাড়ির ঘণ্টায় দুপুর বাজিয়া গেল— একটা মধ্যাহ্নের গানের আবেশে সমস্ত মনটা মাতিয়া আছে, কাজকর্মের কোনো দাবিতে কিছুমাত্র কান দিতেছি না; সেও শরতের দিনে।—

হেলাফেলা সারাবেলা
এ কী খেলা আপন মনে।

মনে পড়ে, দুপুরবেলায় [১৮৮৫?] জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি-আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে— সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা করা। যেটুকু মনের মধ্যে থাকিয়া গেল, কিছুমাত্র আঁকা গেল না, সেইটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ। এদিকে সেই কর্মহীন শরৎ মধ্যাহ্নের একটি সোনালি রঙের মাদকতা দেয়াল ভেদ করিয়া করিয়া সেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র ঘরকে পেয়ালার মতো আগাগোড়া ভরিয়া তুলিতেছে।

জীবনস্মৃতি

৩০ আষাঢ়, ১৩০০

আমি বাস্তবিক ভেবে পাইনে কোন্‌টা আমার আসল কাজ।... মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজ্‌দের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাইনে।... লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি— কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকেও সহজে পাবার জো নেই— তাঁর একেবারে ধনুকভাঙা পণ— তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। একলা কবিতাটিকে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধে— বোধ হয় যেন উনিই আমাকে সবচেয়ে বেশি ধরা দিয়েছেন— আমার ছেলেবেলাকার আমার বহুকালের অনুরাগিণী সঙ্গিনী।

ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

১ আশ্বিন [১৩০৭]

শুনে আশ্চর্য হবেন একখানা sketch book নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকচি। বলা বাহুল্য সে ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্যে তৈরি করচি নে এবং কোনো দেশের ন্যাশন্যাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এরকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই। কিন্তু কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব স্নেহ জন্মে তেমনি যে বিদ্যাটা ভালো আসে না সেইটের উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা এবারে যোলো আনা কুঁড়েমিতে মন দেব তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এ সম্বন্ধে উন্নতিলাভ করবার একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেনসিল চালাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশি রবার চালাতে হচ্ছে, সুতরাং ঐ রবার চালনাটাই অধিক অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে— অতএব মৃত র‍্যাফেল তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে মরে থাকতে পারেন— আমার দ্বারা তাঁর যশের কোনো লাঘব হবে না।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত

২১ কার্তিক, ১৩৫৫

আমার এখনকার সর্বপ্রধান দৈনিক খবর হচ্ছে ছবি আঁকা রেখার মায়াজালে আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে। অকালে অপরিচিতার প্রতি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে পাড়া ছেড়ে চলে গেল। কোনোকালে যে কবিতা লিখতুম সে কথা ভুলে গেছি। এই ব্যাপারটা মনকে এত করে যে আকর্ষণ করছে তার প্রধান কারণ এর অভাবনীয়তা। কবিতার বিষয়টা অস্পষ্টভাবেও গোড়াতেই মাথায় আসে, তার পরে শিবের জটা একটা গোমুখী বেয়ে যেমন গঙ্গা নামে তেমনি করে, কাব্যের ঝরনা কলমের মুখে তট রচনা করে, ছন্দ প্রবাহিত হতে থাকে। আমি যে-সব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক তার উলটো প্রণালী— রেখার আমেজ দেখা দেয় কলমের মুখে, তার পরে যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা পৌঁছতে থাকে মাথায়। এই রূপসৃষ্টির বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে। আমি যদি পাকা আর্টিস্ট হতুম তাহলে গোড়াতেই সংকল্প করে ছবি আঁকতুম, মনের জিনিস বাইরে খাড়া হত— তাতেও আনন্দ আছে। কিন্তু নিজের বহির্বর্তী রচনায় মনকে যখন আবিষ্ট করে তখন তাতে আরো যেন বেশি নেশা। ফল হয়েছে এই যে, বাইরের আর সমস্ত দায়িত্ব দরজার বাইরে এসে উঁকি মেরে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। যদি সেকালের মতো কর্মদায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতুম, তাহলে পদ্মার তীরে বসে কালের সোনার তরীর জন্যে কেবলি ছবির ফসল ফলাতুম। এখন নানা দাবির ভিড় ঠেলে ঠুলে ওর জন্যে অল্পই একটু জায়গা করতে পারি। তাতে মন সন্তুষ্ট হয় না। ও চাচ্ছে আকাশের প্রায় সমস্তটাই, আমারো দিতে আগ্রহ, কিন্তু গ্রহদের চক্রান্তে নানা বাধা এসে জোটে— জগতের হিতসাধন তার মধ্যে সর্বপ্রধান।

রানী মহলানবিশকে লিখিত

১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

যেমন আমার ছবি আঁকা তেমনি আমার চিঠি লেখা। একটা যা হয় কিছু মাথায় আসে সেটা লিখে ফেলি, প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় ছোটো বড়ো যে-সব খবর জেগে ওঠে তার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার ছবিও ঐ রকম। যা হয় কোনো একটা রূপ মনের মধ্যে হঠাৎ দেখতে পাই, চারদিকের কোনো কিছুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা সংলগ্নতা থাক্ বা না থাক্। আমাদের ভিতরের দিকে সর্বদা একটা ভাঙাগড়া চলাফেরা জোড়াতাড়া চলছেই; কিছু বা ভাব, কিছু বা ছবি নানারকম চেহারা ধরছে— তারই সঙ্গে আমার কলমের কারবার। এর আগে আমার মন আকাশে কান পেতে ছিল, বাতাস থেকে সুর আসত, কথা শুনতে পেত, আজকাল সে আছে চোখ মেলে রূপের রাজ্যে, রেখার ভিড়ের মধ্যে। গাছপালার দিকে তাকাই, তাদের অত্যন্ত দেখতে পাই— স্পষ্ট বুঝতে পারি জগৎটা আকারের মহাযাত্রা। আমার কলমেও আসতে চায় সেই আকারের লীলা। আবেগ নয়, ভাব নয়, চিন্তা নয়, রূপের সমাবেশ। আশ্চর্য এই যে তাতে গভীর আনন্দ। ভারি নেশা। আজকাল রেখায় আমাকে পেয়ে বসেছে। তার হাত ছাড়াতে পারছিনে। কেবলি তার পরিচয় পাচ্ছি নতুন নতুন ভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে। তার রহস্যের অন্ত নেই। যে বিধাতা ছবি আঁকেন এতদিন পরে তাঁর মনের কথা জানতে পারছি। অসীম অব্যক্ত, রেখায় রেখায় আপন নতুন নতুন সীমা রচনা করছেন— আয়তনে সেই সীমা কিন্তু বৈচিত্র্যে সে অন্তহীন। আর কিছু নয়, সুনির্দিষ্টতাতেই যথার্থ সম্পূর্ণতা। অমিতা যখন সুমিতাকে পায় তখন সে চরিতার্থ হয়। ছবিতে যে আনন্দ, সে হচ্ছে সুপরিমিতির আনন্দ, রেখার সংযমে সুনির্দিষ্টকে সুস্পষ্ট করে দেখি— মন বলে ওঠে, নিশ্চিত দেখতে পেলুম— তা সে যাকেই দেখি না কেন, একটুকরো পাথর, একটা গাধা, একটা কাঁটাগাছ, একজন বুড়ি, যাই হোক। নিশ্চিত দেখতে পাই যেখানেই, সেখানেই অসীমকে স্পর্শ করি, আনন্দিত হয়ে উঠি।

রানী মহলানবিশকে লিখিত

২ পৌষ ১৩৩৮

ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি, আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকিনে— দৈবক্রমে একটা কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনক রাজার লাঙলের ফলার মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব। কিন্তু সেই একটি মাত্র আকস্মিককে নাম দেওয়া সহজ ছিল, বিশেষত সে নাম যখন বিষয়সূচক নয়। আমার যে অনেকগুলি— তারা অনাহূত এসে হাজির— রেজিস্টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন্ উপায়ে। জানি, রূপের সঙ্গে নাম জুড়ে না দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না। তাই আমার প্রস্তাব এই, যাঁরা ছবি দেখবেন বা নেবেন তাঁরা অনাম্নীকে নিজেই নাম দান করুন,— নামাশ্রয়হীনাকে নামের

আশ্রয় দিন। অনাথাদের জন্যে কত আপিল বের করেন; অনামাদের জন্যে করতে দোষ কী। দেখবেন যেখানে এক নামের বেশি আশা করেন নি সেখানে বহু নামের দ্বারা ছবিগুলো নামজাদা হয়ে উঠবে। রূপসৃষ্টি পর্যন্ত আমার কাজ তার পরে নামবৃষ্টি অপরের।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত

২৬ ফাল্গুন ১৩৩৮

ছবির কথা কিছুই বুঝিনে। ওগুলো স্বপ্নের ঝাঁক, ওদের ঝোঁক রঙিন নৃত্যে। এই রূপের জগৎ বিধাতার স্বপ্ন— রঙে রেখায় নানাখানা হয়ে উঠচে। বসন্তে পলাশ ফুটে উঠল কালোয় রাঙায় একটা রূপ। কিসের গরজ? কে জানে? মানে কি যদি জিজ্ঞাসা কর তার উত্তর কে দেবে? আপনা আপনি সৃষ্টিকর্তার তুলির মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েচে। আবার বেল-ফুল আর এক মূর্তি ধরে বসল কেন? অজানার স্বপ্ন-উৎসব থেকে বিচিত্র রূপ উৎসারিত— এ সম্বন্ধে বিশ্বকর্মার কোনো কৈফিয়ত নেই। আমার ছবিও তাই রূপের নিগূঢ় আনন্দ নানা রূপে রূপে লীলা করচে, সম্পূর্ণ নিরর্থক। এই আনন্দ দর্শকের মনেও যদি সঞ্চারিত হয় তো ভালো— নইলে কারো কোনো ক্ষতি নেই। সৃষ্টি কেন হয় তার ব্যাখ্যা অসম্ভব— সকলের গোড়াকার কথাটা হচ্চে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

সরসীলাল সরকারকে লিখিত

২৩ অক্টোবর ১৯৩৪

আজকাল একেবারে অরুচি ধরেছে লেখায়। মনটা এখন স্বভাবত ছোটে ছবির দিকে। লেখায় খাটাতে হয় কতর্ব্যবুদ্ধিকে। কর্তব্য ফাঁকি দেওয়ার দিকেই মনের স্বাভাবিক ঝোঁক। জীবন আরম্ভ করেছিলুম লীলা দিয়ে— পড়া এড়িয়ে লিখেছি কবিতা। মধ্যবয়সে সেই অকর্মণ্যতা খুব কষে পূরণ করেছি লিখে লিখে। সে সব লেখা বোঝাটানা লেখনীর লেখা। তখন সেটাতে প্রবৃত্তি ছিল। নানা ভাবনা ভাবতুম আর লিখতুম— গদ্যভাষায় নানা চাল উদ্ভাবন করতে ভালোই লাগত— তখন বাংলা গদ্য ভাষার গতিতে কলাবৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল না। তার চাল দুরস্ত করবার কর্তব্য শেষ করেছি। তার আড়ষ্টভাব গেছে, সে নানাদিকে নানা ভঙ্গীতে হাত পা খেলাতে পারে। তাই এখন আমার কলাচর্চার শখটা ছুটছে ছবির দিকে।

অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত

৮ শ্রাবণ, ১৩৩৯

তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায়
লেখনীর নটনলেখায়।
নির্বাকের গুহা হতে আনিয়াছি
নিখিলের কাছাকাছি,
যে সংসার হতেছে বিচার
নিন্দা প্রশংসার।
এই আস্পর্ধার তরে
আছে কি নালিশ তোর রচয়িতা আমার উপরে।
অব্যক্ত আছিলি যবে
বিশ্বের বিচিত্র রূপ চলেছিল নানা কলরবে
নানা ছন্দে লয়ে
সৃজনে প্রলয়ে।
অপেক্ষা করিয়া ছিলি শূন্যে শূন্যে, কবে কোন্ গুণী
নিঃশব্দ ক্রন্দন তোর শুনি
সীমায় বাঁধিবে তোরে সাদায় কালোয়
আঁধারে আলোয়।
পথে আমি চলেছিনু। তোর আবেদন
করিল ভেদন
নাস্তিত্বের মহা-অন্তরাল,
পরশিল মোর ভাল
চুপে চুপে
অর্ধস্ফুট স্বপ্নমূর্তিরূপে।
অমূর্ত সাগরতীরে রেখার আলেখ্যলোকে
আনিয়াছি তোকে।
ব্যথা কি কোথাও বাজে
মূর্তির মর্মের মাঝে।
সুষমার অন্যথায়
ছন্দ কি লজ্জিত হল অস্তিত্বের সত্য মর্যাদায়।
যদিও তাই বা হয়
নাই ভয়,
প্রকাশের ভ্রম কোনো
চিরদিন রবে না কখনো।

রূপের মরণক্রটি
আপনিই যাবে টুটি
আপনারি ভারে,
আর বার মুক্ত হবি দেহহীন অব্যক্তের পারে।

পরিশেষ

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহার ছবির সম্বন্ধে যা ভাবিয়াছেন বা লিখিয়াছেন, বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকা হইতে তাহার একটি সঞ্চয়ন প্রকাশ করা হইল। বলা বাহুল্য, ইহা এই বিষয়ে কবির সমুদয় উক্তির নিঃশেষ সমাহার নয়।

১৩৫১ বৈশাখ

তানসেন ঘরানা

ক্ষিতিমোহন সেন

বাদশাহী আমল হইতে আজ পর্যন্ত উত্তর ভারতে ভারতীয় সংগীতের ধারাকে গৌরবের সহিত বজায় রাখিয়াছেন তানসেনের "ঘরানা" অর্থাৎ পরিবার। তাই তানসেনের ঘরানার ও সেই বংশীয়দের সাধনার কথা কিছু আলোচনা করা দরকার। এই বিষয়ে আমার জানাশুনা যাহা ছিল তাহা অন্যত্রও আমি বলিয়াছি। তাহার পর পণ্ডিত সুদর্শনাচার্য তাঁহার বিখ্যাত পুরাতন-সংগীত-বিষয়ক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে, এবং পণ্ডিত গণেশপ্রসাদ দ্বিবেদী "হিন্দুস্থানী কলচর ও সংগীত" নামে হিন্দুস্থানী-উর্দু কাগজ নয়া-হিন্দের মধ্যে বৎসরাধিক কাল যে-সব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই এই প্রবন্ধে প্রচুর সাহায্য পাইয়াছি। ইঁহাদের সহায়তা বিনা এই প্রবন্ধ লেখা সম্ভব হইত না।

আকবরের দরবারে বাবা রামদাস, তানসেন, ব্রজচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র প্রভৃতি বড়ো বড়ো গুণী ছিলেন। সেই যুগে সিংহলগড়ের রাজা সমুখনসিংহ বীণার অসাধারণ গুণী ছিলেন। আকবর তাঁহাকে কোনো মতে বশ মানাইতে না পারিয়া তাঁহার পুত্র মিশ্রীসিংহকে জোর করিয়া ধরিয়া আনেন ও অনেক কষ্টে সিংহকে শান্ত করেন। মিশ্রীসিংহও পিতার মতোই বীণার গুণী ছিলেন। তাঁহার বীণাবাদ্যে অসাধারণ ওজস্বিতা ছিল।

তানসেনের জন্ম গৌড় ব্রাহ্মণ বংশে। তাঁহার পিতা মকরন্দ পাণ্ডে রেওয়ায় বাঘেল রাজা রামচন্দ্রের দরবারী গুণী ছিলেন। তানসেন প্রথমে ছিলেন বৃন্দাবনের বাবা হরিদাস স্বামীর শিষ্য, পরে গোয়ালিয়রের সুফি ফকির মহম্মদ ঘৌসের কাছে শিক্ষা নেন ও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। তবে তানসেন-পরিবারে এখনো গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের অনেক আচার বজায় আছে। তাহা ক্রমে বলা যাইতেছে।

মোটামুটি ১৫৩১ হইতে ১৫৮৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে তানসেন জীবিত ছিলেন। আবুল ফজল বলেন, গত হাজার বছরের মধ্যে এমন গুণী জন্মান নাই। কবি হিসাবেও তানসেন অতিশয় মাননীয়। তাঁহার গানে হিন্দুব্রাহ্মনোচিত ভক্তি প্রচুর পরিমাণে আছে। ধ্রুপদ-ভৈরবে তাঁহার গানে শিবের অপূর্ব সব বন্দনা দেখিতে পাই।

মহাদেব মহাকাল ধুরজটী শূলী পঞ্চবদন প্রসন্ন নেত্র।
পরমেশ্বর পরাৎপর মহাযোগী মহেশ্বর পরমপুরুষ প্রেমময়
ভিন্ন ভিন্ন পথ যৈসে আবত, সিন্ধুবা পাত্র রহত মগন
তানসেন ঐ হৈ— তৈসে ভিন্ন ভিন্ন মুরতি উপাসত ঐ মহীসমূহ আবত॥

সরস্বতী বিষয়েও মিঞা তানসেনের একটি ধ্রুপদ উদ্ধৃত করা যাউক।

সরস্বতী মাতা হো বরদাঈ
ব্রহ্মা বিষ্ণুকী তো হৈ দুহাঈ...
বীচ সভা কে রহো সহাঈ
দেত তোহে অব রাম দুহাঈ। সরস্বতী...

দীপাবলীর উৎসবে মিঞা তানসেনের বংশীয়েরা স্বহস্তে গৃহপ্রাঙ্গণ গোময়লিপ্ত করিয়া সরস্বতী-পূজায় বসিয়া এই ধ্রুপদটিই গান করেন।

আবার মুসলমানী ভাবের পদেও তাঁহার গভীর অনুরাগ দেখা যায়। সেইরূপ গানও উদ্ধৃত করা যাউক।

তূ অব যাদ কর যে বন্দে
আপনে অল্লাহ কো,
জো কুছ ভলা হো তেরো
লা ইলাহ ইল্লিল্লাহ, মুহম্মদ রসুলিল্লাহ,
নবীজীকা কলাম জবাঁ পর ধর লে বন্দে।

তানসেনের গানেই দেখা যায় চারি প্রকারের ধ্রুপদ ছিল। তাহার মধ্যে রাজা হইল "গৌড়হার," সেনাপতি হইল "খংডার," মন্ত্রী হইল "ডাগুর," বকসী হইল "নৱরহার"।

বাণী চারোঁকে ব্যোহার
সুন লীজে হো গুণীজন তব পারে বিদ্যাসার।
রাজা গোৱরহার, ফৌজদার খংডার, দীৱান ডাগুর, বকসী নৱরহার।
অচল সুর পঞ্চম, চল সুর রেখব, মধ্যম ধৈবত নিখাদ গংধার,
সপ্তক তীন, ইক্কীস মূরছনা, বাঈস শ্রুতি, উনংচাস কূটতান, তানসেন আধার। (ধ্রুপদ ভূপালী)

ইহার মধ্যে তানসেনের রীতি হইল গৌড়হার। তিনি গৌড় ব্রাহ্মণ বংশীয়। ইহা ধীরস্থির বলিয়া রাজা। মিশ্রীসিংহের রীতি ক্ষত্রিয়ের ওজস্বী রীতি, তাহাই সেনাপতি। ঠাকুর হরিদাসই ডাগুর (ঠাকুর), তাঁহার রীতি দীৱান বা মন্ত্রী।

মিশ্রীসিংহের বীণাতে ক্ষত্রিয়কুলোচিত বীরত্ব ছিল। তাই তাহা ছিল খড়্গবৎ তীক্ষ্ণ। সেই বাণীর নাম খড়্গবাণী বা খাণ্ডার-বাণী। মিশ্রীসিংহ তানসেনকে প্রভূত সম্মান করিতেন। কারণ তানসেন ছিলেন মিশ্রীসিংহের পিতার গুরুভাই। তানসেনের অনুরোধে মিশ্রীসিংহ তানসেনের কন্যা সরস্বতীকে বীণা শিখাইতেন। এভাবে উভয়ে প্রেম হয়। মিশ্রীসিংহ তানসেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া মিশ্রী খাঁ হন। পারসীতে 'নবাত' অর্থে মিশ্রী। তাই নবাত খাঁ নামেও তিনি পরিচিত। মিশ্রী বংশে তানসেনের যে দৌহিত্রধারা চলে তাহাতে ন্যামত খাঁ, সদারঙ্গ, অদারঙ্গ প্রভৃতি বহু গুণীর জন্ম হইয়াছে। তানসেনের পুত্রগত ও কন্যাগত বংশের কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া যাইবে। ইঁহারাই সারা উত্তর ভারতের সংগীতবিদ্যাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।

তানসেনের ধারায় চিরদিন বীণাযন্ত্রেরই সমাদর। বীণাকে ইঁহারাও সর্বকলাযুক্ত, সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন। তানসেনের পুত্র ও কন্যার বংশ ছাড়াও দুই-একটি প্রখ্যাত বীণকার-ঘরানা উত্তর ভারতে আছেন। সেইরূপ এক বংশের শেষ গুণী সাদিক অলী খাঁ রামপুর দরবারে উজীর খাঁর স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। ইঁহাদের আদিপুরুষ মাধব নামে ব্রাহ্মণ নাকি রাজা বিক্রমাদিত্যের বীণকার ছিলেন। 'মাধবানল কন্দলা' গ্রন্থ ঐ মাধবেরই কথা। এই বংশেরই শিষ্য হরিদাস ও বৈজু বাওরা। সাধক গুণী বৈজু কোনোদিন কোনো দরবারে ধরা দেন নাই। আকবর তাঁহাকে বহু চেষ্টায়ও বাঁধিতে পারেন নাই। সাদিক অলী খাঁর পিতা মুশর্‌রফ খাঁও অপূর্ব গুণী ছিলেন। তাঁহার গুরু বন্দে অলী খাঁর সমতুল্য গায়ক-বাদক নাকি কেহ দেখেন নাই। তাঁহারা সবাই সাধক বৈজুবাওরার ধারার শিক্ষা পাইয়াছেন।

এই-সব গুণী অতিশয় উদার ও মুক্তপ্রাণ, সাম্প্রদায়িক কোনো সংকীর্ণতার ধার ইহারা ধারিতেন না। ইঁহারা যেমন মুক্তপ্রাণ তেমনি মুক্তহস্ত। অনেকের আয়ও বেশি ছিল না। তাই ইঁহারা প্রায়ই ঋণ করিতে বাধ্য হইতেন। ঋণ করিতে গেলে যদি কিছু বাঁধা রাখিতে হয়; তবে বাঁধা রাখিবার মতো ইঁহাদের ছিলই বা কী? বিত্তের মধ্যে তো এক রাগরাগিণী। তখনকার দিনে বানিয়ারা কোন্ কোন্ রাজা-বাদশার প্রিয় কোন্ কোন্ রাগ, তাহার খবর রাখিতেন, এবং সেই-সব রাগ বাঁধা রাখিয়া গুণীদের কর্জ দিতেন। দরবারে সেই রাগের ফরমাইস হইল, কিন্তু গুণী বাজাইতে অক্ষম। এমন অবস্থায় দরবারের লোক আসিয়া নগদ টাকা দিয়া রাগরাগিণী ঋণমুক্ত করিলে গুণী তাহা বাজাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ ঘটনা তখনকার দিনের বিবরণে পাওয়া যায়।

যে-সব গুণীদের কথা বলা হইতেছে ইঁহারা উত্তর ভারতের। দক্ষিণ ভারতের গুণী ও বীণকারদের ধারা স্বতন্ত্র। ত্যাগরাজ প্রভৃতিদের প্রভাব সেই দেশে। সেখানকার সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী প্রভৃতির বীণাও অপূর্ব বস্তু। সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তাঁহার বীণাতে যেন অন্তরাত্মা কথা বলিত।

তানসেনের বংশের কথা বলিতে গেলে তাঁহার পুত্রদের ধারা এবং কন্যা সরস্বতীর ধারা বলিতে হয়। দুই ধারাই সংগীতে সমান সিদ্ধহস্ত। তানসেনের পুত্রগত ধারা প্রধানত রবাবে ও বীণায় প্রবীণ। তানসেনের পিতার নাম মুকুন্দরাম বা মকরন্দ পাণ্ডে। তানসেনের নাম ছিল রামতনু পাণ্ডে। স্ত্রীর নাম প্রেমকুমারী। তাঁহাদের চারি পুত্র ও এক কন্যা সরস্বতী। মিশ্রীসিংহের সঙ্গে সরস্বতীর বিবাহ হয়। তানসেনের চারি পুত্রের নাম সুরত সেন, শরৎ সেন, তরঙ্গ সেন ও বিলাস সেন। সুরত সেনের পুত্র মোহসেন বা মহাসেন, তাহার পুত্র সুধীন সেন বা সুহীল সেন। মতান্তরে সুরত সেনের পুত্র সুহীল সেন ও সুধীন সেন। দ্বিতীয় পুত্র শরৎ সেন নিঃসন্তান। তৃতীয় তরঙ্গ সেন বা তানতরঙ্গের নামই আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায়। চতুর্থ পুত্র বিলাস খাঁয়ের ধারাই বহুদিন চলিয়াছে। তাঁহার পুত্র উদয় সেন ও দয়াল সেন। উদয় সেনের পুত্র করীম সেন। করীমের পুত্র সুঘর খাঁ ও রাগরস খাঁ। কনিষ্ঠ রাগরসের পুত্র মসীত খাঁ সেতারের

"মসীত খানী" ঢঙের প্রবর্তক। এখন এই ঢঙই সর্ব-গুণিজন-মান্য ও অতুলনীয়। তাঁহার পুত্র বাহাদুর খাঁর সন্তানের কথা জানা নাই। করীমের বড়ো পুত্র সুঘর খাঁর পুত্র হসন খাঁ।

হসনের পুত্র গুলাব খাঁ। গুলাব খাঁ (তানসেনের কন্যাবংশজ) বিখ্যাত সদারঙ্গের বন্ধু ছিলেন। গুলাবের তিন পুত্র ছজ্জু খাঁ, জ্ঞান খাঁ ও জীবন খাঁ। তৃতীয় পুত্র জীবন খাঁর দুই পুত্র বাহাদুর খাঁ ও হয়দর খাঁ। বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরের রাজার আশ্রয় লন ও বাংলাদেশে সংগীতধারা বিস্তৃত করেন। হয়দর খাঁ ফকির হইয়া যান। ইঁহার শিষ্যদের মধ্যে ফকীরী সাধক এক বংশ কানপুরের কাছে কালপীতে এখনো আছেন। লক্ষ্ণৌর নবাব অলী এই বংশের বড়োই ভক্ত। গুলাব খাঁর দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞান খাঁর বংশ নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র ছজ্জু খাঁর দিগ্বিজয়ী তিন গুণী পুত্র, জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসিত খাঁ। ছজ্জু খাঁর ছোটো এক কন্যা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বাহাদুর খাঁ নিঃসন্তান। ছজ্জু খাঁর দ্বিতীয় পুত্র মহাগুণী প্যার খাঁও নিঃসন্তান। তৃতীয় পুত্র বাসিত খাঁর তিন পুত্র। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র কাসিম অলী খাঁরও এক কন্যা। বীণকার অমীর খাঁর সঙ্গে সেই কন্যার বিবাহ হয়।

জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসিত খাঁ তিনজনেই অসাধারণ গুণী। ধ্রুপদে আলাপে যন্ত্রবাদ্যে ইঁহাদের তুলনা নাই। জাফর ও প্যার খাঁ পিতা ছজ্জু খাঁর শিষ্য। বাসিত খাঁ ছিলেন নিঃসন্তান কাকা জ্ঞান খাঁর পালিত পুত্র ও সাকরেদ। জ্ঞান খাঁ বাসিতকে যন্ত্রবাদ্যের সঙ্গে যোগ ও প্রাণায়াম শিক্ষা দেন। এই তিন ভাই রবাবে ও বীণায় সমান ওস্তাদ। তানসেনের কন্যাবংশীয় বিখ্যাত গুণী নির্মল শাহের ভাইপো উমরাও এই তিন ভাইয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। এই চারিজনের শিক্ষা-দীক্ষা-আনন্দ একত্রে চলিত। কাশীর মহারাজার কাছে সকলে সমবেত হইতেন। নির্মল শাহের ঘরানার অনেক গুপ্তবিদ্যা এই তিন ভাই নির্মল শাহের কাছে লাভ করেন।

এখন তানসেনের যে ধারা কন্যা সরস্বতীর সন্তানের মধ্য দিয়া বিস্তৃত, তাহার কথা বলা যাউক। পরম গুণী অতুলনীয় বীণাবাদক রাজা সমূখন সিংহের পুত্র অদ্বিতীয় বীণকার মিশ্রীসিংহ কলাগুরু তানসেনের কন্যা সরস্বতীকে বিবাহ করেন ও তখন ইঁহার নাম হয় নবাত খাঁ। ইঁহাদের বংশে বড়ো বড়ো গুণী বীণকার জন্মিলেন। ইঁহাদের অষ্টম পুরুষে অপরূপ কলাবিৎ ন্যামত খাঁর জন্ম। ইঁহার চলিত নাম সদারঙ্গ। সদারঙ্গ ছিলেন বাদশাহ মহম্মদ শাহ রংগেলীর দরবারে বীণকার। বাদশাহ রংগেলীর দরবারে তখন তানসেনের পুত্রবংশীয় গুলাব রায় ছিলেন গায়ক। গুলাব রায় হইলেন তানসেনপুত্র বিলাস খাঁর পঞ্চম পুরুষ, দরবারে বীণকার বলিয়া ন্যামত খাঁর স্থান ছিল গায়ক গুলাব রায়ের পশ্চাতে। তখন কলাবিদ্যায় ন্যামতের তুলনা নাই। এই দুঃখে ন্যামত খাঁ দরবার হইতে কিছুকালের জন্য বিদায় লইয়া কয়েকটি ভিখারী ছেলে বাছিয়া লইয়া তাহাদের দুই বৎসর অক্লান্ত সাধনায় গান শিখাইলেন। বাদশাহ রংগেলীর দরবারে সেই ছেলেদের গান শুনাইলে সকলে মুগ্ধ হইলেন। ন্যামত খাঁ ধ্রুপদের বদলে সহজতর খেয়াল ছেলেদের শিখাইয়াছিলেন। এতদিন খেয়ালের কদর দরবারে ছিল না। লোকগীত

হিসাবেই তাহা চলিত। এইবার নূতন রীতির এই গান ধ্রুপদ হইতেও বেশি পছন্দ হওয়ায় খেয়ালের স্থান প্রতিষ্ঠিত হইল। আর দুই বৎসরে গায়ক রচনা করায় ন্যামতের স্থানও গায়ক গুলাব রায়ের সমান হইল। ন্যামত খাঁকে সদারঙ্গ নাম উপাধিরূপে দেওয়া হইল। ইহার পরে সব গানে ন্যামত নিজের নাম সদারঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সদারঙ্গের ধারায় ক্রমে শত শত নূতন নূতন খেয়াল রচিত হইতে লাগিল। ধ্রুপদের একাধিপত্য আর রহিল না। তাহার সঙ্গে এই নবাগত রীতি খেয়ালের স্থানও স্বীকৃত হইল।

সদারঙ্গের পুত্র ফিরোজ খাঁ বা অদারঙ্গ এবং ভূপতি খাঁ বা মনরঙ্গ।

সদারঙ্গের পৌত্র জীবনশাহ এবং প্যার খাঁ। এই দুইজনেই সংগীতসাধনায় সিদ্ধপুরুষ। এই প্যার খাঁ "উংগল কট" বা আঙুল-কাটা বলিয়াই প্রসিদ্ধ। বাল্যকালে গাড়িচাপা পড়িয়া তাঁহার ডান হাতের তর্জনীটি কাটা যায়। বীণা বাজাইতে এই আঙুলেরই প্রয়োজন। তাই প্যার খাঁকে গায়কী গানই শিক্ষা দেওয়া হয়। গায়কী বলিতে ধ্রুপদ ধামারের কলাবতী অংশ বুঝায়। ইঁহার দাদা জীবনশাহ বীণায় সিদ্ধহস্ত হইলেন। অথচ ইনি বীণা বাজাইতে অক্ষম, তাই ইঁহার মনে এমন দুঃখ হইল যে ইনি মৃতপ্রায় হইলেন। তখন পিতা মনরঙ্গ ও জ্যাঠা অদারঙ্গের বড়ো দুশ্চিন্তা হইল। তাঁহারা কাঠের আঙুল প্যার খাঁর হাতে পরাইয়া তাহাতে মের্জাব চড়াইলেন। গানের জন্য রাগ-পরিচয় তো ইঁহার পূর্বেই ছিল। এখন বীণায় ইনি অপূর্ব শক্তি লাভ করিলেন। দিল্লীর বাদশাহী দরবারে এই আঙুল-কাটা প্যার খাঁ-ই বীণকার হইলেন। কিন্তু চল্লিশ বৎসর বয়সেই প্যার খাঁ পরলোকগত হইলেন। তাহার পরে জীবনশাহ হইলেন দরবারী বীণকার।

জীবন খাঁ শুধু কলাবিৎ ছিলেন না, তিনি যোগ প্রভৃতি সাধনাতেও অগ্রসর ছিলেন। তাই তিনি 'শাহ' নামে খ্যাত হন।

বাদশা রংগেলীর পরে দিল্লীর বাদশাহীর দুরবস্থা বাড়িতে লাগিল। গুণীদের আর আশ্রয় রহিল না। তাঁহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন। শাহ আলম বাদশার পূর্বে তানসেনবংশীয় ছজ্জু খাঁ ছিলেন রবাবী, এবং ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন তাঁহার ভাই জ্ঞান খাঁ ও জীবন খাঁ। ইঁহাদের বংশকে "দঢ়িয়ালী" পরিবার বলে। তখন বীণকার ছিলেন আঙুল-কাটা প্যার খাঁ; জীবনশাহ। বড়ো বড়ো এত গুণীর সমাবেশ আর কখনো কোথাও দেখা যায় নাই।

দিল্লীর বাদশাহীর দুরবস্থা ঘটিলে তানসেন পরিবারের কেহ কেহ গেলেন রাজপুতানায় হিন্দু রাজাদের দরবারে, কেহ গেলেন কাশীরাজের আশ্রয়ে। উদয়পুরে ধ্রুপদীরা এবং গোয়ালিয়রে ও রেওয়াতে খেয়ালীরা আদৃত হইলেন। কাশীতে গেলেন রবাবীরা, সেতারীরা গেলেন জয়পুরে, বীণকারেরা গেলেন রামপুরের নবাবের আশ্রয়ে। কাশী, অযোধ্যা, গয়া, বেতিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর পর্যন্ত গায়কেরা ছড়াইয়া পড়িলেন। ইহাদের "পূরবিয়া" বলে। রাজপুতানা, রামপুর, গোয়ালিয়রের তানসেনী পরিবারকে "পশ্চিমা" বলে।

জীবনশাহের দুই পুত্র, রসবীন খাঁ ও নির্মলশাহ। নির্মলশাহ ছিলেন অতিশয় উচ্চদরের গুণী। রসবীন বাল্যকালে নাকি বড়ো উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। পরে অনুতাপে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হন। গুরুজনদের তিনি বলিলেন, 'এই জীবনে কাজ কী?' পরে গুরুজনদের আশ্বাসে বীণার সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ও অচিরে অদ্ভুত সিদ্ধিলাভ করিলেন। ইঁহাকে মিশ্রীসিংহের অবতার বলিয়া ছোটো নবাত খাঁ বলা হইত।

নির্মলশাহের বিষয়ে পরে আরো বলা হইবে। তাঁহার দুই পুত্র, অমীর খাঁ ও রহীম খাঁ। অমীরের পুত্র ৱজীর খাঁ ও ফৈজ অলী খাঁ। ৱজীর খাঁর বিষয়েও কিছু ভালো করিয়া বলা দরকার। ৱজীর খাঁর পুত্র নজীর খাঁ, রসীর খাঁ, সগীর খাঁ। নজীর খাঁর পুত্র ঝম্মন খাঁ, দবীর খাঁ ও দিলদার খাঁ। দবীর খাঁ এখনো জীবিত এবং কলিকাতায় তানসেনী সংগীতের বড়ো গুণী। রেডিয়োর মারফতে ইঁহার পরিচয় এখন অনেকে পান।

সুরসিংগার-গুণী বাহাদুর সেন খাঁর সন্তান ছিল না। তাই তিনি রামপুরে থাকিতে আপন সকল বিদ্যা ৱজীর খাঁকে দিয়া যান। ৱজীর খাঁ সংগীত ছাড়াও শ্রদ্ধার সহিত যোগশাস্ত্র পুরাণাদি, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কাছে শিক্ষা করেন। ইঁহার রচিত যে-সব গীতিনাট্য (opera) আছে তাহা অভিনয় করাইয়া দেখিলে লোকে ইঁহার গীতশক্তি বুঝিতে পারিবেন। ইনি ভক্তদের কাছে বৈষ্ণবসাহিত্য শিখিয়া ব্রজভাষায় ভালো কাব্যও রচনা করেন।

হয়দর অলী ছিলেন ভিলসীর জমিদার। তিনি ৱজীর খাঁকে পুত্রবৎ স্নেহে রাখেন। কিছুকাল পরে ৱজীর খাঁ কাশীতে আসিয়া সাদিক অলী ও নিসার অলীর কাছে আরো কিছু কলারহস্য শিখিয়া লইলেন। ইহার পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সম্ভ্রান্ত মুন্সীজীর কাছে রহিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, তারাপ্রসাদ ঘোষ, রাজা দুনী শীল, যাদবেন্দ্রবাবু প্রভৃতির সঙ্গেও ৱজীর খাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিল। ৱজীর খাঁ আট বৎসর এ দেশে থাকিয়া বাংলা বলিতে পারিতেন। পেশাদারী কলাবতদের সহজে তিনি কিছু দিতেন না বলিয়া লোকে তাঁহাকে অহংকারী বলিত। বড়ো বড়ো বৈঠকে তিনি সুরসিংগার বা বীণা বাজাইতেন। একবার গোবরডাঙায় জ্ঞানদাপ্রসন্ন রায়ের বৈঠকে এক আসনে ছয় ঘণ্টা চাঁদনী-কেদারা রাগ তিনি শুনাইয়াছিলেন। যিনি সেই কলা-আলাপ শুনিয়াছেন তিনি কখনো তাহা ভুলিবেন না।

ৱজীর খাঁ কর্ণাটী বা দক্ষিণী বীণরীতিও জানিতেন। তারাপ্রসাদ ঘোষ, প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে তিনি রুদ্রবীণা শেখান। তাহার পর রামপুর হইতে ডাক আসিলে ইনি সেখানে যান। নবাব হামিদ অলী ইঁহার কাছে শিক্ষা লইতে লাগিলেন।

মৈহরের বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দীন ও গোয়ালিয়রের দরবারী ওস্তাদ হফীজ অলী খাঁ স্বরোদীয়া ৱজীর খাঁর শিষ্য। আলাউদ্দীনের বাড়ি পূর্ব্ববঙ্গ ত্রিপুরা জেলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকট শিবপুর গ্রামে। ইঁহারা জাতিতে "নট" অর্থাৎ বাদ্যকর। নটেরা নামে মাত্র মুসলমান। আসলে ইঁহাদের মধ্যে হিন্দু আচার-বিচারই বেশি। ইঁহাদের মধ্যে গুলমহম্মদ, আফ্‌তাবউদ্দীন প্রভৃতিরা বাউল ভাবের সাধক।

আফ্‌তাবুদ্দীনের ছোটো ভাইই হইলেন এই আলাউদ্দীন। ইনি ছিলেন অতি গরীব। কলিকাতায় আসিয়া অতি কষ্টে সংগীত শিক্ষা করিতেছিলেন। ৰজীর খাঁ কিছুতেই এই দরিদ্র শিক্ষার্থীর প্রতি প্রসন্ন হইলেন না। তাই আলাউদ্দীন বছরের পর বছর ৰজীর খাঁর দরবারে ধন্না দিয়া পড়িয়া রহিলেন। পরে যখন ৰজীর খাঁ রায়পুর গেলেন আলাউদ্দীনও পিছে পিছে গেলেন। সেই অচেনা অজানা স্থানে আলাউদ্দীনের দুঃখের অন্ত ছিল না। বহুকাল পরে ৰজীর খাঁ প্রসন্ন হইয়া আলাউদ্দীনকে গ্রহণ করিলেন ও আঠারো বৎসর তালিম দিলেন। এখন ৰজীর খাঁর বিদ্যার শ্রেষ্ঠ অধিকারী আলাউদ্দীন। তিনি এখন সর্ববাদ্যবিশারদ। ইঁহার সঙ্গে ৰজীর খাঁর শিষ্য আর-একজনের মাত্র নাম মনে আসে। তিনি বিখ্যাত স্বরোদীয়া হফীজ অলী।

ৰজীর খাঁর শিষ্যদের মধ্যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, রাজা নবাব অলী, রবাবী মহম্মদ অলীর নাম উল্লেখযোগ্য। ভাতখণ্ডের হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি ছয় ভাগের ধ্রুপদ স্বরলিপির বহু বস্তুই ৰজীর খাঁর কাছে পাওয়া। প্রথমে ৰজীর খাঁ ভাতখণ্ডকে এই-সব স্বরলিপি কিছুতেই দিতে চান নাই। পরে ভাতখণ্ডের সাধনা ও প্রতিভার মহত্ত্ব দেখিয়া ৰজীর খাঁ প্রসন্ন হইলেন ও অজস্র সম্পদ দিলেন।

ভাতখণ্ডে শোনামাত্রই স্বরলিপি করিতে পারিতেন। এই গুণ তাঁহারই শিষ্য শ্রীকৃষ্ণরতন-জনকরেরও আছে। একবার লক্ষ্ণৌ-এর বিখ্যাত বৃদ্ধ গুণী খুর্শেদ অলীকে সংগীত-বিদ্যার-মহাপীঠ মরিস কলেজে সাদরে নিমন্ত্রণ করা হয়। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল একশত বৎসর। তিনি অলী শাহের দরবারী। স্বরলিপিতে যে ভালো ভালো সংগীতবস্তু ধরা পড়ে তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। খুর্শেদ অলী গাহিতেছেন আর শ্রীকৃষ্ণরতন জনকর গোপনে তখনই স্বরলিপি করিয়া চলিয়াছেন। খুর্শেদ অলীর গান শেষ হইতেই তাঁহাকে স্বরলিপি হইতে সেই গান শোনানো হইল। তিনি স্বরলিপির গান শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

ধ্রুপদাদি গানের স্থির অংশকে বলে নায়কী। তাহার উপর কলাবিৎ যে আপন কলায় স্বচ্ছন্দ লীলা দেখান তাহা গায়কী। এই গায়কীও যে স্বরলিপিতে বাঁধা যায় তাহা দেখিয়া খুর্শেদ অলী বলিলেন, "একী ভূতের কাণ্ড! এরা মানুষ না ভূত!"

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাঁহার হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির চতুর্থ ভাগে যাঁহাদের কাছে তাঁহারা সব বস্তু পাইয়াছেন এমন বহু ওস্তাদের নাম করিয়াছেন (পৃ. ৬)। তাঁহাদের মধ্যে তানসেনের পুত্রধারার শেষ গুণী মহম্মদ অলী খাঁ (বাসিত খাঁর পুত্র) এবং কন্যাধারার এই ৰজীর অলীকে আপন গুরু বলিয়াই ভাতখণ্ডে স্বীকার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আরো বহু মুসলমান গুণীদের নাম এই গ্রন্থে আছে। যথা— রামপুর পতি হামিদ অলী খাঁ, সাহেবজাদা সআদত অলী খাঁ, খাঁ সাহেব মুহম্মদ অলী, বাসিত খাঁ রায়পুরী, উজীর খাঁ রায়পুরী, অমীর খাঁ রায়পুরী, মনরংগ পরিবারের মুহম্মদ অলী খাঁ (কবি ৰালী, জয়পুরী), বৈরাম খাঁর শিষ্য হায়দর অলী খাঁ, বরোদার ফৈয়াজ খাঁ, রংগেলী পরিবারের বরোদার অমীর খাঁ (জলতরঙ্গী)। ইহা ছাড়া গোয়ালিয়রের পীর

বক্‌স, নখন খাঁ, বোম্বাইয়ের আবদুল্লা খাঁ, মিরাজ প্রভৃতি স্থানের বহু হিন্দু ওস্তাদের নামও আছে। মুসলমানদের পক্ষে যদিও সংগীতসেবা নিষিদ্ধ তবু সংগীতের বড়ো বড়ো সাধক প্রায় সবই মুসলমান।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ও রাজা নবাব অলীর গুরু এবং তানসেন-বিলাস খাঁর বংশধর মহম্মদ অলী খাঁ বিশ বৎসর পূর্বেও জীবিত ছিলেন। ইঁহাদের বংশে সবাই রবাবে প্রবীণ।

জাফর খাঁর সুরসিংগারের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এমন অপূর্ব যন্ত্রের শেষ মহাগুণী ছিলেন ছম্মন সাহেব, রায়পুরের নবাব সআদত অলী খাঁ। এখনকার দিনে বাংলায় শুধু আলাউদ্দীন ও বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এই আসল সুরসিংগার শুনিয়াছেন এবং আপন জীবনে তাহা রাখিয়াছেন।

ন্যামত খাঁ ও বাদশা মহম্মদ শাহ্ রংগীলীর রচিত বহু খেয়ালের স্বরলিপিই ভাতখণ্ডের গ্রন্থে মেলে। কিন্তু তাঁহাদের রচিত বহু ধ্রুপদ ধামার ঘরানার বাহিরে এখনো যায় নাই। ন্যামত খাঁ আপন সন্তানদের ধ্রুপদ ও আলাপচারী শিখাইলেও তাহা তাঁহাদের দরবারে গাহিতে দিতেন না। সেই বংশীয় মহম্মদ দবীর খাঁর কাছেও এই-সব খবর পাওয়া যায়।

তানসেনী ঘরানায় কলাবতদের অর্থ ও স্নেহের বিষয়ে উদারতার সীমা নাই। কিন্তু সংগীতের বিষয়ে তাঁহাদের কৃপণ মনোবৃত্তির প্রশংসা করা যায় না। তবে তাঁহাদের মধ্যেও তানসেনের কন্যাবংশীয় নির্মলশাহের উদারতা বিস্ময়কর। ইঁহার পূর্বে ঘরানার কোনো "খাস" বস্তু বাহিরে যাইতে পারে নাই। ইঁহার ধ্রুপদী শিষ্যধারাতে ছিলেন মহনীয়কীর্তি মুশর্‌রফ খাঁ। এই যুগের সর্বাপেক্ষা বড়ো ধ্রুপদী উদয়পুরের আলাবংদে খাঁ ও তাঁহার পুত্র নসীরুদ্দীনও নির্মলশাহের শিষ্যধারাতে। ১৯২৪ সালের লক্ষ্ণৌ-এর সংগীত-মহাসম্মেলনে বাপ-বেটা দুইই উপস্থিত হন। ইঁহারা আলাপে সকলকে দুই প্রহর পর্যন্ত স্তব্ধ রাখিয়াছিলেন। ছম্মন সাহেব, ভাতখণ্ডে ও রাজা নবাব অলীর উদ্যোগেই এই মহাসম্মেলন হয়। খেয়ালী শকর মস্‌কিন খাঁও নির্মল শাহের শিষ্য। গত শতাব্দীর বীণাগুরু বন্দেঅলী খাঁ ও স্বরোদীয়া মুরাদ খাঁ এবং হফীজ অলী নির্মলশাহেরই খেয়ালীশিষ্য পরম্পরায়। সেতারী ইমদাদ ও তাঁহার পুত্র ইনায়েত খাঁও এই ধারার সঙ্গেই যুক্ত। হয়তো নির্মলশাহ্ পুত্রহীন ছিলেন বলিয়াই এতটা উদার ছিলেন।

নির্মলশাহের ভাইপো উমরাও খাঁও বহু যোগ্য যোগ্য শিষ্য করিয়াছিলেন। উজীর কুতবুদ্দৌলা এবং গোলাম মহম্মদ খাঁর নাম বহুখ্যাত। খুব বড়ো একপ্রকার সেতারেই নির্মলশাহ কুতুবুদ্দৌলাকে বীণার আলাপ শেখান। তাহাই পরে সুরবাহার নামে খ্যাত হয়। সুরবাহারে সজ্জাদ মহম্মদ খাঁ, ইমদাদ খাঁ, ইনায়েত খাঁ একেবারে চূড়ান্ত কীর্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। সজ্জাদ মহম্মদ খাঁ বহুদিন রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে ছিলেন।

উমরাও খাঁর দুই পুত্র, অমীর খাঁ ও রহীম খাঁ। অমীর খাঁর শিষ্য কাশীর মিঠাইলাল ও মির্জাপুরের পণ্ডিত জোখুরাম। আমরা বাল্যকালে কাশীতে বড়ো বড়ো মজলিসে মিঠাইলালের বাদ্য শুনিয়া সভাসুদ্ধ লোককে স্তব্ধ থাকিতে দেখিয়াছি। বড়কু মিঞা বা আলী মহম্মদও মিঠাইলালের বীণাগুরু ছিলেন। অমীর খাঁর পুত্র ৱজীর খাঁ আরো খ্যাতি লাভ করেন। ইহার কথা অন্যত্র বলা হইয়াছে। ৱজীর খাঁর শিষ্য রায়পুরের নবাব ও রাজা নবাবালী। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে— যিনি সর্বভারতে ভারতীয় সংগীতকে বিস্তৃত করিলেন তিনিও ৱজীর খাঁর শিষ্য।

জাফর খাঁ বহুদিন রেওয়ার মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহের দরবারে ছিলেন। মহারাজা ছিলেন জাফর খাঁর শিষ্য। জাফরের ভাই প্যার খাঁ রেওয়াতে মাঝে মাঝে থাকিলেও বেশি থাকিতেন বেতিয়ার মহারাজা নন্দকিশোরজীর কাছে। ইনি বহু নূতন ধ্রুপদ রচনা করিয়াছেন। বিখ্যাত কথক গায়ক ভক্তাবরজী, শিবনারায়ণজী, গুরুপ্রসাদজী প্রভৃতি ধ্রুপদগায়কদের অগ্রগণ্য। কলিকাতার বিখ্যাত ধ্রুপদী বিশ্বনাথ রাও এই শিবনারায়ণ মিশ্রেরই শিষ্য। রাধিকা গোঁসাই ছিলেন গুরুপ্রসাদজীর শিষ্য। প্যার খাঁ বেতিয়ায় মহারাজা নন্দকিশোরকে আপন ধ্রুপদবিদ্যার সকল সম্পদ অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন।

গণেশপ্রসাদ দ্বিবেদীজী তাঁহার 'রবাবী খানদান' প্রবন্ধে লেখেন, "আমাদের চৈতী, কজলী, লাৱণী, ঝুমর, ফাগ প্রভৃতি রাগ শুনিলেই হৃদয়মন তৃপ্ত ও মুগ্ধ হয়। এই-সব রাগে আমাদের সমস্ত হৃদয় অপরিসীম আনন্দে ভরিয়া ওঠে ও সমগ্র আত্মা উদাস হইয়া রসবন্যায় বহিয়া যায়। দেশের ভূমি এবং দেশীয় প্রকৃতির উপরই এই-সব রাগ প্রতিষ্ঠিত। গুণীদের মস্তিষ্ক হইতে ইহাদের উদ্ভব নহে। ইহারা দেশের মাটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ শাস্ত্র এই-সব দেশজাত বস্তুদের দেশি বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছে।" [১] তিনি আরো বলেন, ভৈরব, শ্রী, মালকোষ, বসন্ত প্রভৃতি সাত আটটি বুনিয়াদী রাগরাগিণীর যোগবিয়োগেই বাকি সব রাগরাগিণীর উৎপত্তি, বিশেষত মুসলমান যুগের রাগরাগিণীদের। কাফী, পিলু, জিল্‌ফ্, সাজগিরী, তিলককামোদ, জংলা, জয়জয়ন্তী, গারা, ঝিঁঝোঁটী, বিহারী, সিংদুরা প্রভৃতি রাগের এই রূপেই উদ্ভব হইয়াছে। [২]

কাফী রাগের ধুনের সঙ্গে দেশি হোলির ধুন হুবহু মেলে। আমীর খুসরুই ইহাকে রাগের রূপ দিলেন। মহম্মদ শাহ রংগীলীর সময় তাহা বড়ো বড়ো রাগের সমান মান্য হইয়া উঠিল। খুসরুর সৃষ্ট ইমন রাগে আজ বীণকরেরা মুগ্ধ, কত ধ্রুপদ ইমনে রচিত। এমন করিয়াই জয়জয়ন্তী ও জিল্‌ফ্ কত উচ্চেই না উঠিল। এখন জয়জয়ন্তী কানাড়ার পাশে এবং জিল্‌ফ্ তোড়ি বা আশাবরীর পংক্তিতে আসন লইয়াছে। [৩]

---

১ নয়া হিন্দি জানুয়ারি ১৯৪৮, পৃ. ৫২।

২ ঐ

৩ ঐ, পৃ. ৫৩

দেশি ধুনের বুনিয়াদেই আমাদের অধিকাংশ রাগের সৃষ্টি। প্যার খাঁ, উমরাও খাঁ, অমীর খাঁ ও রহীম খাঁর আমলে এই বিদ্যা তানসেনের পরিবারের বাহিরেও ছড়াইতে লাগিল।[৪]

তিলককামোদ তো হিন্দুস্থানী সংগীতের এক বিখ্যাত ও অতিসুন্দর রাগ। ইহা কোনো পুরাতন শাস্ত্রীয় রাগ নহে। রবাবী ওস্তাদ প্যার খাঁ এই রাগের প্রবর্তক। তানসেনের পরিবারের রক্তের মধ্যে সাধনার জন্য একটা ব্যাকুলতা ও তাপসজনোচিত ভাব আছে। প্যার খাঁ শেষরাত্রিতে উঠিয়া নির্জনে আপন ধ্যানের জন্য অরণ্য ও গ্রামের দিকে চলিয়া যাইতেন। একদিন পর্বতের তলদেশে এক আভীর-পল্লীর পাশ দিয়া প্যার খাঁ চলিয়াছেন। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, গ্রামকন্যারা জাঁতা পিশিতে পিশিতে গান করিতেছে।

জাঁতা পেশাকারিণীদের গানের সুর প্যার খাঁকে মুগ্ধ করিল। তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া এই গান শুনিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন ঐ গ্রাম্যগানে বেহাগ, কামোদ এবং সোরট বা দেশের মতো তিনটি পুরাতন শাস্ত্রীয় রাগের অপূর্ব সংমিশ্রণ— "ইস দেহাতী ধুনমেঁ বিহাগ কামোদ ঔর সোরট য়া দেশ ঐসে তীন পুরাণে শাস্ত্রী রাগোঁকা বড়ী সুন্দর মিলাৱট হৈ"।

তিনি সুরটি গুন গুন করিতে করিতে ঘরে ফিরিলেন এবং কয়দিনের সাধনায় সুরটিকে আপন যন্ত্রে তুলিয়া দরবারে শুনাইলেন। সকলেরই যৎপরোনাস্তি ভালো লাগিল। সকলে এই নয়া রাগের নাম জানিতে চাহিলে ইনি সারা কাহিনীটি শুনাইয়া দিলেন। এই সুরের নাম তখন রাখা হইল তিলককামোদ। সংগীতের জগতে ইহা অমর হইয়া রহিল। প্যার খাঁ ইহাতে বিস্তর ধ্রুপদ করিয়াছেন। পরে অবশ্য ইহাতে খেয়াল ঠুমরীও অনেক রচিত হইয়াছে।[৫]

জাফর খাঁ ও প্যার খাঁর ছোটোভাই বাসিত খাঁ আরো নামকরা গুণী। ইঁহার মতো সংগীত-শাস্ত্রজ্ঞ খুব কমই হইয়াছেন। ১৭৮৭ খৃস্টাব্দেরই কাছাকাছি বাসিত খাঁর জন্ম। ইঁহার পিতা ছজ্জু খাঁ, পিতৃব্য জ্ঞান খাঁ; জ্ঞান খাঁ ছিলেন নিঃসন্তান। জ্ঞান খাঁ বাসিতকেই পুত্রবৎ পালন করেন। জ্ঞান খাঁ ছিলেন যোগাচারী ফকির। তিনি তাঁহার সর্বশক্তিতে বাসিতকে ফুটাইয়া তুলিলেন। সংযমী বাসিত খাঁ যোগ ও প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া একশত বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। জ্ঞান খাঁ ইঁহাকে বারো বৎসর পর্যন্ত শুধু সপ্তস্বরসাধনা করান। বাসিত অধীর হইলে জ্ঞান খাঁ কহিলেন, "হায় হায়! দাদা, ধৈর্য হারাইলে! আর কিছু সবুর করিলে বৈজু বাওরা প্রভৃতির মতো নায়ক বনিতে পারিতে। তবু তোমার যাহা ভিত্তি হইয়াছে ইহার উপরে সাধনা করিলে এই যুগেও তোমার স্থান অতুলনীয় হইবে।" বাসিত সংস্কৃত ও পারসী ভাষা শিখিয়া হিন্দু ও মুসলমানী শাস্ত্র ভালো করিয়া পড়িয়াছিলেন। রবাবে ইঁহার সমতুল্য কেহ আর তখন ছিলেন না।

---

৪ নয়া হিন্দ, জানুয়ারি ১৯৪৮, পৃ. ৫৩-৫৪

৫ ঐ, পৃ. ৫০-৫২

একবার লক্ষ্ণৌ নবাবের দরবারে এক পাখোয়াজী সাধু আসিয়া সব গুণীদের সঙ্গে বাদ্যে পাল্লা দিতে বসিলেন। ফলমূলমাত্রাহারী সাধু ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থিরাসনে বসিয়া বাদ্যে একে একে সকলকে হারাইলেন। কিন্তু যোগনিষ্ঠ বাসিত খাঁ তাঁহার রবাবে এমন এক কলাকৌশল করিলেন যে সাধু হারিয়া গেলেন। সাধু কী একটা অভিচার করিয়া কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। বাসিত খাঁর বাজাইবার ডান হাতখানি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া গেল। সাধুকে কোথাও আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহার পরে বাসিত খাঁ আর রবাব বাজাইতে পারিতেন না, শুধু রবাবের শিক্ষা দিতেন।

লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ অলী খাঁ বাসিতের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। একবার বাসিতের 'দেশ' রাগ শুনিয়া তিনি আপন রত্নহার বাসিতকে দান করেন। নবাব ওয়াজেদ অলী কলিকাতায় নির্বাসিত হইলে ইংরাজের অনুমতিক্রমে বাসিতকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

বাসিত খাঁ বছর-দুই কলিকাতায় ছিলেন। তাহার মধ্যেই তিনি স্বরোদীয়া নিয়ামত উল্লা খাঁ ও তাঁহার পুত্র করামত উল্লা খাঁ ও কৌকব খাঁকে অত্যল্প কালের মধ্যে প্রবীণ বানাইয়া তুলিলেন। হরকুমার ঠাকুরকেও বাসিত খাঁ রীতিমতো শিক্ষা দেন। বাসিত খাঁ ছয়মাস হরকুমার ঠাকুরকে স্বরসাধনা করাইলে হরকুমার ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন বাসিত খাঁ বলিলেন, 'বাবা, ছয়মাসেই ধৈর্যচ্যুত হইলে? আমি বারো বছর শুধু স্বরসাধনাই করিয়াছি।' কিন্তু আরো ছয়মাসেই তিনি হরকুমার ঠাকুরকে বাছাবাছা সব রাগে শিক্ষা দিয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, মৈহরের আলাউদ্দীন বারো বৎসর এবং ফৈয়াজ খাঁ চৌদ্দো বৎসর শুধু স্বর-সাধনাই করেন।

দুই বৎসর কলিকাতায় কাটাইয়া বাসিত খাঁ গয়ার নিকটে টিকারীর রাজার আশ্রয়ে চলিয়া গেলেন। রাজাকে তিনি কলাবৎ করিয়া তুলিলেন। গয়ার অনেক পাণ্ডাও বাসিতের সাকরেদ হইলেন। সকলে তাঁহাকে দৈবশক্তিসম্পন্ন পুরুষ মনে করিত। একবার অনাবৃষ্টি হইলে বাসিত খাঁ সাতদিন ধ্যান করিয়া মিঞা-মল্লার গাহিয়া নাকি বৃষ্টি করান। বাসিত খাঁ বড়ো একটা দরবারের ধার ধারিতেন না। ভক্তিতে ও ভাবাবেশে তিনি নানা মন্দিরে বসিয়া ভজন গাহিতেন। গয়ার বিখ্যাত এসরাজী হনুমানদাস, ঢেঁড়ীজী, সোমীজী প্রভৃতি বাসিতেরই চেলা। পিণ্ডদান কালে পাণ্ডারা যাত্রীদের দানের একটা অংশ তখন হইতে কলাবিদ্যার জন্য রাখিতেন। তাহার নাম 'তানসেনী ভাগ'। বাসিত খাঁকে এই দানের অংশ লইতে হইত। দশ-বারো বছর আগেও এই নিয়ম চলিত ছিল, এখনকার কথা বলিতে পারি না। ১৮৮৭ সালে শত বৎসর বয়সে তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া বাসিত খাঁ যোগমুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। ইঁহার অন্তিম সৎকারের কাজে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু ও ব্রাহ্মণই বেশি ছিলেন।

জাফর খাঁ ও বাসিত খাঁর ভাই জ্ঞান খাঁ আজন্ম ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি আপন ভাগিনেয় বাহাদুর সেনকে আপন সকল বিদ্যা দিয়া যান।

জাফর খাঁর চারি পুত্র। কাজম অলী খাঁ, সাদিক অলী খাঁ, অহমেদ অলী খাঁ এবং নিসার অলী খাঁ। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র পূর্বপুরুষদের নাম রীতিমতো রক্ষা করেন। সাদিক অলী সংস্কৃতে এমন কৃতী ছিলেন যে লোকে তাঁহাকে পণ্ডিত বলিত। তাঁহার সংস্কৃত উচ্চারণ ও গীতগোবিন্দের গান শুনিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও বিস্মিত হইতেন।

বাহাদুর সেনের হাতে অদ্ভুত মিষ্টতা ছিল। তিনি যেভাবে যে রাগ বাজাইতেন, তাহাই মধুর হইত। সাদিক ছিলেন সংগীতশাস্ত্রের সর্বকলার ধ্যানী গুরু। কাজম অলী শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে চলিতেন। বাহাদুর সেন নব নব পথে আপন মনীষার দ্বারা চালিত হইতেন ও সকলকে মুগ্ধ করিতেন।

একবার এক সভায় কাজম অলী রবাব বাজাইতেছেন, বাহাদুর সুরশৃঙ্গার বাজাইতেছেন। তখন কাজম বেহাগের স্থায়ী ও অন্তরা পূর্ণ করিয়া সঞ্চারীতে প্রবেশ করিবার সময় এক অপরূপ নূতন পথে চলিলেন। মনে হইল সারা সভায় একটা নূতন আলোকের অমৃত বর্ষণ হইল। সকলে ধন্য ধন্য করিল।

সাদিক অলী খাঁ কোথাও চাকুরী করিতে পারিতেন না। যথার্থ কলাবিতের মতো তিনি আপনভাবে চলিতেন। তাই তিনি দীর্ঘকাল কোথাও টিকিতে পারেন নাই। তিনি যে-কোনো রাগ বাজাইতে বাজাইতে ভাঙিয়া-চুরিয়া নানা রাগের অংশ যুক্ত করিয়া আবার আপন আদিরাগে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন। একবার তিনি জয়পুর দরবারে বহু গুণীর মধ্যে দরবারী কানাড়ায় কোমল রেখাব লাগাইয়া বাজাইলেন। সকল গুণী বিস্মিত হইলেন। এমন অপূর্ব এই বাজনা শুনা গেল যে সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাগরাগিণীর উপর এমন দখল ক্বচিৎই দেখা যায়।

বাহাদুর সেন যে-সব গৎ ও তেলানা (তরানা) বাজাইয়া গিয়াছেন, এখন সারা ভারতে কলারসিকেরা তাহা সেতারে ও স্বরোদে বাজান। ঘরানা-গত ও সুকৌশল সব খানদানী তেলেনার অধিকাংশই বাহাদুর সেনের রচিত। তোড়ী রাগে ইনি এক নূতন পথ প্রবর্তন করেন। তাহা বাহাদুরী তোড়ী নামে কলাবৎদের কাছে খ্যাত।

তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁও তোড়ির এক অভিনব পন্থা প্রবর্তন করেন। তাহারই নাম পরে হইল বিলাসখানী তোড়ী। ইহাতে ভৈরবীরই সব স্বর লাগে, কিন্তু গান্ধার ও ধৈবতের এমন একটু লীলা আছে যাহাতে ঠিক তোড়ীর রূপটি প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে। ভৈরবীর সকল স্বর সত্ত্বেও ইহাতেও মূলগত বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। বিলাস খাঁ সাধনাতেও সাধু ছিলেন। তাঁর রাগিণীতে শান্তি ও করুণার রস ভরিয়া ওঠে। তানসেনের ঘরানাতে বিলাস খানের এই প্রভাব চিরদিন সকলের মধ্যেই দেখা যায়।

তানসেনের ঘরানাতে প্যার খাঁর তিলককামোদের কথা আগেই বলা হইয়াছে। এই-সব শুনিয়া কি এই কথা বলা চলে যে কলাবতেরা শাস্ত্রের অচলায়তনেরই উপাসক? তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যথার্থ প্রতিভাশালী তাঁহারা যুগে যুগে আপন আপন প্রতিভানুযায়ী নূতন নূতন অপূর্ব পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় সংগীত কলায় মুসলমান সাধকদের দানের তুলনা হয় না। তাঁহারা দারুণ দুর্দিনে শতাব্দীর পর শতাব্দী এই সংগীতবিদ্যাকে শুধু বাঁচাইয়া রাখেন নাই, ইহাকে দিন-দিন নব-নব ঐশ্বর্যে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। আলাউদ্দীন খিলজী, আকবর, জৌনপুরের সুলতান তুর্কী, মুহম্মদ শাহ রংগীলী, নবাব কলবে অলী, নবাব রজিদ অলী প্রভৃতি বাদশা নবাবদের উৎসাহের তুলনা হয় না। গোয়ালিয়রের হিন্দু রাজা মানতোমর ও রেওয়ার রাজা রাজারামের কথাও এই সঙ্গে স্মরণীয়।

মানতোমর ও আকবরের উৎসাহে যেমন লোকগীত হইতে ধ্রুপদ মার্গ সংগীতের পদ লাভ করিল, তেমনি সুলতান শর্কী ও মহম্মদ শাহের উৎসাহে লোকগীত হইতে খেয়ালের স্থানও মার্গসংগীতের মধ্যে উন্নীত হইল। সুলতান শর্কী নূতন নূতন রাগও সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার নূতন সৃষ্ট 'জৌনপুরী' এখন সকল গায়কদেরই বন্দনীয়। যদিও আশাবরী হইতেই ইহার সৃষ্টি তবু আশাবরী আজ ইহার কাছে এমন নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে যে, এখন অনেকে পুরানো-আশাবরীকে ভুলিয়া গিয়া জৌনপুরীকেই আশাবরী মনে করেন। পণ্ডিত গণেশপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেন যে, পণ্ডিত ভাতখণ্ডেও জৌনপুরীকেই আশাবরী বলিয়া মানিয়াছেন। সুলতান শর্কীর নূতন সৃষ্ট জৌনপুরীর প্রভাবে আসল আশাবরীর কথা এখন সকলেই বিস্মৃত হইতে বসিয়াছেন।

একাধিক রাগ মিলাইয়া নবরাগ সৃষ্টির কাজে যে শুধু মুসলমান ওস্তাদেরাই হাত দিয়াছেন তাহা নহে, হিন্দু ঘরানাতেও এই কৃতিত্ব দেখা যায়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কাশীতে একবার মহারাষ্ট্রীয় কথক রামচন্দ্র বুবার গান শুনি। তাহাতে মালগুঞ্জি নামে একটি অপূর্ব রাগ শোনা গেল। কাশীর সেনিয়া ঘরানার ওস্তাদেরা সেই রাগটির ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিলে জানা গেল যে, বুবা পরিবারে এই রাগটি প্রায় একশো বৎসর পূর্বে রচিত হয়। বাগেশ্রী ও জয়জয়ন্তীর যোগে ইহার সৃষ্টি। বালকৃষ্ণ বুবার অপূর্ব কণ্ঠে এই রাগটি প্রচারিত হয়। পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ছিলেন বিখ্যাত ওস্তাদ বিষ্ণু দিগম্বরের গুরু।

উত্তর ভারতের ও দক্ষিণ ভারতের গায়কের মধ্যে একটি মহা ব্যবধান পড়িয়া আছে। এই ব্যবধানটি সরাইয়া নূতন পথ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ওস্তাদ আবদুল করীম খাঁ। এখনো তাঁহার শিষ্যা হীরাবাঈ ও রোশনারা বেগমের গানে তার কিছু পরিচয় মিলে। কোল্হাপুরের আলাদিয়া খাঁ প্রথমে ছিলেন ধ্রুপদী, পরে হন খেয়ালী। তাই তিনি খেয়ালের মধ্যেও ধ্রুপদের গাম্ভীর্য অনেকটা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আলাদিয়া খাঁর সঙ্গে সঙ্গে নাথন খাঁ ও ফৈজ মহম্মদ খাঁর কথা মনে আসে। এই তিনের উপরে কিছুদিন পূর্বে মহাগুরু ছিলেন আগরা দরবারে— গোলাম আব্বাস খাঁ। আলাদিয়ার নাম ও প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছেন তাঁহার শিষ্যা কেশর বাঈ।

য়ুরোপীয় মধ্যযুগের শেষভাগে যেমন গ্রীক পণ্ডিতেরা ঘর ছাড়া হইয়া সারা য়ুরোপে নবযুগের উদয় করান তেমনি দিল্লীর বাদশাহী ভাঙিয়া গেলে তানসেনী-ঘরানার

ওস্তাদেরা যে সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িলেন, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরে তাঁহারা যে-সব রাজ-রাজড়ার আশ্রয় পাইলেন তাঁহারা বিলাতী শিক্ষার মোহে এমন অভিভূত হইলেন যে, রাজাদের আশ্রয়েও এই-সব গুণী আর কিছুই করিতে পারিতেছেন না। এখন নাকি রাজ-রাজড়ার যুগের অবসান হইয়া গণযুগ বা ডেমোক্রেসির যুগের আরম্ভ হইয়াছে। তাহা হইয়া থাকিলে গণমণ্ডলীরই উপর এই-সব পুরাতন মহনীয় কলা-সংরক্ষকের দায়িত্ব আসিয়া বর্তিয়াছে। বীণাগুণী সাদিক অলী বর্তমানকালে রামপুরের দরবারে বীণকার। কিন্তু তিনি কি সেখানে সুখে আছেন? মনে হয় যে-কোনো গুণগ্রাহী মণ্ডলী ডাক দিলে তিনি আনন্দে সেখানে যান।

এই-সব ওস্তাদ ভারতের কোথায় না সংগীতবিদ্যাকে ছড়াইয়াছেন? তানসেনী পুত্রধারায় বাসিত খাঁর পুত্র অলী মুহম্মদ খাঁ বা বড়ো মিঞা নেপালে গিয়া সেখানে সকল গুণীর গুরু হইয়া বসিলেন। সেখানে তাঁহার পূর্বেও নেপাল দরবারে অনেক গুণী ছিলেন। সেতারে এবং খেয়াল গানে ছিলেন রামসেবক মিশ্র, ধ্রুপদ গানে ছিলেন তাজ খাঁ, স্বরোদ বাদ্যে ছিলেন ন্যামত উল্লা খাঁ ও মুরাদ অলী খাঁ। রামসেবক মিশ্রেরই পুত্র পশুপতি ছিলেন বীণকার, শিব ছিলেন ধ্রুপদী ও খেয়ালী। তালে ও লয়ে শিব-পশুপতির দোসর সারা দেশে ছিল না। ন্যামত উল্লা বড়কু মিঞার চেলা বনিলেন। তাঁহার পুত্র কয়ামতউল্লা খাঁ ও কৌকব খাঁ স্বরোদ যন্ত্রে অতুলনীয় গুণী হইয়া উঠিলেন। নেপালের গুণী মুরাদ অলী খাঁর স্বরোদ যন্ত্রে বীণারও কিছু অঙ্গ ছিল। তাহার হেতু ছিল এই যে, তিনি সুরবাহারে গুলাব মহম্মদের কাছে, বীণায় ওয়াজীর খাঁর কাছে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। এখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় যন্ত্রবাদক হফীজ অলী খাঁ এই মুরাদ অলী খাঁর শিষ্য। শিব-পশুপতির শিক্ষা প্রথমে তাঁহার পিতারই কাছে, সেই পিতাও সেতার বাদ্যে বড়কু মিঞারই চেলা। মুরাদ অলীর চেলা আবদুল্লা খাঁ ও তাঁহার পুত্র অমীর খাঁ স্বরোদীয়া কলিকাতার বহু গুণীকে শিক্ষা দিয়াছেন।

বৃদ্ধকালে শরীর অশক্ত হইয়া পড়িলে বড়কু মিঞা নেপাল ছাড়িয়া কাশীতে আসিলেন। সেখানে তাঁহার ছোটো ভাই (জ্যাঠতুত) নিস্‌সার অলী খাঁ কাশীর দরবারে গুণী ছিলেন। তখন কাশীতে বহু গুণীর সমাবেশ। সেখানে ধ্রুপদী ছিলেন অল্লাবখ্‌শ্‌। অল্লাবখ্‌শেরই শিষ্য অঘোরচন্দ্র চক্রবর্তী। কাশীতে তখন ধ্রুপদী রসূল বখ্‌শ ও দৌলত খাঁ বিদ্যমান, মহেশবাবু বীণকার, চিন্তামণি বাপুলী ভৈরব বাজপেয়ী প্রভৃতি সব গুণী ছিলেন। মিঠাইলালের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

জলন্ধরের সৈয়দ মীর সাহেবও বড়কু মিঞার কাছে সুরশৃঙ্গার শিক্ষা করেন। বাংলাদেশের শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তারাপ্রসাদ ঘোষও বড়কু মিঞার শিষ্য। তারাপ্রসাদ ব্জীর খাঁর কাছে যে শিক্ষা পাইয়াছেন সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তারাপ্রসাদের পিতামহ বিখ্যাত কাশীপ্রসাদ ঘোষ। ইহাদের এখানেই সেতারী ইমদাদ

খাঁ ও খেয়ালী কালে খাঁ ও ধ্রুপদী দৌলত খাঁ ছিলেন। কালে খাঁর পুত্রই গুণী গুলাব অলী। বড়কু মিঞা বড়োই উদার মানুষ ছিলেন। সেজন্য বহু দুঃখ পাইয়াছেন। অর্থ ও বিদ্যা দুইই তিনি সমানভাবে সকলকে অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার হিন্দু-মুসলমান বলিয়া কোনো ভেদবুদ্ধি ছিল না। বড়কু মিঞা বা অলী মুহম্মদ খাঁর পরে তাঁহার ছোটো ভাই মুহম্মদ অলী খাঁই প্রধান হইলেন। ইঁহার জেঠা জাফর খাঁর পুত্র কাজিম অলী রবাবী-বংশে জন্মিলেও বীণেরও বড়ো গুণী ছিলেন। তাই তাঁহার পুত্র কাসিম অলী বীণ-রবাব দুই যন্ত্রেই সমান গুণী ছিলেন। অদ্বিতীয় বীণকার ৱজীর অলী ইহারই ভাগিনেয়। কাসিম অলী পাখোয়াজেও প্রবীণ ছিলেন।

গত শতাব্দীর বিখ্যাত বীণকার বন্দে আলী খাঁ ও মুশর্রফ খাঁ তানসেন পরিবারে না হইলেও তাঁহাদের নাম একটুও কম নহে। তাঁহারা তানসেনের দৌহিত্রবংশীয় উমরাও খাঁর শিষ্য। রামপুরের বর্তমান ওস্তাদ শাদক অলী মুশর্রফেরই পুত্র। ইঁহাদের আদিপুরুষ নাকি হরিদাস স্বামী।

লক্ষ্ণৌর নবাব ৱাজেদ অলী খাঁর দরবার নষ্ট হইলে বাসিত খাঁ গেলেন গয়ায়, কাসিম অলী খাঁ গেলেন ত্রিপুরায় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের দরবারে। তাঁহার দরবারে পূর্বেও অপূর্ব কলাবিৎ যদুভট্ট ছিলেন। যদুভট্ট বৃদ্ধ বলিয়া কাসিম তাঁহাকে রবাব শেখান নাই। কিন্তু যদুভট্ট তাহা শুনিয়াই শিখিয়া ফেলেন। ত্রিপুরা ছাড়িয়া কাসিম অলী খাঁ ভাওয়ালের রাজেন্দ্রনারায়ণের কাছে যান। ঢাকাতেও কাসিম অলী কিছুকাল ছিলেন। ঢাকায় তবলাবাদক প্রসন্নবাবুর বাজনা শুনিয়া কাসিম অলী খাঁ বিশেষ প্রশংসা করেন।

তানসেনী ধারার সঙ্গে পরে বহু গায়কীয় ধারার মিলন ঘটিয়াছে। বিখ্যাত ফৈয়াজ খাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন হিন্দু। অলখদাস ও মলখদাস এই ধারার হিন্দু গায়ক। পরে এই ধারায় এক গুরু তানসেনী ধারা শিক্ষা করেন ও তানসেনী বংশের কন্যা বিবাহ করেন। মহম্মদ শাহ রংগীলীর দরবারে এই বংশীয়দেরও প্রতিষ্ঠা ছিল।

পাতিয়ালার ফতে অলী খাঁই একটি গায়কধারার প্রবর্তন করেন। সেই ধারাতে দেখা যায় ওস্তাদ গোলাম অলী খাঁকে। গোলাম অলীর গুরু ছিলেন তাহার পিতৃব্য কালে খাঁ। এই সঙ্গে মনে আসে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের নাম। তাঁহার গানে ভারতীয় ধর্ম ও তপস্যা যেন মূর্তিমন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তানসেনী ঘরানার বিষয়ে আরো অনেক কথা বলিবার আছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যায় বলিয়া এইখানেই ইহা সমাপ্ত করি। পরে সুযোগ হইলে আরো ভালো করিয়া বলিবার চেষ্টা করা যাইবে। এই সঙ্গে তানসেনীর একটি কুর্শীনামা বা বংশাবলী দেওয়া যাউক।

তানসেন-পুত্রধারা

(তুলনীয় 'নয়া হিন্দ' II, 1947 পৃ. ৫৫০-৫৫১)
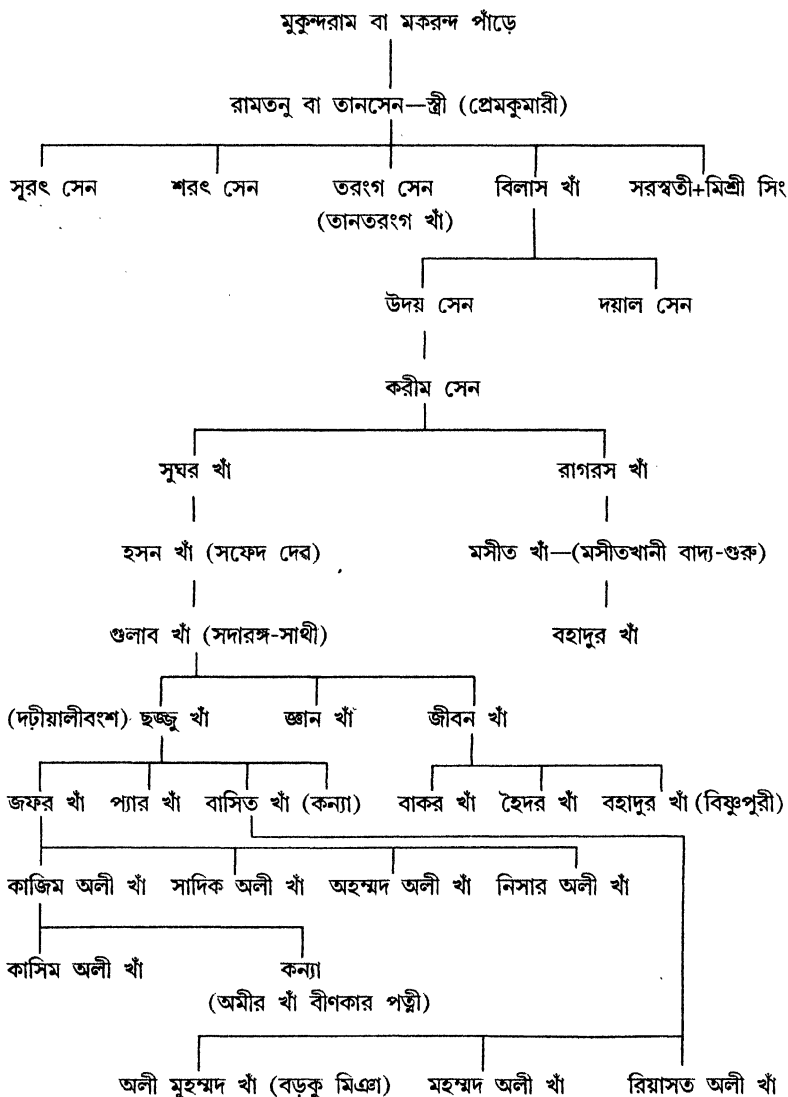
কন্যাধারা

(তুলনীয় 'নয়া হিন্দ'— I, 1949, পৃ. ৫৫৭-৫৫৯)

তানসেন
- সূরৎ সেন
- শরৎ সেন
- (তরজ সেন?) তরংগ সেন
- বিলাস খাঁ
- সরস্বতী+মিশ্রী সিং (সমূখন সিং মহারাজার পুত্র)
  - শের খাঁ
    - হসন খাঁ
      - হুসেন খাঁ
        - বাজিদ খাঁ
          - নজীর খুশহাল খাঁ
            - লাল খাঁ
              - ন্যামত খাঁ (সদারং)
                - ফিরোজ খাঁ (অদারং)
                - ভূপত খাঁ (মনরং)
                  - জীবন শাহ
                    - ছোটে নবাত খাঁ (রসবীন খাঁ)
                      - উমরাও খাঁ
                        - অমীর খাঁ
                          - ৰজীর খাঁ
                            - নজীর খাঁ
                              - ঝম্মন খাঁ
                              - দবীর খাঁ (জীবিত)
                              - দিলদার
                            - বসীর খাঁ
                            - সগীর খাঁ
                          - ফৈজ অলী খাঁ
                        - রহীম খাঁ
                    - নির্মল শাহ
                  - প্যার খাঁ (অংগুল কাট)

১৩৫৫ কার্তিক
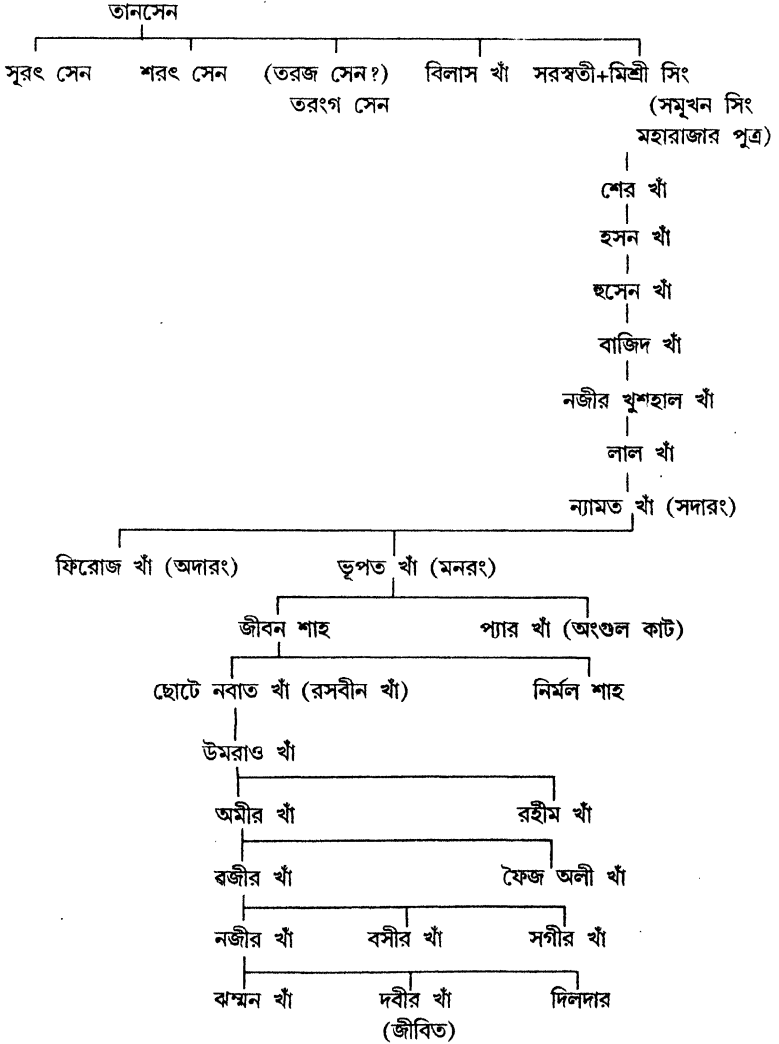
শিল্প ও শিক্ষাব্যবস্থা

স্টেলা ক্রাম্‌রিশ

শিল্পকে বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় অন্যতম বিষয় বলে শুধু গণ্য করলে চলবে না— বিদ্যামন্দিরের ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকে গেঁথে তুলতে হবে, বিদ্যামন্দিরের চতুঃসীমা থেকে শিল্পের প্রভাব শিক্ষার্থীদের উপরে পড়া চাই, তাদের বেষ্টন করে রাখা চাই। শিক্ষার বিষয়টি যাই হোক, শিক্ষার্থীদের সকল আচারে ও আচরণে শিল্পরুচির ব্যঞ্জনা থাকা প্রয়োজন। তারই ফলে যেমন শিক্ষাকালে, তেমনি অবসর সময়ে, একটা চমৎকারের অনুভূতিতে, আত্মিক স্বাস্থ্যও শৃঙ্খলার জ্ঞানে এবং আহ্লাদে তাদের অন্তঃকরণ পূর্ণ থাকবে। এইটেই আমাদের লক্ষ্য। কারণ, সম্ভ্রান্ত সজ্জনের আবাসে শিল্পের স্থান নেই আজ। বিদেশের আমদানি আসবাবপত্রের বাহুল্যে শিল্পের কবর রচিত হয়েছে। পাশ্চাত্য যান্ত্রিক বিপ্লবের ফলস্বরূপ এই যে সামগ্রীসম্ভার এগুলি আমাদের পক্ষে অকল্যাণেরই হেতু; তারই অবিন্যস্ত স্তূপে আজ প্রায় সত্তর বৎসর ধরে ভারতের যাঁরা সম্পন্ন ব্যক্তি, যাঁরা 'ধীমান', তাঁদের গৃহের আর মনের এমন অদ্ভুত সজ্জা যে এদেশে তাঁরা বিদেশীরূপেই বসবাস করেন। অসংগত পরিবেশ এবং বিসদৃশ আচার সহজে দূর হবার নয়; নতুন আগন্তুক শিশুসমাজ তারই মধ্যে বেড়ে ওঠে— কোনো বস্তুর যথার্থ প্রকৃতি বা সার্থক ব্যবহার তাদের জ্ঞানগোচর হয় না। অন্তরে বাহিরে শৃঙ্খলা নেই, ছন্দ নেই।

শিক্ষালয় আর শিক্ষক উভয়ে মিলে পরিবেশকে আবার সংগত আকারে রচনা করা প্রয়োজন— জীবনযাত্রাকে সুষমায় স্বাভাবিকতায় ও সুষ্ঠু অলংকারে পুনরায় সার্থক করে তোলা প্রয়োজন।

ধনীগৃহের দ্রব্যস্তূপে কেউ হাতও দেয় না, কেউ দৃষ্টিও দেয় না; ধূলি-আস্তরণে তা আবৃত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অবলুপ্ত হয় না। চেয়ারে টেবিলে ঘরে স্থান থাকে না, কিন্তু সেগুলি ব্যবহারের নয়, প্রদর্শনের বস্তু। তারই সঙ্গে দেখা যায় প্রাচীরলগ্ন চিত্রাবলী— সেও সমান নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন, কেউ চোখে না দেখলেও কিছু যায় আসে না। তা হলেও, এই অনাবশ্যক ছবিতে ঘরের দেয়ালে আর অনাবশ্যক আসবাবে ঘরের মেজেয় ভিড় করে ঘরের ভিতরের সমস্ত অবকাশ ও আরাম, পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা হরণ করে। প্রাচীন সংস্কৃতির শিকড় ছিন্ন, তাই ব্যর্থ স্বামিত্বের আরোপিত অভিমানমাত্র সম্বল করে এরূপ সামগ্রীস্তূপের মধ্যে অন্ধ ও উদাসীনের মতো লোক জীবনযাত্রা নির্বাহ করে— আপন গৃহে থাকে পর হয়ে। প্রাচীন পরিবারগুলির এই

তো ব্যাধি; নূতন যারা নিজেদের বাসা নিজে বাঁধছে, তারা সেরূপ ভারগ্রস্ত নয়। তাদের গৃহের দেয়াল বা মেজে পরিচ্ছন্ন ও মসৃণ, আধুনিক কালোচিত আরামের ব্যবস্থা তথাকথিত 'নূতন' রকমের আসবাবপত্রে। বদ্ধ ঘরের অবকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে মুক্ত বাতায়নে, 'নূতন' ফ্যাশানের আয়স জালায়নে তার শোভাবৃদ্ধি। শোভাবৃদ্ধি ছাড়া নিরাপত্তাও আছে, ফলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষেও গুপ্ত আমলের বুদ্ধমূর্তির ব্রোন্‌জ্‌ নকলের ধ্যানমগ্ন সৌন্দর্যের তারিফ করা সম্ভবপর।

এদিকে পথপার্শ্বে দরিদ্র পল্লীতে রজকের কুটীর বাঁশ বাখারি ও মৃত্তিকার তৈরি, পিতল-কাঁসার পাত্রগুলি চ্যাটাইয়ের পটভূমিতে সোনার মতো ঝক্‌ঝক্‌ করছে। ঘরে অনাবশ্যক আসবাবপত্র নেই বলা চলে, বাইরে বিশেষ তিথিতে বিশেষ বারব্রত উপলক্ষে দাওয়ার দেয়ালে আল্পনার আকারে বিশেষ চিত্র ও প্রতীক অঙ্কিত করা হয়— সেগুলি বারে বারেই নূতন অথচ চিরপুরাতন। দেশের আবহাওয়া (পল্লীতে ও শহরে সে বিষয়ে কোনো ভেদ নেই) এবং নিজেদের বৃত্তি ও উপার্জন, এগুলির সঙ্গে সংগতি রেখে এই কুটীরবাসীদের জীবনযাত্রায় একটি যথাযোগ্য সম্ভ্রম দেখা যায়— তারা বস্তির বাসিন্দা নয়।

মফস্বল শহরে, আর পল্লীতেও, শিক্ষিত সমাজের চালচলন সাধ্যপক্ষে অন্যের দ্বারাও অনুকৃত হচ্ছে। একমাত্র ক্ষুৎপীড়িত দরিদ্রের পক্ষেই জীবনযাত্রার সুষমারক্ষা আজও সম্ভব রয়েছে। দেশের এই বিশাল জনসমাজের সমরুচি মুষ্টিমেয় লোকের সাক্ষাৎ মেলে শহরের বিদ্বৎসমাজেও, কোথাও বেশি কোথাও কম— এঁরা বৃত্তির দিক দিয়ে শিল্পী; শিল্পী বলে কেউ কেউ প্রতিষ্ঠাও লাভ করেছেন। এই শিল্পীদের চিত্রে সে ছন্দসংগতি দেখা যায় বাসগৃহেও তাই— কিন্তু, যদি বা কোনো উৎসাহদাতা সেই গৃহে পদার্পণ করেন, শিল্পীর ছবি চোখে পড়লেও গৃহ চোখে পড়ে না।

চোখ থাকতেও যারা দেখে না এমন এক উদাসীন অনাসক্তভাবে তারা সংসারে বিচরণ করে যা কেবল বিষয়বিমুখ, তুরীয়ের ধ্যানে মগ্ন সাধু সন্ন্যাসীরই যোগ্য। তবে সাধুদের নিকটে লোক জীবনের উন্নত আদর্শের সন্ধান পেয়ে থাকে, এদের কাছে পাবে কোথা থেকে?— জগতের অতীতে তো এদের দৃষ্টি যায় না, জগতের অভ্যন্তরেও এরা চোখ বুজে থাকে। এদের তো অনাসক্তি নয়, অভাব— ইন্দ্রিয়মনের একপ্রকার পঙ্গুতার ফলে সংসারকে এরা ফিরে দিল ন্যূনতম দেয়। চক্ষুষ্মান মানবের পক্ষে এ জগৎ জ্ঞানের নিদান, আনন্দ-অমৃতরূপ— এরা সে দিক থেকে বঞ্চিত।

এই প্রকার অসাড়তা ও পঙ্গুতা 'শিক্ষিত সমাজে'ই দেখা যায়; সেই সমাজের সংস্কৃতিমান ব্যক্তিরাও ঐ দলভুক্ত, তথাকথিত 'শিল্পী'রাও প্রায় বাদ যান না। শিক্ষা বলতে ইংরেজি শিক্ষাই বোঝায়— রুচির বিষয়ে, চালচলনের বিষয়ে। পাশ্চাত্যের যে আসবাবপত্রের আমদানি এদেশে, তা হল সেখানকার নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর রুচিসম্মত। সেকেলে, সে হল পুরাতনের পুনরাবৃত্তি— স্বদেশে তার আয়ু কয়েক যুগ আগে নিঃশেষ হলেও এদেশে আজও সমাদৃত। না স্থানের সঙ্গে না কালের সঙ্গে

আছে তার মিল, অসন্দিগ্ধ চিত্তের কাছে আজব জিনিস বা 'কিউরিও' হিসাবেই তার সমাদর— প্রায়-মূল্যহীন দ্রব্যের নকলের তা নকল।

তা বলে এই রুচিবিগর্হিত অনুকরণসার নিষ্ক্রিয়তা এদেশের লোকের সহজ প্রকৃতি নয়— পরবশতারই অন্যতম পরিণাম মাত্র।

অভিনব শিক্ষাব্যবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শিক্ষাবিষয়ে সর্বাগ্রে মনোযোগ দিতে হবে। সেরূপ শিক্ষার লক্ষ্য সমগ্র জাগ্রত জীবন্ত সত্তা; উপায় পুঁথি মুখস্থ করা নয়, ক্রিয়া, জীবনচেষ্টা— সেরূপ পদ্ধতিতে দেখার ক্ষমতা, ওজনের বোধ, স্পর্শের বোধ, মনন, এগুলির কোনোটিই অবহেলার নয়। একমাত্র অন্ধ ব্যক্তিই চোখে দেখে শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত; শ্রুতি, স্পর্শজ্ঞান, ভারবোধ, এগুলিতেই তার বিষয়কে অন্তরঙ্গভাবে জানা এবং অন্ধত্বের ক্ষতিপূরণ হয়। অন্ধ নয় বা দৃষ্টি ব্যাধিগ্রস্ত নয় এরূপ যে কোনো মানুষকেই শিক্ষিত করা চলে দেখার মতো করে দেখতে শিখিয়ে।

এ কথার অর্থ নয় যে শিশুমাত্রেই শিল্পী হবে বা শিশুর আঁকা ছবি অসাধারণ একটা কিছু। শিশু ছবি আঁকে আপন চোখের দেখা ও চিত্তপটের ছাপ আপনার কাছে, অন্যের কাছে, গোচর করবার স্পৃহায়। শিশুর পক্ষে বিশ্ববাসভূমিকে পরিচ্ছন্নভাবে ও পরিস্ফুট প্রতীকে জানবার এ একটা প্রক্রিয়া। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আঁকবার উপায় উপকরণ ও বিষয় বদলাতে থাকে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যোড়শ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর স্বভাবশিল্পীর ভাব সে হারিয়ে ফেলে। বাল্যে, অর্থাৎ তিন থেকে ষোলো বৎসর বয়স পর্যন্ত, শিশু বা কিশোর মানবজন্মের অর্থ ও সুষমা এক দিকে যেমন গ্রহণ করে অন্য দিকে তেমনি নির্মাণও করে। ঐ বয়স পার হয়ে বেশির ভাগই তারা নির্মাতার পদবী থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নিছক গ্রহণ করার দৈন্য স্বীকার করে, আর স্ব স্ব পরিবেশের বিরুদ্ধতায় ক্লিষ্ট হয়।

শিশুর নির্মাণপ্রবণতার পুষ্টি ও সংস্কৃতি শিল্পশিক্ষকেরই হাতে। কিন্তু, শিল্পবস্তুর যোগ্য গ্রহীতারূপে শিশুর অর্থাৎ ভাবী সামাজিকের যে শিক্ষা তা বিশেষ বিষয়গত নয়। সে শুধু সম্ভব বিদ্যালয়ের আদ্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা আর অখণ্ড পরিবেশকে বিশেষ একটি উৎকর্ষ দান করে, বিশেষ একটি সুরে বেঁধে তুলে।

শিল্পের গুণগ্রহণ করে এমন সমাজ আজ এদেশে নেই। শিল্পীদের উৎসাহদান ও প্রতিষ্ঠানদানের উদ্দেশ্যে বড়ো বড়ো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়— সেখানে ভিড়ের মধ্যে গোপনচারী দু-চারজন সমঝদার মৌনকেই বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ বলে জানেন। বিচিত্র রীতিতে আঁকা বাঁধা বিষয়েরই ছবি— সেই স্থলে আমন্ত্রিত হয়ে বিপুল জনতা তিলধারণ-স্থান-শূন্য দেয়ালে দেয়ালে দৃষ্টিহীন চোখ বুলিয়ে যায়। প্রদর্শিত সামগ্রীর মধ্যে অল্প কিছু সুরচিত। কিন্তু চিনে নেবার লোক কোথা?

প্রদর্শনীর দর্শকদের ভিড়ে তেমন লোক বিরল যে কোনো একটা বস্তু ঠিকমতো বানাতে জানে। ব্যবসায়ে বা চাকুরিতে অর্থসঞ্চয় করাটা জানে বটে। এদের বিচারে শিল্পের দরকারটা কী! এদের বাসগৃহে এই মনোভাবের জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য। পাশ্চাত্য

আসবাবপত্র— নির্মাতা আর ক্রেতা কম-বেশি উভয়ের কাছেই তা বৈদেশিক রয়ে গেছে চোখে পড়ে। তেমনি তো প্রদর্শনীর দেয়ালগুলিও পাঁচরঙা সামগ্রী দিয়ে আবৃত— তারই মধ্যে দু-দশটা, প্রদর্শনীর দেয়াল ত্যাগ করে ঘরের দেয়ালে গিয়ে গলরজ্জু অবস্থায় লম্বিত হয়, যে কারণেই হোক— বড়ো কারণটা অবশ্য ঘরের মালিকের পছন্দই।

দর্শকসমাজে এমন লোক কমই পাওয়া যাবে যে কিছু একটা গড়তে পারে, হোক তা ছাতা জুতা, হোক তা মাটির বাসন। কারখানার তৈরি জিনিস নিয়েই যা কিছু ব্যবহার। বিধিদত্ত হাতখানা নিষ্ক্রিয়। আর, যে যন্ত্রে ব্যবহার্য বস্তুর উৎপাদন তা ভারতে উৎপন্ন নয়, বিদেশীরই আবিষ্কার। ভারতের ক্রেতা যান্ত্রিক যুগে আজ যন্ত্রের দাসের দাস মাত্র। কারিগরি ও শিল্পসৃষ্টির জন্মভূমি বা যজ্ঞশালা থেকে বহুদূরে। ভাববারই সাহস নেই যে কোনো বস্তু আপন হাতে গড়ে তুলতে সে সক্ষম— সেই হাতের কাজের ছলে জড় বস্তুতেও আপন জীবনী সঞ্চার করে আপন জীবনকে অমিতায়ু করতে সমর্থ। জীবনের এই পরিবৃদ্ধি, এই অমৃতত্বলাভ, শিল্পীও তো আপনসৃষ্ট আলেখ্যে মূর্তিতে তাকে দান করতে উৎসুক— সে গ্রহণ করতে পারবে কি?

চৈতন্যশীল জীবরূপে বেঁচে থাকার শিল্প হল লক্ষণবিশেষ, ক্রিয়াবিশেষ। বর্বর আদিবাসীর জীবনেও এর দর্শন মেলে। বস্তিবাসীর জীবন এর প্রসাদবঞ্চিত। তেমনি বঞ্চিত ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষিত সমাজ; কারণ, জীবনযাত্রার বিচিত্র উপকরণ আপন হাতে নির্মাণ করার ও আপন চোখে নির্বাচন করার শক্তির অব্যবহারে চোখ থাকতেও তারা অন্ধ, হাত থাকতেও তারা ঠুঁটো।

মানুষের অন্তঃকরণে নির্মাতার পদবী গ্রহণের যে সহজ প্রবৃত্তি, সুনির্মিত দ্রব্যরাজির পরিবেশেই তার সম্যক্ উদ্দীপন ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর। শহরের সাধারণ গৃহস্থঘরে তার অভাব।

ছাত্রদের মানসিক সুখ ও স্বাস্থ্যবিধানের উদ্দেশে অন্তত বিদ্যালয়গুলির সুনির্মিত স্থাপত্যনিদর্শন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট শিল্পকে নীতিশতক আওড়াতে হয় না; তার সঙ্গমাত্রই স্বাস্থ্যবিধায়ক, শিক্ষাবিধায়ক, নিঃশব্দে অথচ অনিবার্য বেগেই তা মনোযোগ আকর্ষণ করে।

যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট, যথাবিধ আয়তনের ও যথোচিত গঠনের দ্রব্যটি, তরুণ মনে কীভাবে যে কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করে ব্যাখ্যা করা কঠিন। মন্ত্রবৎ তার কার্য; নিঃশব্দ সেই মন্ত্রণায় আকাশ আলো ও বায়ুর আনুকূল্য। নির্মাতার বদ খেয়ালে বা বিনা বিবেচনায় রচিত বিসদৃশ আয়তনের জানলা দরোজা চক্ষুষ্মান শিশুদের কম যন্ত্রণা দেয় না। সে কী কষ্ট! অষ্টপ্রহর ভাঙা যন্ত্রে যেন বেসুর সাধনা হচ্ছে। বেঢপ পরিচ্ছদ পরতে হলে যে অস্বস্তি ও অসুখ, ঘরের মাপে আর দরোজা জানলার মাপে সংগতি না থাকলেও সেই অবস্থা। গঠনকর্মে পূর্বাপর ভাবনার অভাবে, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ত্রুটিতে, এমন মনুষ্যাবাসও দেখা যায়, সেখানে আলোতে চাবুক মারে, অন্ধকারে ত্রাস সঞ্চার করে— সুখ আর শান্তির ভাব জাগায় না।

পরিবেশের মধ্যে পরিমিতি গৃহের সুগঠন, এগুলি তো শিক্ষার্থীর নিয়ত সঙ্গী— এরই পুণ্যপ্রভাবে, আপন জীবনকে ও পরিবেশকে সে ছন্দোময় করে তুলবে। যথোচিত ছন্দ ও মাত্রা এগুলি তরুণমন সহজেই গ্রহণ করে, এরূপ পরিচ্ছন্ন পরিবেশেই তাদের অন্তঃকরণ সুস্থ থাকে। অন্তরে বাহিরে চিন্তায় চেষ্টায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, ভারসাম্য ও পরিমিতি তাদের প্রয়োজন। পরিদৃশ্যমান বিষয় আর সক্রিয় বিষয়ী উভয়ের ঠিক সম্বন্ধবন্ধনটি ঘটা চাই চেতনার সর্বস্তরে। তবেই পরিবেশের মধ্যে শৃঙ্খলা, পরিমিতি, ছন্দ; চিন্তার মধ্যেও ন্যায়, মাত্রা, সমতা। গৃহভিত্তির ঋজুগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা ঠিকমতো যে উপলব্ধি করেছে চারিত্রিক ঋজুতার বা সমতার মূল্যও সে নিশ্চিত বুঝেছে।

ভারতের পল্লীতে পল্লীতে, বাংলায় বা রাজস্থানে বা অন্যত্র, শিক্ষার্থীরা আজও যদি যায় প্রবুদ্ধ মন আর নির্মল দৃষ্টি নিয়ে, ঠিকটি দেখা আর ঠিক জিনিসটি তৈরি করার শিক্ষা তারা পাবে। গ্রাম্য কুমোরের গড়া মৃৎপাত্র বিদ্যালয়ে এনে দেখানো ভালো। স্থানীয় কারিগরের সাহায্যে সুতা কাটা, কাপড় বোনা, কাঠের কাজ, মাটির কাজ প্রভৃতি বিবিধ কারুশিল্পের স্বেচ্ছানুকূল শিক্ষাও দেওয়া চলে। কোনো জিনিসটি ঠিক-ঠিক নির্মাণ করে আর ব্যবহার করে আপন হাতের কাজে ছাত্রের যে গর্ববোধ আর আনন্দলাভ তার ফলে, 'চারু' শিল্প শেখাবার ব্যবস্থা বা 'শিল্প-সমঝদারির' ক্লাস নাই থাকুক, শিল্প যে কী সে বোধ সে লাভ করবে। (শিল্প সম্‌ঝাবার ক্লাস! বোঝাই যাচ্ছে একালের চিন্তাধারার কী পর্যন্ত অধোগতি! সত্য সম্‌ঝাবার ক্লাস খুললে ক্ষতি কী ছিল!)

বিশেষ কালে বিশেষ প্রতিমা আবাহন করে পূজার ব্যবস্থা করা ভালো— স্থানীয় কারিগরদের সর্বোত্তম গড়নটি ছাত্রেরা বেছে এনে অর্চনা করবে, পুষ্পাঞ্জলি দেবে।

চারুকলা ও কারুকলার যে ধারা আজও এদেশে বর্তমান তার সঙ্গে বিদ্যায়তনগুলির প্রত্যক্ষ যোগসাধনের বহু অবকাশ আছে। শিশুরাই ভাবী সমাজের সামাজিক; শিল্পের আবহাওয়ায় লালিত হওয়াতে শিল্প সম্পর্কে তাঁদের ক্ষুধাবোধ ও স্বাদবোধ জন্মাবে, শিল্পের যোগ গ্রহীতা তারা হবে। কারুকর ও শিল্পীদের পক্ষে অরণ্যে বাস হবে না, সমাজে তাদের কাজের মূল্য ও মর্যাদা থাকবে। দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই কৃতার্থ হবে।

ভারত তাদের বাসভূমি, চোখ খুলে এই ভারতের রূপ তরুণেরা দেখুক; এরই জীবনযাত্রার ছন্দে নিজেদের জীবন, নিজ নিজ গৃহ তারা গড়ে তুলুক। সে যে সুন্দর, আজও সে অবিকৃত। এদেশে পল্লীবাসী লোকের চলনে ও বলনে শালীনতা, পরিধানের বসন দেহবীণার যেন তান। এই দেশে যে কোনো ভার-উত্তোলনে বা বহনে, যে কোনো দ্রব্য-দেওয়ায় বা গ্রহণে যে ভঙ্গি সর্বব্যাপক কী এক নৃত্যের ছন্দে তা বাঁধা। সেই ভঙ্গির দাক্ষিণ্যে ও বাঙ্ময়তায় জীবৎসত্তার পরিস্ফূরণ।

আপন পরিবেশের শৃঙ্খলা, সকল বস্তুর প্রাণদীপ্তি এবং তারই অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে যারা তাঁদেরও প্রাণময় গরিমা— শিশুদের নিরাবরণ দৃষ্টিতে তা উদ্ভাসিত হোক। তাদেরই মধ্যে নূতন জাতি নূতন জীবনে জেগে উঠে এদেশীয় শিল্পকলার অন্তর্নিহিত সত্যের ও সামর্থ্যের ধারণায় ধন্য হোক।

১৩৫৫ মাঘ

গান ও গায়কি

অমিয়নাথ সান্যাল

উত্তরভারতে ধ্রুবপদ খেয়াল টপ্পা ঠুমরি এমন-কি কজ্‌রী শাওন ঝুলন হোরি ও চৈতিয়া শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত মার্জিত গীতরূপগুলির সমালোচনার সময়ে ওস্তাদ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রায়ই 'গায়কি' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। গানের মজ্‌লিশে যখন কোনো তরুণ উদীয়মান শিল্পী স্থায়ী অন্তরা আলাপ-অওচার দিয়ে গীতটির বিশেষ চিত্র ফুটিয়ে তুলতে বিভোর— তখন প্রধান ওস্তাদেরা পরস্পরে মৃদু শব্দে হয়তো বলাবলি করছেন, "হাঁ হাঁ ঈসকা আওয়াজ্‌ সুরিলা হ্যায়, রাগ-অওচারভি দুরুস্ত হ্যায় মগর গায়কি ঠিক নহি হ্যায়", অথবা "অরে ভাই ঠুমরিকা গায়কি এক হ্যায়, ফিন্‌ হোরিকা গায়কি অওর হ্যায়" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ওস্তাদেরা 'গায়কি' বলতে ঢং মনে করেন না। সম্প্রতি গীত-ও-স্বরলিপির যুগে এই ক্ষুদ্র শব্দটি তার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত ও ভাবসম্পদের মাহাত্ম্যে প্রণিধানযোগ্য হয়েছে মনে করে প্রবন্ধের অবতারণা করি।

গণ-শিক্ষার ধারা এ পর্যন্ত গুরুমুখী শুশ্রূষা অনুকরণ ও অভ্যাস দিয়েই চলে এসেছে, এবং চিরকালই এরকমে চলতে থাকবে। বাস্তব গীতরূপ একটি শব্দরূপ। এই শব্দরূপের মধ্যে স র গ ম প্রভৃতি স্বরের স্বরূপগুলি পরম্পরায় আবির্ভূত ও তিরোভূত হতে থাকে; তারই সঙ্গে মিশিয়ে অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণস্বরূপগুলি বৈশিষ্ট্যপরম্পরা দিয়ে শব্দ বাক্য ও পদ সৃষ্টি করতে করতে আবির্ভূত ও তিরোভূত হয়। স্বররূপ ও বর্ণাত্মক-রূপগুলির সমগ্র বা চূর্ণীকৃত অবস্থাকে কোনো প্রতীক বা প্রতিলিপি দিয়ে যথার্থভাবে প্রকাশ করা যায় না। সাক্ষাৎ গুরুর মুখ থেকে বা গীতশিল্পীর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়ে যে শব্দরূপটি শিষ্য বা শ্রোতার সংবিদের মধ্যে বিশিষ্ট শব্দপ্রতীতি বা শব্দানুভূতির রূপ গ্রহণ করে, সেই প্রতীতির বা অনুভূতির প্রতিনিধি হয় না। অর্থাৎ, একমাত্র শব্দরূপই শব্দপ্রতীতি বা শব্দানুভূতিতে পরিণত হয়। এই পরিণতিকে সহজ বাস্তব অবস্থান্তর-পরিণতি মনে করা যায়। সহজ বলেই শ্রুত শব্দরূপকে অনুকরণ করাও সহজ অর্থাৎ অল্পায়াসসাধ্য। অন্য পক্ষে, কাগজের উপর ছককাটা স র গ ম অথবা ক খ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি আসলে দৃশ্যরূপ, শব্দরূপ নয়। এই দৃশ্যরূপগুলিকে চক্ষু দিয়ে সংবিদের মধ্যে পাঠিয়ে দিলেই যে তারা সহজে বা স্বভাবে শব্দরূপে পরিণত হবে এরকম মনে করা যায় না। দৃশ্যরূপগুলিকে শব্দপ্রতীতি শব্দানুভব বা শব্দরূপে পরিণত করতে হলে, অর্থাৎ রূপান্তর-সাধন করতে হলে, অন্তঃকরণ-ব্যাপারের মধ্যে কিছু-না-কিছু বিজাতীয় আলোড়ন ও পরিশ্রম হয়। এই

আলোড়ন ও পরিশ্রম অভ্যস্ত হয়ে গেলে আমাদের কষ্ট হয় না— এইমাত্র। তবুও এই রূপান্তর-সাধনকে সহজ সরল বা স্বাভাবিক বলা যায় না। আরো এই যে, বাইরের শব্দরূপ শুনে সংবিদের মধ্যে স্বজাতীয় শব্দপরিণতির ব্যাপারে শব্দরূপের যৎসামান্য বিকৃতি সম্ভব হলেও তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বার বার একই শব্দরূপ শোনার ফলে সেই বিকৃতিগুলি আপনা থেকেই অন্তর্ধান করে। কিন্তু স্বরলিপির দৃশ্যরূপগুলিকে অন্তঃকরণের মধ্যে বিজাতীয়, অর্থাৎ শব্দরূপে, শব্দপ্রতীতি বা শব্দানুভূতিতে, রূপান্তরসাধন করবার ব্যাপারের মধ্যে বিকৃতির সম্ভাবনা অনেক বেশি। এবং এই বিকারগুলির সময়মতো সংস্কার না করলে, অর্থাৎ অন্য-এক রকমের পরিশ্রম না করলে, রূপান্তরিত প্রতীতি বা অনুভূতির মধ্যে বিকৃতিগুলি থেকে গিয়ে শব্দানুভবের সূক্ষ্ম মন্ত্র বা ব্যবস্থার মধ্যেই গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে। ফলে, শব্দের অনুকরণ-ব্যাপারটিও দূষিত হয়ে পড়ে। গীত শুনে গান করার চেষ্টা ও পরিশ্রম এবং গীত না শুনে স্বরলিপি দেখে গান করার চেষ্টা ও পরিশ্রম— এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য ও ফলগত প্রভেদ বুঝতে কষ্ট হবে না।

সাক্ষাৎ শুনে গীতের যে আংশিক বা সমগ্র রূপটি প্রতিভাত হয়, ছাত্র বা শিষ্য সেই শব্দরূপাবলীকে শ্রুতি দিয়ে গ্রহণ করে, শব্দস্মৃতি দিয়ে ধারণ করে, শব্দানুভূতি দিয়ে তার রূপ ও সৌন্দর্য উপভোগ করে, এবং অনুকরণবৃত্তি দিয়ে কণ্ঠে প্রকাশ করার চেষ্টা করে ও অভ্যাস করে। শ্রুতি বা শ্রবণ নামে সূক্ষ্ম ব্যাপার-ব্যবস্থা না স্বীকার করলে অন্তঃকরণে শব্দের সংস্কারবিষয়ে অন্য-কোনো 'উদ্বোধক কারণ' প্রমাণ করা যায় না। 'শব্দস্মৃতি' নামে একটি আশ্রয়-ব্যবস্থা অস্বীকার করলে স্বপ্নে শব্দ-প্রতীতির কারণ পাওয়া যায় না। শব্দানুভূতি নামে একটি বিশেষ বৃত্তি-ব্যবস্থাকে অস্বীকার করলে শব্দরূপের ভেদ অথবা 'এই সুরটি এই গানটি ভালো লাগল— ঐ সুরটি বা ঐ গানটি ভালো লাগে নি' এরকম উৎকর্ষাপকর্ষের ভেদ ও সুন্দরতা-বোধের কোনো কারণ সিদ্ধ হয় না। এবং অনুকরণবৃত্তি বা ব্যবস্থা অস্বীকার করলে সর্বজনপ্রত্যক্ষ শব্দানুকরণকার্যের মূলকেই অস্বীকার করা হয়। অতএব এই চার রকমের ব্যাপার-ব্যবস্থা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য; যদিও ছুরি-কাঁচি দিয়ে জীবিত বা মৃতের ব্যবচ্ছেদ করে এগুলিকে দেখানো সম্ভব নয়। শিশু যেভাবে বাপ-মা-ভাই-বোনদের কথা শুনে কথা বলতে চেষ্টা করে এবং ক্রমশ অবিকল অনুসরণ করে, ঠিক সেইভাবেই ছাত্র গুরুর নিকটে উপস্থিত হয়ে গানশিক্ষা করে; এ দুয়ের মধ্যে কোনো যথার্থ বা মৌলিক ভেদ নেই। এবং গান-শিক্ষার ব্যাপারে এ থেকে সহজ সরল ও প্রশস্ত অন্য উপায় নেই।

সমগ্র শ্রুতরূপকেই 'গীত' বলা যাক। কাগজের উপর লেখা রূপকে 'গীত' না বলে 'গীতি' বললে কোনো ক্ষতি নেই, অথচ ভারতের কিছু প্রাচীন শাস্ত্রকারদের পরিভাষাকেও শ্রদ্ধা করা হয়। এবং গীতিকে গীতরূপে অভিব্যক্ত করার কার্যকে 'গান' বা 'গান করা' বললে যদি একটু ব্যাকরণের প্রতি পক্ষপাত করাই হয়, তাতেও ত্রস্ত

বা শঙ্কিত হওয়ার কারণ দেখি নে যতক্ষণ পর্যন্ত পরিস্ফুট অর্থবোধ হয় এবং গীতি, গীত ও গান শব্দগুলিকে অর্থত এটাকে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যথেচ্ছাচার না করা হয়।

এখন ওস্তাদদের কথা ও ইঙ্গিতে 'গায়কি' বলতে যে অভিপ্রায় উদ্ধার করা যায় তা আলোচনা করে পরিষ্কৃত করা সম্ভব হবে।

স র গ ম প্রভৃতি শব্দরূপের বিশিষ্ট বিন্যাস এবং অক্ষরগুলির বিন্যাস বা বাঁধুনি অবিকল ও নিশ্চিত রেখেও গান করে একই গীতির কিছু বিভিন্ন গীতরূপ ফুটিয়ে তোলা যায়। এই ব্যাপার ভারতে বহুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রত্যক্ষ হয়ে আসছে, এখনো হয় এবং পরেও হবে। কণ্ঠে দেখিয়ে দিলে এই ব্যাপারটি সুন্দর ও সুস্পষ্ট সত্য বলে প্রত্যক্ষ হয়। লিখে আলোচনা করে এই ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করানো যায় না, কিন্তু বোঝানো যায়। অর্থাৎ এর মধ্যে কোনও mysticism বা হিং-টিং-ছট নেই, যার দরুন কথা দুর্গ্রহ হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেক শিষ্য একই গুরুর নিকটে একই ধ্রুবপদগীতি শিক্ষা করলেন। সুরে তালে পদে সেই গীতি নিবদ্ধ, অর্থাৎ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। বলা যায় যে, সকলে একই গীতি শিক্ষা করেছে। পরে, ছাত্রগুলি তার গীতরূপটি অভিব্যক্ত করার সময়ে শিক্ষা ও অভ্যাসের গুণে গীতির অবিকল ও অবিকৃত অনুকরণ করলেও দেখা যায়, একজনের কৃতিত্বে গীতরূপটি প্রাণবান ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং অন্য একজনের যথোপযুক্ত চেষ্টা ও অবিকল অনুকৃতি সত্ত্বেও গীতরূপটি নির্জীব ও নিষ্প্রভ। কণ্ঠের মাধুর্যের তারতম্যই এরূপ হবার কারণ এ রকম সিদ্ধান্ত করে নিশ্চিত হওয়া যায় না। হয়তো দেখা গেল, সমধিক মধুর কণ্ঠেই নির্জীব রূপটি অভিব্যক্ত হয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত সাধারণ, এমন-কি কিছু রুক্ষ কণ্ঠস্বরের, গায়কটিই প্রাণবান ও উজ্জ্বল রূপটি প্রতিভাত করেছে। কণ্ঠের মাধুর্য ও গীতরূপের অভিব্যক্তির বা ঔজ্জ্বল্যের এমন কোনো অব্যভিচারী সম্বন্ধ পাওয়া যায় না যা থেকে মনে হয় যে, মাত্র মধুর কণ্ঠেই উত্তম গীত হতে পারে অথবা অমধুর কণ্ঠে কখনোই গীতরূপ সার্থক হয় না। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছেন, বিশ্বনাথ রাও ও মহিমবাবু। দুজনই অসামান্য প্রতিভার নির্দশন ছিলেন (ইংরেজি ১৯১২ থেকে ১৯১৪)। মহিমবাবুর কণ্ঠ অত্যন্ত মধুর এবং বিশ্বনাথ রাওজির কণ্ঠ সত্যসত্যই রুক্ষ ছিল। এই দুজন গীতশিল্পীকে বহুবার ধ্রুবপদ-ধামার গান করতে শুনেছি; এবং বন্দেশের (composition) ধামার গান করতে শুনেছি। কিন্তু ধামারের গায়কিতে রাওজির কৃতিত্ব এতই বিশিষ্ট সুন্দর ও অতুলনীয় ছিল যে, তাঁর নাম হয়েছিল 'ধামারী বিশ্বনাথ'। হোরি-ধামার অনেকেই গান করেছেন এবং এখনো করছেন। কিন্তু ঐ বিশেষণটি আর কারো ভাগ্যে জোটে নি। পরে, ১৯১৯ থেকে ১৯২৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে, মথুরার চন্দন চৌবেজির ধামারও অনেকবার শুনেছি। এঁর কণ্ঠ অদ্ভুত রকমের মধুর ও বলশালী ছিল। এ দুটি গুণ একত্রে পাওয়া বিরল। তাঁর ধামারের গায়কিও অনন্যসাধারণ ছিল। তবুও বেশ মনে পড়ে রাওজির গায়কিতে এমন-একটি দীপ্তি বা চমক ছিল যা চৌবেজির

ধামারে পাই নি। রবীন্দ্রগীতি ও গীতশিল্পীদের সম্বন্ধেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; যা থেকে মনে হয় যে, মাত্র কণ্ঠের সুমিষ্টতা থাকলেই গীতের উজ্জ্বল প্রাণবান্ সার্থক বা চরম রূপ অভিব্যক্ত হয় না, তার সঙ্গে আরো কিছুর প্রয়োজন আছে।

নির্জীব হোক বা সজীবই হোক, যে-কোনো গীতরূপকে গীত মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করা আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে নানা কারণে। কিন্তু যথার্থ অনুভবী ওস্তাদ সমালোচক কেবল সেই গীতরূপকেই গায়কি-সম্পন্ন মনে করেন যেগুলি উজ্জ্বল রক্তিম প্রীতিকর ও কাম্য রূপে দেখা দেয়। গীতরূপের মধ্যে এই গুণগুলির আবির্ভাবকে এক কথায় 'বর্ণালংকারসমৃদ্ধি' বলা যায়। যত বড়ো রূপসীই হন, যথাযোগ্য ভাব ও প্রসাধনের কৃতিত্ব ছাড়া তাঁর রূপের বিশিষ্ট ও চরম অভিব্যক্তি হয় না। ঠিক সেই রকম গীতি যত সুন্দরই হোক, গানের মধ্যে বর্ণালংকারসমৃদ্ধি না থাকলে গীতরূপের সৌন্দর্য বিকশিত হয় না— এরূপ কথা প্রাচীনতম গীতশাস্ত্রবিদ্ মহামুনি ভরত বলে গিয়েছেন।

যদিও গান ছাড়া গীত নিষ্পন্ন হয় না, তবু গানক্রিয়ার মধ্যে এমন-কিছু বিশেষ ব্যাপার ঘটে যার ফলে গীতরূপে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হয় এবং রূপটি প্রত্যগ্র কুসুমের মতো বিকশিত হতে থাকে। যেমন লতার মধ্যে অদৃশ্য আন্তরিক ভাবসম্পদ্ শাখাপ্রশাখাবৃন্তের মধ্যে প্রবাহিত হতে হতে উপযুক্ত মুহূর্তে ক্রমান্বয়ে ও সমঞ্জসভাবে কুসুমের রূপে পরিণতি লাভ করে এবং তার বর্ণগন্ধের সমাবেশ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আত্মনিবেদন করে একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষার চরম পরিতৃপ্তি লাভ করে, সেইরকম গীতশিল্পীর অন্তরে ভাবী গীতেরও একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা থাকে— যে আকাঙ্ক্ষা একটি বিশেষ তৃপ্তি বা পরিসমাপ্তির অপেক্ষা করে। সেই গীতির গূঢ় ভাবসম্পদগুলি গানের ক্রমাভিব্যক্ত কার্যস্তরের মধ্যে সঞ্চারিত হতে হতে শুভমুহূর্তে গীতরূপে রূপায়িত হয় এবং ক্রমান্বয়ে ও সমঞ্জসভাবে স্বর-পদ-ছন্দের সমাবেশ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আত্মনিবেদন করে চরম পরিতৃপ্তি ও সার্থকতায় পর্যবসিত হয়। গীতরূপের মধ্যে ভাবগুলি উজ্জ্বল ও প্রীতিকর হয়ে ফুটে উঠলে তারা শ্রোতার হৃদয়ে সমান বা সদৃশ ভাব ও অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। সেই বিশিষ্ট ভাব ও অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে পারাই সেই গানের চরম ফল বা একমাত্র সার্থকতা। অন্যথা সুর-তাল-পদ দিয়ে গান করে গীতের একটি দুকুড়ি-সাতের খেলা বজায় রাখা যায়। কিন্তু মাত্র খেলা বজায় রাখাই সেই গীতির পূর্ণ অভিব্যক্তি নয়, গীতশিল্পীরও চরম লক্ষ্য নয়।

গানক্রিয়ার মধ্যে যে-সকল বিশেষ ব্যাপার ঘটলে গীতির যথার্থ স্বরূপ পূর্ণ বিকশিত ও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়, যার অভাব হলে গীতরূপ ম্লান ও অনর্থক বলে বোধ হয়, সেই ব্যাপারগুলি সমগ্রভাবে 'গায়কি' শব্দ দিয়ে সূচিত করা যায়। প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে, গায়কি কতকগুলি 'কায়দা' বা technique— যার মধ্যে একান্ত ও বিশেষভাবে গীতরূপকে ফুটিয়ে তোলার রহস্য নিহিত আছে। সুরে গান করা, শব্দ বা পদগুলি সুশ্রব উচ্চারণ করা এবং বিরাম দিয়ে গীতির ছন্দোময়ী রূপ প্রকাশ

করা— এ-সকল ব্যাপার সাধারণ অঙ্গ, যাকে ওস্তাদরা 'খানাপুরি' বলেন। গায়কি এদেরও অতিরিক্ত এবং একটি বিশেষ ব্যাপার। এই বিশিষ্টতা তখনই বুঝতে পারি, যখন দেখি অল্প-স্বল্প স্বরবিচ্যুতি হয়েও, পদবাক্যের বিকৃতি বা অস্পষ্টতা হয়েও, এমন-কি মাত্রালোপ বা ছন্দোভঙ্গ হয়েও গীতরূপের বিশিষ্ট অভিব্যক্তি সম্ভব হচ্ছে; অর্থাৎ, সুর-তাল-পদের দোষত্রুটিকে ঢেকে গীতরূপকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা গায়কির মধ্যেই আছে। এই শক্তির পরিচয় পেলে আমরা কল্পনা করতে পারি, সুমিষ্ট কণ্ঠে যথাযোগ্য সুর-তাল-পদ দিয়ে এবং বিশেষ গায়কির সাহায্যে গান করলে গীতরূপটি কত সুন্দর ও বিশিষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে পারে। ভাগ্যবান শিল্পী তিনিই, যিনি জীবনের কোনো-কোনো মুহূর্তে এই কয়টি ব্যাপারের সহযোগে চারুনির্মিতির কৌশলজাল সৃষ্টি করবার ছলে অপূর্ব গীতমূর্তি রচনা করতে পারেন। মাত্র তখনই আমাদের, অর্থাৎ শ্রোতাদের, মনে উদয় হয় 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী'। গান কে না করে? কিন্তু গুণী, তোমার গানের মহিমা, তোমার কৌশল স্বতন্ত্র! কোনো রকমে গান করে যাহোক একটা গীত হয়। কিন্তু একমাত্র কৌশল দিয়েই যথার্থ গীত বা সার্থক গীত হতে পারে। মাত্র গান করা স্বাভাবিক হতে পারে, এবং পাগলেও গান করে। কিন্তু কৌশলজাল তৈরি করাটাই art বা কৃত্রিম চারুনির্মিতি— যাকে গায়কি বলে, যা না হলে গীতের অপূর্ব স্ফূর্তি হয় না।

গায়কির অধিকার খুবই ব্যাপক ও বিচিত্র। জগতে যেখানে গীতি ও গীতশিল্প আছে সেখানেই গায়কি আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষা ও গানের যোগ্য পদ আছে। নিশ্চিত মার্জিত বা প্রসিদ্ধ রাগ বা melody ছাড়াও অসংখ্য ও উদ্ভট স্বর-সন্দর্ভ আছে। ছন্দ ও তালেরও শেষ নেই। একথা ভেবে দেখলে বোঝা যায়, গুণী বা শিল্পী কত বিচিত্র সংস্কার ও গায়কির কৌশল-জাল দিয়ে নিত্য-নব সুচারুনির্মিতির প্রয়োগ করতে পারেন।

ভারতের কথাই ধরা যাক্। এখানে এমনও গীতচেষ্টা আছে, যাতে গীতির পদমর্যাদা একেবারে নেই বললেই হয়; এরূপ ক্ষেত্রে রাগের গায়কিই শিল্পীর কল্পনায় প্রধান হয়ে উদ্ভূত হয়। ফলে, রাগের গায়কি ও গীতির গায়কি সুস্পষ্টভাবে পৃথক শ্রেণীতে গড়ে উঠেছে। গীতি আছে অথচ তার প্রাপ্য পদমর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না, এরূপ ক্ষেত্রে শিল্পী যে রূপ অভিব্যক্ত করেন তাকে 'গীত' বলা সংগত কি না, এখানে সে বিষয়ে আলোচনা করব না। এরকম গীতপ্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত ধ্রুবপদ খেয়াল ও টপ্পা; 'টপ্পা' অর্থাৎ পাঞ্জাবি ভাষার টপ্পা। এ-সকল ব্যাপারে গীতিগত পদ ও ভাবের মূল্য না দেওয়া হলেও গীতরূপের মধ্যে রাগের যে সমাহিত ও স্থির অথবা উদ্দাম ও চলমান মূর্তি বিকশিত হতে থাকে, শ্রোতাবিশেষের উপর তার ঐকান্তিক বিশিষ্ট ও অদ্ভুত প্রভাব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

অন্যদিকে, এমনও গীতপ্রচেষ্টা হয়েছে যাতে গীতির অন্তর্নিহিত অর্থ লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা, এক কথায় সুপ্রতীত ভাবসম্পদই, প্রধান ও বিশিষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয় এবং

শ্রোতার রসপিপাসু মনের মধ্যে অনুপ্রেরিত হয়। এরকম প্রচেষ্টারও বহু ভেদ দেখা যায়। উত্তরভারতের পাশ্চাত্যখণ্ডে ঠুমরি ও গজল এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাচ্যখণ্ডে, অর্থাৎ বাংলাদেশে, এরকম গীতপ্রচেষ্টার অপূর্ব ও অভিনব স্ফূরণ দেখা যায় পদকীর্তনগীতের মধ্যে এবং কাব্যবন্ধগীতের মধ্যে। পদকীর্তনে রসের অনুভূতি, উল্লাস ও পরিবেষণই কাম্য বলে মনে করা হয়। এই শিল্পপ্রেরণা ও প্রচেষ্টার অনুরূপ গায়কিও শিল্পকলার লক্ষ্য হয়ে আছে। বাংলাদেশের কীর্তনগানের গায়কিকৌশলের তুলনা পাওয়া যায় না। এর নির্মিতি এতই সূক্ষ্ম মনোজ্ঞ ও শক্তিগর্ভ যে, গানের স্বরবিচ্যুতি ও মাত্রার তারতম্য অভিভূত ও অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং অভিব্যক্ত গীতরূপের মধ্যে তা কলঙ্কের ছলে গুণ হয়েই দেখা দেয়। যাঁদের রসবোধ বা রসদৃষ্টির অভাব অথচ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সুপ্রখর, তাঁদের কানে কীর্তনগীতের বা গায়কির গুণগুলিই কলঙ্ক বলে দেখা দেয়। বৈজ্ঞানিকের বস্তুগ্রাসী দৃষ্টিতে সুন্দরীর ঠোঁটের নীচে তিলটি রূপলাবণ্য ফুটিয়ে তুলছে কি না ততটা গোচর হয় না; সেই তিল আঁচিলের পর্যায়ভুক্ত, না, অন্য চর্মরোগের শ্রেণীভুক্ত, এই চিন্তাটাই প্রবল হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু কবি ও চিত্রশিল্পীর চোখে সেই তিলটির মূল্য একেবারেই অন্যরূপ; তার অস্তিত্ব ও অবস্থানের মর্যাদাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেরকম, সহৃদয় বা রসজ্ঞ শ্রোতার পক্ষে কীর্তনগায়কির দোষগুণের মূল্য নির্ধারিত হয় গীতরূপের রসাভিব্যক্তি ও ভাবোল্লাস দিয়ে। বলা বাহুল্য, কীর্তনের গায়কি গুরুশিষ্যানুক্রমে ও সানুভব সাধনার ধারায় একটি নিজস্ব বিশিষ্ট ও সমৃদ্ধ গায়কিশ্রেণীতে পর্যবসিত হয়ে আছে এবং এর পরিবর্তন করে কোনোরূপ উন্নতিসাধনের প্রয়োজনও নেই, অবকাশও নেই। মহাজনপদাবলীর রসভাবময়ী গীতির সঙ্গে কীর্তনগায়কির সম্বন্ধ এতই নিগূঢ় ও ঐকান্তিক যে, দেহ থেকে প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সেই দেহকে সাজিয়ে রাখা বা তেলে ডুবিয়ে রক্ষা করার চেষ্টায় যে উৎকট ও বীভৎস পরিণতি হয়, পদাবলীকে গায়কি থেকে বিচ্যুত করে ধ্রুবপদ-খেয়াল-টপ্পা-ঠুংরি-সিনেমা-গায়কির প্রসাধনে মণ্ডিত করে গান করলে সেইরকমের ফল-পরিণতি হয়।

কীর্তন বাদ দিয়ে এবং সারি-বাউল-ঝুমুর-ভাটিয়ালি-রামপ্রসাদী নামের ছক-কাটা গীতরূপগুলিকে বাদ দিয়ে বাংলার যে অজস্র গীতরূপ পাওয়া যায়, সে-সকলের মধ্যে ভাবুকতা বা ভাবসম্পদই প্রধান ও বিশিষ্ট; কোনো রসের সূচনা বিরল অথবা অপ্রধান। এক-একটি গীতি যেন মধুচক্র, যার মধ্যে বহুভাবের পাঁচমেশালি মধু পাওয়া যায়। এগুলিকে আমি 'কাব্যবন্ধ গীতি' নামে অভিহিত করেছি, কারণ কাব্যসুলভ মধুর ও বিচিত্রভাবের সমাহারই এর বৈশিষ্ট্য; এবং বিশিষ্ট রসের দ্যোতনাই অপ্রধান। এইজাতীয় গীতির সম্বন্ধে মহামুনি ভরত সুবিচার করেই 'কাব্যবন্ধ' নাম দিয়ে গিয়েছেন, সে কারণে আমি ঐ নামটি অবজ্ঞা করে অন্য কোনো আধুনিক নাম দিতে ইচ্ছা করি না। সম্প্রতি 'রাগপ্রধান' 'কাব্যপ্রধান' ও 'আধুনিক বাংলা' গান নামে যে পরিভাষা ও শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়েছে, তার মধ্যে কোনো সংগতি বা যুক্তি খুঁজে পাই নে। অসংগতি পাওয়া যায়, যেমন 'রাগপ্রধান' গানকে অনায়াসে ধ্রুবপদ-খেয়াল টপ-খেয়াল বা টপ্পার

শ্রেণীতে রাখা যায়। নূতন করে 'রাগপ্রধান' শ্রেণীর প্রয়োজন কি? বাংলাভাষায় কি ধ্রুবপদগীতি খেয়াল বা টপ্পা গীতি হয় নি বা হতে পারে না? বেতারে যখন ঘোষণা করা হয় 'এখন রাগপ্রধান গান...' তখনই মনে হয় ইতিপূর্বে যে অমুকে ধ্রুবপদ বা খেয়াল গাইলেন সেগুলি কি 'অরাগপ্রধান'? 'কাব্যপ্রধান'-শব্দ ও 'কাব্যবন্ধ'-শব্দ একার্থক। এদের মধ্যে 'বন্ধ'-শব্দটি বিন্যাস ও বিশিষ্টরূপ সূচনা করে বলে 'কাব্যবন্ধ'-শব্দটিই উত্তম। 'আধুনিক বাংলা গান' কথাটির মধ্যে মাত্র যুগেরই ইঙ্গিত আছে, কোনোরকম বাঁধুনি বা বিন্যাসবৈশিষ্টের লেশমাত্র সূচনা নেই। বলা বাহুল্য, কথিত 'আধুনিক' গানগুলির গীতি ও গীতরূপের আলোচনা করলেই দেখা যায়, গীতি-অংশটি নিছক 'কাব্যবন্ধ' এবং গীতরূপগুলি একাধিক রাগের মিশ্রণ, রাগবর্জিত ব্যাপার নয়।

অতএব কাব্যবন্ধ শ্রেণীটিই বজায় থাকে। কোনো বিশেষ রাগকে গায়কি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা আদৌ এর লক্ষ্য নয়। এর লক্ষ্য হল স্বর-সমাবেশ দিয়ে গীতির বিচিত্র ভাবগুলিকে অভিব্যক্ত করা। এইরকম ভবিতব্যের কল্পনাই গীতিরচয়িতা ও গীতশিল্পীকে অদ্ভুত, এমন-কি কিম্ভুত, পরীক্ষায় প্রবৃত্ত করে। ফলে, এ যুগের গীতবাদ্য-রাজ্যের free-lance কবি ও গীতশিল্পীদের, যে কারণেই হোক্ যাঁরা কবিতায় নিয়ম বা গায়কি নিয়ম-ধর্ম পালন-পোষণ করতে অনিচ্ছুক, কাব্যবন্ধ গীতির রচনায় ভীড় করতে ব্যগ্র দেখা যায়। কাউকেই অন্যের নিয়ম মানতে হবে না, কোনো গায়কির নিয়ম পালন করতে হবে না; এতে অফুরন্ত স্বাধীনতা ও আনন্দ সন্দেহ নেই। প্রত্যেকেই নিজেকে হয় Schubert, নাহয় Wagner না হয় Schonberg মনে করতে রীতিমতো প্রস্তুত। পরীক্ষা করে দেখাই হল মূলমন্ত্র।

এই পরীক্ষা ও কল্পনাবিলাস কিছুমাত্র দোষের হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সৌন্দর্যসৃষ্টির আন্তরিক নিয়মগুলি ভঙ্গ না হয়। কিন্তু সৌন্দর্যসৃষ্টিই সুন্দরের পূর্বাস্বাদ পরিচয় ও স্মৃতির অপেক্ষা করে। এককথায়, একটা সৌন্দর্যানুভূতির সংস্কার আছে— যাকে ঘষেমেজে পরিষ্কার করতে হয়। এই সংস্কারটি সুতীক্ষ্ণ ও সুমার্জিত থাকলে, পরে কল্পনা ও পরীক্ষা দিয়ে গীতরূপের নিত্য-নব ইন্দ্রজাল রচনা সম্ভব হয়; নচেৎ মাকড়সার জাল রচনা হয়। মাকড়সার জালও কদাচিৎ রোদে বাতাসে ঝকমক করে। গীতরূপের বিকাশ দিয়ে বোঝা যায় কিরূপ ও কতখানি সৌন্দর্যের অনুভূতি ও প্রেরণা দিয়ে জাল রচনা হয়েছে।

এ যুগে কাব্যবন্ধ গীতির বহু ইন্দ্রজালিক হয়ে গিয়েছেন। কাব্যবন্ধ গীতের পরীক্ষা ও প্রচলন হয়েছে। নাট্যে সিনেমায় ঘরোয়া-বৈঠকে বেতারে বিশিষ্ট-জলসায় কাব্যবন্ধের উদ্দাম পরীক্ষা চলেছে। এতদিনে এর গায়কি নিশ্চিত বা নির্ধারিত হওয়ারই কথা। কিন্তু একমাত্র রবীন্দ্রগীতি ছাড়া গানকৌশল বা গায়কির কিছুমাত্র নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ রবীন্দ্রগীতির গীতরূপগুলি ধীরভাবে আলোচনা করলে তাদের ভিতরে বিশেষ গায়কি ও গূঢ় সৌন্দর্যশৃঙ্খল পাওয়া যায়। এগুলি এতই বিশেষ ও অবচ্ছিন্ন,

এতই সবল অথচ সরস যে, অতি সামান্য পরিবর্তন করলেই এদের গীতরূপের মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। আমি নিজে কিছু কিছু রবীন্দ্রগীতির গীতরূপ এবং অন্য অনেক কাব্যবন্ধ গীতরূপের পরীক্ষা করে দেখে এরূপ কথা বলতে সাহস করি। পরীক্ষা করেছি গীতির স্বর-পদ-তালবিন্যাসের রকম-ফের করে নয়, গায়কির অল্পস্বল্প বা আমূল পরিবর্তন করে। গীতরূপের সুষমা ও সৌকুমার্যই কিছু দোষ বা অবজ্ঞার বস্তু নয়। তা যদি হত তবে মাটি বা পাথরে গড়া ফুলেরই বেশি আদর হত।

গীতরূপের বা যে-কোনো রূপের লাবণ্য সৌন্দর্য বা সুকুমারতার বিশ্লেষণ হয় না। কিন্তু যে-সকল ব্যাপার দিয়ে ঐ গুণগুলির প্রকাশ সম্ভব হয়, সেই ব্যাপারগুলি পরীক্ষার যোগ্য। পরীক্ষা হয়েছে বলেই জগতে কাব্য চিত্রশিল্প ভাস্কর্যশিল্প ও গীতশিল্পের সমৃদ্ধি হয়েছে। রবীন্দ্রগীতির গীতরূপগুলি যে অত্যন্ত সুকুমার, তাদের শ্রী ও সুষমা কোনো রকম বিজাতীয় গায়কির স্পর্শমাত্র সহ্য করতে পারে না— এ কথা শুধু সত্য নয়, যে-সকল আধুনিক উন্মার্গগামী শিল্পী রবীন্দ্রগীতি নিয়ে খেলা করবার চেষ্টা করেন, অর্থাৎ তাঁদের স্বকপোলকল্পিত গায়কি দিয়ে রবীন্দ্রগীতির উদ্ভট রূপ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন, সেই-সকল free-lanceদের ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়ার মতো অপ্রিয় কাজ আর কিছু নেই। প্রশ্ন হতে পারে রবীন্দ্রগীতি এত স্পর্শসহিষ্ণু কেন? প্রশ্নের যদি উত্তর নাও পাওয়া যায় তাহলে ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রগীতি ও গীতরূপগুলি পরীক্ষা করে দেখে উক্ত প্রশ্নের একরকম উত্তর পেয়েছি। খুব সোজা করে বলতে গেলে স্বর্গের তিলোত্তমাকে দিয়েও ধান ভানিয়ে নেওয়া যায়; সেরূপ অবস্থায় নিশ্চয়ই তিলোত্তমার অন্য রকম শ্রী, বা হতশ্রী, ফুটে ওঠে। কিন্তু তিলোত্তমার রূপলাবণ্য ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান ভানবার দৃশ্যরূপ সৃষ্টি করবার জন্য হয় নি। ধানভানা-দৃশ্যরূপের সুন্দরতা বা চমৎকৃতি সৃষ্টি করবার জন্য অন্যরকমের শারীর-বিধান বা অবয়ব-সংস্থানের প্রয়োজন। আবার তিলোত্তমার হাতে খড়্গ ত্রিশূল দিয়ে রৌদ্রমূর্তি কল্পনা করা যায়। তবুও তিলোত্তমার মোহিনী রূপটিই সহজ ও অভিপ্রেত, রুদ্রাণী মূর্তিটি কল্পনাবিলাস বলতে হবে। উপমা ছেড়ে এবার বাস্তব গীতি ও গীতরূপে আসা যাক।

দৃষ্টান্তস্বরূপ 'নিশীথ রাতের বাদলধারা' গীতিটি আলোচনা করা যেতে পারে। গীতিটির গূঢ় সৌন্দর্য রয়েছে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার মধ্যে, আভিধানিক অর্থ বা যোগরূঢ়ী লক্ষণার বা indication-এর মধ্যে নয়। 'নিশীথ রাত' ও 'বাদলধারা' কথাগুলির আভিধানিক অর্থ স্পষ্ট হলেও কবি এই অর্থপ্রকাশমাত্র লক্ষ্য করে পদ রচনা করেন নি। এরূপ স্পষ্টার্থ থেকেও অন্য অভিনব ইঙ্গিতবহ লক্ষণা সংগ্রহ করা যায়, যথা অবিরাম অবিরল বর্ষণের রিম-ঝিম, ঘুমপাড়ানোর গান, শব্দরূপ বা অনুভূতি। কবি এই লক্ষণার্থকেও লক্ষ্য করেন নি, অর্থাৎ লক্ষণাপ্রয়োগ করেও ক্ষান্ত হন নি, আরো একটি সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিকে প্রকাশ করেছেন নিশীথ রাতের স্তব্ধ-গম্ভীর নিরুৎসাহভাব, ভয়ভীতি নির্বেদ-নিঃসঙ্গ পরিচয়, অন্ধকার ও বাদলপ্রপাতের কারাবেষ্টনী—

এ-সকলকে ভেদ করে উত্তীর্ণ হয়ে অতিক্রম করে কবির আত্মা একটি অপ্রাকৃত ধ্বনির গোপন-অভিসার ও মিলনের অপূর্ব সূচনা করেছেন। বাইরের অন্ধকার যতই নিবিড় হোক, তার ক্ষমতা নেই এই অপ্রাকৃত ধ্বনি-রূপকে আবৃত করে বা চির-আকাঙ্খিত অভিসারকে স্তব্ধ করে; ধারাপ্রপাতের শক্তি নেই গোপন-অভিসারের ক্রমাগত সুর-মাধুরীকে অবলুপ্ত করে। সমগ্র গীতির মধ্যে বিপ্রলম্ভ ও আশার সূক্ষ্ম ধ্বনিগুলি অপেক্ষাকৃত স্থূল ও স্পষ্ট ভাবতরঙ্গের অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। অসামান্য কবিপ্রতিভা ভাবতরঙ্গের মধ্যে ডুব দিয়ে যে অবর্ণনীয় অনুভূতি ও ধ্বনিরূপ সাক্ষাৎ করেছেন সেই অনুভূতি ও ধ্বনিরূপের সূক্ষ্ম অনুরণন পাই ঐ শব্দ-বিন্যাসের মধ্যে। 'নিশীথ রাতের বাদলধারা'— মাত্র এই একটি চরণের মধ্যেই সেই অনুরণনগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে : সুর-তাল-পদের বাঁধুনিতে, গান্ধারসুরে বিশ্রান্তির মধ্যে. গায়কি-প্রতিভার সহজ সুন্দর উন্মেষের মধ্যে। এই প্রতিভা রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিভা। প্রতিভা সেই গুণ ও শক্তি, যা ইতিপূর্বেই সুন্দর ও সৌন্দর্যসৃষ্টির সংস্কার সঞ্চিত ও আয়ত্ত করে রেখেছে, যা পরীক্ষা ও কসরৎ করে সুন্দর-অসুন্দর উচিত-অনুচিতের বাছাই করে না। রূপাভিব্যক্তির সময়ে প্রতিভাই বিদ্যুতের ঝলকের মতো একনিমেষে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সৌন্দর্য উন্মেষিত করতে পারে।

কবি-মনের নিভৃত গুহা থেকে এই গীতি যে বিশেষ ধ্বনি বহন করে এনেছে, তার একমাত্র সার্থক রূপটি ফুটে উঠেছে তার গীতরূপের মধ্যে। এখন যে-কোনো কৌশলী বা খামখেয়ালী শিল্পী গায়কির পরিবর্তনসাধন করলেই বুঝতে পারবেন গীতরূপের কিরকম অনভিপ্রেত পরিবর্তন এসে পড়ে, গীতির ধ্বনিরূপটির কতখানি উচ্ছেদ ও অবলোপ হয়। কিন্তু ধ্বনিরূপটি নিজে অনুভব করাই আসল কথা। ধ্বনিরূপটির অনুভব না হলে ঐ গীতিকে রামপ্রসাদী সুরের ছকে ফেলে গান করা অথবা কোনো প্রচলিত ধ্রুপদ-খেয়াল-খেমটা-গজল বা যাহোক-একটা-কিছু দিয়ে সুরে তালে গান করা একই কথা। অর্থাৎ, মনে হবে, 'কেন, এও তো একরকম বেশ লাগল মন্দই বা কি? সুর-তাল-পদ তো বেশ ফুটে উঠেছে'। ধ্রুবপদ-খেয়ালের শিল্পী নিজের ইচ্ছা ও কল্পনামতো ঐ গীতটি গাইবার সময়ে 'ঢোঢ়ন্' 'মোঢ়ন্' 'বোঢ়ন্' 'গমক্' 'পুকার' 'সুত্' প্রভৃতি গায়কি কৌশল অথবা ডাগরবান্-গুবরহারবান্ প্রভৃতি বাণীর গায়কি ফুটিয়ে তুলতে পারেন সন্দেহ নেই। জগতে ফুটে ওঠার অন্ত নেই, লাবণ্যও ফুটে ওঠে হাম-বসন্তও ফুটে ওঠে। আসল কথা, গায়কের অনুভবটি কি রকম ফুটে ওঠা আশা করে সে সম্বন্ধে একটু অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এবং ফুটে ওঠার পর বা সঙ্গে সঙ্গে ঐ গীতির সূক্ষ্ম ধ্বনিটি বেঁচে থাকে কি নিস্পন্দ হয়ে যায়, এও অনুভব দিয়ে বিচার করতে হবে।

'নিশীথ রাতের বাদল ধারা'র গূঢ় ধ্বনিকে বাদ দিয়ে তার অভিধা ও লক্ষণার ধ্যান করেও সুর ও গায়কি দেওয়া যায়। যথা নিশীথ রাতে বাদল ধারার ঝিম্‌ঝিম্ শব্দ ও দর্দুরকূলের বিচিত্র উল্লাসস্ফোট (পল্লীগ্রামের কুটির ও পুষ্করিণীর দৃশ্যপটে)

অথবা তার সঙ্গে করোগেট ছাউনির উপর ধারাপাতের দুর্দার অসহনীয় শব্দ এবং ঘরের পাশেই বড়ো বড়ো মানপাতার উপর বৃষ্টিপাতের তুমুল-কোলাহল (সহরপ্রান্তে শ্রমিকনিবাসের পারিপার্শ্বিকে) ইত্যাদি লক্ষণাও বেছে নেওয়া যেতে পারে। এবং পাশ্চাত্যের harmony discord বা tonic-counterpoint-এর বিচিত্র সমাবেশ ও গায়কি দিয়ে ঐ-সকল লক্ষণার অন্তর্গত ধ্বনি-বিকার বৈসাদৃশ্য বা cacophony-র অদ্ভুত চিত্র ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে। কোনো উদীয়মান শিল্পী যদি এরূপ cacophony-র প্রাকৃত আদর্শ খোঁজেন, তাহলে তাঁকে বেশি দূরে নয় গুপ্তিপাড়ায় বর্ষার একটিমাত্র নিশীথের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে বলি। সেখানে তিনি একসঙ্গে সমস্ত লক্ষণাগুলির প্রাকৃত স্বরূপ পাবেন। ইচ্ছামতো একটি programme বা symphony বেছে নিয়ে 'নিশীথ রাতের' গীতের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারবেন, এও কল্পনা করি। তিনি শিল্পচাতুরী প্রয়োগ করে এই অদ্ভুত কাকু-বিলাস যতই ফুটিয়ে তুলবেন, ততই যে কবি-রবীন্দ্রনাথের গীতি বা শিল্পী-রবীন্দ্রনাথের গীতিরূপটির নির্মম ধ্বংসসাধন হবে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কারণ, গীতির ধ্বনি ও গীতের গায়কির যে অপূর্ব মিলনবন্ধন রবীন্দ্রনাথ নিজে রচনা করে গিয়েছেন, সেই রক্ষা সূত্রটিই যথার্থ অনুভূতির অভাবে ছিন্ন হয়ে যায়। যে শিল্পী ও শ্রোতা এই রক্ষা-সূত্রের মহিমা অনুভব করতে পারে না, তার পক্ষে এই গীতি গান করা অথবা উপভোগ করা অসম্ভব, এবং চেষ্টা করা বৃথা।

সংক্ষেপে বলা যায়, কাব্যবন্ধ গীতির মধ্যে যেগুলিতে সূক্ষ্ম ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাই বাণী হয়ে, প্রধান বা লক্ষ্য হয়ে সুন্দররূপে দেখা দেয়, সেগুলির পক্ষে যথাযোগ্য ললিত সুকুমার ও সরল গায়কিই প্রয়োগের যোগ্য। মাত্র এই উপায় অবলম্বন করলে ধ্বনি ও গীতরূপ সার্থক হয়ে প্রতিভাত হয়। জেনে শুনে এই স্বাভাবিক নিয়মকে অবহেলা করলে জ্ঞানকৃত পাপই হয়। সেই পাপের নাম গীতি-হত্যা।

মাত্র একটি গীতি বা গীতরূপের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় প্রত্যেক গীতির একটি নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা বা গীতরূপ আছে। প্রত্যেক গীতের যোগ্য গায়কির এমন-একটি নিশ্চিত নির্বাচিত রূপ গড়ে ওঠে, যার সামান্য পরিবর্তনসাধন করলেই গীতরূপে ম্লানিমা ও খর্বতা দেখা দেয়। ধ্বনিগর্ভ কাব্যবন্ধ গীত যে স্পর্শসহিষ্ণু হবে তাতে আশ্চর্য কি? এবং অধিকাংশ গীতই ধ্বনিগর্ভ বলে সমান ধর্মের প্রেরণায় রবীন্দ্রগীতির গায়কিও অবচ্ছিন্ন বিশিষ্ট ও সুকুমার গুণের পক্ষপাতী হয়ে পড়েছে। আগেই বলেছি, তিলোত্তমাকে ধান ভানতে দিলে তার লাবণ্যের অভিব্যক্তি হবে না।

রবীন্দ্রগীতি ছাড়াও অনেক কাব্যবন্ধ গীতি আছে। কিন্তু মোটের উপর লক্ষণার প্রাধান্য এবং অর্থের বৈচিত্র্যই এই গীতিগুলিকে অল্পবিস্তর মুখরিত করে রেখেছে। লক্ষণা ও অর্থের সহযোগ বা প্রাধান্য থাকলে একদিকে সুবিধা এই যে, শ্রোতার অনুভবের কাছে সূক্ষ্ম হিসাব দিতে হয় না; তার জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ-অধিকার ও স্থানলাভ করতে পারলেই কাব্যবন্ধের কিছু সফলতা হল। ফলে এই ধরনের গীতির একাধিক অভিব্যক্তি বা interpretation হতে পারে। এস্থলে interpretation শব্দটি

'গীতরূপ' অর্থেই ব্যবহার করেছি, ব্যাখ্যা হিসেবে নয়। বহু রূপের সম্ভাবনা থাকে বলেই স্বাভাবিক অথবা পরীক্ষামূলক গায়কিরও নানারকমের সমাবেশ এসে পড়ে। প্রত্যেকটি এসে বলে 'দেখ ত আমি কত সুন্দর, চমৎকার।' শুনে বলতে হয়, 'হ্যাঁ তুমি সুন্দর, চমৎকার; এমন-কি অদ্ভুতও বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে?' মনে হয় শতকরা নিরানব্বইটি নাট্যগীত এই শ্রেণীতে পড়ে। এদের মধ্যে এমনও দু-চারটি গীতি আছে, যার মধ্যে হয়তো ধ্বনিই প্রধান, লক্ষণা ও অর্থ অপ্রধান। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় বা box-office-এর তাগাদায় এদের রূপ অভিব্যক্ত করা হয়েছে অনাবশ্যক রকমের চটুল বা উজ্জ্বল গায়কি দিয়ে অর্থাৎ রাস্তায় ঢাক-ঢোল-কাঁসির সঙ্গে বর-কনের সাজের মতো।

পদকীর্তন ও কাব্যবন্ধে প্রভেদ এই যে, প্রথমটি রসবন্ধ এবং রসসৃষ্টির কামনায় যথানুরূপ বিশদ বিস্তারিত ও বিচিত্র গায়কিসমুচ্চয়কে অপেক্ষা করে। সুতরাং গান করে গীতরূপটি সম্যক্ ফুটিয়ে তুলতে বেশ-কিছু সময় লাগে। কাব্যবন্ধের সাধনা একটি ধ্বনিরূপকে অভিব্যক্ত করে ও কোনো অনাগত রসাস্বাদের সূচনামাত্র করে অন্তর্হিত হওয়া। অতএব একটি কাব্যবন্ধ গান করতে ন্যূনপক্ষে তিন মিনিট এবং ঊর্ধ্বপক্ষে সাত-আট মিনিটের বেশি লাগা উচিত নয়। কদাচিৎ দু-একজন পাল্লাদার গীতশিল্পীকে (duration-singer বলা যায় কি?) কাব্যবন্ধের মামুলি রচনাকে গানের দড়ি দিয়ে এদিক ওদিক বিস্তর টানাটানি করে তার জান পরেশান করতেও শুনেছি। শ্রোতাকে হয়রানি করা ছাড়া এর ভবিষ্যৎ দেখি নে।

রবীন্দ্রগীতির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বলেই গান ও গায়কির মধ্যে বিশিষ্টতা এসে পড়েছে। অন্যপক্ষে এমনও লক্ষ করতে বাধ্য হয়েছি যে, শিল্পী গীতির স্বরলিপি অর্থাৎ official record-এর মাছিমারা নকল করে গান করে যেতে থাকলেও গীতটি বৈশিষ্ট্যহীন সমনজারির মতো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। অথচ সেই একই গীতি ও স্বরলিপির নির্দোষ অনুসরণ করে অন্য-একজন শিল্পী এমন রূপটি প্রকাশিত করছেন যাতে শ্রোতারা সকলেই নিস্তব্ধ ও বিহ্বল হয়ে একমনে গীতসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে আছে। এবং গানের শেষেও হৃদয়ের মধ্যে সেই রূপটি শব্দের মধুর অনাড়ম্বর অনুকরণের মতো কিছুক্ষণ থেকে গিয়েছে। যদি শ্রোতার মনে একটি বিশিষ্ট চিত্র ও সুন্দর প্রভাব সৃষ্টি করাই কাব্যবন্ধের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বলতে হবে যে, সুর-তাল-পদের অবিকল অনুবর্তন করেও প্রথমোক্ত গানচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এবং সুর-তাল-পদের অনুবর্তন করে অধিকন্তু যথোপযুক্ত গায়কির সাহায্যেই শেষোক্ত গান সার্থক হয়েছে। এই অধিকন্তুই রবীন্দ্রগীতির গায়কি বা বিশেষ গায়কি। এই বিশেষ গায়কি এতই বাস্তব ও প্রত্যক্ষযোগ্য এবং প্রয়োগযোগ্য যে, গায়কিবর্জিত ও গায়কিযুক্ত একই গীত দু রকমে দেখিয়ে শিখিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

এখন একটি প্রশ্ন, গুরুর মুখ থেকে সাক্ষাৎ গীতরূপ শুনে অনুকরণ করে গান করার অভ্যাস করলে অনুকরণের প্রবাহই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে গায়কি বয়ে নিয়ে

আসবে। তাহলেই তো গীতরূপটি আপনা থেকে গায়কিযুক্ত হবে। অতএব গীতরূপটি উত্তম ও সার্থক হবে। যদি অনুকরণমাত্র সম্বল করে গানের চরম সাধনা ও গীতরূপের ইষ্টসিদ্ধি হয়, তবে গায়কি নামে একটি অভিনব তত্ত্ব উপস্থাপিত করে পরিশ্রম বাড়িয়ে লাভ কি।

সংক্ষেপে ও উদাহরণ দিয়ে এর উত্তর দেওয়া যায়। গায়কির অধিকারে এত বিচিত্র ও বিভিন্ন ব্যাপার আছে এবং গীতরূপও এত রকমের যে, প্রত্যেকটির বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব হবে না। মাত্র সাধারণভাবে মন্তব্য করা যাবে।

স্বীকার করা যাক, ছাত্র যথার্থ অনুকরণ করবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। গুরু প্রত্যেকটি চরণ পৃথকভাবে ও বার বার গান করে দেখিয়ে দিচ্ছেন। গুরু মাত্র একবার ও সমগ্র গীতরূপটি গান করে দেখিয়ে দিলেন এবং ছাত্র সেই গানক্রিয়া আয়ত্ত করেই গীতরূপটি প্রকাশিত করল; এমন শ্রুতিধর আমি অবশ্য দেখি নি। যাই হোক, একই চরণ বার বার গান করে দেখিয়ে দেওয়া এমন একটি পাখি-পড়ানোর মতো যান্ত্রিক ব্যাপার হয়ে যায়, যার জন্য সেই চরণটির যথার্থ রূপ অভিব্যক্ত না হয়ে গায়কিবর্জিত সুর-তাল-পদবিন্যাসরূপ একটি সাধারণ ন্যূনতম রূপ অভিব্যক্ত হয়; অর্থাৎ শিক্ষাদানের সময়ে গুরুর গুরুত্বই প্রকট হয়, শিল্পীত্ব চাপা পড়ে যায়। সেই গীতরূপটি মজলিসে অভিব্যক্ত করার সময়ে গুরু শিল্পী হয়ে যখন গায়কির রং ফলাতে থাকেন, মাত্র তখনই গীতের চরণটি সমগ্র পরিকল্পনার দৃশ্যপটে সমঞ্জস ও অঙ্গীভূত হয়ে তার নিজস্ব একান্ত কাম্যরূপে আবির্ভূত হয়। শিক্ষাগৃহের পরিবেশের মধ্যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে নৈতিক বা ব্যবহারিক পরিশ্রমের মধ্যে যখন মাত্র শিক্ষাদান ও বস্তুলাভই গুরু ও শিষ্যের লক্ষ্য থাকে, তখন গুরুর পক্ষে এক-একটি বিচ্ছিন্ন গীতচরণের বার বার আবৃত্তি করে দেখিয়ে দেওয়ার সময়ে সেই চরণটির যথার্থ স্বরূপের বিকাশ হয়তো সম্ভব হয় না। কুড়ি-পঁচিশ বার আবৃত্তির মধ্যে যদিই বা দু-একবার গায়কিগুলি ফুটে ওঠে, কিন্তু সেই মুহূর্তগুলিতে ছাত্র হয়তো সুর-তাল-পদের সমাবেশবৈশিষ্ট্যের প্রতি ধ্যাননিবদ্ধ হয়েছে এবং জ্ঞান দিয়ে বস্তুলাভের আগ্রহে অন্তরাত্মার অনুভূতি সঞ্চয় করার ব্যাপারে নিরুদ্ধ হয়ে আছে; অর্থাৎ গুরুর নিকট শিক্ষা করার সময়ে গীতির নীরস ন্যূনতম ও সাধারণ রূপটিই ছাত্রের মনে সংক্রামিত ও বদ্ধমূল হয়ে পড়ে। এই নীরস অধ্যবসায় ও অভ্যাসের শক্তি মিলিত হয়ে ছাত্রের সংবিদ্ ও স্মৃতির মধ্যে গীতের যে সমগ্র রূপটি প্রতিফলিত করে সেই রূপটিই ভবিষ্য গীতসংকল্পের বীজরূপে থেকে যায়। অভ্যাস ও পরিশ্রম করে যাকে অর্জন করা হয় তার সংস্কার বা প্রবণতাকে গান করার সময়ে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব বা অত্যন্ত কঠিন, স্বীকার করতে হবে। এর কুখ্যাত উদাহরণ, গুরুর মুদ্রাদোষগুলি ছাত্রে বর্তায় এবং অবশ্যম্ভাবী হয়েই দেখা দেয়— যদি গুরু বা ছাত্র এ বিষয়ে অনবহিত থাকেন। যাই হোক, ছাত্র যখন তার অভ্যস্ত গীতরূপটি গান করে তখন একটি নীরস গায়কিবর্জিত রূপই ফুটে ওঠে। তার নিজের পক্ষে সম্ভবত সেই রূপটি অসুন্দর বা অপ্রিয় লাগে

না। কারণ, অভ্যাসের এমনই মহিমা যে, আফিং-এর মতো দুর্গন্ধ ও তিক্তস্বাদ বস্তুটিও নেশাখোরের রসনায় অতীব স্বাদু এবং নাসিকায় সুঘ্রাণ বলে মনে হয়। গায়কিবর্জিত গীতরূপের সৌভাগ্য এই যে, শ্রোতার মধ্যেও নেশাখোর শ্রোতা থাকে।

এরকম সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে লাভ নেই, কারণ আধুনিক গীত-বিদ্যালয়গুলিতে পাইকারি হারে গীতশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার ফলে স্বাদগন্ধবর্জিত গানচেষ্টা ও গীতরূপের বাহুল্য দেখা দিয়েছে। ছাত্রদের পিতামাতা এ-সকল ব্যাপারের সন্ধান রাখেন না, বোধ হয় তাঁরা অশক্ত— 'তনয় যদ্যপি হয় অসিতবরণ, প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন' ন্যায়; অথবা তাঁরা প্রয়োজনের দিকটা দেখেন না।

এ পর্যন্ত মনে করা হয়েছে যে, গুরু মাঝে মাঝে শিল্পীরূপেও দেখা দেন। কিন্তু অন্য সম্ভাবনাও আছে। বয়োবৈগুণ্য বা অন্য কারণে গুরুর পক্ষে শিল্পকৃতিত্ব অসম্ভবও হতে পারে; অথবা কৃতিত্ব কষ্টসাধ্যও হতে পারে। কষ্টসাধ্য কৃতিত্বের অনুকরণ থেকে গান শিক্ষা করার সময়ে কষ্টসাধনসূচক বিকৃতি বা দোষগুলিরও অজ্ঞাতসারে অনুকরণ হয়ে পড়ে।

এর উপরেও মনে করা যাক, শেষোক্ত গুরুটি অত্যন্ত কড়াপাকের isolationist, অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যবাদী। অর্থাৎ তিনি মনে করেন, একমাত্র তাঁর জ্ঞান ও প্রয়োগই ঠিক, অন্য সবই বিকৃত ও ভ্রান্ত; অথবা তাঁর সম্প্রদায় বা ঘরবানার শিল্পপ্রয়োগ প্রভৃতিই ভারতের একমাত্র আদর্শ, অন্য সমস্ত ঘরবানা অনাদর্শ বা ভুঁইফোড়। এরকম গুরু মনে করেন, ছাত্ররা তাঁর কৃতিত্ব বা ঘরবানার অচলায়তনের মধ্যে বদ্ধ থাকবে; অন্য গুরু সম্প্রদায় বা শিল্পের ছোঁয়াচ তাদের পক্ষে হাম-বসন্তেরই মতো মারাত্মক ও বর্জনীয়। অতএব শিষ্যকে বাইরের সংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই শ্রেণীর গুরু অবিরল নয়। এরকম দু-চারজন মঠধারীর সঙ্গে আলাপ করে গায়কি সম্বন্ধে তাঁদের সরল মত উদ্ধার করেছি। মতটি এই— "আমি যা গাইব করব বা দেখব তাই-ই গায়কি। গায়কি বলে শেখাবার মতো স্বতন্ত্র বস্তু নেই। অন্য ওস্তাদ বা ঘরবানা যে পৃথক গায়কির কথা বলে সে-সবই বুজরুকি"। এঁদের মধ্যে যাঁরা শিল্পী তাঁরাই ঘরবানা বজায় রাখেন বা নূতন করে ঘরবানা তৈরি করেন। যে-রকমই হোন, ছাত্রগুলি ভয়ে ভক্তিতে নিজেদের অচলায়তনে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় তাদের মনে অস্বাভাবিক সংকোচ ও পরশ্রীকাতরতার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। এবং পূর্বোক্তভাবে গীতের নীরস মূর্তিটি অভ্যস্ত হয়ে গেলে ভবিষ্যৎজীবনে কখনোই সরস প্রাণবান গীতাভিব্যক্তি সম্ভব হয় না; এবং সংকোচের কারণে অন্য শিল্পী বা ঘরবানার যথার্থ গায়কিও তার পাষাণ-মনে রেখাপাত করতে পারে না। এরকম শিক্ষাপদ্ধতির দুই কি তিন পুটপাকের পর যে শিষ্যশাবক গড়ে ওঠে, সেগুলি এক-একটি পাথরের নুড়ি বিশেষ। মাইকেল বা মজলিসে দলবদ্ধ হয়ে দঙ্গল সৃষ্টি করা ছাড়া এই নুড়িগুলির অমূল্য জীবনে আর-কোনো সার্থকতার উদয় হয় না। এই দঙ্গলী শিল্পী বা গাইয়ে এখনো প্রচুর আছে এবং যথানিয়মে প্রস্তুতও হচ্ছে। এখনো যে জলসায় দলগত বা

ব্যক্তিগত কলহের উদ্ভব হয়, সেগুলি পাথরের নুড়িদের ঠোকাঠুকি মাত্র। ভুক্তভোগীরা এ-বিষয়ে অবগত আছেন।

মোটের উপর অবস্থা এই। এখন এরূপ আশা করা যায় না যে, প্রত্যেক গুরুই এক-একজন বিশিষ্ট শিল্পী। শিল্পী হলেও পাখি-পড়ানো শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপারটি মনে রাখতে হবে। পাইকারি বন্দোবস্ত দিয়ে গানশিক্ষার সাধারণ ফল অনুমান করা কঠিন হয় না। এরকম অবাঞ্ছিত সম্ভাবনার মধ্যে দীক্ষা-শিক্ষা পেয়েও দু-একজন শিষ্য যে পরে উঁচুদরের শিল্পী হয়ে দেখা দেন, সে কেবল অদৃষ্টলব্ধ বুদ্ধি অনুভবশক্তি ও কর্মক্ষমতার মাহাত্ম্যে, শিক্ষার গুণে নয়। এদের মহোদয়ের কারণে গুরু বা ঘরবানা বা বিদ্যায়তনের মাহাত্ম্য বাড়ে তো মঙ্গল, কিন্তু পণ্ডশ্রমের উদাহরণ দেখে নিরাশ হতে হয়।

এর একমাত্র প্রতীকার আছে 'গায়কি' প্রস্তাবের মধ্যে। প্রস্তাবটি সংক্ষেপে বলা যাক।

সার্থকনামা গীতিমাত্রেরই একটি উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তির উপযুক্ত রূপ আছে। গান করে এই অভিব্যক্তি-সাধন হয়। গানকার্যের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ ব্যাপারই 'গায়কি'। সমগ্র গীতির সাধারণ্যকে মনে করলে গায়কিরও সাধারণ্য মনে করা যায়। এই সাধারণ্য বাংলা দেশে বা ভারতে বা ইয়োরোপে বা সারা জগতেই গীতরূপের সাধারণ অপরিহার্য অলঙ্ঘনীয় হয়ে আছে। এই সাধারণ্যের জ্ঞান ও প্রয়োগ চর্চা করা উচিত, ঠিক যে কারণে বালক-বালিকাকে নাকানিচোবানি না দিয়ে ডুবে যাবার ভয় না হতে দিয়ে এবং জল না খাইয়েও বৈজ্ঞানিক ব্যায়ামপদ্ধতি অনুসারে সাঁতার শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। ন্যূনপক্ষে ছ-হাজার বৎসরের ভারতীয় সভ্যতার কোনো অতিপ্রাচীন সমৃদ্ধি ও অভ্যুদয়ের যুগে গীতবিষয়ে গায়কির এই সাধারণ্য-প্রয়োগ পরীক্ষা বিচার ও সিদ্ধান্তের অধিকৃত হয়ে গিয়েছে। সেই সিদ্ধান্তগুলি অপেক্ষা সূক্ষ্ম ব্যাপক বিশদ ও বাস্তব কোনো সিদ্ধান্ত আর পাওয়া যায় না। ইয়োরোপীয় তথাকথিত classical ও romantic গীতিশ্রেণীর পক্ষে যে গায়কি উদ্ভূত হয়েছে, সেও এই সাধারণ্যের অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণ্যের অতিরিক্ত বিশেষ বা বিশিষ্ট গায়কিও আছে। কিন্তু এগুলি সমস্তই সাধারণ্যের তত্ত্ব বা category-র মধ্যেই আছে। কালে কালে দেশে দেশে যে গীতভেদ দেখা যায়, তাদের মধ্যে এই গায়কির বিশেষ ও বিশিষ্ট ভেদগুলি পাওয়া যায়। বিশেষ আর কিছুই নয়, সমাবেশের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য। এগুলিও আলোচনা ও প্রয়োগযোগ্য, কারণ শিল্পী দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যেই উদিত হন।

গীতির, অর্থাৎ প্রত্যেক গীতির, ব্যক্তিগত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আছে। সে কারণে ব্যক্তিগতভাবেও বিশিষ্ট গায়কির সমাবেশ আছে।

এই গায়কি বা গায়কিভেদ কল্পনা বা abstraction নয়, এর মধ্যে কোনো অতি-প্রাকৃত রহস্য বা mysticism নেই, তার স্থান নেই অবকাশও নেই। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ অনুভবের যোগ্য ও বাস্তব।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, গায়কির বিচিত্র চিত্রাঙ্কন ছাড়া গীতরূপের সুন্দর বা কাম্য অভিব্যক্তি হতে পারে না; সাধারণ বা বিশেষ গায়কি আয়ত্ত না করে শিল্পী হওয়া অসম্ভব; একমাত্র অসাধারণ প্রতিভাই গায়কি আয়ত্ত করার পরিশ্রম না করেও যথানুরূপ গায়কি দিয়ে গীতরূপ সৃষ্টি করতে পারেন। গায়কি না জেনে বা আয়ত্ত না করে নিজ ইচ্ছা ও কল্পনাপ্রসূত গায়কি দিয়ে গীতরূপকে খাড়া করা যায়, কিন্তু সেই রূপটির পক্ষে যথার্থ গীতরূপ হওয়া বা না-হওয়া শিল্পীর উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে Chance and law of probability-র উপর, অর্থাৎ সুর-তাল-পদের সমাবেশ ভেদ এবং গায়কি-সাধারণ্যের নির্দিষ্ট ছেচল্লিশটি ভেদ এদের যতরকম ইচ্ছাকৃত ও কাকতলীয় যোগাযোগ হতে পারে তাদের মধ্যে মাত্র একটি সমাযোগই যথার্থ গীতরূপের মধ্যে থাকে। উপমাস্বরূপে, হাত পা নাড়তে পারে ও বল আছে এমন একটি সাঁতার-না-জানা বালককে পুকুরে ফেলে দিলে তার পক্ষে আপ্রাণ চেষ্টায় বেঁচে পারে ওঠার সম্ভাবনা বা যোগাযোগ যেমন, পূর্বোদ্ধৃত সম্ভাবনা বা যোগাযোগও সেই রকমের। গায়কিবর্জিত কসরৎমাত্রসম্বল গান অভ্যাস করিয়ে তরুণ মনের সহজ অনুভবশক্তির ও সৌন্দর্যলোলুপতার উত্তমরূপে অবলোপসাধন হতে পাড়ে, যদি অচলায়তন ও ছুৎমার্গপদ্ধতির বেড়া দিয়ে ছাত্রদের ঘিরে রাখা যায়। কোনো কিছু শিক্ষা না করে, মাত্র স্বভাবের বশে বালক-বালিকারা সেই সেই গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয় যেগুলি গায়কির গুণে সজীব ও রক্তিদায়ক; কিশোরবয়স্কদের গান শিক্ষা দেওয়ার ভার যিনি গ্রহণ করেন বিশেষ করে সেই গুরু ও শিক্ষকের গায়কি বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, কারণ তিনিই সম্ভবত তরুণ মনের উপর প্রাথমিক রেখাঙ্কন করতে ব্রতী হয়েছেন।

সাক্ষাৎগুরুর কাছে গান শিখতে গিয়ে যদি এত রকমের ব্যাঘাত ও অভাবের সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে নির্জীব ছাপার কাগজের উপর লেখা স্বরলিপিকে সামনে রেখে গান শিক্ষা করবার চেষ্টা অথবা যথার্থ গীতরূপকে অভিব্যক্ত করার শ্রম কতটুকুই-বা সার্থক হতে পারে, এরূপ সমীচীন প্রশ্ন বা তর্ক আপনা থেকেই জেগে ওঠে। বারান্তরে এই প্রশ্ন ও তর্কের মীমাংসা করার ইচ্ছা রইল।

১৩৫৬ কার্তিক

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

আমার অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে ছিল রবীন্দ্রনাথ গানের ক্ষেত্রেও কিরকম পরকে আপন করে' নিতে পেরেছেন— চলতি কথায় যাকে আমরা তাঁর গান ভাঙা বলি— তার পরিধি কত বিস্তৃত, এবং তাতেও কিরকম অপরূপ কারিগরী দেখিয়েছেন, তার একটি স-দৃষ্টান্ত আলোচনা সংগীতমহলে করি। রবীন্দ্রসপ্তাহ উপলক্ষে সেই সাধ পূর্ণ হল।

গান ভাঙা দু-রকমে হতে পারে— এক, পরের সুরে নিজের কথা বসানো; দুই, পরের কথায় নিজের সুর বসানো। এক্ষেত্রে পরের সুরে নিজের কথা বসাবার দৃষ্টান্তই বেশি পাওয়া যায়। পরের কথায় সুর দেবার দৃষ্টান্ত অতি বিরল; যদিও একেবারে নেই, তা নয়। এই প্রথম শ্রেণীকে আমি সুবিধার্থে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি : ১. অ-বাংলাভাষার গান ভাঙা; ২. বাংলাভাষার গান ভাঙা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসংগীতগুলির কথার সম্পদ বাদ দিয়ে শুধু সুরের দিক থেকে আলোচনা করলেও আমাদের হিন্দু-সংগীতের একটি বিপুল রত্নভাণ্ডারের পরিচয় ও ইতিহাস পাওয়া যাবে। আজ যে ভাঙা গানের আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, তারও অধিকাংশ এই ভাণ্ডারেই সঞ্চিত। কবি নিজে যেখানে যে ভালো সুরটি শুনেছেন, অথবা অন্য লোকে দেশবিদেশ থেকে যে-সব গান আহরণ করে তাঁকে এনে দিয়েছেন, তার প্রায় সবগুলিকেই তিনি পূজার বেদীতে নিবেদন করেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। মাঘোৎসবে নতুন নতুন গান সরবরাহের তাগিদ তাঁর অন্যতম কারণ হতে পারে।

১

পিতৃদেব সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল ছিল বোম্বাই প্রদেশ, তাই সেই প্রদেশের নানা ভাষার গান ভাঙার নমুনার কথাই আমাদের প্রথমে মনে পড়ে। বিবাহের অনতিপূর্বে তিনি কারওয়ার নামক বোম্বাইয়ের যে সুন্দর বন্দরে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সেখানে এক সময়ে একদল নর্তকী গান শোনাতে আসে, মনে পড়ে। তাদের কাছে কয়েকটি কানাড়ী ভাষার গান শুনি ও শিখি, যা পরে তিনি 'ভাঙেন'। সেইগুলির দৃষ্টান্তই প্রথমে দিচ্ছি, কারণ আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতির সঙ্গে বিদেশী গানের মধ্যে এইগুলিই প্রথমে গ্রথিত। তবে বলে রাখা ভালো যে, উদাহরণগুলি কালানুক্রমিকভাবে সাজাবার কোনো চেষ্টা করা হয় নি।

মূল ॥ সখি বা বা
ভাঙা ॥ বড়ো আশা করে
মূল ॥ পূর্ণ চন্দ্রাননে
ভাঙা ॥ আজি শুভদিনে
মূল ॥ চারি বর্ষা পর্যন্ত
ভাঙা ॥ সকাতরে ওই কাঁদিছে

মারাঠী যদিও ও-অঞ্চলের একটি প্রধান ভাষা, এবং আমি তার তিন-চারটি গান যে না শিখেছিলুম তাও নয়, তবু কেন জানি নে, রবীন্দ্রনাথের মারাঠী থেকে ভাঙা কোনো গান মনে করতে পারছি নে।

গুজরাটী সম্বন্ধেও প্রায় তথৈবচ। অর্থাৎ যদিও একটি ব্রহ্মসংগীতের ("কোথা আছ প্রভু") মাথায় 'গুজরাটী ভজন' লেখা আছে, কিন্তু তার মূল কথাগুলি আমি জানি নে। তবে ঐ শিরোনামার সাক্ষ্যের জোরে ভাঙা গানটির উল্লেখ করে' গুজরাটের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করছি। এটি এখন চলিত না থাকলেও আমরা ছেলেবেলায় খুব শুনতুম। এ গানটিতে সুরের বিশেষ চটক না থাকুক, বেশ একটি ধীর শান্ত ভাব আছে, যা ভজনের উপযোগী। যেখানে কথাই প্রাণ, সেখানে সুরের অলংকরণে তাকে চেপে না দেওয়াই সংগত; সেইজন্য ধর্মসংগীতের পক্ষে টপ্পার চালের চেয়ে ধ্রুপদের চালই প্রশস্ত মনে হয়। কৃষ্ণধন বাঁড়ুজ্যেও এই মত সমর্থন করেন।

আর-একটি ভজনের সুরও সরলাদেবী চৌধুরানীর 'শতগানে' গুজরাটী নামাঙ্কিত আছে বলে সাহস করে এই পর্যায়ে ফেলছি। সেই সুরে বসানো দ্বিজেন্দ্রনাথের "অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি" গানটি হয়তো ব্রাহ্মসমাজে বেশি পরিচিত; কিন্তু তা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ এই তিনটি গানে ঐ ভজনের সুর দিয়েছেন— "এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি"; "নমি নমি ভারতী" (বাল্মীকি-প্রতিভা); "যাও রে অনন্তধামে" (কাল-মৃগয়া)। এ সরল সুরটিও ভজন বা ধর্মসংগীতের উপযোগী।

মাদ্রাজী ও মহীশূরী ॥ মাদ্রাজী সুরের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য রবীন্দ্রনাথের গানে লক্ষিত হয়। তার একটি কারণ আমার মনে হয় কার্যোপলক্ষ্যে সরলাদেবীর অনেককাল মহীশূরে অবস্থান ও সেখান থেকে সুন্দর সুন্দর গান আনয়ন, যথা "এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ"। তার মধ্যে "আনন্দলোকে" গানটিই বোধ হয় সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয়, যদিও তার মূল কথা জানি নে। এই সহজ সুন্দর সুরটি ভজন গানের বিশেষ উপযোগী। আবার "সংগচ্ছধ্বং" নামক বিখ্যাত বৈদিক শ্লোকে এই সুরটিই একটু ইতরবিশেষপূর্বক সরলাদিদিই বসিয়েছেন ও সামান্য স্বরসন্ধি লাগিয়ে কত সভাস্থলে গান করিয়েছেন, তা হয়তো একালের অনেকে নাও জানতে পারেন। আরো বেশি সেকালে গেলে "নমামি মহিষাসুরমর্দিনি" নামক মাদ্রাজী ভজন-ভাঙা "ভজো রে ভজো রে ভবখণ্ডনে" গানটি আমাদের কালে খুব চলিত ছিল; এটি দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাঙা। আবার দেশকালপাত্রে সমসাময়িকের কাছ ঘেঁষে এলে দেখা যায় আমরা মাদ্রাজে যাই না-যাই, মাদ্রাজ

আমাদের কাছে এসেছে। অর্থাৎ শান্তিনিকেতনেরই একজন মাদ্রাজী ছাত্রীর কণ্ঠের সুন্দর সুন্দর মাদ্রাজী গান রবীন্দ্রনাথ সুন্দরতরভাবে ভেঙেছেন, তা এখানকার অনেকে আমার চেয়ে ভালোই জানেন। যথা "বেদনা কী ভাষায়" "বাজে করুণ সুরে" ইত্যাদি।

"চিরসখা মোরে ছেড়ো না" এবং "চিরবন্ধু চিরনির্ভর" গান দুটির সুরও মহীশূরী বলে প্রসিদ্ধ। "প্রণমামি অনাদি-অনন্ত সনাতন পুরুষ" গানটি মাদ্রাজী ভজন থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভেঙেছেন। তারও আগে সত্যেন্দ্রনাথের আমলে গেলে "জয় দেব" "হায় একি হেরি শোভা" প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর ভজন-ভাঙা গান পাওয়া যায়।

পাঞ্জাবী বা শিখ ভজন॥ শিখ ভজনও আমরা সুন্দর সুন্দর পেয়েছি। তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর "বাজে বাজে রম্য বীণা"। আমার মনে হয় এটি ভাঙা গানের রাজা— এই হিসেবে যে, যতদূর সম্ভব কম পরিবর্তনে [১] বিদেশীকে স্বদেশীতে পরিণত করা

---

১ এ রকম আর-একটি দৃষ্টান্ত ১৩২০ চৈত্র-সংখ্যা প্রবাসী থেকে উদ্ধৃত করছি—

॥ হিন্দি আরতি ॥
অমৃতসর গুরুদরবারে গীত

[মূল]	[অনুবাদ]
এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর তেরো চরণ'পর সির নমেঁ॥	এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর, মস্তক নমি তব চরণ-পরে।
সেবক জনকে সেব সেব পর, প্রেমী জনকে প্রেম প্রেম পর, দুঃখী জনাকে বেদন বেদন। সুখীজনাকে আনন্দ এ॥	সেবক জনের সেবায় সেবায়, প্রেমিক জনের প্রেম-মহিমায়, দুঃখীজনের বেদনে বেদনে, সুখীর আনন্দে সুন্দর হে; মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।
বনা বনামেঁ সাবঁল সাবঁল, গিরি গিরিমেঁ উন্নিত উন্নিত, সলিতা সলিতা চঞ্চল চঞ্চল, সাগর সাগর গম্ভীর এ।	কাননে কাননে শ্যামল শ্যামল, পর্ব্বতে পর্ব্বতে উন্নত উন্নত, নদীতে নদীতে চঞ্চল চঞ্চল, সাগরে সাগরে গম্ভীর হে; মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।
চৌন্দ সূরয বরৈ নিরমল দীপ। তেরো জগমন্দির উজার এ॥	চন্দ্র সূর্য্য জ্বালে নির্ম্মল দীপ, তব জগমন্দির উজ্জ্বল করে, মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তবে এ অনুবাদটি গানরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল কি না, আমাদের ঠিক জানা নেই।— মূলগানটি বাংলাদেশেই একসময় এত সুপ্রচলিত হয়েছিল যে, তার প্রায় আক্ষরিক অনুবাদটি গান হিসাবে মূলগানটির পাশাপাশি প্রচলিত না হওয়াই সম্ভব।— রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে এ অনুবাদটি এ যাবৎ স্থান পায় নি।— সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

হয়েছে, যেন একই স্বর্ণমুদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। অবশ্য মূল গানের ("বাদৈ বাদৈ রম্য বীণ বাদৈ") ভাষাই তাঁকে সে সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু যদিও স্বীকার করি যে তিনি মূলের প্রত্যেক কথা অনুবাদ করেছেন মাত্র, তাহলেও শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহনবাবুর কাছে শুনেছি যে শুধু প্রথম কলির কথাগুলিই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, বাকি দুটি কলি তিনি পূর্বাপর সংগতি রেখে নিজেই সংযোজন করেন। অবশ্য তাঁর কারিগরী বা শিল্পচাতুরী এতই স্বয়ম্প্রকাশ যে, আমাদের মতো লোকের অন্যকে চোখে আঙুল দিয়ে সেটা দেখাতে যাওয়া অনেকটা প্রদীপ ধরে সূর্যের আলো দেখাবার মতন। তবে প্রদীপেরও প্রয়োজন আছে, নইলে দীপালি হবে কিসে?

এই শিখ-ভজনেরই আর-একটি বহুকাল আগে আমাদের কাছে এসেছিল, কী সূত্রে তা জানি নে; এবং আশ্চর্যের বিষয়, সেটিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একেবারে প্রায় অক্ষরে-অক্ষরে অনুবাদ করেছেন। গানটি এই—

মূল॥ গগনোমে থাল রবিচন্দ্র দীপ বনি
তারকামণ্ডল জনক মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল পবন চঙর করে
সগল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।
ক্যায়সি আরতি হুয়ি হো ভবখণ্ডন তেরি আরতি
অনাহত শবদ বাজন্ত ভেরী রে॥

ভাঙা॥ গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে॥
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে॥
কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন তব আরতি
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে॥

কেউ কেউ ভুল করে ভাবেন এটি রবীন্দ্রনাথের। এই আক্ষরিক অনুবাদ যে এত অবিকল করা সম্ভব হয়েছে, তার থেকেই বোঝা যায় শিখদের গুরুমুখী ভাষা কতটা সংস্কৃত-ঘেঁষা। যাকে পাঞ্জাবী ভাষা বলা যায়, তার নমুনা রবীন্দ্রনাথের টপ্পা-ভাঙা গানের মূলে পাওয়া যাবে।

আর-কোনো স্বদেশী ভাষা থেকে তিনি গান ভেঙেছেন বলে মনে করতে পারছি নে। তাই এবার যে ভাষা নিতান্ত পরদেশী হলেও ঘটনাচক্রে আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিতান্ত আপনার করবার প্রাণপাত চেষ্টা করতে হয়েছে, সেই **ইংরেজি** বিমাতৃভাষার গান ভাঙার দু-একটি নমুনা দিয়ে প্রথম অধ্যায় শেষ করছি।

কবি প্রথমজীবনে বিলাতপ্রবাসে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন, তাই তাঁর প্রথমদিককার গানে বা গীতিনাট্যে বিলেতি প্রভাব লক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। যথা, 'বাল্মীকি-প্রতিভায়' ও 'কাল-মৃগয়া'য়। "কালী কালী বল রে আজ" নামক ডাকাতদের কালী-বন্দনার সুর

একেবারে সশরীরে একটি ইংরেজি গান থেকে তোলা; সে গানটি হচ্ছে Nancy Lee, এবং তাতে একজন নাবিক তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর গুণগান করছেন।

মূল॥ Nancy Lee	ভাঙা॥ কালী কালী
মূল॥ Ye banks and braes	ভাঙা॥ ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে
মূল॥ Robin Adair	ভাঙা॥ সকলি ফুরালো
মূল॥ Go where glory	ভাঙা॥ মানা না মানিলি মরি ও কাহার বাছা; ওহে দয়াময়
মূল॥ The British Grenadiers	ভাঙা॥ তুই আয় রে কাছে আয়
মূল॥ ?	ভাঙা॥ ও দেখবি রে ভাই আয় রে ছুটে
মূল॥ Auld Lang Syne	ভাঙা॥ পুরানো সে দিনের কথা
মূল॥ Drink to me only	ভাঙা॥ কতবার ভেবেছিনু [অচলিত]

কাল-মৃগয়ার অনেক গানই ইংরেজি বা স্কচ ও আয়রিশ সুরভাঙা। Go where glory waits thee-সুরটি Tom Moore-এর *Irish Melodies*-এর অন্তর্গত। কবীন্দ্রের জীবনীকারেরা জানেন, তাঁর অল্পবয়সে তাঁদের দলে মুর-এর কবিতার এক সময় খুব চল ছিল। এই গানটির সুর আমার বড়ো মিষ্টি ও করুণ লাগে। তাঁরও নিশ্চয় তাই লেগেছিল, কারণ বাল্মীকি-প্রতিভা ও কাল-মৃগলা দুই নাট্যেই বনদেবীদের করুণভাবাত্মক দুটি গানে এই সুর দিয়েছেন। আর-একটি ধর্মসংগীতে দিয়েছেন— "ওহে দয়াময়", যা হয়তো এখনকার লোকে তত জানে না। এই সুরটি আমার তো মোটে বিদেশী লাগে না।

সূক্ষ্মভাবে ধরলে হয়তো রবীন্দ্রসংগীতে বৈতালিক প্রভাব আরো দেখানো যেতে পারে; তবে এও ঠিক যে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি তিনি খুব বেশি বিদেশিয়ানার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন নি; বরাবরই স্বদেশী ভিত্তির উপর মজ্জাগত মৌলিকতা স্থাপন করেছেন। কোনো-কোনো উত্তেজনাপূর্ণ গানে তিনি বিলেতী 'কোরাস্' বা গানের প্রত্যেক কলির শেষে একটি ধুয়া সমবেত কণ্ঠে গাবার পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, যথা "জনগণমন"-র 'জয় হে জয় হে', কিংবা "মাতৃমন্দির"-এর 'জয় জয় নরোত্তম' ইত্যাদি। কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্তও বিরল। আর-একটি বিলেতী সুরবৈশিষ্ট্য— যাকে বলে হার্মনি বা স্বরসন্ধি— সেদিকেও তিনি বিশেষ মনোনিবেশ করেন নি। যদিও তাঁর বংশের কেউ কেউ এদিকে কিছু কিছু চেষ্টা করেছেন; কিন্তু বিশেষ জ্ঞানের অভাবে সে চেষ্টা ছেলেখেলামাত্রেই পর্যবসিত হয়েছে। তিনি তাদের এ খেলায় যোগ না দিলেও তাদের নিরস্ত করবার চেষ্টা যে করেন নি, এতেই তাঁর উদারতা প্রকাশ পায়। এবং যদি এর পরে কোনোকালে কোনো যোগ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে কৃতকার্য হন তো তিনি থাকলে সর্বাগ্রে তাঁর কণ্ঠে জয়মাল্য দিতেন, এটুকু বলতে পারি।[২]

---

২ সবুজপত্র, ভাদ্র ১৩২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে পারা যায়।

মনে করেছিলুম, হিন্দি ভাষা থেকে ভাঙা গানের একটি আলাদা বিভাগ করব, কারণ হিন্দি ভাষা একাই এক-শ'। কিন্তু সেগুলি এতই সংখ্যাবহুল যে, আমি এই সংক্ষিপ্ত পরিধির মধ্যে তার অবতারণা করা সংগত মনে করলুম না। সেকালের ও মধ্যকালের রবীন্দ্রসংগীত হিন্দি থেকে এত ভাঙা হয়েছে যে, তার আলোচনা করতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। তবে আমার বক্তব্যের সম্পূর্ণতাসাধন এবং রবীন্দ্রসংগীতরসজ্ঞের কৌতূহল নিবারণার্থে পরিশিষ্টে তাঁর হিন্দি থেকে ভাঙা গানের একটি স্বতন্ত্র তালিকা যতদূর সংগ্রহ করতে পেরেছি, সংযোজন করে দেওয়া গেল; যার যেমন মনে পড়ে, যদি এই জাতীয় হিন্দি গানের আরো নাম ও কথা বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ বা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন, তাহলে তালিকাটি ক্রমশ সুসম্পূর্ণ হবার আশা করা যায়।— হিন্দী গানের প্রথম লাইন মাত্র দিলেও অনুসন্ধিৎসুর সৌকর্যার্থে তার উৎপত্তিস্থানও যথাসম্ভব নির্দেশ করে দেওয়া হল। সুরে তালে উভয়বিধ গান শোনবার সৌভাগ্য যাঁদের হবে, তাঁরা দেখবেন যে এর মধ্যেও তিনি মৌলিকতা দেখিয়েছেন।

২

আমার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় বাংলা ভাষা থেকে ভাঙা গান। সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ বাউল গানই বেশির ভাগ ভেঙেছেন। কিন্তু আমি একটিমাত্র— বাঙলায় যাকে বলে রাগসংগীত জানি, যা তাঁর সোনার কাঠির স্পর্শলাভ করবার সৌভাগ্য পেয়েছে। এটির সঙ্গেও আমার ছেলেবেলাকার স্মৃতি জড়িত, কারণ এটি বোধ হয় আমার বাইরের লোকের কাছে শেখা প্রথম গান। সে বাঙালি ভদ্রলোকটির নাম পর্যন্ত ভুলে গেছি, কিন্তু এই গানের মধ্যে তাঁর অনামী স্মৃতি রয়ে গেছে। নীচে সেটির উল্লেখ করছি—

মূল ॥ চাঁচর চিকুর আধো
ভাঙা ॥ বেঁধেছ প্রেমের পাশে

এ গানটির কথা ও সুরের বাঁধুনি ভালো। আর-একটি লক্ষ করবার বিষয় এই যে এর মধ্যেও তিনি নিজত্ব দেখিয়েছেন, অর্থাৎ দুই ভাগের মধ্যে একটি সেতু রচনা করেছেন— যা মূল সুরে ছিল না।

বাংলা গানের সুরের সম্পর্কে এখানে রামপ্রসাদী সুরের উল্লেখ না করে আমি থাকতে পারছি নে। এই একটিমাত্র সুর-রচনাতেই এমন ঐক্য, ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বের ছাপ দেওয়া যে শুনলেই রামপ্রসাদী সুর বলে দেশসুদ্ধ লোকে চিনতে পারে, এ যে রামপ্রসাদ সেনের কত বড়ো কৃতিত্ব তা বোধ হয় আমরা কখনো ভেবে দেখি নে বলেই তাঁর প্রাপ্য প্রশংসা তাঁকে দিই নে। এই খাঁটি সরল বাংলা সুরে রবীন্দ্রনাথ

অনেকগুলি গান বেঁধেছেন, যথা "আমিই শুধু রইনু বাকি" "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" "শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা" ইত্যাদি। শেষ গানটি যখন নিজে বাল্মীকি সেজে তাঁর পূর্ণ গলা ছেড়ে দিয়ে অভিনয়পূর্বক গাইতেন, তখন ভাষায় রূপে রসে যে কী অপূর্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি হত, যাঁরা না-দেখেছেন না-শুনেছেন তাঁদের শুধু শুষ্ক কথায় তা বোঝানো অসম্ভব।

বাউল সুরের চর্চা, ও বলতে গেলে তাকে জাতে তুলে নেওয়া, রবীন্দ্রসংগীতের একটি বিশেষ অঙ্গ, তা আগেই বলেছি। এ স্থলে তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত বাউল-ভাঙা সংগীতের উল্লেখ করে এ পর্ব শেষ করব—

মূল ॥ হরিনাম দিয়ে জগত মাতালে
ভাঙা ॥ যদি তোর ডাক শুনে কেউ
মূল ॥ আমি কোথায় পাব তারে
ভাঙা ॥ আমার সোনার বাংলা
মূল ॥ মন-মাঝি সামাল-সামাল
ভাঙা ॥ এবার তোর মরা গাঙে

৩

আমি এই বলে আরম্ভ করেছিলুম যে, পরের কথায় নিজের সুর দেবার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রসংগীতে বিরল হলেও, একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়।

যতদূর জানি, বিদ্যাপতির "এ ভরা বাদর" এবং গোবিন্দদাসের "সুন্দরি রাধে" এই দুটি ব্রজভাষার গানেই কেবল তিনি সুর দিয়েছেন।

অবশ্য সংস্কৃত বেদগানে এবং পালি বৌদ্ধমন্ত্রে সুর দেওয়াও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বেদগানের মধ্যে "যদেমি প্রস্ফুরন্নিব" "য আত্মদা বলদা" "শৃণ্বন্তু বিশ্বে" "তমীশ্বরাণাং" এই চারটিই এখন প্রচলিত। কিন্তু "এষাস্য প্রশাসনে গার্গি", "ধীরাত্বস্য মহিম্না" এই দুটিতেও সুর দিয়েছিলেন জানি; ব্রহ্মসংগীতে এর কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু জানিনে যোগ্যতমের উদ্বর্তনের কোনো নিয়মানুসারে এর সুরগুলি একেবারে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। কেউ যদি সেখান থেকে উদ্ধার করে দিতে পারেন ত বড়োই বাধিত হব।

পালি শ্লোকগুলি শ্রীশান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসংগীত' পুস্তকে এবং সুরগুলিও তাঁর কাছে পাওয়া যাবে।

সম্প্রতি শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধে ("রবীন্দ্রগীত-জিজ্ঞাসা", গীতবিতান বার্ষিকী, ১৩৫০) দেখলুম, রবীন্দ্রনাথের পরের কথায় সুর দেবার আরো কয়েকটি উদাহরণ আছে, যথা—

"মিলে সবে ভারত সন্তান", সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর [৩]
"বুঝতে নারি নারী কি চায়", অক্ষয়কুমার বড়াল
"গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে", সুকুমার রায়

আর-একটি পরস্ব গানে তিনি আংশিকভাবে সুর বসিয়েছেন, যেটি একাই একশো'; সেটি হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বনামধন্য সর্বজনমান্য "বন্দে মাতরম্" গান। সেইটি গাইয়ে আমি আজকের আসর ভঙ্গ করব। শুধু তাই নয়, আপনাদের সেই সুর ধরিয়ে দেব যার রেশ কানের ভিতর দিয়ে মরমে নিয়ে আপনারা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই মহীয়ান মন্ত্র উচ্চারণ করতে সমর্থ হবেন, যার বলে স্বাধীনতার সিংহদ্বার অনায়াসে উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে। এখনো যেন বিশ্বাস হয় না যে আমাদের সেই স্বপ্নরাজ্য বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে, সেই স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হয়েছে। কিন্তু যদি হয়ে থাকে তো এই গান তাতে অনেক পরিমাণে সহায়তা করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। *

১৩৫৬ মাঘ

৩ প্রবন্ধলেখক 'শতগান' থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তবে এটির সুর রবীন্দ্রনাথের দেওয়া কি না তাতে আমার সন্দেহ আছে। এ বিষয়ে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (১৩২৬) গ্রন্থ থেকে এই কয় ছত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

"সত্যেন্দ্রনাথের গাও ভারতের জয়... হিন্দু মেলার সময়ে বিষ্ণুবাবু এই গানটিতে একটা চলিত খাম্বাজ সুর বসাইয়া দিয়াছিলেন— সে সুরে যেন তেমন জোর ছিল না। পরে গ্রেট্ ন্যাশন্যাল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ গানটির বেশ একটা জোরাল' সুর দিয়াছিলেন, সেই সুরেই ইহা এখনো গীত হয়।"— পৃ. ১৪২

* শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পরলোকযাত্রাবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রসপ্তাহে বক্তৃতার সারমর্ম।

নিধুবাবু ও বাংলার টপ্পা

রাজ্যেশ্বর মিত্র

বাঙালির স্বভাবে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে ভারতীয় সমাজে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে। এই বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য তার সংগীত-সংস্কৃতিতেও বর্তমান। বাংলার সংগীত এবং উত্তর ভারতীয় সংগীত— এই দুইয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে অথচ দুইয়ের মধ্যে এক সুনিবিড় যোগসূত্রও বর্তমান। এই পার্থক্য কোথায়? একটি সামাজিক এবং মানবিক, অপরটি কৌশলী শিল্পবৈজ্ঞানিক। এই যে সামাজিক এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, এইটিই হল বাংলা গানের মূলকথা। দরবারি গানের চর্চা বাংলায় হয়েছিল কিন্তু বাঙালির কৃতিত্ব সেখানে নয়; বাংলার সংগীতকলা সেখানেই সার্থকতা অর্জন করেছে যেখানে সংগীত উচ্চ ভাবলোক বা আয়াসসাধ্য রূপবন্ধ ছেড়ে নিজের জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত অনুভূতিকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই কারণেই বাংলার লোকসংগীত এত মধুর, এবং কীর্তনের আখরগুলি এইজন্য আমাদের অন্তরকে এত স্পর্শ করে। বাংলার কাব্যসংগীত যখন গড়ে উঠতে লাগল তখনো তাতে রাগসংগীতের প্রয়োগ হলেও তার কাব্যসুষমা অক্ষুণ্ণ রইল। আমাদের মনোভাব এবং অনুভূতিকে রাগ-সংগীতের স্পর্শে রূপায়িত করা হল কিন্তু নানা 'কর্তব্' খাটিয়ে তাকে একটা উচ্চশ্রেণীর সংগীতে পরিণত করবার প্রয়াস বিশেষ প্রাধান্যলাভ করে নি। এরকম চেষ্টা যে একেবারে হয় নি তা নয়, কিন্তু তেমন সমর্থন পায় নি। নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত)-র টপ্পার মূল বৈশিষ্ট্য বোলতান সাপট্‌তান বা জমজমায় নয়, ছোটো ছোটো বিস্তারে এবং আন্দোলিত তানে। পুরোনো বাংলাগানের সংগঠন লক্ষ্য করলেই দেখা যায় খুব একটা ওস্তাদির অবকাশ তাতে নেই কিন্তু ছোটোখাটো বিস্তার এবং তানপ্রয়োগের অবসর আছে। এতে খুশি না হয়ে অনেকে নানারকম কৌশল বিস্তার খাটিয়ে টপখেয়ালের অবতারণা করেছিলেন বটে কিন্তু তাতে অনেক ক্ষেত্রেই কাব্য এবং সংগীত এই দুই বস্তুরই অঙ্গহানি ঘটেছে। নিধুবাবুর রচনার সবচেয়ে বড়ো কথা হল একটি মানবিক আবেদন— শুধু কাব্যের ক্ষেত্রে নয় সংগীতের ক্ষেত্রেও ফুটে উঠেছে এবং এই আবেদন যাতে মর্মে পৌঁছয় সেজন্য তিনি টপ্পার তানকে দ্রুত করেন নি, তাকে ধীর আন্দোলিত রূপে প্রকাশ করেছেন। উত্তর ভারতে যে টপ্পার তান প্রচলিত তার রূপ আর নিধুবাবুর টপ্পার তানের আকৃতি এক নয়। একটি দ্রুত তানকর্তবের সমষ্টি, অপরটি সমীরণে ঈষৎ আন্দোলিত ঢেউয়ের মতো দুলে দুলে চলেছে, আর আমাদের হৃদয়তটে এসে আছড়ে পড়ছে। শোরির টপ্পার দ্রুত তানে একটি কারুণ্য

আছে, তানহিল্লোলে সেই কারুণ্য প্রকাশ পায়। বিখ্যাত টপ্পা "ও মিঞা বে জানেওয়ালে" গানটিতে হিন্দিচালে দ্রুত তানে চমৎকার রসসৃষ্টি করবার সুযোগ আছে। এ গানটি গাইবার সময় বাংলা টপ্পার চাল আমাদের মনে আসে না। কিন্তু এরই ছকে ফেলা গান "যে যাতনা যতনে" যখন গাইতে বসি তখন আপনা থেকেই আসে নিধুবাবুর প্রবর্তিত সেই করুণ মিঠে ধীর দুলকিচালের তান। এ গানটি শ্রীধর কথকের রচনা। নিধুবাবুর রচনা বলে চিরপ্রসিদ্ধ "তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে" এই গানটির সুর শুনলে এই ধীর আন্দোলিত তানের বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে বোঝা যাবে।

তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে
আকাশের পূর্ণশশী সেও কাঁদে কলঙ্কছলে।

এ ক্ষেত্রে "কলঙ্কছলে"র পরে টপ্পার যে তান দেওয়া হয় তা যদি দ্রুত করা যায় তাহলে ওস্তাদি হয়তো প্রকাশ পায় কিন্তু পূর্ণশশীর পরিতাপ প্রকাশ পায় না। কাব্যসংগীতে নিধুবাবুর অসামান্য প্রতিভার বিকাশ এইরকম ক্ষেত্রেই ঘটেছে। নিধুবাবু রাগসংগীতকে অবলম্বন করেছিলেন এবং তিনি নিজে ছিলেন ওস্তাদ মানুষ কিন্তু সংগীতের প্রকৃত মর্ম যে কাব্যের আবেদনে, নিছক ওস্তাদিতে নয়, এটা তিনি সেই যুগে বুঝেছিলেন যে যুগে এক দিকে ছিলেন হিন্দিগানের দুর্ধর্ষ ওস্তাদবর্গ আর অপর দিকে কবিগান আর খেউড়-গায়করা। নিধুবাবু সে যুগের সংগীতে মধ্যপথ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি গুরুগম্ভীর ধ্রুপদী রীতির প্রয়োগ করেন নি, আবার হালকা চালকেও গ্রহণ করেন নি, অথচ লোকের রুচি অনুসারে গান লিখেছেন। কি সাহিত্য কি সংগীত, এই দুই ক্ষেত্রেই সাধারণের রুচিকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কথা যেটা সবাই পারেন না। সাধারণের রুচি বলতে অনেকে নিম্নরুচি বোঝেন; কিন্তু এই ধারণা ভ্রমাত্মক। সাধারণের মধ্যেই অসাধারণ রয়েছে— যে শিল্পী এটি প্রত্যক্ষ করতে পারেন তিনিই সাধারণকে অসাধারণ প্রত্যক্ষ করাতে পারেন। নিধুবাবু পেরেছিলেন— তাঁর সেই অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তাঁর পরে আর-একজন এইরকম অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তিনি শ্রীধর কথক। বাংলা টপ্পার সবচেয়ে পরিমার্জিত রূপ শ্রীধরের রচনায় পাওয়া যায়।

সংগীতে মানবিক আবেদন সবচেয়ে বড়ো বলে নিধুবাবু রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার আবরণে নিজের বক্তব্যকে ঢাকেন নি অথচ প্রবহমান প্রণয়সংগীতের মূলরসটি তাঁর সংগীতে ছিল। গায়কী রীতিও তিনি সেইভাবে সংস্কৃত করে নিয়েছিলেন যাতে গানের চাল হালকা না হয় অথচ বক্তব্য সুপরিস্ফুট হয়। প্রয়োগশিল্পের এই সংযোগে যে রূপ সৃষ্ট হল তা একান্ত পরিচিত অথচ নতুন। নিধুবাবুর স্বকীয়তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই সৃষ্টিকর্মে। এই প্রভাবে পরবর্তীকালের বহু রচনা গৌরবান্বিত হয়েছে, এমন-কি পাঁচালি-কথকতাও। পাঁচালিতে ব্যবহৃত অনেক গানের সুর টপ্পার মাধ্যমে নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই-সব রচনায় লোক-সংগীতের একটি বৈশিষ্ট্য আছে অথচ টপ্পার

স্পর্শে এগুলি কাব্যসংগীতের লালিত্যে মনোরম রূপ ধারণ করেছে। এমন একাধিক গান দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে মেলে।

টপ্পার প্রভাবে ভদ্রসমাজে পরিত্যক্ত "খেমটা" চালের গানও মার্জিত এবং সুললিত হয়ে উঠেছিল। বস্তুত "আড়-খেমটা" গানের অশ্লীলত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে একটা ভীতি আছে তা অনেক পরিমাণে অমূলক। খেমটা চালের গান মাত্রই যে অশ্লীল এমন নয়। আড়-খেমটার ঢঙে কয়েকটি বিশেষ মনোভাবকে প্রকাশ করা যায় যা হয়তো আর-কোনো ঢঙে সম্ভব নয়। এই ঢঙে এক দিকে মনের প্রফুল্লতা, চাপল্য, অপর দিকে কারুণ্যও প্রকাশ পায়। সবচেয়ে বড়ো কথা এর নাটকীয় আবেদন। আর নাটকীয় আবেদন মানেই মানবিক অনুভূতির প্রকাশ। খেমটা ধরনের গানগুলির সার্থকতাও এইখানেই। এই-সব গানের সুরে আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটে নি সত্য কিন্তু মানবিক হৃদয়াবেগের প্রকাশ ঘটেছে। যা সাধারণের চেতনার ঊর্ধ্বে তাকে অনুভব করাবার চেষ্টা হয়তো মহৎ কিন্তু যা আমাদের প্রাত্যহিক ভাবধারার মধ্যে লুকিয়ে আছে অথচ যা আমাদের জানান দেয় না, আমাদের অন্তরে ছোট্ট একটুকরো সুরের আঘাতে যদি তার পরিচয় প্রকাশ হয় তবে তার মূল্য বড়ো কম নয়।

ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার
চারদিকে মালঞ্চ বেড়া
ভ্রমরেতে গুন গুন করে
কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া।
ভ্রমরা ভ্রমরী সনে
আনন্দিত কুসুমবনে
আমার ঐ ফুলবাগানে
তিলেক নাই বসন্ত ছাড়া।

গানটি গোপাল উড়ের যাত্রায় ছিল। খাঁটি আড়-খেমটা চালের গান। এক সময় এ গানের খুব আদর ছিল, এখন অবশ্য কালধর্মে একেবারেই বিস্মৃত। এমনি পড়ে গেলে এ গানে আর কি বৈশিষ্ট্য আছে? কিন্তু কালাংড়া সুরে আড়-খেমটায় এ গান শুনলে মালঞ্চের আনন্দচঞ্চল রূপ ভেসে উঠবে— ভ্রমরের গুঞ্জরণ শ্রোতার কানে এবং প্রাণে পুলকের সাড়া জাগিয়ে তুলবে। এই-সব গান ছোটো ছোটো টপ্পার স্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে। বস্তুত গত শতাব্দীতে বাংলার সংগীতে সাধারণভাবে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করেছে টপ্পা। শ্যামাসংগীত, আগমনী বিবিধ ভক্তিরসাত্মক সংগীতও টপ্পার রসে অভিষিক্ত। বাংলা গানের ধারা পর্যালোচনা করলে এইটাই মনে হয় যে বাঙালিরা একটা ধরাবাঁধা পথে কোনো নির্দিষ্ট গম্ভীর রীতি অনুসরণ করার চেয়ে আবেগপ্রধান প্রাণশক্তিতে উচ্ছল সংগীতকেই অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনধারার যোগ নেই এমন উচ্চ ভাবলোকে অবস্থিত সংগীতকে প্রাধান্য দিলেও আপনার করে নেন নি। এই কারণেই প্রাচীন অতিবিলম্বিত রীতির

কীর্তন ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেল এবং সে জায়গায় সহজ সরল ছন্দবেগে হিল্লোলিত যে কীর্তন তাকে বরণ করা হল। এই একই কারণে জয়দেবের কোমলকান্তপদাবলী বাঙালির এত প্রিয় যে, এই রীতিতে গান রচনা জয়দেবের পরে শত শত বৎসর ধরে চলে এসেছে। এই মনোভাবই টপ্পাকে একেবারে আপনার করে নিয়েছে।

নিধুবাবু বাঙালির চরিত্রকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছিলেন। তিনি যে সহসা খুব উঁচুদরের গান বেঁধে বাংলা গানকে সুসংস্কৃত করতে চান নি এটি তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। জাতীয় মনোভাব কি রকম সেটা তিনি জানতেন এবং জাতীয় রুচির বিকৃতি কোথায় সেটাও তিনি ঠিক ধরেছিলেন। অতএব তাঁর চেষ্টা ছিল যাতে রুচির শোধন হয় অথচ তা জাতীয় মনোভাবের পরিপন্থী না হয়। এই দুদিকে লক্ষ্য রেখে তিনি বাংলা গানের একটি সুসংস্কৃত রূপ প্রদান করলেন। এই সংগঠন-পরিকল্পনায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও বড়ো কম ছিল না। তিনি যে যুগের মানুষ সে যুগে বাঙালিকে কঠিন দুর্যোগের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল। নিধুবাবু তাঁর দীর্ঘজীবনে রাজনৈতিক এবং সামাজিক মহাবিপ্লবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং এই সমস্ত ঘটনার প্রভাব তাঁকে নিতান্ত ভাবপ্রবণ করে তোলে নি, তাই তিনি অগ্রপশ্চাৎ ভেবেই আমাদের সংগীতের সংস্কার-সাধনায় অগ্রণী হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে যাঁরা সংস্কার-সাধনে অগ্রসর হলেন তাঁরা এতটা সাবধানতা অবলম্বনে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন না এবং এইখানেই তাঁরা মস্ত ভুল করলেন যার ফলে বহু সংগীত আজ লুপ্ত হয়েছে।

গত শতাব্দীতে শিক্ষিত সমাজের অনেকে সুনীতি এবং সুরুচি প্রতিষ্ঠার প্রবল আগ্রহে অনেক সুকুমার কলাকে অবজ্ঞার চোখে দেখেছিলেন। আমাদের চরিত্রে দুর্বল দিকটা বিশেষভাবে প্রকট হবার ফলে একটা সংস্কারের আশু প্রয়োজন ছিল সত্য কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি অনাস্থার কোনো কারণ ছিল না। নবশিক্ষার প্রভাবে রুচির পরিবর্তন এমন বৈপ্লবিকভাবেই ঘটল যে পুরাতন প্রচলিত গানের কতটুকু রক্ষণীয় এবং কতখানি বর্জনীয় সেটি ভেবে দেখবার অবকাশ ঘটে নি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে উদার মনোভাব সে যুগের শিক্ষিত সমাজে জীবনকে বৃহৎ এবং ব্যাপকভাবে দেখবার সহায়তা করেছিল সে ঔদার্য সংগীতের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয় নি। মনে হয়, প্রচলিত সংগীতকে সাধারণভাবে নিতান্ত অশিক্ষিত স্তরে আরোপ করা হয়েছে যেন সংগীতনির্বিশেষে সবই খেউড়ের স্বগোত্র। এই মনোভাবের ফলেই তৎকালপ্রচলিত প্রণয়-সংগীতের একটি বৃহৎ অংশকে কলুষের পরিচায়কজ্ঞানে ভদ্রসমাজ থেকে বর্জন করা হয়। এর সঙ্গে জড়িত হয়ে বহু নিষ্কলুষ গানও দুর্নামের ভাগী হয়েছে। কালধর্মে নিধুবাবুর শ্রেষ্ঠত্বের অসামান্য স্বীকৃতিও অনাদর এবং অবহেলায় অবজ্ঞাত হয়ে রইল। নিধুবাবুর কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি তাঁর যুগের সংগীতকে অস্বীকার না করে সুসংস্কৃত করে নিয়েছিলেন এবং সাংগীতিক ঐতিহ্যকেও অবহেলা করেন নি। আর পরবর্তী যুগের অসাফল্য এইখানে যে, তাঁরা প্রবহমান সংগীত-সংস্কৃতির উপর প্রবল আঘাত হেনে তাকে ভেঙে

দিলেন কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য অথচ সুললিত সংগীতশিল্প গঠনে সক্ষম হন নি। নিধুবাবুর মতো প্রখরব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং সামাজিক পরিবর্তনে সচেতন সংগীতস্রষ্টা যদি তাঁর অব্যবহিত পরেই আর কেউ থাকতেন তবে হয়তো তিনি যুগোপযোগী মনোভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে সংগীত সৃষ্টি করতে পারতেন এবং সাংগীতিক ঐতিহ্যকেও অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতেন, কিন্তু সেই রকম অভিজ্ঞ এবং শিল্পকুশল ব্যক্তি সে যুগে আর কেউ ছিলেন না। বস্তুত গত শতাব্দীর অপরার্ধে কয়েকজন অসাধারণ সংগীতরচয়িতার উদয় না হলে আমাদের সংগীত-সংস্কৃতি বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়ত। পরবর্তী সংগীতস্রষ্টারা পূর্বের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে এবং ক্ষতি যা হবার তাও হয়ে গেছে। তবুও রক্ষণশীল একটি সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় অতীতের কিঞ্চিৎ ভগ্নাংশও আমরা পাচ্ছি। তাঁরাই কেবল এ-সব গানকে সম্পদজ্ঞানে শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে ছিলেন।

নিধুবাবুর বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতার কথা বলেছি। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জীবনের পরিচয় পেলে তাঁর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা করা যাবে। সে যুগের ঐতিহাসিক বৈচিত্র্য এবং গতির সঙ্গে মিলিয়েই তাঁকে দেখা কর্তব্য।

খৃস্টীয় ১৭৪১ (১১৪৮ বঙ্গাব্দ) অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধেরও ষোলো বছর আগে নিধুবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন কলকাতার কুমারটুলির বাসিন্দা। তাঁর পিতা বর্গীর ভয়ে ত্রিবেণীর কাছে চাঁপতা গ্রামে চলে এসেছিলেন এবং এইখানেই তাঁর জন্ম হয়। বছর ছয়েক বয়সে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং শিক্ষালাভ করেন। নিধুবাবু সংস্কৃত পারসী ছাড়া ইংরেজিও কিছু শিখেছিলেন। পরে সম্ভবত ইংরেজি পাঠাভ্যাস আরো ভালোভাবে করেন। শেষ জীবনে তিনি ইংরেজি বই পড়ে অবসর যাপন করতেন। এর থেকে এইটাই প্রমাণিত হয় যে প্রথম ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি একজন অথচ এর কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। সংস্কৃত পারসীও তিনি ভালোই জানতেন। এই ব্যাপক শিক্ষার ফলে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনও তিনি আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। রামমোহন রায় প্রবর্তিত আন্দোলনে তাঁর ঔৎসুক্য ছিল এবং সম্ভবত রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রহ্মসংগীত তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি ব্রহ্মসংগীতও রচনা করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপাল কর্তৃক ১২৭৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গীতরত্ন (তৃতীয় সংস্করণ) থেকে একটি চিত্তাকর্ষক অংশ উদ্ধৃত করছি—

ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব উপাচার্য্য ৺উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ মহোদয় একদিবস রামনিধিবাবুকে আদেশ করিলেন— "মহাশয়, একটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়া শ্রবণ করাইতে হইবে।" সেই অনুরোধে বাবু তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া এই গীত রচনা করিয়া শুনাইলেন, যথা।

বেহাগ— তাল আড়া
পরমব্রহ্ম তৎপরাৎপর পরমেশ্বর
নিরঞ্জন নিরাময় নির্বিশেষ সদাশ্রয়
আপনা আপনি হেতু বিভু বিশ্বধর

সমুদয় পঞ্চকোষ জ্ঞানাজ্ঞান যথা বাস
প্রপঞ্চ ভূতাধিকার
অন্নময় প্রাণময় মানস বিজ্ঞানময়
শেষেতে আনন্দময় প্রাপ্ত সিদ্ধ নর।

বিদ্যাবাগীশ মহোদয় এই গীত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন— "বাবু তুমি সাধু, তোমার অসাধারণ ক্ষমতাদৃষ্টে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি, কারণ এ প্রকার গীত পূর্ব্বে, কখন রচনা করেন নাই, তাহাতে হঠাৎ এমন রচনা শুনা যায় নাই, যাহা হউক এই গীত দেওয়ানজীকে অর্থাৎ রামমোহন রায় মহাশয়কে দেখাইয়া ব্রাহ্মসমাজে গান করাইব।" এই কথাবার্ত্তার পর কোনো বিশেষ রোগাক্রান্ত হইয়া এতন্মায়াময় সংসার পরিহার করত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন। একারণ অনুমান হইতেছে এ গীত সমাজের গীতে ভুক্ত হয় নাই, অপ্রকাশ রহিয়াছে।

যে যুগে বাঙালির কাছ থেকে রামমোহনকে বহু বাধাবিপত্তি এবং উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল সে যুগে নিধুবাবু কোনো সামাজিক মতবাদে শিল্পীধর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি— ব্রহ্মসংগীতের শান্ত সমাহিত রসে পরিতৃপ্তির সঙ্গে অবগাহন করেছেন। এই গানটি থেকে সংস্কৃত দর্শনসাহিত্যে তাঁর অধ্যয়নশীলতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

অতি দীর্ঘ জীবনে নিধুবাবু বাংলার এক বিরাট সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তন দেখবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁর জন্মের সময় আলিবর্দি যুদ্ধের ভিতর দিয়ে বাংলার মসনদ দখল করেছেন। তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে এল পর পর নিষ্ঠুর বর্গীর আক্রমণ। কলকাতায় ইংরেজের সঙ্গে নবাবী সৈন্যের সংঘর্ষও বোধ হয় তিনি চোখের উপর দেখেছিলেন— তখন তাঁর বয়স প্রায় পনেরো হবে। ওদিকে বাংলা সাহিত্যে তখন ভারতচন্দ্রের রাজত্ব। ভারতচন্দ্র যখন মারা যান তখন তিনি উনিশ-কুড়ি বছরের তরুণ। ভারতচন্দ্রের রচনা পড়তে পড়তে তিনি হয়তো প্রেরণা পেতেন নতুন কিছু সৃষ্টি করবার এবং হয়তো অল্প বয়স থেকেই গানও বাঁধতেন কিন্তু তাঁর বহু গান হারিয়ে গেছে। তাঁর অল্প যে কটি রচনা আমরা পাই তা থেকে কোন্‌টি কোন্ সময়কার রচনা বোঝবার উপায় নাই।

সম্ভবত টপ্পার সঙ্গে নিধুবাবুর তরুণ বয়স থেকেই পরিচয় হয়েছিল। নিধুবাবুর পূর্বে টপ্পার ধরন যে বাংলায় প্রচলিত ছিল না এমন মনে করা সংগত হবে না কিন্তু টপ্পার মধ্যে বৈচিত্র্য এবং নূতনত্ব নিধুবাবুই বিশেষভাবে প্রয়োগ করেন। টপ্পাকে যে এত ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যায় সেটা বোধ হয় তাঁর পূর্বে আর কেউ ধারণা করতে পারেন নি। বাংলা টপ্পার সাংগীতিক বিশ্লেষণ যথাযথভাবে করা হয় নি। আগেকার গ্রন্থাদিতে টপ্পার যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তার সঙ্গে বাংলা টপ্পার কিছু প্রভেদ আছে। উদাহরণ স্বরূপ বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক ১৩০৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "গীতাবলী"র দ্বিতীয় সংস্করণে টপ্পার যে বর্ণনা আছে সেইটি উদ্ধৃত করি—

টপ্পা হিন্দি শব্দ, আদি অর্থ লম্ফ, তাহা হইতেই রূঢ়ার্থ সংক্ষেপ, অর্থাৎ ধ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান সংক্ষেপতর, তাহার নাম টপ্পা। ইহার কেবল দুই তুক; আস্থায়ী ও অন্তরা। খেয়ালের প্রায় সকল তালই টপ্পায় ব্যবহৃত হয়।

এই উদ্ধৃতিটি আরো কয়েক জায়গায় দেখেছি বলেই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা গেল। টপ্পা ধ্রুপদ এবং খেয়াল থেকে সংক্ষেপতর বললে বাংলা টপ্পার তাৎপর্য বোঝা যাবে না, কেননা এমন অনেক বাংলা টপ্পা আছে যাতে উত্তম সঞ্চারী আছে। অতএব বাংলা টপ্পা যে দুই তুকে সীমাবদ্ধ এ ধারণাও ঠিক নয়। আসলে টপ্পা খেয়ালের রকমফের হলেও উত্তর ভারতীয় টপ্পার কয়েকটি শিল্পকৌশলকে অবলম্বন করেই বাংলা টপ্পা রচনা করা হয়েছে। নিছক খেয়ালিয়ার দৃষ্টিতে বাংলা টপ্পা রচনা করা হয় নি— বাংলার টপ্পা বাংলার কাব্যসংগীতের অন্তর্ভুক্ত।

যাই হোক, তরুণ বয়সে নিধুবাবু টপ্পা তথা বাংলার সংগীত সম্বন্ধে কতটা ভেবেছিলেন জানি না, তবে সংগীতচর্চার পূর্ণ অবসর হয়তো তাঁর মেলে নি, কেননা সময়টা আদৌ শান্তিপূর্ণ ছিল না। নিধুবাবুর বয়স যখন যোলো তখন পলাশীর যুদ্ধের ফলে তুমুল পরিবর্তনের মধ্যে দেশে নানা দুর্দৈব ঘটেছে। তার পরে দেখা দিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। সেই বিভীষিকাও নিধুবাবুকে দেখতে হয়েছে। তারও বছর সাতেক পরে তিনি চাকরি উপলক্ষে ছাপরায় যাত্রা করলেন। ছাপরা কালেক্টরির দেওয়ান ছিলেন তাঁর প্রতিবেশী। তাঁর চেষ্টাতেই একটি কেরানির পদ পেয়ে গেলেন। প্রায় আঠারো বছর চাকরি করেছিলেন তিনি। এর মধ্যে দেওয়ান পালটে ছিল। এঁর সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। কেউ কেউ বলেন হিসাবের খাতায় গান লেখবার জন্য সাহেবের সঙ্গে বিরোধ ঘটায় তিনি পদত্যাগ করেন, কিন্তু এ রটনা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ছাপরায় তিনি দীর্ঘকাল সংগীতসাধনার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর এক মুসলমান ওস্তাদ ছিলেন। তিনি প্রথমটা বেশ শিখিয়েছিলেন কিন্তু পরে আর কিছু দিতে চাইলেন না। অতএব নিধুবাবু নিজেই সংগীতচর্চা আরম্ভ করলেন। এই সময় থেকেই তিনি বাংলার কাব্যসংগীতকে সংগঠন করবার উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হন।

কলকাতায় যখন ফিরলেন তখন তিনি প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করেছেন। অবশিষ্ট জীবন তিনি সংগীত-চর্চাতেই অতিবাহিত করেন। প্রায় সাতানব্বই বৎসর বয়সে ১২৪৫ সালে (খৃঃ ১৮৩৮) রামনিধি গুপ্ত লোকান্তরিত হন। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে তাঁর একটি সংগীতসংগ্রহ "গীতরত্ন" নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জয়গোপাল এই গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ সম্পাদন করেন।

সুদীর্ঘ জীবনে নিধুবাবু যথেষ্ট প্রতিপত্তি এবং সম্মানলাভ করেছিলেন। তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব তাঁর সুন্দর আকৃতি এবং গম্ভীর প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ছিলেন একাধারে চিন্তাশীল এবং সার্থক প্রয়োগশিল্পী। এই প্রয়োগশিল্প চিরকালই উদার দৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তাঁর সম্পর্কে এইটিই সবচেয়ে বড়ো কথা।

১৩৬৩ *বৈশাখ*

চিত্র

কানাই সামন্ত

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥

বাৎস্যায়ন-প্রণীত কামসূত্রের টীকায় যশোধর এই শ্লোকটি প্রসঙ্গক্রমে সংকলন করেছেন, কোন্ আকরগ্রন্থ থেকে সে আমাদের জানা নেই। শিল্পী ও পথিকৃৎ অবনীন্দ্রনাথ এই শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যায়, ভারতীয় চিত্রকলা যে কী বস্তু সেটি সবিশেষ বুঝিয়েছেন। আমরাও তাঁরই অনুসরণে বিষয়টি সংক্ষেপে বুঝে নিতে পারি।

উত্তম চিত্রের তথা চিত্ররচনার ষড়ঙ্গ, অর্থাৎ ছয়টি অঙ্গ সম্পর্কে এই শ্লোকে বলা হয়েছে।

প্রথমেই নিখিল রূপরাজির ভিতর থেকে একটি বিশেষ রূপকে বেছে নেওয়ার কথা। বিশেষ ভূমিকায় বিশেষের গলায় বরমাল্য না দিলে তো আর্টের উদ্ভব হতে পারে না; চিত্র বলো, মূর্তি বলো, কবিতা বলো, কিছুই প্রত্যক্ষ ও পরিচিত হয় না। ছন্দোবিধৃত ও রসনিষ্ণাত হলে সেই বিশেষ রূপই তখনকার মতো বিশ্বরূপের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়ায়। সে আলোচনা পরে। উপস্থিত এটুকু স্মরণ করলেই হবে যে, জড়ের সঙ্গে জীবের প্রভেদ আছে, উদ্ভিদ পশু পাখি সরীসৃপ কীট পতঙ্গ মানুষ কেউ কারো মতো নয়, আর উল্লিখিত যে-কোনো শ্রেণীর মধ্যেও যে-কোনো-একটি আকারে আয়তনে— জাতি কুল লিঙ্গ বয়স ও অবস্থার গুণে— অন্য সবগুলি থেকে পৃথক। ষড়ঙ্গের, অর্থাৎ চিত্ররচনার অপেক্ষাকৃত বহিরঙ্গের, এইটিই হল প্রথম প্রণিধানের বিষয়। দেখে বুঝতে পারা চাই চিত্রিত মানুষটি নর অথবা নারী, অল্প অথবা অধিক -বয়সী, সুস্থ সবল অথবা রুগ্ন দুর্বল, কোন্ দেশের কোন্ জাতির কোন্ শ্রেণীর কিরূপ লোক— স্থূলকায় অথবা কৃশ, বামন অথবা প্রাংশু। আবার, নর বা বানর সেটিও, অবশ্য স্থির হওয়া চাই। ঘোড়া এঁকে সেটি যে ঘোড়া, গাধা নয়, অনুদ্‌গতশৃঙ্গ ভেড়াও নয়, এ তো লিখে দিলে চলবে না।

রূপভেদের প্রয়োজনে আপনি এসে পড়ে প্রমাণ, অর্থাৎ নানাবিধ মাপ-জোপ। বানর থেকে নর বিশেষ হয়েছে সুদীর্ঘ একটি অঙ্গ নেই বলেই নয়; হাত-পায়ের, মুখ-চোখের, মান-প্রমাণের আরো বহুপ্রকার পার্থক্যে। মানুষে মানুষে জাতি কুল স্বাস্থ্য ও বয়ঃক্রম -জনিত যা-কিছু ভেদ সেও পরস্পর মাপজোপের অসংখ্য ভেদ-রূপেই আমাদের চক্ষুগোচর হয়। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট প্রমাণগুলির প্রয়োগ জানলেই অভীষ্ট রূপের জাতি কুল বয়স ও অবস্থা পরিষ্কার এঁকে দেখানো যাবে।

ষড়ঙ্গকে চিত্ররচনার বহিরঙ্গ বলেছি বটে, রূপভেদ ও প্রমাণের পরেই তবু চিত্ররচনার নিগূঢ় গভীর রহস্যের দিকে, অন্তরঙ্গ তাৎপর্য ও সেটি ফুটিয়ে তোলার অপরূপ কৌশলের দিকে, শিল্পী ও রসিকের ক্রমিক আরোহণ-পর্ব সূচিত হচ্ছে।

এক নজরে ধরা পড়ে এমন তথ্যের জোগান বা বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজে চার্ট, বা পোস্টার -রচনার ষড়ঙ্গের সূচনার দুটি অঙ্গই যথেষ্ট বলা যেতে পারে। কিন্তু ছবি বলে তাকেই আদর করল না মানুষ চিরদিন। চিরদিনের আদর কাড়তে হলে চিরকাল হৃদয়ে দোলা দেয় এমন জিনিস হওয়া চাই তো। যা-কিছু খবর এবং তথ্য কোনো না কোনো প্রয়োজনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা; আজ হোক কাল হোক, প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় আর প্রয়োজনসাধক বস্তুও অনাদৃত বা বিস্মৃত হয়। ফুরোতে চায় না ভাব ও লাবণ্য -যুক্ত বস্তু। ভাব বলতেই হৃদয়ের ভাব, হৃদয়ের অভিব্যক্তি। তাই ভাব সম্পর্কে হৃদয়ের আসক্তি, অনুরাগ, বিস্ময়, যাই বলো, কিছুতে শেষ হয় না; অন্তরের ভাবকে বাইরে অভিব্যক্ত হতে দেখলে মুগ্ধ হয়ে বলে—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

এই ভাব দিয়ে দেখা হয় বলেই সহৃদয়ের কাছে সূর্যচন্দ্রতারার উদয়াস্ত পুরাতন হয় না, শিশু বা নারীর মুখ চিরসুন্দর। হর্ষ বিষাদ ভক্তি প্রীতি ভয় বিস্ময় কৌতুক বা ঘৃণা কোনো-একটি ভাব যে রূপের আধারে ভরে ওঠে তাই আমাদের নানা প্রকারে কেবলই আকর্ষণ করে এবং সহজে স্মৃতি হতে মুছে যায় না। এই ভাবই হল রসের মূল উপাদান এবং রসেই যে সর্ববিধ শিল্পের পরাকাষ্ঠা ও পরাগতি সে আমরা সকলেই জানি বা মানি।

ভাবের আধার হলে, সুন্দর বা কুৎসিত, তরুণ বা জরাগ্রস্ত, এ-সকল বিচার-বিবেচনা অবান্তর হয়ে পড়ে। স্নেহময়ী মায়ের কাছে কানা ছেলেও যে পদ্মলোচন। আর, সহৃদয় ব্যক্তি ছেলেকে দেখতে হলে মায়ের অনিমেষ চোখের দেখা দিয়েই দেখবেন। এই-যে বিশেষ দেখার বিশেষ স্বাদ— রূপে রূপে ভাবের পরিস্ফুটনে ভঙ্গির সমাবেশ শুধু নয়, মনের মাধুরী অথবা ভীত-চকিত মুগ্ধ-বিস্মিত হৃদয়ের স্পর্শ— এটিকে লাবণ্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ, ভঙ্গি দিয়ে যার গঠন সেই ভাবেরও ভাব হল লাবণ্য। 'লবণ' থেকে 'লাবণ্য' শব্দের উৎপত্তি ধরা যেতে পারে, আবার 'লব' শব্দের সঙ্গেও তার যোগ রয়েছে। অম্লমধুর কটুতিক্ত কষায় নানা স্বাদ থাকলেও, লবণ না হলে যেমন রন্ধনের সমুচিত আস্বাদন হয় না, অভাবটি স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় অথবা 'কী যেন নেই' 'কী যেন নেই' মনে হতে থাকে— চিত্ররচনায় ভাবের পরিস্ফুটনে, ভঙ্গী আছে অথচ ভাবলাবণ্য নেই সে হল অনুরূপ ঘটনা। রূপে ভাব যুক্ত হল; অতঃপর লেশমাত্র, লব-পরিমাণ, লাবণ্য দিতে পারলেই বাহ্যতঃ অসুন্দর রূপেও সৌন্দর্য পূরা হয়ে উঠবে। 'লাবণ্য' শব্দের ব্যাখ্যায় রূপগোস্বামিপাদ বলেছেন : মুক্তাফলেষুচ্ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা প্রতিভাতি যদঙ্গেষু। নিটোল মুক্তাটির রূপের ধারণা বা বর্ণনা সহজেই করা যেতে

পারে, কিন্তু তার ঢলঢল সর্বাঙ্গে যে তরলিত আভা সেটির বর্ণনা হয় না; চিত্রকর কী কৌশলে সেটি আপনার পটে ফুটিয়ে তুলবেন সেও বলা কঠিন। কিন্তু, শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে ঘনীভূত উজ্জ্বলরসের উজ্জ্বলতা ফুটবে না সেই লাবণ্য না হলে। তেমনি অন্যান্য ভাব ও রস সম্পর্কেও। কায়া নয়, কান্তি— রূপের মুকুর থেকে ঠিকরে-পড়া হৃদয়াভাবের দ্যুতি এই লাবণ্য।

ষড়ঙ্গতত্ত্বের প্রথম পদক্ষেপেই যথাযথ প্রমাণ-সহ রূপভেদ, দ্বিতীয়ে ভাবলাবণ্যযোজনা, আর তৃতীয়ে পুনরাবর্তন— কোথায়? সাদৃশ্যতত্ত্বে। সাদৃশ্য বলতে শুধু বুঝি নে গোরুর মতো গোরু অথবা মানুষের মতো মানুষ, যদু-মধুর বাহ্য অবয়বের যথাযথ নকল করে যদু-মধুর প্রতিচ্ছবিমাত্র। কারণ, যথোচিত মান-পরিমাণ-সহ রূপভেদ যখনি নিষ্পন্ন হল তখনি তো ছবিতে প্রতিচ্ছবির যতটা প্রয়োজন তা পাওয়া গিয়েছে। একই বিষয়ের পুনঃপুনঃ উল্লেখ অনাবশ্যক ও অনুচিত, বিশেষতঃ সূত্ররচনায় বা তত্ত্ববিচারে। সাদৃশ্য বলতে সারূপ্য ব্যতীত মনে ওঠে তুলনা বা উপমার কথা। সকল যুগের সকল কবিকৃতিতে এই তুলনার বা উপমার ভূয়িষ্ঠ প্রয়োগ দেখা যায়। কাব্যালংকারের মধ্যে এইটিই অতুলনীয় বলা যেতে পারে। এবং স্থূল, সূক্ষ্ম— রূপের, তেমনি ভাবের— নানাবিধ উপমা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কাব্যশরীরের বিভূষণ এটি শুধু নয়, সে অর্থে অলংকারও সব সময়ে নয়। অবশ্য, প্রধানত চোখের দেখায় সহজপ্রতীয়মান তুলনা যা দেওয়া যেতে পারে, কেবল কাব্যে নয়, শিল্পেও তার ব্যবহার ও উপযোগিতা প্রচুর— আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল লিখে ও এঁকে ভালোভাবে তা বুঝিয়েছেন[১] ভারতীয় চিত্র ও মূর্তির পরম্পরাগত আদর্শে। তাতে দেখা যাবে, সিংহকটি বা বক্ষকবাট এগুলি উপর থেকে চাপানো কতকগুলি বাঁধা ধারা-ধরন নয়, মন-গড়া আকার হলেও বাস্তববিরুদ্ধ নয় এবং ভাবপ্রকাশের উপযোগীও বটে। পদ্মপলাশনেত্রে নয়নবিশেষের সীমাঙ্কন শুধু নয়, গড়নও সুন্দরভাবে সূচিত হচ্ছে। আবার হরিণের সঙ্গে, খঞ্জনের সঙ্গে সাদৃশ্য যে নিছক রীতির অনুরোধে হতে হবে এমনও নয়— কারণ, আকৃতি ও প্রকৃতি দু দিক দিয়েই কোনো সুন্দরীর চকিত-চঞ্চল নয়ন দুটি হরিণের মতো বা খঞ্জনের মতো হওয়া অসম্ভব নয়। তা হলেও, কাব্যে উপমালংকারের বা চিত্রে সাদৃশ্য-প্রয়োগের এ-সবই হল বাহিরের কথা।

অতিপুরাতন একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিশেষকে নানাভাবে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া, নন্দিত হৃদয়ের পুলক ও বিস্ময়কে সেইভাবে ব্যক্ত এবং জাগ্রত করা, উপমাপ্রয়োগের এই হল নিঃসীম সার্থকতা। কেন-না—

বিরলে বসিয়ে চাঁদের মুখ নিরখি

এ কথায় আকারের সাদৃশ্য সূচিত হচ্ছে অল্পই; চাঁদের মতো কিংবা ততোধিক শোভাময়, ঘর-বার-আলো-করা, প্রীতিপ্রদ তাঁর বাছনির মুখ এই কথাই মা বলতে

---

১ বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' গ্রন্থমালায় : ভারতশিল্পে মূর্তি : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চেয়েছেন। আর, 'ধনকে নিয়ে' বিরল বনে যদি-বা যান, তা হলেও তাঁর কোলের সন্তানের যোগে তিনি যে আভূমিআকাশ যেখানে যা-কিছু সুন্দর ও মধুর আছে তার সঙ্গে যুক্ত রইলেন সেও ভালোভাবেই বলা হয়েছে। প্রেয়সীর—

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল

অথবা প্রিয়তমের রূপ—

দেখিবারে আঁখিপাখি ধায়

এ শুধু কথার কথা নয়, সাদৃশ্য বা উপমা সে অর্থে নয়। এক রূপের সঙ্গে অন্যান্য রূপের, এক গতিপ্রকৃতির সঙ্গে অন্য গতিপ্রকৃতির সংযোগসাধন; সেই উপায়ে রস ও রহস্যের সৃজন; ভেদ থেকে শুরু করে নিখিলের যত্রতত্র ঐক্যে ও আত্মীয়তায় উত্তরণ।

ভেদের মধ্যে অভেদের উপলব্ধি, অনন্তবৈচিত্র্যের মধ্যে অনুস্যূত ঐক্যের জ্ঞান, এ যেমন দর্শনবিজ্ঞানের সারমর্ম, তেমনি রূপসৃষ্টির অন্যতম মূল প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, রূপভেদের পর রূপসাদৃশ্যের সন্ধান এই হিসাবেই সার্থক ও সংগত। বিশেষকে বিশ্বের ছন্দে মিলিয়ে দেওয়ার পক্ষে তার উপযোগিতা রয়েছে প্রচুর।

ষড়ঙ্গের সর্বশেষ সাধন হল বর্ণিকাভঙ্গ। আসলে এটি দুই, এক নয়। বর্ণবিলেপন করে যে তুলি তাকেই বর্ণিকা বলা হয়েছে। যেমন তুলি না হলে বর্ণ তেমনি বর্ণ না হলে তুলি নিষ্ফল। অতএব বর্ণিকাভঙ্গে বর্ণের রুচি আর তুলিচালনার বৈশিষ্ট্য, চিত্রকরের এই দ্বিবিধ কৃতি ও নৈপুণ্যই লক্ষ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, কোনো চীনা সমঝদার কালি তুলি ও রঙ সম্পর্কে যা বলেছেন[২] সংকলন করতে চাই—

Ink applied meaninglessly to silk in a monotonous manner is called dead ink : that appearing distinctly in proper chiaroscuro is called living ink.

অর্থাৎ, রেশমী পটে নিরর্থকভাবে পর্দা-দীন যে কালি বুলোনো হয় তা প্রাণহীন, সজীব কালি হল তাই যা মনোমতো[৩] ধূপছায়াপর্যায়ের দ্যোতক ও পরিস্ফুট।

কালির সম্পর্কে যা বলা হল প্রকারান্তরে রঙ সম্পর্কে তা খুবই সত্য। ছবিতে বহু বর্ণের সমাবেশ হলেই হবে না, বর্ণের বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বলের বিচিত্র পর্দায় পরিষ্কার সংগীত বেজে ওঠা চাই। কেন-না—

Colouring in a true pictorial sense, does not mean a mere application of variegated pigments. The natural aspect of an object can be beautifully conveyed by ink-colour only, if one knows how to produce the required shades.

---

২ Chapter XI, *The Flight of the Dragon* by Laurence Binyon in Wisdom of the East Series.

৩ এ ক্ষেত্রে চোখে দেখার অনুকরণে আলো-ছায়ার বা উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বলের বিন্যাস নয়। গাঢ় থেকে গাঢ়তর, গাঢ়তম এবং ফিকে থেকে ক্রমশই আরো ফিকে— কালির বিচিত্র পর্দার সমাবেশে কালিমার একটি স্পৃহনীয় প্যাটার্ন বা নক্সার রচনা— এইমাত্র লক্ষ্য।

অর্থাৎ, ছবিতে বহুবিধ রঙ ব্যবহার করলেই সার্থক বর্ণবিলেপন হল না। কেবল কালির রঙেই যে-কোনো বস্তু সুন্দরভাবে ফুটে উঠতে পারে যদি জানা থাকে কোথায় কোন্ পর্দার ব্যবহার হবে। পরে আরো বলা হয়েছে—

In ink-sketches the brush is captain and the ink is lieutenant, but in coloured painting colours are the master and the brush is the servant. In other words, ink complements, but colours supplement, the work of the brush.

অর্থাৎ, কালি-তুলির কাজে তুলিকারই প্রাধান্য, কালি তার সহায়। রঙের কাজে রঙগুলি মনিবিআনা করে, তুলি থাকে তাদের অধীনে। অন্যভাবে বলতে গেলে, তুলির কাজের অনুগত থাকে কালি, রঙ তাকে ছাপিয়ে যায়।

কথাটা সর্বৈব মিথ্যা নয়। তুলিকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন বলেই সেরা সেরা চীনা শিল্পীদের ঝোঁক বেশি কালি-তুলির কাজে। তাঁরা জানেন কাগজে, কাপড়ে, রেশমের পটে, নিরঞ্জন শুভ্রতার বুকে, কালো কালিতেই রামধনুর সব কটি রঙ, তথা প্রভাত সন্ধ্যা দুপুর আর বর্ষা শরৎ শীত বসন্তের সকল রূপরাগ দেখাতে পারেন মায়াবী চিত্রকর। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'কালি তখন আর কালি থাকে না, যদি মন তাহাকে রাঙায় আপনার বর্ণে'।

বর্ণসংগীতির দ্বারা বিবিধ ভাবের বিচিত্র ব্যঞ্জনা দেওয়া যায়, সে কথা অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকৃতি-প্রসঙ্গে অন্যত্র আমরা আলোচনা করেছি। উপস্থিত বর্ণের বদলে বর্ণিকার কথাই আর-একটু বিশদভাবে বলা দরকার। চীনা চিত্রকর ও চিত্রজ্ঞগণ এ বিষয়ে বহু আলোচনা করেছেন; সব আমাদের জানাও নেই এ পর্যন্ত জানি, ও দেশে উৎকৃষ্ট লেখাঙ্কনে আর উৎকৃষ্ট চিত্রে কোনো তফাত করা হয় না। এ কথা ঠিকই— লেখাঙ্কনে আসল যেটি দেখবার জিনিস সে হল তুলির টান এবং তারই বশে কালির স্বচ্ছন্দ প্রবাহ ও পর্দা। সাবলীল তুলির প্রত্যেক টানে শুধু যে বিস্ময়কর সৌন্দর্য আছে তা নয়, আছে লেখকের চরিত্রের দ্যোতনা, ব্যক্তিসত্তার সুনিশ্চিত ছাপ। সেই তুলিচালনায় কখনো আছে শাণিত তরবারির বিদ্যুচ্চকিত গতি, কখনো-বা শ্যামায়মান বনান্ধকারে কামিনীফুলদলের নিঃশব্দ ঝরে পড়া, কখনো আবার শরৎপূর্ণিমায় নিস্তরঙ্গ তড়াগের বুকে দূরের সুরলহরীর অতিলঘু স্পর্শ। সকল কবিত্ব বাদ দিলেও এ কথা সত্যই, লেখাঙ্কনে, তুলির টানে টানে যতটা প্রকাশ করেন আপনাকে লেখক বা শিল্পী, প্রকাশ হয় তাঁর স্থায়ী চরিত্র এবং বিশেষ সময়ের বিশেষ মেজাজ, তন্ময়তা বা তারই এতটুকু অভাব ও অসংগতি অন্য কোনো উপায়েই তা হতে পারে না। অর্থাৎ, পাশ্চাত্য মতের স্টাইল, যেটি হল ব্যক্তিসত্তার অলিখিত অথচ সুস্পষ্ট স্বাক্ষর, সেটি আছে তুলির ভঙ্গিতেই।[৪] বর্ণিকাভঙ্গের সেটি হল বিশেষ কথা তেমনি ষড়ঙ্গেরও সারকথা বা শেষকথা। লেখাঙ্কন বা কালিতুলির আলেখ্যে শুধু নয়— আসলে, তুলি ধ'রে আঁকা

৪ বলা হয়তো বাহুল্য, চীনে বা জাপানে এক তুলিতেই লেখা ও আঁকা দু কাজ হয়ে থাকে।

যাবতীয় শিল্পসৃষ্টিতে। প্রচলিত-ব্যবহার-অনুযায়ী ছবি আঁকার পর ছবিতে স্বাক্ষর লেখার প্রয়োজন হয়ে থাকে; নইলে সে ছবির মূল্য বা মর্যাদা নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু, ছবির কোনো এক কোণে, এমন-কি পাঁচ জায়গায়, বানান করে নাম লেখার চেয়ে ছবির সর্বত্রই অলিখিত লেখার স্বাক্ষর রাখা বহুগুণে চমৎকারজনক ও শ্রেয়স্কর, সেও কি বলতে হবে? শিল্পী এবং সমঝদারগণের না জানা তো নয়— আঙ্গিকের যোগে অথচ অজ্ঞাতভাবে বিষয় এবং বিষয়ীর অবিভাজ্য মিলন, তারই অন্য নাম 'সার্থক

দেখা গেল ষড়ঙ্গের সব-কটি অঙ্গই অতি প্রয়োজনীয়, তাদের অর্থও অতিশয় প্রাঞ্জল। অথচ শিল্পীকে ও রসিককে বলতেই হবে : এহ হয়, আগে কহো আর। অদ্ভুত অন্তরদৃষ্টির অধিকারী অবনীন্দ্রনাথও এ কথা বুঝেছিলেন। তাই এই বিচ্ছিন্ন শ্লোকটি ছাড়া, তাঁর প্রবন্ধ-রচনার সময়ে, ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্ক অন্য তেমন কোনো গূঢ়ার্থদ্যোতক বচন না পেয়ে, যে বিশ্বাস ও উপলব্ধি তাঁর অন্তরে ছিল, সকল কালের সকল রসিকের অন্তরেই আছে, এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় সে প্রসঙ্গও যোগ করতে বাধ্য হয়েছেন— সে হল ছন্দ এবং রসের প্রসঙ্গ।[৫] অথচ ছন্দ এবং রসের কথা এ শ্লোকে একেবারেই নেই। থাকবার হলে অতিশয় স্পষ্টভাবেই থাকত না কি? কেন-না, যে-কোনো শিল্পসৃষ্টিতে রস ও ছন্দের অস্তিত্ব এবং মর্যাদা-যে কোনো প্রকারেই গৌণ বা অপ্রধান এমন তো বলা যায় না।

রস বা ছন্দের উল্লেখ এ শ্লোকে নেই। কারণ, আসলে এটি চিত্রের অথবা চিত্রণকর্মের ছয়টি অঙ্গের অথবা অঙ্গে-অঙ্গে-লীন লক্ষণেরই বিবরণ— তার প্রাণধর্মের বা আত্মস্বরূপের নির্দেশ নয়। সে প্রসঙ্গ যথাবিধি ও যথাক্রমে নিশ্চয়ই অন্য কোনো শ্লোকে বা শ্লোকরাজিতে নিবদ্ধ ছিল, আজ অবলুপ্ত। উপায়ে উদ্দেশ্যে উপাদানে উপকরণে একশা করে দেখবার কোনো কারণ ছিল না। যা হোক, কামসূত্রের 'জয় মঙ্গল' টীকায় উদ্ধৃত এই শ্লোকের বিচ্ছিন্নতা ও তজ্জনিত 'অপূর্ণতা' অপ্রত্যাশিতভাবে দূর করছে অন্য শাস্ত্রের অন্য দু-চারটি শ্লোক। তন্মধ্যে, বক্তব্যে ও অর্থব্যঞ্জনায় যে শ্লোকটি অতুলনীয়, পৃথগ্‌ভাবে তারই আলোচনা সেরে নিতে চাই আগে। শ্লোকটি[৬] হল—

৫ দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী-প্রকাশিত : ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬ বিষ্ণুধর্মোত্তর উপপুরাণে তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক। ১৯১২ খৃস্টাব্দের ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস -কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের পাঠ বা অপপাঠ-অনুযায়ী, এ শ্লোকের সব্যাখ্যা ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ভারতশিল্পতত্ত্ববিদুষী শ্রীমতী স্টেলা ক্রাম্‌রিশ। দ্বিতীয় ছত্রের ইংরেজি এই—

Hence no work of (this) earth, (oh) king should be done even with the help of these two, (for something more has to be done.)

অর্থ বোঝা যায় না, বিশেষতঃ প্রসঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে। এজন্য দায়ী পূর্বলব্ধ পাঠ : জগতো ন ক্রিয়া কার্যা দ্বয়োরপি যতো নৃপ। (নু স্থলে ন, আর কিছুই নয়।) স্থান কাল ও প্রসঙ্গের

বিনা তু নৃত্যশাস্ত্রেণ চিত্রসূত্রং সুদুর্বিদম্।
জগতোঽনুক্রিয়া কার্যা দ্বয়োরপি যতো নৃপ॥

নৃত্যশাস্ত্র সহায় না হলে চিত্রসূত্র অতিশয় দুর্জ্ঞেয়, যেহেতু উভয়েরই কার্য বা করণীয় হল জগতের অনুক্রিয়া।

এই শ্লোকের প্রায় প্রত্যেক শব্দটি বিশেষ-তাৎপর্য-বাহী, কাজেই সার্থক। চিত্রের বিবিধ অঙ্গ অথবা বিচিত্র লক্ষণ এ শ্লোকের লক্ষ্য নয়। চিত্রের কার্য, অতএব তার স্বভাব বা প্রকৃতি হল এ ক্ষেত্রে একমাত্র বিচার্য বিষয়। কী কার্য নৃত্যের অথবা চিত্রের? জগতের অনুক্রিয়া। বিশ্ব-আকৃতির অনুকৃতি নয়। তা যদি হত তা হলে ক্রিয়া অনুক্রিয়া অথবা জগৎ শব্দ একেবারেই অর্থহীন হত।

জগৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ হল যা গতিশীল, জঙ্গম, যা প্রতিনিয়তই চলছে। চিত্রকর্মে ও তার গূঢ়ার্থবিচারে বিশ্বভুবনের আকৃতিসমূহ চোখে দেখার চেয়ে তার আসল প্রকৃতিটি মনে ধারণা করাই প্রথম এবং পরম প্রয়োজনীয়। বহিঃপ্রতীয়মান আকৃতিতেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলে অনুকরণের কথা উঠত, আর্ট্ যে কোনো-না-কোনোভাবে চোখে-দেখা রূপেরই অনুরূপ এই ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ থাকত। কিন্তু অতিপ্রাচীন ঋষি আর অতি আধুনিক বিজ্ঞানী উভয়েই জানেন— অস্থিরকে স্থির বলে ধারণা করা মিছে। চিরচলিষ্ণু জেনেই তার সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করতে হবে চিরপরিবর্তমান চলার ছন্দে, ক্রিয়ার ছন্দে। বিজ্ঞানের ভাষা আমাদের তেমন পরিচিত নয়, তার সামগ্রিক তত্ত্ব তেমন বিস্তারপূর্বক ব্যাখ্যা করা যাবে না— প্রয়োজনও অবশ্য নেই। মোটের উপর মিল আছে জানি নবীনে এবং প্রাচীনে। প্রাচীন, বিষ্ণুধর্মোত্তর উপপুরাণের যিনি বক্তা বা সংকলনকর্তা তাঁর থেকে বহুগুণে প্রাচীন, ঋষি বলেছেন—

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।[৭]

বিশ্বের সমস্ত কিছুই প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে সর্বদা প্রাণেই গতিমান রয়েছে। জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই প্রাণ হল energy প্রৈতি[৮], নিয়তকম্পন, নিয়তগতি। 'যদিদং

বিচারে কিছু অর্থ একান্তই যদি আদায় করতে হয় তবে এই ভাষান্তর হয়তো হতেও পারে : যেহেতু, হে নৃপ, জগতের ক্রিয়া (যথাযথ) করণীয় (অর্থাৎ, অনুকরণীয়) নয় (নৃত্য এবং চিত্র) উভয়েরই। তা হলে, বিধি হিসাবে যা বলবার বিষয় সেটা অন্তত ঘুরিয়ে নিষেধের ছলেও বলা হয়। কিন্তু, বর্তমান ক্ষেত্রে নিষেধের চেয়ে বিধিরই বিশেষ উপযোগিতা। এজন্য পূর্বপাঠকে আমরা লিপিকারপ্রমাদ বলেই গণ্য করছি। ১৯১২ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত উল্লিখিত গ্রন্থে লিপিপ্রমাদের অপ্রতুলতা নেই; বহু স্থলে যা অর্থহীন মনে হয় তারই দু-একটি অক্ষরের অদল-বদলে চমৎকার একটি অর্থ ফুটে ওঠে।

উদ্ধৃত নূতন পাঠ, একখানি নেপালী পুঁথি থেকে উদ্ধার করে ও আমাদের গোচরীভূত করে বন্ধুবর শ্রীকালিদিণ্ডিমোহন বর্মা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

৭ কঠোপনিষৎ।

৮ রবীন্দ্র-প্রয়োগ।

কিঞ্চ জগৎ সর্বং' পদবন্ধনের অর্থ আরো পরিস্ফুট হবে ঈশোপনিষদের অনুরূপ শ্লোকাংশে : যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজি করেছেন : whatsoever is individual universe of movement in the universal motion.

অর্থাৎ, নিখিলগতির অন্তর্গত অগণ্য গতিসর্বস্ব ভুবন।

জগৎ-ব্যাপারটি এমন যে, অনন্ত আকাশে অনন্ত নক্ষত্ররাজি, ভ্রাম্যমাণ রয়েছে কল্পনাতীত দূর সুদূর কক্ষপথে, অসংখ্যের মধ্যে একটি নক্ষত্র হল আমাদের এই সূর্য, সূর্যকে ঘিরে বহু গ্রহ, গ্রহগুলি ঘিরে কত চন্দ্রমা— নিয়ত একটি প্রদক্ষিণ করে চলেছে প্রদক্ষিণপর অন্য বৃহত্তর সত্ত্বকে। ভয়ে বিস্ময়ে অনন্ত (?) আকাশ থেকে দৃষ্টি ও কল্পনা ফিরিয়ে যদি আনি দেখতে পাব (চোখে অবশ্য দেখবার নয়) প্রত্যেক জড়-জীবের মধ্যে অণু-পরমাণু এবং প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যেও বুঝি মহাশূন্য-পূর্ণ-করা নিখিল নাক্ষত্রজগতের প্রতিবিম্ব ঝলকিত— নানাজাতি অচিন্ত্যগতি বৈদ্যুতকণের অশ্রান্তভ্রমণবেগে।

রূপস্রষ্টা ও রসিকের পক্ষে অবশ্য এতটা জানা বা 'দেখা' সর্বদা অপরিহার্য নয়। যদি দেখেন তা হলেও শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপদর্শনে অর্জুন যেমন ধন্য হয়েছিলেন, আবার ভয় পেয়ে বলেছিলেন, হে বিশ্বমূর্তি, তোমার সৌম্য, সৌম্যতর, যে নারায়ণ ও নর রূপ তাই আমায় দেখাও— শিল্পী এবং রসিকও তাই বলবেন। নয়ন ও মনের অগ্রে অনন্তরূপের যে অপরূপ বিভ্রম সে তিনি ত্যাগ করবেন না, তবে এটুকু সততই মনে রাখবেন— বিশ্ব গতিময় আর তারই গতির অন্তরে গতিময় প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক ব্যক্তি স্থির কিছু নেই। তুলি ধরে এঁকে তুলতে হবে স্থিরপ্রতীয়মান পটে এই অস্থিরকেই। সেটি যে কেমন করে সম্ভবপর সেই তো উত্তম রহস্য।[৯]

সবই গতিশীল এ কথার অর্থ সবই **সক্রিয় বা সক্রীড়**। রূপের-অনুকরণ-আকাঙ্ক্ষা যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, ক্রিয়ার অনুকরণ তো করা যেতে পারে? মোটের উপর সেটিই হল নাট্য বা অভিনয়। অথচ 'অনুক্রিয়া' শব্দে সেটিই যে এই শ্লোকের সূত্রধরের অভীষ্ট, নানা কারণে তাও তো মনে হয় না। মনে হয় না এজন্যই যে, নাট্যের সঙ্গে চিত্রের

---

৯ অনুকরণের দিকে ঝোঁকা যে মূঢ়তা এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির উল্টোমুখে চলা, সদ্য তার একটি প্রমাণ পেয়েছি। নতুন এই ছেলে-ভুলোনো (stereoscope) খেলনার রন্ধ্রযুগলে চোখ লাগিয়ে অতিকারী কাচচক্ষুর ভিতর দিয়ে দেখা যায় অতিশয় বাস্তব, অতিপ্রত্যক্ষ দৃশ্যাবলী— মূলে রয়েছে তার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রঙিন আলোকচিত্রযুগ্মক। মায়াবী কাচচক্ষুর গুণে ছোটো ছবি আর ছোটো থাকে না তা ছাড়া পুরোদস্তুর তিন আয়তন নিয়ে দেখা দেয়। কিন্তু তাই দেখে রূপরসিকমাত্রই মর্মাহত হবেন। কারণ, জড় ও অনড় পাহাড় পর্বত মূর্তি মন্দিরে আপত্তির কিছু নেই, জীবগুলি (পশু পাখি মানুষ) জীবনের ভঙ্গি উদ্যত করে হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যেন মরে গিয়েছে। এই জীবনমৃতের ভুবনে বা ডামির রাজত্বে ঘুরে ফিরে অল্পেই দম বন্ধ হয়ে আসে, পালাতে পারলে বাঁচি। কী কুৎসিত। অথচ, অনুকরণ যে ষোলো আনা তাতে আর সন্দেহ নেই।

তুলনা না দিয়ে নৃত্যের সঙ্গেই তাকে এক সূত্রে গাঁথা হয়েছে। নৃত্য হোক আর নৃত্তই [১০] হোক, নির্দিষ্ট কোনো ঘটনা বা কাহিনীর প্রসঙ্গ থাক্ আর না'ই থাক্, ঐ-সকল ক্ষেত্রে ছন্দেরই একান্ত প্রাধান্য। অতএব সূত্রকারের মতে চিত্রেও সেইটেই বাঞ্ছিত। এও তো জানি, খৃস্টপূর্ব সময় থেকে পাঠান-মোগলদের রাজত্বকাল পর্যন্ত এ দেশে চিত্ররচনার যে ধারা নানা শাখা প্রশাখায় প্রবাহিত, প্রায় সর্বসময়ে তাতে ছন্দই প্রধান। অর্থাৎ, সূত্রের মধ্যেই যে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে আর সূত্রের বাইরেও [১১] যে রীতিপদ্ধতি এ দেশে সহস্রাধিক বৎসর ধরে আচরিত, দুয়েরই প্রমাণে সন্দেহ থাকে না যে, অনুক্রিয়া বলতে তথাকথিত 'অনুকরণ' নয়।

এই ভবের খেলায় প্রত্যহ প্রতিক্ষণে কত-কিছু আমরা অনুভব করি। অনুভব ব্যাপারটা কী? ভব, যা হয়েছে, প্রাণের টানে, সত্তার আনন্দে বা বেদনায়, তাই পুনরায় হওয়া। এই অনুভবরূপ ক্রিয়ায় অনুভবগম্য বিষয়টির কতই না বাদ পড়ে যায়— বহু কাঁটাখোঁচা, বহু খুঁটিনাটি, বাহিরের বহু প্রক্ষেপ। অর্থাৎ, যা আকস্মিক, যা আরোপিত, যা আগন্তুক, সে-সব স্বভাবতঃই পরিহার করে, বস্তু বা ব্যাপারের যা সার, যা স্বরূপ, তাই আমরা অনুভব করি বা করতে চাই— অন্তরে অন্তরে তারই সঙ্গে আমাদের সত্তাকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিই। অনুক্রিয়াও ঐরূপ। কোনো ক্রিয়ার যেটি নিহিত মর্ম বা নিগূঢ় 'রূপ'— যা অলক্ষ্যে আদ্যন্ত ক্রিয়ার অন্তরে অনুস্যূত থেকে তাকে ধারণ করে আছে, চালিয়ে নিয়েও যাচ্ছে— সেই অস্খলিতসুন্দর গতি ও বেগ, সেই ছন্দ,

১০ উদ্‌ধৃত শ্লোকে 'নৃত্য' থাকলেও, অন্য বহু শ্লোকে 'নৃত্ত' আছে— কতটা শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় আর কতটা লিপিকারের 'অবদান' বলা কঠিন। অনেকে বলেন, আখ্যানকথন বা ঘটনাব্যাখ্যান-শূন্য 'নৃত্ত' কলাটি যেমন প্রাচীনতর, শব্দটিও তেমনি— নৃত্যের তুলনায়। চিত্রে ঘটনা বা আখ্যান প্রায়ঃশই থাকে, সুতরাং নৃত্য-উপমান অবশ্যই অসংগত নয়। আর, নৃত্যেরই অপেক্ষাকৃত অবচ্ছিন্ন বা abstract রূপ হল নৃত্ত, এ হিসাবে তার সম্পর্কে শিল্পী বা রসিকের যথেষ্ট সাভিনিবেশ, সচেতন থাকা দরকার। কাজেই মোটের উপর বলা চলে, নৃত্ত বা নৃত্য যে শব্দের ব্যবহার হয়ে থাক্, তাৎপর্যের খুব বেশি পার্থক্য ঘটে না।

১১ 'বিষ্ণুধর্মোত্তরম্' কোন্ শতকে কখন রচিত সে বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত ধারণা নেই। নানা প্রমাণে বা অনুমানে শ্রীমতী ক্রাম্‌রিশ মনে করেন, চিত্রকলা সম্পর্কে যে-সব অধ্যায় সেগুলির রচনা খৃস্টীয় সপ্তম শতকে, অজন্তা-চিত্রশৈলীর প্রৌঢ় পরিণতির ও বিশেষ উৎকর্ষের সমকালে। এ সিদ্ধান্ত একেবারে বিতর্কাতীত হোক বা না হোক, এটি অন্তত স্পষ্টই দেখতে পাই যে, সংকলিত শ্লোক আর পূর্ণপরিণত অজন্তা-চিত্রশৈলী পরস্পরকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে ও উদ্ভাসমান সৌন্দর্যে চিনিয়ে দেয় তা যার-পর-নেই বিস্ময়জনক। সূত্রে ও শিল্পসৃষ্টিতে এতটা মিল আর কোথাও দেখা যায় না। সূত্র এবং চিত্র (অথবা, চিত্র এবং সূত্র বলাই হয়তো সংগত) একই কালের রচনা হলে, বিস্ময়ের হেতু অল্প হয়, অন্তত হেঁয়ালি থাকে না। একই কার্যকারণসূত্রে দুটি সহজেই বাঁধা পড়ে; উভয়ের পিছনে আর সামনে, অতীতে ও বর্তমানে, কখনো ম্লান কখনো উজ্জ্বল সাজে চলেছে এক অশেষ শোভাযাত্রা— সেই হল ভারতীয় চিত্রকলার অচ্ছিন্ন পরম্পরা।

তাকে গ্রহণ করা, তাকে ধারণা করা— তাকেই এক উপাদান থেকে অন্য উপাদানে, এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে, বলা চলে এক সৃষ্টি থেকে আর-এক সৃষ্টিতে, সঞ্চারিত ও সঞ্চালিত করে দেওয়া এই হল অনুক্রিয়ার স্বরূপ বা স্বধর্ম, কী নৃত্যে আর কী চিত্রে। যে-কোনো ক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ দেশকালপাত্র এবং অবস্থা -হেতু যা-কিছু অস্বাভাবিক বা অবান্তর, যা-কিছু শক্তি বা সুষমার প্রকাশে ব্যাঘাত বা বাধা, সেগুলি কম-বেশি পরিত্যাগ করেই **অনুক্রিয়া-রূপ ছন্দটি** ফুটে উঠতে পারে এবং ওঠে। নৃত্যের বেলায় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ওঠে না। আর চিত্রের বেলাও বিতর্কের সম্ভাবনা দেখি নে, পরম্পরাগত ভারত-চিত্রকলার নানা দিগ্‌দেশে কার্যত, অথবা মনে মনেও, একবার চোখ বুলিয়ে নিলে।

পূর্বেই একপ্রকার বলা হয়েছে, ষড়ঙ্গ প্রসঙ্গে ছন্দের অনুল্লেখে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ যেমন বিব্রত তেমনি হয়তো বিস্মিত হয়েছিলেন। এ দিকে দেখেছিলেন, চীনদেশে খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের শেষে বা ষষ্ঠ শতাব্দের আরম্ভে যে ছয়টি চিত্রসূত্র বিধিবদ্ধ ও লিপিবদ্ধ হয়েছিল (তার পূর্ব থেকেই প্রবর্তিত ও প্রচলিত ছিল না কে বলবে) ঐ সূত্রাবলী সব রকমের ছন্দকেই শিরোধার্য করে রেখেছে। চীনা থেকে সেই প্রথম সূত্রটির ইংরেজি ভাষান্তর অনেকে অনেক প্রকার করেছেন।[১২] জড়ে[১৩] জীবে তরুলতায় সর্বত্র, জীবনের সব দৃশ্যত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ছন্দের ভিতরে ভিতরে, বিশ্বের বা বিশ্বাত্মার যে ছন্দ অনুস্যূত সেটিরই ধ্যানধারণা ও প্রকাশ— এই-যে উল্লিখিত সূত্রের মোটের উপর নির্দেশ সে বিষয়ে কেউ সন্দেহ করেন না।

At any rate, what is certainly meant is that the artist must pierce beneath the mere aspect [outward appearance] of the world to seize and himself to be possessed by that great cosmic rhythm of the spirit which sets the currents of life in motion.[১৪]

অর্থাৎ, বহিঃপ্রতীয়মান রূপের প্রতিফলন হৃদয়ে ধরাই আর্টের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল তার নিখিলরূপকে সঞ্জীবিত ও সঞ্চলিত করে রেখেছে যে ছন্দ, মনুষ্যসৃষ্টিগত রূপের ছলে সেই অরূপকেই প্রকাশ।

আমাদের মনে হয়, ভারতের রসরূপদ্রষ্টা চিত্রসূত্রকার 'অনুক্রিয়া' শব্দে এই ছন্দের প্রতিই লক্ষ রেখেছেন।

প্রশ্ন তবু ওঠে, চিত্রের কথা বলতে গিয়ে বিশেষ করে নৃত্যের কথাই বা কেন এল? ভালো নাচিয়ে হলে তবেই ভালো চিত্রকর হয়ে থাকে এমন আজগুবি ঘটনার বিষয় শুনি নি আর বিশ্বাস করাও কঠিন।

---

১২ দ্রষ্টব্য : ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ।

১৩ 'জড়'কে সত্যই অচেতন ও জীবনহীন বলে ধারণা করা জাত-শিল্পীর পক্ষে, বিশেষত প্রাচ্য শিল্পীর পক্ষে অসম্ভব।

১৪ *The Flight of the Dragon.*

নাচতে জানবেন এমন নয়, নাচের তত্ত্ব জানবেন চিত্রকর। এমনও বলা চলে, যথাবিধি নৃত্যশাস্ত্র তিনি নাই বা জানলেন, নৃত্যশাস্ত্রের যেটি সারকথা, যেটি দেহের বিশুদ্ধ গতিচ্ছন্দেরই কথা, অন্তর বা বাহির যেখান থেকে যেমন করে হোক, সেটি যখনই ধ্যানধারণায় ধরবেন চিত্রশিল্পী, চিত্রকর্মে দখল হবে তাঁর পূরা চিত্রের বিষয়ে বলতে গিয়ে নৃত্যের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে গুরুতর কয়েকটি কারণে। প্রথম তো দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকলা যেগুলি তার মধ্যে, নৃত্তেই, অথবা নৃত্যেও, ছন্দের বিশুদ্ধ রূপ ও সর্বময় প্রভুত্ব সব থেকে বেশি। সুতরাং নয়নমনোগোচর ছন্দের বিষয়ে যিনি উপদেশ দিতে চাইবেন নৃত্ত বা নৃত্য ছাড়া আর কোন্ কলাকে তিনি আদর্শ হিসাবে ধরবেন? দ্বিতীয়ত অনেকেই বলেছেন, হয়তো আমাদের শাস্ত্রকারদেরও সেই অভিমত ছিল, যে, মানুষের সকল কলাসৃষ্টির মধ্যে নৃত্ত বা নৃত্যই আদিম। রূপকলাসমূহের মধ্যে তো বটেই। তৃতীয়ত ভারতীয় ধারাবাহী চিত্রকলায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই যে রূপ যার-পর-নেই মুখ্য ও আদরণীয় হয়ে আছে সে হল মানুষেরই রূপ, অথবা রূপান্তর। অরণ্য পর্বত গাছপালা পশুপাখি নিয়ে বিশাল প্রকৃতি যখন যে ফাঁকে উঁকিঝুঁকি দিয়েছেন সে হল ছবির পাড়-হিসাবে বা পটভূমি-রূপে। মনুষ্যরূপের ছন্দ, তার দেহের বিচিত্র গতি ও স্থিতির মাত্রা ও যতি, এগুলি নৃত্যকলাতেই যে বিশেষভাবে প্রকটিত। মূর্তিকলাও প্রধানত মানুষ নিয়ে, মনুষ্যদেহী দেবতা নিয়ে, আর এ দেশে সে ক্ষেত্রেও পরিস্ফুট ছন্দের শ্রী ও শক্তি অল্প কিছু নয়— বিশেষত ধাতুমূর্তিসমূহে— তবে, রঙ ও রেখা নির্ভর হওয়াতে, বিহিত উপায় ও উপকরণগুলি অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য ও বশ্য হওয়াতে, ছন্দোবেগ চিত্রে যেভাবে যতটা প্রকাশ করা সম্ভবপর এবং বাঞ্ছিত মূর্তিতে তেমন নয়। এ ব্যাপারে নৃত্যের পরই চিত্রের স্থান।

তাই বলা হয়েছে : বিনা তু নৃত্যশাস্ত্রেণ চিত্রসূত্রং সুদুর্বিদম্। ছন্দোময়ী ছবিকে জানতে হলে ছন্দে বাঁধা আর ছন্দেই মুক্ত নৃত্যকে ভালোভাবে জানা চাই।

এখানে একটি কথা ভেবে দেখা দরকার। সংকলিত শ্লোকটি, বিষ্ণুধর্মোত্তর উপপুরাণের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে— নিঃসঙ্গ এককভাবে নয়। ইষ্ট-আরাধনা করবেন বলে মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে উপদেশপ্রার্থী হয়েছেন বজ্রনরপতি। তাতেই এল প্রতিমা, তথা প্রতিমালক্ষণের প্রসঙ্গ। মুনি বললেন, চিত্রসূত্র না জানলে প্রতিমালক্ষণ জানা যায় না।

বেশ, তাই উপদেশ করুন মুনিবর।

নৃত্য না জানলে চিত্র জানা যায় কি?

নৃত্য সম্পর্কে জানতেও নৃপতির অশেষ কৌতূহল।

নৃত্যের জন্য প্রয়োজন আতোদ্য বা বাদ্য।

সে সম্পর্কেই বলা হোক-না কেন।

তখন মুনি বললেন, গীত না হলে বাদ্যে কী হবে, নৃত্যও হয় না।[১৫]

বোঝা গেল ভারতীয় হিন্দুর কাছে, হিন্দু শাস্ত্রকারের কাছে, জীবনের কিছুই খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন নয়। ধর্মার্থকামপ্রদ ও মোক্ষপরিণামী সমগ্র জীবনের একটি কল্পনা— বা বাস্তবতাই বলা সংগত— সর্বদা তাঁদের ধ্যানধারণায় জাগরূক; সেই সমগ্রতার ভিতরেই জীবনের সবকিছু নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কর্তব্য করে যাচ্ছে। ধর্মার্থকামমোক্ষসমন্বিত জীবনে চতুঃষষ্টিকলারও অবশ্যই স্থান আছে অপরূপ একটি সংহতি ও সংগতির আকারে। প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক ব্যাপারের, মানুষের প্রত্যেক প্রবৃত্তি বা প্রবণতার প্রবল স্বাতন্ত্র্যলীপ্সায় ও সমূহ বিকাশে আজ যদি সেই সুসংহতি ও সমগ্রতা দীর্ণ বিদীর্ণ ধূলিবিকীর্ণ হয়ে থাকে, তবু প্রাচীন আদর্শ যে মন্দ ছিল আর আজকের অবস্থা ও ব্যবস্থা— প্রায়শই দুরবস্থা ও অব্যবস্থা— সে-সব যে স্বভাবতই ভালো, এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। একটি সম ছেড়ে আর-একটি সমের দিকে চলেছে মনুষ্যসমাজ আর মানুষের জীবন, মানুষের সকল জ্ঞান বিজ্ঞান কলা কৃতি, যেখানে আবার এক অতি বৃহৎ সামঞ্জস্যের মধ্যে, সংগীতির মধ্যে সব মিলতে পারবে— প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক বিষয় সার্থক হবে সকলের যোগে আর সম্পূর্ণ করবে সকলকে।

ফলকথা, উপস্থিত বিষয়কে প্রাচীন যেভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণই তাঁদের দেশকালোপযোগী, আর আমরাও যে পৃথগ্‌ভাবে একটি বিষয়েরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি সেও আমাদের কালোপযোগী, আমাদেরই সীমিত সাধ্য এবং সাধনার অনুকূল।

মুনির ব্যাখ্যামুখে জানা গেল বিভিন্ন কলার মধ্যে রয়েছে একটি ক্রমিক শৃঙ্খলা, দূর ও নিকটের একটি সংগত অন্বয়। নৃত্যের সঙ্গেই চিত্রের বিশেষ সাধর্ম, তাই বিশেষ সম্পর্ক, সে আলোচনা আমরা যথাসাধ্য করেছি। নৃত্যের যে ছন্দ, যে-কোনো ক্ষেত্রে যে-কোনো ছন্দ, তার জন্য এক দিকে চাই মাত্রা ও তাল, অন্য দিকে চাই সুর। চতুর্বিধ আতোদ্য— যেমন বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, মন্দিরা[১৬]— তার কতকগুলিতে সুর বাজে, কতকগুলিতে তাল। সুর এবং তালের প্রয়োজন হয় মনুষ্যকণ্ঠের গীতে। এই ভাবে একপ্রকার আরোহগতিতে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, 'অচল' থেকে সচলে— অর্থাৎ, মূর্তি থেকে চিত্রে, চিত্র থেকে নৃত্যে, নৃত্য থেকে আবার বাদ্যসহকৃত গীতে পৌঁছে আমরা ক্ষান্ত হই। সমুদয় কলাগুলির মধ্যে যার-পর-নেই বিমূর্ততার মূর্তি ঐ গীতে; 'তাল'

---

১৫ অতঃপর সংগীত সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা।

বলা বাহুল্য, উপরে বিষ্ণুধর্মোত্তরের বক্তব্যের সারসংকলন করা হয়েছে মাত্র। তা ছাড়া সমগ্র 'বিষ্ণুধর্মোত্তরম্' আমরা আলোচনা করে দেখি নি। আজ হোক কাল হোক সে কাজ যিনি করবেন (যথার্থ ভারততত্ত্ববিদ্ ও ভারতের-সর্ববিধ-কলা-বিদ্ তাঁর হওয়া চাই) আমাদের অনেক ভুলভ্রান্তি তিনি সংশোধন করতে পারবেন— অথচ আমাদের মূল বক্তব্যের হয়তো হানি হবে না।

১৬ যথাক্রমে তত, শুষির, আনদ্ধ ও ঘন, এই চতুঃশ্রেণীর এক-একটির উল্লেখ হয়েছে।

এবং 'সুর' চরমে এই দুটি মাত্র উপায়ে বা উপাদানে পর্যবসিত হওয়ায়, গীতের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে ছন্দের ও রসের বিশুদ্ধতম বা আদিতম প্রকাশ। ছন্দের কারণে, বিশেষত রসের কারণে, গীত অন্য সবগুলি মুখ্য কলায় নিহিতভাবে অবশ্যই আছে। অতএব এই প্রসঙ্গে বিষ্ণু ধর্মোত্তরে মিথ্যা বলা হয় নি : গীতশাস্ত্রবিধানজ্ঞঃ সর্বং বেত্তি যথাবিধি।

কিন্তু, আমাদের ধারণা এই যে, রসের বিশ্লেষণ হয় না যেমন, আসলে সুরেরও হয় না। অতএব যেমন নৃত্যের সঙ্গে, তেমনি গীতের সঙ্গেও, চিত্রের পরম নিগূঢ় সম্পর্কের উল্লেখ করেই এখন আমরা পূর্বপ্রসঙ্গে, চিত্রের ছন্দোময় প্রকৃতির প্রসঙ্গে ফিরে যাব।

চিত্রে ছন্দোবেগের এই প্রাধান্য-বশত শাস্ত্রকার এ কথা বলেছেন—

রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্যা বর্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরে জনাঃ॥

চিত্রে রেখাই বিশেষ করে গতির ব্যঞ্জনা দেয়, ছন্দকে প্রকট করে, এজন্য প্রশংসনীয় হলে, বিশেষ করে রেখারই প্রশংসা করেন শিল্পী ও শিক্ষাদাতা আচার্যগণ। যাঁরা শিল্পী বা আচার্য নন, অথচ সমজ্‌দার, তারা বিশেষ করে গড়নেরই প্রশংসা করেন চিত্রে— এই গড়ন চিত্রিত রূপকে দেয় প্রয়োজনীয় বাস্তবতা। এক দিকে রেখাশ্রিত ছন্দোবেগে রূপ ছুটে যেতে চাইছে অরূপে বা অলক্ষ্যে, অন্য দিকে দেখি গড়ন দিয়ে, বাস্তবতা দিয়ে, ভার চাপিয়ে, তাকে ধরে রাখতে চাইছে মাটির পৃথিবী— বলছে যেন, 'হাওয়ায় পা ফেলো না। আমার বুকের উপর দিয়ে চলো!'

চিত্রে স্ত্রীজাতি বা অনুরূপ যাঁদের প্রকৃতি, তাঁরা পছন্দ করেন অলংকরণ, কেন-না মণ্ডনে আরো যেন মধুর সুন্দর করে স্বভাবসুন্দর রূপকে, মেয়েরা নিজেও তো নানা বিভূষণ ধারণ করেন দেহে— তা ছাড়া খুঁটিনাটি এটি-সেটিতে তাঁদের যথেষ্ট মনোযোগ, যা না হলে কোনো ব্যক্তিকে বা বস্তুকে ভূষিত করা যায় না অথবা, 'ভূষণমিচ্ছন্তি' প্রয়োগে যদি মনে করি, মণ্ডনদ্রব্য তো নয়ই, চিত্রের এখানে সেখানে কারুকার্য বা মণ্ডনকার্যও নয়, সমুদয়-চিত্রে-ওতপ্রোত মণ্ডনগুণই দেখতে চান স্ত্রীজাতি বা সমপ্রকৃতি অন্যজন, তা হলেও অনুচিত বা অবাস্তব ব্যাখ্যা কিছু হয় যে এমনও নয়। বরং তার বিপরীত। চিত্রে ছন্দপ্রাধান্যের অবশ্যম্ভাবী ফল হল অল্প বা অধিক পরিমাণে, প্রচ্ছন্ন বা প্রকট ভাবে, মণ্ডনগুণ, মণ্ডনধর্ম। ছন্দের দূরগামী এবং পারগামী তাৎপর্যটি যথাযথ ধারণা করা দুরূহ হলেও, ছন্দের সেই বহির্লক্ষণে আকৃষ্ট হওয়া, তজ্জনিত রূপসুষমায় বা কান্তিতে মুগ্ধ হওয়া স্ত্রীস্বভাবোচিত সন্দেহ নেই। এই মণ্ডনগুণ থাকে রূপ ও রঙ উভয়েরই।

আচার্য পণ্ডিত ও স্ত্রীজাতি-বহির্ভূত জনসাধারণ, চিত্রে তাঁরা দাবি করেন বর্ণাঢ্যতা, বর্ণসুষমা ঠিক নয়, উচ্চগ্রামে বাঁধা রঙচঙ— দেশ-কাল-বিশেষে দ্বন্দ্বমান রঙের

কোলাহলে বা কলহেও অভিরুচি হতে পারে— যেহেতু তাঁরা চান চড়া সুর, প্রবল প্রকট রূপ।

বাকি রইল রসের প্রসঙ্গ। সকল সার্থক কলাসৃষ্টির রসেই সূচনা যদি না'ও হয়, অথবা জ্ঞানত না হয়, রসেই গতি ও স্থিতি তার আর সন্দেহ নেই। বিষ্ণুধর্মোত্তরে রসের উল্লেখ নেই যে এমন নয়। সম্পূর্ণ একটি অধ্যায়ের ঊনচল্লিশটি শ্লোকই 'শৃঙ্গারাদিভাবকথনে' নিযুক্ত, তবেই চিত্রসূত্রের সমাপ্তি। কিন্তু রসের নামরূপ যতই আলোচিত হয়ে থাকুক, রসের সংজ্ঞার্থ পাওয়া যায় না; উক্ত অধ্যায়ে রসের তত্ত্বকথা বা মর্মকথা এমন কিছু বলা হয় নি যাতে রসিকচিত্তের চিরচমৎকার জন্মাতে পারে। আদৌ সে উদ্দেশ্য ছিল না শাস্ত্রকারের। অথচ এ কালের আমরা তার কমেও সন্তুষ্ট হতে পারি নে। রসের যে স্থায়ী ও ব্যভিচারী -ভেদে শ্রেণী ও সংখ্যা বেঁধে বর্ণনা দেওয়া যায় বা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে— হয়তো এ বিশ্বাসই আমাদের নেই। রস যে কী সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তাকে উস্‌কিয়ে দিয়ে বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করেছেন মার্কণ্ডেয় মুনি, রসলক্ষণের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে নয়, কিন্তু পূর্বোক্ত শ্লোকরাজিতে যার চরমে বলা হয়েছে 'সকল কলাসৃষ্টি তত্ত্বতঃ জানেন যিনি গীত জানেন'।

যেটিকে অর্থের, অর্থাৎ মননের, পারে পৌঁছে রস বলি, উপায় ও উপাদানের চরমে পৌঁছে **সেটিকেই** সুর বলা হয়ে থাকে— এই আমাদের বিশ্বাস। প্রকারান্তরে এ-কথা পূর্বেই বলেছি। অথচ সুরের বিচার-বিশ্লেষণে আমাদের যোগ্যতা নেই যেমন, বস্তুলাভ হতে পারে এ আশাও মিথ্যা। আলোচ্য চিত্রকলায় সুর হয়েছে রূপ। সুতরাং, রসকে অনির্বচনীয় রস বলেই স্বীকার করে নিয়ে, রসের বিস্তারিত নামরূপ আচার-আচরণের হিসাব নিকাশের মধ্যে না গিয়ে, শুধু রস এবং রূপের সম্পর্কটি নিয়ে কতদূর কী বোঝা যায় ভেবে দেখতে হবে। এ ব্যাপারে সুপ্রচলিত একটি বচনের তাৎপর্য গ্রহণ করে আমরা লাভবান হতে পারি। বহু ধীমান রসিক ব্যক্তির বহুশত বৎসরের কাব্যবিচারে পরিণামে সেটি পাওয়া গিয়েছে। অবোধ অচেতনকে প্রবোধ দিতে বিশল্যকরণীর মতোই অব্যর্থ। অবশ্য, বিশল্যকরণী চাই বলেই গন্ধমাদন উৎপাটন করে আনব না— পণ্ডিতজন আমাদের এ অক্ষমতা ক্ষমা করবেন।

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্[১৭]— অতি প্রসিদ্ধ এই বচন। পরিষ্কার অর্থ তার : রস যার আত্মা, সেই বাক্যই কবিতা। কবিতার দেহ হল বাক্য বা বাগর্থ।

ভাব অনুভূতি আবেগ বা প্রক্ষোভ— এগুলি রস নয়। আখ থেকে 'রস', তা থেকে গুড় (তৎপূর্বে তাড়ি তৈরি হবারও একটি সম্ভাবনা রইল), গুড় থেকে অল্প বা অধিক -পরিষ্কৃত চিনি, চিনি থেকে মলিন বা উজ্জ্বল স্ফটিকের মতো দানাবাঁধা মিছরি, এ

---

১৭ সাহিত্যদর্পণ।

যেমন পরিবর্তনপরম্পরা, পণ্ডিতেরা বলেন— অতি স্থূল দুঃখসুখ বাসনাবেদনার বিক্ষোভ থেকে উত্তরোত্তর-উৎকর্ষের সিঁড়ি ভেঙে অবশেষে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রসে পৌঁছুনো যায় এবং 'বোধে বোধ' [১৮] হয়ে থাকে। সেখানে সুখদুঃখ শোকসান্ত্বনা ভয়বিস্ময় ক্রোধঘৃণা সবই অনির্বচনীয় আনন্দের বা চেতনার নানা নাম, নানা রূপ— যা ছিল ব্যক্তিগত তা হল বিশ্বজনীন, আর বিশ্বসত্তারও সব-কিছু ব্যক্তির অনাসক্ত অনুরাগ, স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং আনন্দময় প্রতীতির বিষয় হয়ে উঠল।

যে বিচার ও সিদ্ধান্ত কাব্য সম্পর্কে সত্য, প্রকারান্তরে সেটি অন্যান্য কলাসৃষ্টি সম্পর্কেও অবশ্যই সত্য এবং অর্থদ্যোতক হবে। এ হিসাবে **রসাত্মক ও ছন্দোময় হলেই** বাগর্থকে কাব্য, ধ্বনিতরঙ্গকে গীত, ধ্বনিতরঙ্গিত বাগর্থকে সংগীত, জড়পিণ্ডকে মন্দির বা মূর্তি, অঙ্গভঙ্গিকে নৃত্ত বা নৃত্য, ক্রিয়ারূপকে অভিনয় এবং বস্তু বা [১৯] অবস্তু -রূপকে চিত্র বলা যেতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে রসই আত্মা, ছন্দই প্রাণ। বাক্ অথবা ধ্বনি অথবা আকৃতি হল শরীর শুধু। শরীরকে চালনা করে যেমন প্রাণ বা ছন্দ, বিভিন্ন উপায়ে ও উপাদানে, অন্নে, তাকে গঠনও করে সে'ই— প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভাব আবেগ তত্ত্ব তথ্য-যোগে এক-একটি সূক্ষ্ম শরীরও গড়ে ওঠে— আমাদের দেশে মনকেই সূক্ষ্মশরীর বলে থাকে— তারও স্রষ্টা যেন প্রাণ বা ছন্দ— আকর্ষক ও আশ্রয়দাতা।

অতীত-বর্তমানের কলালোকে একটি চিন্তনীয় ব্যাপারের প্রতি রূপস্রষ্টা আর রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ আলোচনা শেষ করতে চাই।

বিভিন্ন উপাদানে বিভিন্ন কলাসৃষ্টি, বিভিন্ন-ইন্দ্রিয়-সহায় চিত্তবুদ্ধির যোগে তার বিচিত্র উপভোগ, বহু ক্ষেত্রেই কলাসৃষ্টি রূপ ধরেছে দুই প্রকার— অনুষঙ্গী ও অবচ্ছিন্ন, অথবা বলাও যেতে পারে 'মূর্ত' এবং 'বিমূর্ত', concrete এবং abstract। নৃত্তে তাই কাহিনী নেই, যন্ত্রের বা কণ্ঠের গীতেও কথা নেই, স্থাপত্যে জগৎসংসারের কোথাওকার কোনো স্পষ্ট সাদৃশ্য বা অনুষঙ্গ নেই, অথচ উল্লিখিত প্রত্যেক কলাসৃষ্টি ছন্দোবেগবান তো বটেই— রসাত্মক যে, সে বিষয়েও রসিকের মনে কোনো সন্দেহ উপস্থিত হয় না। কাব্য এবং চিত্রের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যহীন বা অনুষঙ্গরহিত কোনো-প্রকার রসাত্মক কলাসৃষ্টির বিষয় আমাদের জানা ছিল না। একেবারে অর্থহীন অথচ ছন্দোবদ্ধ

---

১৮ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষা।

সংস্কারকামনাদি পার হয়ে ক্রমশ রসে পৌঁছোন কীভাবে কবি ও রসিক, পরিষ্কার নক্সা এঁকে দেখিয়েছেন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তাঁর ব্যাখ্যাও মৌলিক হোক বা না হোক— চমৎকার। দু'ই পাওয়া যাবে 'কাব্যপরিমিতি' গ্রন্থে।

১৯ বস্তু বলতে চেতন বা অচেতন সর্ববিধ দৃষ্ট বস্তুই বোঝাচ্ছে। অবস্তুর এখানে, এই সংজ্ঞার্থে, স্থান হয় কিনা সন্দেহ আছে। অবস্তু যদি বস্তুরই দেহ ধরে কথা নেই, যেমন বুদ্ধ বা নটরাজ-মূর্তিতে অথবা চৈনিক ড্র্যাগনে। abstract বা অবস্তু থাকবে অথচ রেখায় বা রঙে, ছন্দ শুধু নয়, রসের উদ্রেক করবে— এমন হয় ব'লে আমাদের জানা নেই।

কোনোরূপ শব্দসংহতি আজও প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে কোথাও রচিত ও কাব্য বলে আদৃত হচ্ছে কিনা জানি নে। যেখানে জাগ্রতে-জানা-চেনা কিছুর সঙ্গে সাদৃশ্য নেই অন্তত স্বপ্ন অথবা মনোবিকারের সঙ্গেও সাদৃশ্য আছে— রসসৃষ্টির হওয়া না-হওয়া সর্বদাই পৃথগ্‌ভাবে বিচার্য। চিত্রের বেলায় ব্যাপার হয়েছে বিচিত্র। স্বপ্নসাদৃশ্যে অথবা অবচেতনগূঢ় কামনা কল্পনা স্মৃতি বিস্মৃতির প্রেরণায় ও উপাদানে রচিত হয়ে, অথবা জ্যামিতি ও ধনমিতির চতুর ছদ্মবেশে অল্পাধিক আত্মগোপন করে, যে-সব চিত্ররীতি অপূর্ব সার্থকতার, হয়তো বা রসাত্মকতারও দাবি উপস্থিত করেছিল একদিন, তারই 'শেষ' বিবর্তনে প্রায়-সকল-সংস্কার-ও-অনুষঙ্গ-মুক্ত যে 'কেবল রূপ' নিয়ে দেখা দিয়েছে চিত্র আজ পাশ্চাত্য দেশে— তাকেও কি কলাসৃষ্টি বলব? কার্পেটে, কাপড়ে, হাঁড়ি-কলসিতে, ধামা-কুলোয়, যুগে যুগে সভ্য বা অসভ্য জাতিদের মধ্যে এতদিন যা নক্সা রচিত হয়েছে— যখন সাদৃশ্য থাকে নি— সেও তা হলে বুদ্ধ বা ম্যাডোনার মুখচ্ছবি, চীনদেশীয় জলস্থল আকাশের দৃশ্যকাব্য, ভ্যান্ গগের আঁকা প্রদীপ্ত পুষ্পস্তবক বা টার্নারের মায়াতুলি-উদ্‌বোধিত তাণ্ডবমত্ত সমুদ্র, সে-সবেরই সমশ্রেণীতে স্থান পাবে কি? অথবা, ধনী-নির্ধন শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রায় সর্বশ্রেণীর নেত্রপ্রীতিকর হওয়াতেই অন্ত্যজ বলে গণ্য হবে এবং স্পর্শ বাঁচিয়ে দূরে থাকবে, অন্তত ফ্রেমে বাঁধানো হয়ে বাসর বা বৈঠকখানার দেওয়াল থেকে ঝুলবে না?

জড়পিণ্ড দিয়ে রসসৃষ্টির বেলায় সাদৃশ্যযুক্ত মূর্তির বড়ো শরিক ছিল সাদৃশ্যমুক্ত স্থাপত্য— জীবনযাত্রার তথা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার অন্য একটি বিশিষ্টতাও আছে। বর্তমানে পরম্পরানিষ্ঠ মূর্তি ও স্থাপত্যের মাঝখানে আর-এক 'বিমূর্ত মূর্তিকলা' পাশ্চাত্যে রচিত হয়েছে বা হচ্ছে যাকে কখনো মূর্তি কখনো বা অব্যবহার্য স্থাপত্য বলেই ভ্রম হয়। স্বপ্নের অনুষঙ্গে, স্থূল ও প্রত্যক্ষ স্থিতির নিশ্চয়তায়, রস বা রসের আভাস কোথায় কত দূর থাকে অথবা আদৌ থাকে না তার, মহাকালই তার যোগ্য বিচারকর্তা।

ইতিমধ্যে, ভারতের ধারাবাহী চিত্রকলার বিচার-বিবেচনা থেকে এই আমরা জেনেছি যে, দুই আয়তনের ক্ষেত্রে উদ্ভাসমান, ছন্দোবিধৃত, ছন্দেই মুক্ত, রসাত্মক যে রূপ তারই নাম চিত্র বা ছবি।

১৩৬৪ কার্তিক

বাংলা সংগীতচিন্তার নবজন্ম

সুধীর চক্রবর্তী

জাতি হিসাবে সর্বক্ষেত্রে বাঙালির নবজন্মের সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীতে। বাংলা সংগীতচিন্তার নবজন্ম বাঙালির সর্বাত্মক জাগরণের সঙ্গে নিবিড় তাৎপর্যে সংযুক্ত। অর্থাৎ মানবতাবোধের প্রসার, যুক্তির সমুন্নতি, বিজ্ঞান ও ইতিহাসাশ্রিত মুক্ত মূল্যবোধের বিকাশ, নারীজাতির প্রতি নবদৃষ্টিপাত প্রভৃতি নবজাগরণের সর্বস্বীকৃত লক্ষণের সঙ্গে বাংলা সংগীতের নবরূপান্তর, প্রচার ও সংরক্ষণ-প্রবণতার সহযোগ অবিচ্ছিন্ন। দেশকালের তালে লয়-গাঁথার এই বিশেষত্ব সংগীতে আবহমানকাল থেকে স্পন্দিত। য়ুরোপীয় নবজাগরণের সূত্রে উৎসারিত তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমকালীন সংগীতে প্রস্ফুট হয়েছিল; তার ফলে রাজসভা ও চার্চের শুদ্ধরীতিবদ্ধ ধর্মাশ্রিত সংগীত ধারা বর্জন করে সেই সময়ে শিল্পী-ব্যক্তির স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম লক্ষ্য করা গেছে। য়োহান্ সেবাস্টিয়ান্ বাখ্ থেকে শুরু করে, বেতোফেনকে ঘিরে, সংগীতের সেই প্রচণ্ড একক স্বাতন্ত্র্যসংগ্রামে য়ুরোপীয় নবজাগরণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত। অবশ্য সর্বকালেই সংগীত এইভাবে সমকালীন সমাজ ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। তাই লক্ষ করা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপে ডারুইনের বিবর্তনবাদ ও সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের মনোবিকলন সংক্রান্ত শাস্ত্ররচনার সমকালে সংগীতযন্ত্র পিয়ানো শ্রেষ্ঠতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। আত্মস্থ দৃষ্টিতে বোঝা যায় : ডারুইনের তত্ত্বে মানুষের ক্রমবিকাশের গূঢ় সূত্রসন্ধান, ফ্রয়েডের তত্ত্বে মানবিক অন্তর্মনের সূক্ষ্মতম তরঙ্গের অনুধাবন প্রয়াস এবং পিয়ানোর অসংখ্য সুরসামর্থের মধ্যে মানবহৃদয়ের অনুপুঙ্খ সুরধ্বনি প্রকাশের প্রবণতা— এই তিন প্রচেষ্টা রূপের দিক থেকে স্বতন্ত্র হলেও আত্ম-আবিষ্কারের মৌল ভাবের অন্তর্গত।

সম্প্রতি, কিছুকাল থেকে, নানাভাবে বাংলা নবজাগরণের স্বরূপ ও তাৎপর্যসন্ধান চলছে। ধর্মান্দোলন, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি সাধনা, মানবতাবোধের বিকাশ, সাহিত্যের ভাব ও রূপের পালাবদল প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বাংলার নবজাগরণকে প্রতিষ্ঠা দান করা হয়েছে। কিন্তু সেই অভিনব ভাবপ্রবাহের গভীরে অনুস্যূত সংগীতের সূত্রটি এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখা হয় নি। অথচ তথ্য ও তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে সংগীতচিন্তা তথা সামগ্রিকভাবে বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে নবজন্মের সূচনা হয়েছিল। বাংলার আবহমান দেশ ও কালের বাতাবরণে সেই সাংগীতিক নবজন্ম সকর্মক, নিগূঢ় ও বহুবিচিত্র রূপান্তরের বার্তাবহ।

বর্তমান রচনায় বাংলা নবজাগরণের সেই উপেক্ষিত কিন্তু অপরিহার্য সংগীতসূত্র অনুসন্ধান করবার চেষ্টা হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত, মূলত রাজনৈতিক অ-স্থিরতায়, বাংলাদেশে অবক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। মানবতার শোচনীয় ও অপমানিত অস্তিত্ব, নারীজাতির অশ্রুসর্বস্ব বন্দিত্ব, স্থূল অশ্লীলতার প্রতি পক্ষপাত, দেশীয় ঐতিহ্যবিহীন ভাবনা ও অপরিকল্পিত সাহিত্যসৃষ্টি প্রভৃতি অবক্ষয়ের মধ্যে বাংলার দেশগত ও জাতিগত কোনো বিশেষত্ব ছিল না। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথ-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েক দশক ব্যাপী জীবনসাধনার মূলমন্ত্র ছিল দেশের এই আত্মদৈন্য মোচন করে নবভাবের প্রবর্তন। সেই প্রবর্তনা কখনো বুদ্ধি ও যুক্তির পথে প্রাগ্রসর হয়েছে, কখনো স্বদেশীয় মহৎ ধর্মাদর্শের মার্গে, আবার কখনো বিদেশী চিন্তানায়কদের নির্দেশিত পথে। তারই পরিণামে নারীত্বের তথা মানবতার স্বীকৃতি, ধর্মনিরপেক্ষ শুভবুদ্ধি, দেশীয় ঐতিহ্য ভাবনা ও বিদেশী নবভাবনার সমীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বিশিষ্টভাবে বাংলা ও বাঙালির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। তৎকালীন সমাজ রাষ্ট্র সাহিত্য ও সমগ্রভাবে চিন্তাধারায় সেই মহাভাববন্যা যদি প্রকৃতই নবীনতার জনয়িতা হয়ে থাকে, তবে বাংলা সংগীতধারায় সেই নবজন্ম কতখানি ব্যাপ্ত ও কী পরিমাণ সৃজনধর্মী তার বিশ্লেষণ অবশ্য কর্তব্য।

ঐতিহাসিক বিচারে বলা হয়, রামপ্রসাদী গানের পরই বাংলাগানের সৃজনপর্ব অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। কেন-না উত্তর-রামপ্রসাদ বাংলাগানে ব্যক্তির মহৎ ভাবাদর্শের পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছিল একধরনের ঐহিক তাঁরল্য ও স্থূল ইন্দ্রিয়তন্ত্র। গানের বাণীতে অশালীনতার সংক্রাম ঘটেছিল। অর্থাৎ, লৌকিকতার প্রতি অতি-আনুগত্য অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণের গীতকারদের আবহমান সাংগীতিক ঐতিহ্য থেকে ভ্রষ্ট করে জন-মনোরঞ্জনের তরল প্রচেষ্টার অভিমুখী করেছিল। সেই কারণেই হাফ-আখরাই, তরজা, খেউড়, পক্ষীদলের গান প্রভৃতি গীতিরীতিতে সৃজনের মত্ততা আছে কিন্তু সৃষ্টির শুদ্ধতা নেই। সে সময়ের গান ভাবের বিচারে নিরাবেগ ও অশালীন, বাণীর বিচারে আনুপ্রাসিক ক্লান্তিময়। গীতরূপায়ণেও প্রাধান্য ছিল তালোন্মত্ত উৎসাহের। অতঃপর, নীলকণ্ঠের মতো সমকালীনতার তীব্র গরলটুকু আত্মসাৎ করে যিনি সৃষ্টির অমৃত পদ্ম প্রস্ফুটিত করলেন তিনি রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু।

অবক্ষয়ের কালে বাস করেও নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯) যে সার্থক সৃষ্টিধর্মী ছিলেন তার কারণ মুখ্যত তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্ব, কিন্তু গৌণত তাঁর দীর্ঘ জীবন। প্রায়-শতায়ু জীবনক্রমায় তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন : ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনা, রামপ্রসাদের সাধনসংগীতের স্বর্গ, পলাশির যুদ্ধ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জনিত জমিদারী বিপর্যয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন, ছাপাখানার ও বাংলা গদ্যের সূচনা, রামমোহনের বেদান্তচর্চা, বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার, ইয়ংবেঙ্গলের উন্মাদনা প্রভৃতি বিচিত্র অভিজ্ঞতার। সেই অভিজ্ঞতার সারদর্শী নিধুবাবু হয়ে উঠেছিলেন একজন ব্যক্তি মানুষ। সেইজন্য

বাংলাসংগীতকে অবক্ষয়ের বৈচিত্র্যহীনতা থেকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে তিনি ভাবের দিক থেকে গ্রহণ করলেন লিরিকের মন্ময় আবেগ এবং রূপায়ণের অভিনবত্ব ফোটালেন পশ্চিম ভারতীয় টপ্পা-রীতির অন্তর্মর্ম লাবণ্যস্পর্শে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, লিরিকের মন্ময় সৌন্দর্য বাংলা সংগীত ও সাহিত্য নিধুবাবুর আগে প্রকৃষ্টভাবে ফুটে ওঠে নি এবং পাঞ্জাবী টপ্পার রূপকল্প নিধুবাবুর আগে বাংলাগানে অজ্ঞাত ছিল। এই বিশেষ সংগীতের স্বরূপ অনুশীলন ও স্বীকরণের জন্য তিনি দীর্ঘকাল পশ্চিম ভারতে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর পরবর্তীকালের সার্থক গীতকারদের (যেমন : রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ) রচনায় লিরিকের মন্ময় সৌন্দর্য ও টপ্পার দানা— এই দুই-ই বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। এইজন্য নিধুবাবু বাংলাসংগীতে ক্রান্তিকালের যুগন্ধর শিল্পী। সংগীতের ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে তাঁর নবীনচিন্তা পরবর্তীকালে পথিকৃৎ হয়েছে।

অবশ্য কোনো দেশের সাংগীতিক পশ্চাদ্গামিতা কোনো-একজন ব্যক্তিশিল্পীর একক সাধনায় মোচন হয় না; সেজন্য প্রয়োজন হয় দেশব্যাপী সচেতন জাগৃতি ও সামগ্রিক সক্রিয়তা। সাংগীতিক নবজন্ম সামগ্রিকতার বোধ থেকে উৎসারিত হয়। বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে সেই সম্মিলিত উদ্যমে ব্যাপক সংগীত-আন্দোলনের সূচনা ঘটে। সে আন্দোলন কখনো নিতান্ত ব্যক্তিগত উদ্যম, কখনো প্রাতিষ্ঠানিক, কোথাও সংগীতবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ, কোথাও সার্বজনিক স্বরলিপি-পদ্ধতি আবিষ্কারের সাহায্যে গীতপ্রচারের কর্তব্যপ্রণোদিত শুভবুদ্ধি। তৎকালীন সংগীত-আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যকলাপের অন্তরালে বাংলাদেশে আধুনিক নানা গীতরীতি এবং স্বরূপত সত্যিকারের বাংলাগান উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি স্মরণীয় যে, এই আন্দোলনের পরিণতি ও প্রভাব হয়েছে ব্যাপক ও বিস্তৃত। তার প্রমাণস্বরূপ দেখা যায়, এই সংগীত-আন্দোলনের নেপথ্যভূমি থেকে ও প্রত্যক্ষভাবে উপাদান সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-নজরুলের রচিত ও সুরারোপিত গানগুলি বাংলার সারস্বতসাধনায় শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হয়েছে।

সংগীতচিন্তার নববাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে সংগীতক্ষেত্রে যে-সব নবভাবনা ও নবপ্রয়াস ঘটেছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখপঞ্জী সম্মুখে রেখে, সে ব্যাপারে তৎকালীন বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই পর্বের সাংগীতিক প্রয়াসগুলি ছিল প্রধানত :

এক. নতুন যুগের ভাবানুযায়ী গান রচনা (ভাব ও ভাষা উভয়তই) এবং সেই গানের ভাবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ গীতরীতি-অনুসরণ। এই প্রচেষ্টা থেকেই মূলত ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্‌খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতির প্রবর্তন ও ক্রমোৎকর্ষ ঘটে। নতুন তালেরও (যেমন মধ্যমান ও একতাল) উদ্‌ভব ঘটে।

দুই. অর্কেস্ট্রা, হার্মনি, অপেরা প্রভৃতি বিদেশাগত সুরবৈশিষ্ট্য বা গীতরীতি সুসমঞ্জসরূপে বাংলাগানে গ্রহণ ও ভাবপ্রকাশের নতুন উপাদানরূপে ব্যবহার।

তিন. দেশে-বিদেশে প্রচলিত নানাপ্রকার স্বরলিপি-পদ্ধতির সারাৎসার করে সর্বজনবোধ্য সরল ও স্বল্পব্যয়ে মুদ্রণোপযোগী একটি স্বরলিপি-পদ্ধতি প্রণয়ন এবং তার সাহায্যে বাংলা ও ভারতীয় গানের প্রচার ও সংরক্ষণ।

চার. সংগীতবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনে সংগীত সম্পর্কে অনুরাগ ও কৌতূহল সৃষ্টি এবং সংগীতসংক্রান্ত সংবাদ প্রচার।

পাঁচ. সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সংগীতবিষয়ক প্রামাণিক কোষগ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ, সংগীতসংক্রান্ত নতুন গ্রন্থ রচনা, ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগীতের ইতিহাস প্রণয়ন।

ছয়. প্রাক্তন গীতকারদের জীবনী রচনা ও গীত সংকলন সম্পাদনার সাহায্যে দেশের প্রবহমান গানের সঙ্গে নবীন সংগীতোৎসাহীদের মেলবন্ধন।

সাত. সংগীত-উন্নয়নী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগীতবিদ্যালয় স্থাপন করে প্রত্যক্ষভাবে তরুণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান, সংগীত প্রচার ও স্বদেশে সংগীতের মানোন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি।

আট. ভারতীয় কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রবাদ্যের কালানুক্রমিক ইতিহাস ও বিবরণ ইংরাজি ভাষায় রচনা করে জগৎসভায় ভারতীয় সংগীতের বহুশতাব্দীবাহিত ঐতিহ্যের পরিচয় প্রদান।

নবভাবনার রূপায়ণ। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে এমন অনেক মহৎ কর্মীপুরুষ জন্মেছেন এবং স্বদেশ ও স্বসমাজের উন্নতিবিধানে আজীবন সাধনা করেছেন যে, সেই সময়ের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান শব্দদুটি প্রায় সমার্থক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, সে যুগের ব্যক্তিরাই ছিলেন এক একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলা সংগীতের নবজন্মের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিত্বের এই দ্বৈত ভূমিকা লক্ষণীয়।

কালক্রমের দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীত-আন্দোলনে প্রথম উল্লেখযোগ্য নাম : রাধামোহন সেন। আনুমানিক ১৬৭৪ খৃস্টাব্দে লিখিত মির্জা খানের 'তুহ্ফাৎ-উল-হিন্দ্' নামে পার্শিভাষায় লেখা সংগীতকোষ অবলম্বনে তিনি বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম সংগীতের কোষগ্রন্থ ভাষান্তরণ করেন। এই গ্রন্থের নাম 'সংগীত তরঙ্গ'। ১২২৫ বঙ্গাব্দের ২৫শে আষাঢ় (ইং ১৮১৮ খৃস্টাব্দ) তারিখে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় রাধামোহন লিখেছেন :

সংগীত বিদ্যার বহুতর গ্রন্থ হয়।
তাবতের ভাষা করা যুক্তিযুক্ত নয়॥
অতএব কতকগুলি গ্রন্থকে ভাঙিয়া।
প্রকাশ করিব আমি নানা ভাষা দিয়া॥

লেখকের সংকল্প অনুধাবন করলে বোঝা যায়, 'সংগীত তরঙ্গ' আসলে ভারতের একাধিক সংগীত-আকর-গ্রন্থের সারানুবাদ প্রয়াস। তার সমর্থন মেলে রাধামোহনের আরেকটি মন্তব্যে :

সংগীত দর্পণ আর দেখ দামোদব।
রত্নাকর মকরন্দ রূপ রত্নাকর॥
মান কুতূহল সভা বিনোদ সংগীত।
পারিজাতক প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত॥

গত শতাব্দীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংগীতের সংকলন ও কোষগ্রন্থ কৃষ্ণানন্দ ব্যাস -কৃত 'সংগীত রাগ কল্পদ্রুম' (১৮৩৪) বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

রাধামোহনের পরে উল্লেখযোগ্য রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম। সংগীতের পরম ভক্ত, পণ্ডিত ও প্রচারক হিসাবে তাঁর সমপর্যায়ের ব্যক্তি যে কোনো দেশেই বিরল। অবশ্য রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গে তাঁর সহযোগী ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নামও স্মরণীয়। এই দুই অসামান্য সংগীতবেত্তা প্রাচীন হিন্দুসংগীত ও ভারতীয় যন্ত্রসংগীতের স্বাতন্ত্র্যপ্রচারে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। বিবরণে পাওয়া যায়, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন একটি 'মিউজিক অ্যাকাডেমি'র সূচনা করেন। সেখানে ভারতীয় কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতের কয়েকজন সার্থক শিল্পী ছাড়াও কয়েকজন সংস্কৃত ভাষায় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতকেও গ্রহণ করা হয়েছিল। শেষোক্তদের কাজ ছিল সংস্কৃত সাহিত্যধারা থেকে ভাবগ্রহণ করে উচ্চ ভাবধারার গান রচনা। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মীদের মধ্যে ছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন স্বয়ং, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, লছমীপ্রসাদ মিশ্র ও কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। দশ বছরের পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'যন্ত্র-ক্ষেত্র-দীপিকা', 'সংগীত-সার' 'কণ্ঠ-কৌমুদী' গ্রন্থ তিনটি এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দের অন্তর্গত কয়েকটি গানের স্বরলিপি। শৌরীন্দ্রমোহন নিজে এগারোখানি গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেন। তিনি বিশেষভাবে ভাবিত ছিলেন হিন্দুসংগীতে পাশ্চাত্য হার্মনির সংযোগ প্রতিষ্ঠায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত 'The Musical Scales of the Hindus : with remarks on the applicability of harmony to Hindu music' গ্রন্থটির চিন্তাধারায় নবভাবনা স্মরণীয় হয়ে আছে। হিন্দুসংগীত সম্পর্কে পাশ্চাত্য সংগীতবেত্তাদের মতামত তিনি সযত্নে সংগ্রহ করে সংকলন করেন 'Hindu-music from various authors' গ্রন্থে। হিন্দুসংগীতের মহিমা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনা তাঁর দেশানুরাগ ও দেশীও সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধার অবিস্মরণীয় স্মারক। কিন্তু সংগীত সম্পর্কে রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'Universal history of music' গ্রন্থরচনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, যখন বিশ্বের ইতিহাস রচনার উপাদান ছিল অপ্রতুল সেই সময় তিনি যে অমানুষিক শ্রমে এ গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে মূর্ত হয়েছে তাঁর ইতিহাসবোধ তথা বিশ্ববোধ। সেইসঙ্গে ফুটে উঠেছে সংগীতের ক্ষেত্রে পারস্পরিক ভাববিনিময়ের আগ্রহ ও চিত্তের ঔদার্য। সৌভাগ্যত, শৌরীন্দ্রমোহন তাঁর দায়িত্বের গভীরতা সম্পর্কে সচেতন মন্তব্য করেছেন গ্রন্থটির ভূমিকায় :

> 'The study of music of various nations is advantageous to the musicians for a number of reasons. The study is important from an ethnological point of view, as it affords him an insight into the inward man and displays the character and temperament of different races, and the relations they bear to one another. It is also important from a historical standpoint, for it shows the different stages of progress which music has made in different countries.'

রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের রচনাবলী সম্পূর্ণত ইংরাজিভাষায় লিখিত; তার কারণ, এই-সব রচনার মূল উদ্দেশ্য বিশ্বের সংগীতসভায় ভারতীয় সংগীতের পরিচয় প্রদান এবং ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে বিশ্ববাসীর সশ্রদ্ধ মন্তব্য উন্নাসিক ও ঐতিহ্যভ্রষ্ট ভারতীয়দের সম্মুখে উপস্থাপন।[১]

শৌরীন্দ্রমোহনের পর বাংলার সংগীতক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বদেশে সংগীতপ্রচারের জন্য তিনি আত্মদান করেছেন বললে ভুল হয় না। জীবনের অপরাহ্নে লেখা তার একটি পত্রাংশে তাঁর গীতাত্মপ্রাণ আত্মজীবনীর প্রকৃতচিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন :

> 'আমি একসময়ে সংগীতে পাগল হইয়াছিলাম। সংগীতচর্চার জন্য উপযুক্ত সাবকাশ পাইতাম না বলিয়া, আমি বেঙ্গল গবর্নমেন্টের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটী পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, যে-পদ এখন লোকে মাথা খুঁড়িয়াও পায় না।'[২]

কৃষ্ণধনের ইচ্ছা ছিল য়ুরোপীয় সাংকেতিক স্বরলিপি এ দেশে প্রচার করা। সেজন্য তিনি বহু চেষ্টা করেন এবং বহু অর্থব্যয়ও করেন; কিন্তু তাঁর ইচ্ছা সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। কেন-না জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -প্রবর্তিত আকার মাত্রিক স্বরলিপি শেষ পর্যন্ত সকলে গ্রহণ করেন। সে প্রসঙ্গ অন্যত্র ব্যাপকভাবে আলোচিত হবে। আপাতত স্মরণীয় যে, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে অনেকগুলি সংগীত-বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৬৭ সালে প্রথম প্রকাশ পায় 'বঙ্গৈকতান'। এই গ্রন্থে ছিল ঐকতান বাদ্যের গৎ। ১৮৬৮ সালে প্রকাশ পায় 'Hindustani Airs arranged for the Pianoforte' ও 'সংগীতশিক্ষা' নামে দুটি বই। ১৮৭৩ সালে প্রকাশ পায় 'সেতারশিক্ষা'। এই-সব গ্রন্থরচনার পশ্চাদপটে পাশ্চাত্য সুরকে এদেশী গানে গ্রহণ করবার এবং

---

১ প্রসঙ্গত শৌরীন্দ্রমোহন -কর্তৃক ইংরাজিভাষায় রচিত প্রধান সংগীত-গ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া গেল :

1. Hindu music from various authors 1875 2. Short notices of Hindu musical instruments 1877 3. Six principal ragas, with a brief view of Hindu music 1877 4. A few specimens of Indian songs 1879 5. Eight tunes 1880 6. The musical scales of the Hindus 1884 7. The twenty-two musical Srutis of the Hindus 1886 8. Six ragas and thirty-six raginis of the Hindus 1887 9. Universal history of music 1896.

২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত। গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০। পৃ. ২৫

দেশী-বিদেশী যন্ত্রসংগীত সম্পর্কে তাঁর উৎসাহের প্রমাণ মেলে। কিন্তু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'গীতসূত্রসার'। নানা অসুবিধার মধ্যে দীর্ঘ দশ বছরের শ্রমে আবদ্ধ উনবিংশ শতাব্দীর এই মহৎগ্রন্থ ১৮৮৫ সালে প্রকাশ পায়। ভারতীয় সংগীতের ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াত্মক উভয়তই এই গ্রন্থ আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ। ভূমিকার সূচনায় লেখক উল্লেখ করেছেন : 'কণ্ঠে গীতচর্চার বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ বিধানার্থ এই পুস্তক প্রণীত ও প্রকাশিত হইল।' ভূমিকার শেষে লেখক জানিয়েছেন : 'এই পুস্তকদ্বারা স্বদেশীয় একটি লোকেরও বিশুদ্ধ সংগীতজ্ঞানের, ও গান শক্তির উন্নতি সাধিত হইলে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব'। কৃষ্ণধনের এই আবেগ ও আকূতি মর্মস্পর্শী। তাঁর অসামান্য স্বাদেশিকতা ও গীতপ্রীতির অভিজ্ঞান 'গীতসূত্রসার'-এর পাঁচশত পৃষ্ঠা।

বাংলা সংগীতের নবরূপায়ণ ও প্রচার ব্যাপারে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিজে অপেরা ঢঙে নাটক রচনা করে এবং কিশোর রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশী-বিদেশী সংগীতের দ্বার উন্মুক্ত করে তিনি বাংলার সংগীতক্ষেত্রে প্রবক্তার গৌরব অর্জন করেছেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি; নানা প্রতিষ্ঠান ও সংগীত উন্নয়নী সভার কাজে ব্যাপ্ত হয়েছিল। অর্কেস্ট্রা প্রবর্তন, সংগীতপত্রিকা সম্পাদন, সংগীতসমাজ স্থাপন, স্বরলিপি সরলীকরণ প্রভৃতি নানা কাজে তাঁর যুগান্তকারী শিল্পবুদ্ধি সার্থকতা দেখিয়েছে। নিজের জীবনস্মৃতিতে নবীন সংগীতসৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এই বলে : 'কি সৌখীন কি পেশাদার কোনো গায়কের কোনো গান ভালো লাগিলেই, অমনি সেটি টুকিয়া লইয়া, আমরা ব্রহ্মসংগীত রচনা করিতে বসিতাম। এইরূপে ব্রহ্মসংগীতে অনেক বড়ো বড়ো ওস্তাদী সুর ও তাল প্রবেশলাভ করিয়াছে।'

লক্ষণীয় যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে যুগের অন্যান্য সংগীতবেত্তাদের মতো সংগীতের ইতিহাস বা কোষগ্রন্থ রচনা করেন নি, কেন-না তাঁর দৃষ্টি ছিল মূলত প্র্যাকটিকাল। সেইজন্য সংগীতকে প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ্যে প্রচার করাই ছিল তাঁর ধ্যান ও ধর্ম। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে তিনি ১৬৮টি গানের স্বরলিপি সংকলন করে যে 'স্বরলিপি গীতি-মালা' প্রকাশ করেন, প্রসংগত সেই গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যেতে পারে :

> 'যদি কোনো শিক্ষার্থী স্বরলিপির কোনো অংশ ঠিক বুঝিতে না পারেন তাহা হইলে আমাকে পত্রের দ্বারা জানাইলে আমি তাহা বুঝাইয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। অথবা গ্রন্থস্থিত কোনো গান যদি মৌখিক শুনিতে ইচ্ছা করেন, কিংবা নিয়মিতরূপে গান শিক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহারও বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।'

উদ্ধৃত বিজ্ঞপ্তিতে যে সদিচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে তাতে সংগীতপ্রাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের সংগীত উন্নয়নে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আগ্রহ

ও আবেগ আরো সার্থকভাবে ব্যক্ত হয়েছিল 'আদি ব্রাহ্মসমাজ সংগীত বিদ্যালয়' এবং 'ভারত সংগীত সমাজ' নামে দুটি সংগীতপ্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন ও পরিচালনার মধ্যে।[৩]

'আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসংগীতের স্থায়িত্ব ও উন্নতিসাধনের জন্য' ১৮৭৫ সালের ৪ঠা জুন আদি ব্রাহ্মসমাজ সংগীতবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি একা পরিচালনা করতেন সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সেখানে ছাত্রদের বিনাবেতনে উচ্চাঙ্গ, কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষক ছিলেন যদুভট্ট। দুর্ভাগ্যত, ক্ষণজীবী এই প্রতিষ্ঠানটির সমগ্র কার্যবিবরণ পাওয়া যায় নি। সেই বিবরণ সংগৃহীত হলে বাংলা ধ্রুপদচর্চার প্রকৃত ইতিহাস সকলে জানতে পারবেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় সংগীতপ্রতিষ্ঠান 'ভারত সংগীত সমাজ' কিন্তু দীর্ঘজীবী হয়েছিল।[৪] পুণায় অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের কাছে অবস্থানকালে সেখানকার 'গায়ন সমাজ' দেখে কলকাতায় অনুরূপ এক সভাস্থাপনে ইচ্ছা জাগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে। 'ভারত সংগীত সমাজ' সেই ইচ্ছারই ফলিত রূপ। সমাজের উদ্দেশ্য ছিল 'বাংলাদেশে সংগীতশিক্ষা, সংগীত অধ্যাপনা, প্রচার এবং বাংলার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন।' সংগীতসমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একহাজার টাকা দান করেন এবং ঠাকুরপরিবার থেকে আরো সহস্রাধিক টাকা সংগৃহীত হয়।[৫]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সংগীতসমাজের প্রথম সম্পাদক। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার ডোয়ার্কিন কোম্পানির স্বত্বাধিকারী দ্বারকানাথ ঘোষের নামও উল্লেখযোগ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় ইনি 'স্বরলিপি গীতি-মালা' নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করেন। বাংলাদেশে হার্মোনিয়ম বাদ্যযন্ত্রের স্রষ্টা ও প্রবর্তক হিসাবেও দ্বারকানাথ প্রসিদ্ধ। উৎকৃষ্ট হার্মোনিয়মবাদকরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুনাম অর্জন করেন এবং ব্রাহ্মসমাজে বাংলা গানে হার্মোনিয়ম বাজিয়ে তিনি বাংলা সংগীতক্ষেত্রে পালাবদলের সূচনা করেন।

বাংলা নাটকে অর্কেস্ট্রার সার্থক প্রয়োগ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যতম কীর্তি। তাঁর পূর্বে ১৮৫৮ সালে ৩১শে জুলাই বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে 'রত্নাবলী' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে বাংলা অর্কেস্ট্রা সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও

---

৩ ছাত্রদের সংগীত শিক্ষাদান ও সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম কৃতিত্ব রামনিধি গুপ্তের প্রাপ্য। জানা যাচ্ছে,

> 'His fame as a singer spread far and wide. Youngmen having a penchant for music clustered around him. Unlike professional songsters, he unreservedly gave them lessons in vocal music. ...Ramnidhi established a society composed mostly of youngmen, for cultivation of music, chiefly vocal music.'

দ্রষ্টব্য : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, ভবতোষ দত্ত, পৃ. ৪০৫

৪ দ্রষ্টব্য : ভারতসংগীত সমাজ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৬০

৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ. ২১৭-২১৮

যদুনাথ পাল।[৬] কিন্তু তাঁদের উদ্যমে ঐকতানসৃষ্টির চাহিদা ছিল গৌণ আর তাঁদের রচিত সুর ছিল ভারতীয় রাগরাগিণীর আশ্রয়ে পুষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রয়াসে বাংলা অর্কেস্ট্রা দেশী-বিদেশী সুরের সমন্বয়ে রচিত এবং ঐকতানে রূপায়িত হয়। এই অর্কেস্ট্রা প্রথম রূপায়িত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই পরিচালনায় ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারি, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে, 'নবনাটক'-এর প্রথম অভিনয় রজনীতে। কনসার্টে যে-সব বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়েছিল তা হল : হার্মোনিয়ম, দুই তিনখানি বেহালা, ক্ল্যারিওনেট, পিক্‌লো, বড়ো বাস-বেহালা, করতাল, ঢোল, বাঁয়াতবলা ও মন্দিরা।[৭] দেশী-বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের এই মিশ্র সমারোহে সেই সময়কার সংগীতজগতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে নবযুগের আভাস এনেছিলেন তার গুরুত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের পরিমাপ আজও হয় নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো বাংলাসংগীতের উন্নতিকল্পে সকর্মক উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন মনোমোহন বসু। বাংলা অপেরার জনয়িতা মনোমোহন বাংলাগানের সমুন্নতিকল্পে প্রধানত প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেকালের বিভিন্ন সভাসমিতিতে তিনি বাংলা সংগীতের পক্ষে বক্তৃতা করতেন। ১২৭৩ সালে (এপ্রিল ১৮৬৭) কলিকাতায় যে হিন্দুমেলার সূচনা হয়, তার অন্তর্ভুক্ত জাতীয়-মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে মনোমোহন ছয়টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন; তার মধ্যে পঞ্চম প্রস্তাবটি ছিল সংগীত প্রাসঙ্গিক। তিনি সেই প্রস্তাবে আশা প্রকাশ করেছিলেন : 'যাহাতে মেলাস্থলে বিবিধপ্রকার সংগীতজ্ঞ গুণিমণ্ডলীর গুণপ্রকাশ, যন্ত্রাদি প্রদর্শন ও সংগীত সম্বন্ধে দেশে সু-ধারার প্রবর্তন হয়।'

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা রঙ্গমঞ্চে পরিবর্তনের স্পর্শ লাগে। বিদেশী নাটকের রূপরীতি ঐ দেশের নাটকে অঙ্গীকৃত করা এবং দেশীয় যাত্রাগানের ধারার সঙ্গে বিদেশী অপেরার সাযুজ্যসাধন এই সময়ের নাট্যনির্মাতা ও প্রয়োগকর্তাদের অন্যতম উদ্‌যোগ ছিল। তারই ফলে, বাংলা-নাটকে গান ও আবহসংগীতের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে যুগোপযোগী চিন্তাভাবনা চলতে থাকে। এই চিন্তাভাবনা ও প্রয়োগকর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিণামে গিরিশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে গানের যথাযথ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পরবর্তীকালে লক্ষিত হয়।

নাটকে গানের এই সংগতিপূর্ণ সন্নিবেশ প্রসঙ্গের প্রথম প্রস্তাবক সম্ভবত মনোমোহন বসু। ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যশালার উদ্বোধন হয়।

---

৬ 'An individual orchestra was composed of genuine ragas and raginis by Kshetramohon Gosain and Jadunath Paul.' (First performance of Ratnavali)
The Theatre : by Ahindra Choudhury, pp. 293.
Studies in the Bengali Renaissance
The National Council of Education, Bengal, Jadavpur 1958

৭ "নবনাটক" নাটক হল; জ্যোতিকা' মশায় অর্গ্যান বাজালেন। সেইবারেই প্রথম অর্গ্যান বাজলো'।— আমাদের পারিবারিক সংগীত চর্চা; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০, পৃ. ১৯

নাট্যশালার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব সভায় মনোমোহন যে ভাষণ দেন তাতে সারা বাংলার গীতময়তার চমৎকার বিশ্লেষণ রয়েছে। [৮]

> 'দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা আপাতত অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করিতেছি। তাহার প্রথমটি গীতের প্রসঙ্গ। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড়ো আবশ্যক করে না। ইউরোপীয় রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয়কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা এই সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে দেশে সকল সময়ে সকলস্থানে সকলকার্যেই গান নহিলে চলে না... সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সংগীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে?
>
> 'আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই বোধ হয়, যে, অভিনেতৃগণ অধুনা যেরূপে অভিনয়ের নিমিত্ত যত্ন পান, তৎসঙ্গে গানের পারিপাট্য সাধনার্থ যদি তদ্রূপ মনোযোগী হইতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের অভিনয় দর্শনসময়ে শ্রোতা ও দর্শকমণ্ডলী এককালে মোহে অভিভূত হইয়া গলিয়া যাইবেন। আমি এমন বলিতেছি না, যে, যাত্রাওয়ালারা যেমন কথায় কথায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকেও তদ্রূপ হউক। আমার অভিপ্রায় এই যে, স্বভাবোক্তির পর যেখানে যেখানে গান খাটিতে পারে, তাহা উক্ত স্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় যতই কেন হউক না ফলতঃ যে কয়টি গান হইবে, সে কয়টি যেন উত্তমরূপে গাওয়া হয়। ফল কথা, আমরা মধ্যস্থ মানুষ; আমরা চাই দেশে পূর্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও।'

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সর্বপ্রকার নবভাবনার মূলমন্ত্র ছিল, পূর্বাগত ধারাকে বিলোপ না করে নতুন যুগের উপযোগী পরিমার্জিত রূপান্তর সাধন। এই পরিমার্জনের জন্য আদর্শহিসাবে গৃহীত হয়েছে কখনো ভারতের অন্যপ্রদেশের ধারা ও সংস্কৃত মহৎ ঐতিহ্য, কখনো বৈদেশিক ধারা। বাংলা সংগীতের নবভাবনাতেও এই পরিমার্জন-সংস্কার ব্যাপারে ভাবের দিক থেকে আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল ঔপনিষদিক মহৎ গাম্ভীর্য; রূপের দিক থেকে গৃহীত হয়েছিল উদাত্ত ধ্রুপদ, উচ্ছল খেয়াল ও অন্তর্মর টপ্পা। বিদেশী সংগীতের রূপরীতি, বিশেষত অপেরার ভঙ্গিও বাংলা গানে বিশেষ আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছিল।

অবশ্য অন্যপ্রদেশের গীতধারা বাংলা গানে গ্রহণ করবার জন্য গত শতাব্দীর যে-সব বাঙালি সংগীতব্রতী সক্রিয় অনুশীলন করেছিলেন তাঁদের সকলের নাম জানা যায় না। ব্যক্তিগত সাধনার নীরব প্রাঙ্গণ থেকে তাঁরা কদাচিৎ সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করতেন। কিন্তু তাঁদের কর্মসাধনার পরোক্ষপ্রভাব এখনকার বাংলাগানেও পাওয়া যায়। পাঞ্জাবি

---

৮ সাহিত্যসাধক চরিতমালা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫১ খণ্ড

টপ্পাকে বাংলোগানে প্রয়োগ করে কীর্তিমান হয়েছেন নিধুবাবু এবং বাংলাগানের সঙ্গে য়ুরোপীয় সুরের পরিণয় সাধনে আচার্যের ভূমিকা নিয়ে প্রসিদ্ধ হয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এঁদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞাত যে-দুজন উদ্যমী সংগীতশিল্পীর নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন কালী মির্জা ও মহেশ মুখুজ্যে।

কালী মির্জা (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একজন গায়ক ও গীতরচয়িতা। সংস্কৃত ও পার্শিভাষায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে কাশী গিয়ে তিনি বেদান্ত ও সংগীতচর্চা করেন। উত্তরভারতীয় গীতরীতির ব্যাপকতর চর্চার জন্য পরে তিনি লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী যান। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সে বাংলাদেশে ফিরে সংগীতরচনা ও শিক্ষা দান করে বাকি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কালী মির্জার কাছে রামমোহন রায় সংগীতশিক্ষা করেন বলে শোনা যায় এবং 'মির্জা মহাশয়ের সমীপে সংগীত শিক্ষা সময়ে মহাত্মা রামমোহনের হৃদয়ে অদ্বৈতবাদিতার বীজ প্রথম রোপিত হয়'— এই তথ্য স্মরণীয়।[৯]

মহেশ মুখুজ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ। টপ্পা ও টপ্-খেয়াল সংগীতে তিনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ গুণী। পাঞ্জাবি টপ্পা ও গোয়ালিয়র-ঘরানার ধ্রুপদ-খেয়াল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভ করতে তিনি গোয়ালিয়র যান এবং পশ্চিমী টপ্পার একজন পারদর্শীরূপে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষাদানে বাংলাসংগীতে পশ্চিমী টপ্পার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি (অর্থাৎ, শোরী, হামেদুন ও মস্ত বুলবুল্-এর বিখ্যাত গান) সমীকৃত হয়।[১০]

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণে বহু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি এবং বহু প্রতিষ্ঠান (যেমন তত্ত্ববোধিনী সভা, স্কুল বুক সোসাইটি, হিন্দুমেলা, সঞ্জীবনীসভা প্রভৃতি) সক্রিয়-ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঠিক তেমনই বাংলা সংগীতের নবজাগরণের বহু প্রখ্যাত গীতকার, গায়ক ও নাট্যকার ছাড়াও বহু সংগীত উৎসাহী কর্মী ও প্রতিষ্ঠান দেশের সংগীত উন্নয়নে আত্মদান করেছেন। তাঁদের সাধনা ও সংকল্পের পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হলে আমাদের স্বদেশসাধনার এক নব ইতিহাস জানা যাবে।[১১]

সংগ্রহ ও সংকলন : সংরক্ষণ

রেনেশাঁসের অন্যতম লক্ষণ ইতিহাসচেতনা এবং সেই চেতনার পরিচয় ফুটে ওঠে দেশের অতীতের প্রতি নব দৃষ্টিপাতে, প্রাক্তন ঐতিহ্যের নতুন ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণপ্রবণতায়।

---

৯ দ্রষ্টব্য : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী : ভবতোষ দত্ত, পৃ. ৪৩৯

১০ দ্রষ্টব্য : Music and Song by Amiyanath Sanyal. Studies in the Bengali Renaissance. P. 311.

১১ এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক কর্মহিসাবে দ্রষ্টব্য :

শতবর্ষের বাংলা গানের দিগ্দর্শনী : অমিয়নাথ সান্যাল। Krishnagar College Centenary Commemoration Volume 1948.

এই অর্থেই রেনেশাঁসের নামান্তর পুনর্জন্ম বা নবজন্ম। কোনো জাতি যখন ভাবতে পারে : তাদের কী ছিল, কী হয়েছে এবং কী তাদের হওয়া দরকার, তখন সেই জাতির ঘটে নবজাগরণ তথা নবজন্ম। এই নবজন্মের ভিত্তি আসলে এক অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্যের বোধ, যে বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নবচেতনার সৃষ্টিসম্ভার প্রকাশ করে।

সুখের বিষয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই অতীতপ্রীতি এবং দিগদর্শী ইতিহাসচেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন। জীবনের প্রারম্ভ পর্যায়ে তিনি কবিওয়ালাদের দলে গান বাঁধতেন এবং তাঁর চেতনা দেশের অতীত কবি-গীতকারদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান ছিল। প্রাক্তনের প্রতি তাঁর এই সশ্রদ্ধ অনুরাগ মূলত ব্যক্তিগত কিন্তু অংশত তৎকালীন নবজাগরণের উত্তেজনাজাত। বাংলাদেশের অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাব থেকে তিনি তাঁর কয়েকজন যোগ্য সাহিত্যশিষ্যকে জাতীয়তাবাদের অম্লান আদর্শে দীক্ষিত করেন। বাংলার প্রাক্তন কবি ও গীতকারদের জীবনচরিত ও রচনা সংগ্রহ ব্যাপারে ঈশ্বর গুপ্ত আকুল আগ্রহ প্রকাশ করে আবেদন করেছিলেন :

> 'এতদ্দেশীয় যে-সকল প্রাচীন কবি মহাশয়েরা বঙ্গ ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রণীত পুরাতন কবিতা ও সংগীত সকল এবং সেই সেই পুরুষের জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া যিনি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন, আমরা মহোপকার স্বীকার পূর্বক যাবজ্জীবন তাঁহার স্থানে কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ রহিব, এবং তাঁহাকে দেশহিতৈষি-দলের প্রধান শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিব। এই মহা মঙ্গলময় ব্যাপারে ক্লেশ ও শ্রমস্বীকার জন্য যদিস্যাৎ কেহ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রত্যাশা করেন, আমরা যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব তৎপ্রদানেও বিরত হইব না।... যদবধি এই দেহের সৎকার্য না হয় তদবধি এই সৎকার্য সাধনে যদ্যপি সর্বস্ব যায়, নিঃস্ব হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয় তথাচ আমরা এই কর্তব্যকল্পে কখনই ক্ষান্ত হইব না।'

ঈশ্বর গুপ্তের এই অঙ্গীকার ব্যর্থ হয় নি। ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে তিনি বাংলার প্রাচীন কবি-গীতকারদের জীবনী ও রচনা সংগ্রহ করে সংকলিত করেন। ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালাদের সমুদয় রচনা ও বিবরণ সংগ্রহ করে তিনি যেমন বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন, তেমনই রামপ্রসাদ ও রামনিধি গুপ্ত-সংক্রান্ত সমুদয় জীবনী-তথ্য ও গীতসংগ্রহ করে বাংলাসংগীতের অতীত সূত্রটি নির্দেশ করেছেন। অতীতের সংগীতনায়কদের জীবনবৃত্তান্ত সংকলন এবং প্রাক্তন গীতসংগ্রহের প্রয়াস বাংলাদেশে ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম সম্পন্ন করেন।

ঈশ্বর গুপ্তের আবেদন অনুসারে আর কজন বাঙালি গীতসংগ্রহ ও জীবনীরচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন তার সামগ্রিক বিবৃতিদান সম্ভব নয়। তবে ঈশ্বর গুপ্ত প্রবর্তিত ও নির্দেশিত জীবনীরচনা ও গীতসংগ্রহের রীতি দীর্ঘকাল চলেছিল। তার প্রমাণ মেলে ১৩১০ বঙ্গাব্দের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা 'সংগীত প্রকাশিকা' মাসিক পত্রিকার দুটি সংখ্যায়। মাঘ সংখ্যায় ও ফাল্গুন সংখ্যায় বলীন্দ্র সিংহদেব যথাক্রমে সংগীত-গুরু ৺রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের ও সংগীতাচার্য ৺অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী রচনা করেন।

প্রাচীন গীতসংকলন ব্যাপারেও এই শতাব্দীতে বিশেষ উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। তার কারণ, বাংলাগানের বহুশতাব্দীবাহিত ঐতিহ্যের দিকে এইসময়ে বহুজনের আগ্রহদৃষ্টি প্রসারিত হয়। বিশেষভাবে সংগ্রহ ও সংকলিত হয় বৈষ্ণব পদগীতি। সংকলনগুলির নামে যে 'রত্ন' শব্দটির প্রয়োগ আছে তার থেকেই গানগুলির সংগ্রাহক ও সম্পাদকগণের সশ্রদ্ধ অনুরক্তির পরিচয় আছে। এ জাতীয় সংকলনগুলি আত্মপ্রকাশ করে প্রধানত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে। প্রধান গীতসংকলনগুলির এক কালানুক্রমিক তালিকা এখানে সংযোজিত করা হল।

গ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক বা সংকলয়িতার নাম
গীতরত্ন	১২৪৪	রামনিধি গুপ্ত
কমলাকান্ত পদাবলী	১২৯২	শ্রীকান্ত মল্লিক
প্রেমসংগীত	১২৯৪	—
গুপ্তরত্নোদ্ধার	১৩০১	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গীতরত্নমালা	১৩০৩	অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়
গীতাবলী	১৩০৩	বৈষ্ণবচরণ বসাক
প্রীতি গীতি	১৩০৫	অবিনাশচন্দ্র ঘোষ
সাধক সংগীত	১৩০৬	কৈলাসচন্দ্র সিংহ

তালিকাটি নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ, কিন্তু গীতসংকলন প্রণয়ন করবার এই প্রবণতা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুইদশক পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল। তার থেকে বোঝা যায়, এ জাতীয় সংকলন প্রণয়নের পশ্চাদ্‌পটে বাঙালির তাৎক্ষণিক ভাববিলাস ছিল না, এই প্রবণতা বস্তুত এক বৃহৎ ভাবান্দোলনের প্রতীকস্বরূপ।

সংগীত-বিষয়ক পত্রিকা

বাংলাগদ্যে লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮০১ খৃস্টাব্দে। প্রথম বাংলা সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত ১৮১৮ খৃস্টাব্দে 'দিগদর্শন' বা 'সমাচারদর্পণ' প্রভৃতি প্রথমদিকের কয়েকটি শিশুপত্রিকাকে সূত্র করে অচিরে বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাব ও আদর্শগত সংঘাত-সংগ্রাম শুরু হল। তার ফলে একাদিক্রমে আরো অনেকগুলি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অন্যতম যুগসমস্যা ছিল ধর্মাদর্শের দ্বন্দ্ব। একদিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে নবাগত ইংরাজদের খৃস্ট-ধর্মপ্রচারের চেষ্টা; আরেকদিকে নব আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার এবং সনাতন হিন্দুধর্মের সমর্থকগণের ভাবান্দোলন। ত্রিধাবিভক্ত এই ধর্মাদর্শগত সংগ্রাম রূপায়িত হতে লাগল প্রত্যেক দলের নিজ নিজ পত্রিকার মাধ্যমে। সেইজন্য প্রাথমিক বাংলা সাময়িক পত্রগুলি ধীরে ধীরে বিতণ্ডার অস্ত্র হয়ে উঠল। অবশ্য সেই প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের নেপথ্যে দেশ ও জাতির কল্যাণচিন্তার একটি অলক্ষ্য সদিচ্ছা অন্তর্লীন

ছিল ধর্ম ও দল নির্বিশেষে। ক্রমশ বাংলার শিক্ষিত সমাজে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্যাদর্শ প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে দল ও মতের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পেল পত্রিকার সংখ্যাধিক্য সেই পরিমাণে হল। কালক্রমে অবশ্য বাংলা সাময়িক পত্রের এই যুযুধান অস্থিরতা কেটে গিয়ে সুস্থ ও গভীর গঠনমূলক কর্মে নিয়োজিত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সূত্রে শিক্ষিত বাঙালির মননচিন্তা, মহৎ ভাবাদর্শ, মানবিকতার শুভ্র সাধনা, সাহিত্যের নবরূপ প্রভৃতি বিকশিত হয়। বাংলাগদ্যের বিকাশেও সাময়িকপত্রের ভূমিকা নিগূঢ়।

বাংলা সাময়িকপত্রের এই গুরুতর কর্মপ্রয়াসের পাশাপাশি আরেক ধরনের লঘুস্বভাবের সাময়িক পত্র বেশ প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল। মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে শেষ দশক পর্যন্ত নানা বিচিত্র ধরনের পত্র-পত্রিকা, অনেকটা ফ্যাশনের মতো, সচল ছিল। রঙ্গতামাসার পত্রিকা, নাটক ও নাট্যমঞ্চ-সংক্রান্ত পত্রিকা, এমন-কি পশুদের সম্পর্কে একটি পত্রিকা, পশ্বাবলী-র খবর পাওয়া যায়। এই জাতীয় বিচিত্র ভাবধারার তরঙ্গেই সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংগীতবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু অচিরে আরো অনেক সংগীত-পত্রিকা বেরোতে থাকে, তার সব কটাই কিছু ফ্যাশনের টানে আসে নি। বরং সংগীত সম্পর্কে গভীর মনস্কতা ও অন্যান্য নানা যুগোপযোগী চিন্তাধারা সে-সব পত্র-পত্রিকায় লক্ষ করা যায়। সেইজন্য এ সিদ্ধান্ত অসংগত নয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীতক্ষেত্রে নবভাবনার টানে সংগীত-পত্রিকাগুলি স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করে এই অনুমান দৃঢ়তর হয়, পত্রিকাগুলির অন্তর্ভুক্ত তিনটি উদ্দেশ্য লক্ষ করে। প্রথমত, নিছক রঙ্গতামাশা বা জনমনোরঞ্জন সম্পর্কে পত্রিকাগুলির কর্তৃপক্ষের অনাগ্রহ; দ্বিতীয়ত, পত্রিকাগুলি অবলম্বন করে সংগীতক্ষেত্রে বিতণ্ডাসৃষ্টির অনিচ্ছা; তৃতীয়ত, গানের স্বরলিপি-প্রকাশ, নানাজাতীয় গান-সংগ্রহ, সংস্কৃতভাষায় লেখা সংগীতের কোষগ্রন্থগুলির অনুবাদ, সংগীতবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা প্রভৃতি সৎপ্রয়াসের সাহায্যে দেশীয় সংগীতের উন্নয়ন ও প্রচারব্রত। সংগীত সম্পর্কে উৎসাহী নানা ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ ও পোষকতায় এই জাতীয় সংগীত-পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। ক্রমশ এই জাতীয় পত্রিকার উদ্যমে সংগীত-আন্দোলন ব্যাপক রূপলাভ করে এবং সমকালীন অন্যান্য বিষয়ক পত্রিকাতেও সংগীত প্রসঙ্গ সংযুক্ত হতে থাকে কিংবা ক্রোড়পত্ররূপে স্বীকৃত হতে থাকে। 'তত্ত্ববোধিনী', 'সাধনা', 'ভারতী' প্রভৃতির মতো সেকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্রগুলিতে সংগীত-প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে বাংলাসংগীতের নবভাবনার পরম স্বীকৃতি।

বস্তুত, যে কোনো দেশের সংগীতকলার মানোন্নয়ন, প্রচার ও সংরক্ষণ-ব্যাপারে সংগীত-পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত হয়। যে জর্মান-সংগীতের শ্রেষ্ঠত্ব আজ বিশ্বস্বীকৃতি পেয়েছে তার মূল্যায়ন ও প্রচারে সর্বপ্রথম অগ্রণী হয়েছিল ১৭২২ খৃস্টাব্দের মাথেসনের 'Musica Critica' এবং ১৭২৮ খৃস্টাব্দের টেলম্যানের 'Der Getreve Musik-Meister' নামে দুইটি জর্মান পত্রিকা। ইংলন্ড থেকে প্রকাশিত

'Quarterly Musical Magazine' (প্রথম প্রকাশ ১৮১৮ খৃস্টাব্দ) এবং ন্যু-ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ 'The Musical Quarterly' (১৯১৫ খৃস্টাব্দে রুডল্‌ফ্‌ স্কিরমার প্রতিষ্ঠিত) অথবা সম্প্রতিলুপ্ত 'Penguin Music Magazine' আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংগীত সম্পর্কে নিত্য-নূতন চিন্তাধারা ও সম্ভাবনাকে বার বার লোকসমক্ষে হাজির করেছে। কোনো কোনো প্রসিদ্ধ সংগীতনায়ক কোনো সংগীত-পত্রিকাকে আশ্রয় করে তাঁর মতবাদ ও সৃজনকর্ম বিষয়ে মনের ভাবকে অনর্গলিত করেছেন, তার ফলে পরবর্তীকালে সংগীতপিপাসুরা অনেক মূল্যবান সূত্র পেয়েছেন। উদাহরণত উল্লেখযোগ্য প্রখ্যাত জর্মান সংগীতজ্ঞ হুগো উল্‌ফের নাম, যিনি জর্মানীর 'Wiener Salonblatt' নামে সংগীত-পত্রিকায় রোমান্টিক সংগীতের বিরুদ্ধে আলোচনার ঝড় তুলেছিলেন। সংগীত-পত্রিকা কেমনভাবে একজন মহান শিল্পীকে সকলের সামনে পরিচিত করে দেয় তার অবিস্মরণীয় বিবরণ বহন করছেন জর্মানীর 'Neue Zeitchrift fiir Musik' পত্রিকা। পত্রিকা-সম্পাদক বিশ্ববিশ্রুত সুরকার রবার্ট শুমান এই পত্রিকাতেই New Path প্রবন্ধের মাধ্যমে জোহানেস ব্রাহম্‌সের সংগীত প্রতিভাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে লিখেছিলেন :

> 'I thought that sooner or later someone would and must appear, distined to give ideal expression to the spirit of the times; one who could not gradually show the development of his genius, but who, like Minerva, would spring fully armed from the head of Jove. And he has come, a young blood at whose cradle Graces and Meroes kept watch. His name is Johannes Brahms. ... He bears all the inner characteristics and cutword signs that proclaim that he is one of the elect.' [১২]

শুমানের এই স্বাগত-প্রবন্ধ কীভাবে জোনানেস ব্রাহম্‌সের শিল্পীজীবনকে নতুন পথে পরিচালিত করেছিল তার বিবরণ [১৩] যেমন আকর্ষণীয় তেমনই অভিনব।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীত-পত্রিকাগুলি আন্তর্জাতিক সংগীতক্ষেত্রে বিশেষ সক্রিয় না হলেও (বাংলাভাষার সীমাবদ্ধতায় যা অসম্ভব) এই দেশের সংগীত-ভাবনা ও কর্ম-রূপায়ণের প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল। অবশ্য এখনকার শিক্ষিত মানুষ সেই-সব পত্রিকার সক্রিয় কর্মসাধনের সংবাদ সম্পূর্ণত অবগত নন এবং পত্রিকাগুলির নামও সম্ভবত অনেকে জানেন না। এর কারণ, হয়তো, সংগীত সম্পর্কে বর্তমানকালের বাঙালির অসামান্য নিরুৎসুক স্বভাব কিংবা অন্যান্য প্রসঙ্গে অতি উৎসাহ। যাই হোক, বাংলাসংগীতের নবরূপায়ণের বাতাবরণে বাংলার সংগীত-পত্রিকাগুলি যে-সকল ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি বিষয় ছিল : ১. বাংলাসংগীতের প্রচার ২. স্বরলিপি-পদ্ধতির স্বপক্ষে যুক্তি ও জনমত সৃষ্টি

---

১২ Brahms. by Ralph Hill. Duckworth, London pp. 35-36

১৩ দ্রষ্টব্য : Schumann, by André Boucourechliev. Evergreen Profile Book 2. New York

৩. সংগীত-সংক্রান্ত প্রামাণিক কোষগ্রন্থগুলির অনুবাদ ৪. য়ুরোপীয় ও বিশেষত বিলাতি সংগীতের সুর ও ঢং বাংলাসংগীতে গ্রহণ করার অনুকূলে সংগ্রাম ৫. লুপ্তমান ও বিস্মৃতপ্রায় গানের সংগ্রহ ৬. বাংলা ও ভারতের বিশিষ্ট সুরশিল্পীদের জীবনীরচনা এবং ৭. সংগীত-সমালোচনার প্রবর্তন।

বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম সংগীত-পত্রিকার নাম 'সংগীত চিত্তসন্তোষ'। পত্রিকার পরিচালক ছিলেন উমাচরণ সেন ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। ১২৭৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (ইং ১৮৭০ খৃস্টাব্দ) মাসিক পত্রিকারূপে এটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু অল্পদিন চলে বন্ধ হয়ে যায়।

রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের উদ্‌যোগে ১২৭৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (ইং ১৮৭২ খৃস্টাব্দ) 'সংগীত-সমালোচনী' প্রকাশ পায়। সম্ভবত এটি শৌরীন্দ্রমোহনের 'মিউজিক অ্যাকাডেমি'-র মুখপত্র ছিল। সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। পত্রিকার আয়ুষ্কাল ছয়মাস। এর পর ১২৮৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (ইং ১৮৭৮ খৃস্টাব্দ) রাজকৃষ্ণ রায়ের সম্পাদনায় নতুন একটি সংগীত-পত্রিকা 'বীণা' আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকাটিতে বেশ কিছুদিন গানের স্বরলিপি ছাপা হয়েছিল। পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল অজ্ঞাত।[১৪]

ইতিমধ্যে বাংলাভাষায় অন্যান্য বিষয়ক সাময়িক পত্রিকাগুলিতে কিন্তু সংগীত-সম্পর্কিত প্রসঙ্গোক্তি ও আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। সেই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ১৮৬৯ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসের 'তত্ত্ববোধিনী'-পত্রিকার শেষে অতিরিক্ত ছয় পৃষ্ঠার ক্রোড়পত্রে সংযোজিত : 'সংগীত লিপিবদ্ধ করিবার চিহ্নাবলী' এবং তার অনুষঙ্গে পাঁচটি ব্রহ্মসংগীতের স্বরলিপি। মুদ্রিত আকারে স্বরলিপি প্রচারের উদ্যম সর্বপ্রথম এইখানেই লক্ষ করা যায়। এর বেশ কয়েক বছর পরে ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের 'বালক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ঠাকুরপরিবারের প্রতিভাদেবী 'সহজে গান শিক্ষা' এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় 'গান অভ্যাস' শিরোনামে স্বরলিপি প্রচারে সক্রিয় হয়েছিলেন। ঐ পত্রিকায় তৃতীয় সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বোম্বায়ের গানবাজনা' প্রবন্ধে ভিন্নপ্রাদেশিক সংগীত-ধারা সম্পর্কে বাঙালির নবজাগ্রত কৌতূহলের চিহ্ন রয়েছে। একাদশ সংখ্যায় মুদ্রিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাঙালির গান' প্রবন্ধে নতুন যুগচিন্তা ও সংগীতের নবভাবনার চমৎকার পরিচয় রয়েছে :

> 'ইংরাজি সংবাদপত্রই বল আর বাঙালা মাসিক পত্রই বল, বাঙালির সংবাদ, বাঙালির গান কোথাও পাইবে না।... বাঙালি একা থাকিয়া কিছু করিতে পারিত না, ইংরাজ আসিয়া তাহার দশা ফিরিয়াছে, তাহার মুখের ভাব আর একরকম হইয়াছে। এখন আবার ভারতবর্ষের অন্য জায়গা হইতে স্রোত বহিয়া বঙ্গদেশে যাইতেছে। বাঙালির গান ভারতবর্ষের গান হওয়া চাই, তবেই সে গান টিঁকিবে।'

---

১৪ 'সংগীত চিত্তসন্তোষ', 'সংগীত-সমালোচনী' ও 'বীণা'-র ফাইল বর্তমান লেখক কোথাও পান নি। কেউ এ সম্পর্কে আলোকপাত করলে ইতিহাসের ছিন্নসূত্র যোজিত হবে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা কর্তব্য যে, 'বালক' পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত, হর্বার্ট স্পেনসর-প্রভাবিত 'সুরে নাটক' বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়ার স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল।

'বালক' পত্রিকার মতো সংগীত-সচেতনতা, সম্ভবত যুগবৈশিষ্ট্যবশত, সমকালের অন্যান্য সাময়িক পত্রতেও লক্ষ করা যায়। এই সূত্রে স্মরণীয় যে, 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় 'সহজে গানশিক্ষা' এবং 'সংগীত-শিক্ষা' নামে ধারাবদ্ধ স্বরলিপিপ্রচার নিয়মিত চলেছে। এই বিভাগটি পরিচালনা করতেন ঠাকুরবাড়ির প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী ও ইন্দিরা দেবী। স্বরলিপি প্রকাশ ব্যাপারে এই পত্রিকার সক্রিয়তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়, ১২৯৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় বর্ষার গানের স্বরলিপি, মাঘ সংখ্যায় বেদগানের, আষাঢ় সংখ্যায় মহীসূরী গানের স্বরলিপি প্রভৃতির মধ্যে। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বীণা' নামক সংগীত-পত্রিকার পর ১২৯৪ বঙ্গাব্দে নতুন অংশত একটি সংগীত-পত্রিকা 'গান ও গল্প' প্রকাশ পায়। পত্রিকাটিতে কিছু গান ও গল্প মুদ্রিত হয়েছিল। গানগুলিতে রাগ ও তালের নির্দেশ থাকত কিন্তু স্বরলিপি থাকত না। এর পর ১২৯৭ বঙ্গাব্দে দুর্গাদাস দে-র প্রকাশনায় 'মজলিস' নামে যে-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে তার নামপত্রে যদিও উল্লেখ ছিল 'বৈঠকী আলাপ, সংগীত, কবিতা, খোসগল্প, চরিত্রসমালোচন, চুটকী, রং তামাসাপূর্ণ মাসিক পত্রিকা', তবু শেষ পর্যন্ত সংগীতই এ পত্রিকায় প্রধান স্থান পায়। তার কারণ, প্রকাশক সর্বপ্রকার সংগীতসংগ্রহে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। পত্রিকার 'গোড়ার কথা'-য় তিনি নিবেদন জানান :

> 'সরস সংগীতের মধ্যে প্রেম সংগীতই, বোধ হয়, বিশেষ চিত্তরঞ্জক : সুতরাং নির্বাচনকালে তৎপ্রতিই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। অন্যান্য সংগীত যে আদৌ থাকিবে না, এমন কথা বলিতেছি না। প্রথমে আমরা ভালো ভালো পুরাতন সংগীত সকল গ্রহণ করিব।'

বাংলা সংগীত-পত্রিকার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ডোয়ার্কিন কোম্পানির অর্থানুকূল্যে তিনি ১৩০৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৮৯৭ খৃস্টাব্দ) 'বীণাবাদিনী' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশে সংগীতপ্রচার ও সংরক্ষণ-ব্যাপারে এই পত্রিকার এক স্থায়ী অবদান রয়েছে। মাত্র দুই বৎসরে 'বীণাবাদিনী' বাংলার সংগীতসমাজে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। পত্রিকাটির ঐতিহাসিক দিক থেকেও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে; কেন-না স্বরলিপিপদ্ধতির সরলীকরণের যুক্তিসমূহ এই পত্রিকার পাতাতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন এবং সেই সূত্রে বাংলাদেশের সংগীতমোদী জনসাধারণকে আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির অনুরাগী করে তোলেন। তাঁর প্রবর্তিত এই আকারমাত্রিক পদ্ধতিই বাংলা সংগীতে গৃহীত হয়েছে এবং সর্বাধুনিক কালেও প্রচলিত রয়েছে। সম্পাদকরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সবরকমের গানের স্বরলিপি সংগ্রহের ব্রত নিয়েছিলেন। 'বীণাবাদিনী'-র আশ্বিন, ১৩০৪ সংখ্যায় 'সম্পাদকের নিবেদন' অংশে দেশ ও জাতির সংগীত সংরক্ষণ আকাঙ্ক্ষা তাঁর ভাষায় গভীর আন্তরিকতার স্পন্দনমান। তিনি লিখেছেন :

'স্বরলিপি-লেখক মহাশয়দিগের প্রতি সানুনয় নিবেদন এই, শ্যামাবিষয়ক গান, কৃষ্ণবিষয়ক গান, বাউলের গান, কীর্তনের গান, যাত্রার গান, থিয়েটারের গান, হাসির গান, হিন্দুস্থানী গান প্রভৃতি বিবিধপ্রকার গানের মধ্যে, যিনি যাহা জানেন, তাহার স্বরলিপি করিয়া যদি তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দেন তবে বড়োই ভালো হয়। হিন্দু-সংগীত লিপিবদ্ধ করিয়া উহার স্থায়িত্ব বিধান করাই বীণাবাদিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য।'

অন্যান্য সংগীত-পত্রিকার মতো 'বীণাবাদিনী'-তেও নিয়মিত স্বরলিপি ছাপা হত; অধিকন্তু সংগীত সম্পর্কে গভীরতর চিন্তাভাবনাবাহী রচনাও লক্ষ করা যায়। বস্তুত, সংগীতের ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াত্মক এই উভয়বিধ বিষয়ে বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম আলোচনার সূত্রপাত হয় 'বীণাবাদিনী'-তে।[১৫] ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় 'রাগের মূর্ছনা, স্বর-মিল' রহস্য প্রবন্ধ এবং আশ্বিন সংখ্যায় 'তাল কাহাকে বলে' প্রবন্ধ গভীরতর দৃষ্টির পরিচয় বহন করছে।

তৎকালীন বাংলাসংগীতে বিদেশাগত অর্কেস্ট্রারীতি সম্পর্কে নতুন চিন্তা ও পরিকল্পনার আভাস 'বীণাবাদিনী' পত্রিকায় বিশেষ স্থান লাভ করেছিল। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সমবেত-বাদ্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রবন্ধে মত প্রকাশ করা হয়েছে যে :

'বহুমিলের অভাবে, আমাদের সমবেত বাদ্য, অনেক সময়ে একঘেয়ে হইয়া পড়ে। উহাতে আর একটুকু বিচিত্রতা সঞ্চার করা আবশ্যক। বহুমিলের অভাবে, বিচিত্রতা সম্পাদনের একটি উপায় আছে। কোনো একটি বিশেষ রাগরাগিণী বাজাইবার সময়, ঝাঁপতাল, সুর ফাঁকতাল একতালা, কাওয়ালি প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দের তালের ফেরতায় যদি সেই সুরটি সমবেত বাদ্যে বাজান যায়, তাহা হইলে উহার একঘেয়ে ভাব অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে।'

'বীণাবাদিনী' পত্রিকা দুই বছর চলে বন্ধ হয়ে যায়; তার কারণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে 'ভারত সংগীত সমাজ' স্থাপন করেন এবং ত্রিপুরার রাধাকিশোর মাণিক্যদেব বর্মণের অনুরোধে সংগীতসমাজের মুখপত্ররূপে 'সংগীত প্রকাশিকা' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। সুতরাং 'সংগীত প্রকাশিকা' যদিও ১৩০৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর সূচনায় আত্মপ্রকাশ করে, তবু তা 'বীণাবাদিনী'র অনুপূরক তথা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীতের নবভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। পত্রিকাটি দশ বছর চলেছিল। 'সংগীত প্রকাশিকা'-র সম্পাদকরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষ্য সংস্কৃত ভাষায় লেখা সংগীতের কোষগ্রন্থগুলি বঙ্গানুবাদ। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য' শিরোনামে সে কথা স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছিল :

---

১৫ অবশ্য গ্রন্থাকারে এই দুই বিষয়ে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল এর আগে; শৌরীন্দ্রমোহন ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীত গ্রন্থাবলী প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য। তবে ঐ বিষয়ে পত্রিকাকেন্দ্রিক Discourse 'বীণাবাদিনী'-তেই প্রথম শুরু হয়।

'আজকাল, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ কাব্য প্রভৃতি বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ-সকল অনুবাদিত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে বহুলরূপে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত সংগীত-বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাদির অনুবাদ কার্যে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। সংগীত-নির্ণয়, সংগীত-দর্পণ, সংগীত-দামোদর, রাগ-বিরোধ, রাগ-সর্বস্ব-সার, রাগার্ণব, নারদ-সংহিতা, ধ্বনি মঞ্জরী, প্রভৃতি বিবিধ সংগীত-গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় রহিয়াছে—দুই একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে মাত্র।... এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া মূল ও অনুবাদ আমরা ক্রমশঃ এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব, এইরূপ সংকল্প করিয়াছি।

'আমাদের আরেকটি উদ্দেশ্য— তানসেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ওস্তাদদিগের পুরাতন গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ করা। স্বরলিপির অভাবে, অনেকগুলি পুরাতন গান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং যাহা এখনও প্রচলিত আছে তাহাও কালক্রমে মুখ-পরম্পরায় বিকৃত হইয়া যাইতেছে। অতএব, এ বিষয়ে আমাদের আর উদাসীন থাকা উচিত নয়; যাহাতে পুরাতন গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ হয়, সংগীতবেত্তা মাত্রেরই সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই সংকল্প অংশত সার্থক হয়েছিল। 'সংগীত-প্রকাশিকা'-র প্রথম সংখ্যা থেকেই সোমেশ্বর-কৃত 'রাগবিরোধ' গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। অনুবাদক ছিলেন পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এ ছাড়া সারদাপ্রসাদ ঘোষ ধারাবাহিক ভাবে লিখতেন 'রাগ-রাগিণীর পরিচয়'। 'সংগীত-প্রকাশিকা' পুরানো সংখ্যাগুলিতে ইতস্তত নানা বিচিত্র ও মূল্যবান সংগীত সংক্রান্ত রচনা ছড়িয়ে আছে। সেগুলির বিষয় কখনো 'প্রথম শতাব্দীতে ভারতে সংগীত' অথবা 'সংস্কৃত ছন্দ ও সংগীতের তাল' প্রভৃতি জটিল অথচ উপভোগ্য চিন্তায় সমৃদ্ধ। এগুলি একত্রে সংকলিত হলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীত-সমালোচনার বিষয়বৈচিত্র্য ও আদর্শ দুই-ই পাওয়া যাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সর্বশেষ যে সংগীত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় তার নাম 'আলাপিনী'। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১লা কার্তিক। এতে প্রধানত স্বরলিপি-প্রচার চলত। প্রথম সংখ্যার 'অবতরণিকা'-য় বলা হয়েছিল :

'স্বরলিপি চর্চা ও অভ্যাস যতই বৃদ্ধি পাইবে সংগীতশিক্ষা সম্বন্ধে ততই মঙ্গল ও উন্নতির পথ পরিষ্কার হইবে। স্বরলিপির আলোচনা যাহাতে আরো বৃদ্ধি হয় এবং উহা দেখিয়া সহজে সকলে সংগীতশিক্ষা করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা প্রকাশ করা হইল।... প্রতি খণ্ডে দুই তিন পৃষ্ঠা করিয়া কেবল গানের স্বরলিপি থাকিবে। সংগীত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি এবং বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াদিও ইহাতে বর্ণিত হইবে।... স্বরলিপির অভাবে কোনো একটি গীতের সুর চিরকাল সমান সুরে স্থায়ী থাকে না, সেইজন্য একই গান বিভিন্ন কণ্ঠে বিভিন্ন সুরে গাহিতে শুনা যায়। অতএব যাহাতে স্বরলিপির চর্চা খুব বৃদ্ধি হয় সংগীতপ্রিয় সকল ব্যক্তিই সেজন্য বিশেষ চেষ্টা ও সহায়তা করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।'

'আলাপিনী' পত্রিকার এক উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা ছিল, ইংরাজি গান, আইরিশ পোলকা প্রভৃতি জনপ্রিয় সুরের স্বরলিপি মুদ্রণ।

আগে উল্লিখিত হয়েছে যে, বিশিষ্টভাবে সংগীত-পত্রিকা না হয়েও যুগবৈশিষ্ট্যের কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক সাময়িক পত্রিকা সংগীত সম্পর্কে নানা আলোচনা ও মন্তব্যাদি প্রকাশ করে সমকালীন সংগীতের নবভাবনায় অংশ নিয়েছিল। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রাচীন বাংলা গানের সংগ্রহগুলি মুদ্রিত হয়েছিল। সেইসূত্রে কবিওয়ালাদের জীবনী ও রচনা এবং বিশেষত রামপ্রসাদ ও নিধুবাবুর সম্পর্কে সর্বপ্রথম তথ্যাদি পাওয়া গেছে। 'তত্ত্ববোধিনী'-র সাংগীতিক প্রয়াসের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। আপাতত, এই প্রসঙ্গে বাংলার সংগীতে নবভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে 'ভারতী' ও 'সাধনা' পত্রিকাদুটির ভূমিকা বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। 'ভারতী' ও 'সাধনা' এই দুটি পত্রিকাই ছিল প্রধানত সাহিত্যসম্বন্ধীয় উচ্চমানের সাময়িক পত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের সংগীত-সমালোচনা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পত্রিকাদুটি তৎকালীন সংগীত-আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে। সত্যিকারের সংগীত-সমালোচনা যাকে বলে, অর্থাৎ— সংগীতের উৎপত্তি, উপযোগিতা, স্বরূপ সন্ধান ও অন্যতর শিল্পরূপের সঙ্গে সংগীতকলার সম্পর্ক নির্ণয় প্রভৃতি গূঢ় নানা বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টিময় প্রবন্ধ এখানেই সর্বপ্রথম প্রকাশ হয়। আর সেই বিশেষ ধরনের আলোচনায় আচার্যের ভূমিকা নিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রসঙ্গত মনে রাখা কর্তব্য যে, রবীন্দ্রনাথ মূলত কবিরূপে বিশ্বস্বীকৃতি পেলেও গানের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশের সাধনা ও নিরীক্ষা তিনি বিশেষভাবে করে গেছেন। এই উপলক্ষে সংগীত সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ও আদর্শ প্রবন্ধাকারে বার বার লিখে বোঝাতে হয়েছে।

দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল লেখক কাব্যের মাধ্যমে আত্মবিকাশের সাধনা করেছিলেন। অবশ্য সেই কাব্যের রূপায়ণ হত আবৃত্তিতে নয়, সুরে। কদাচিৎ সেই সুর আবৃত্তির গদ্যধর্মকে মেনে নিত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে বাংলা সাহিত্যে এখনকার মতো সুরবিযুক্ত পাঠ্য কবিতা ও গানের মধ্যে কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তই সম্ভবত সুরবিযুক্ত পাঠ্য কবিতা লেখেন; অবশ্য তাঁর কবিদৃষ্টি বস্তুময় ছিল বলেই লিরিকের লাবণ্যসন্ধান তিনি আদৌ করেন নি। তাঁর পরবর্তীকালে হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, মধুসূদন, বিহারীলাল ও নবীনচন্দ্র বাংলা কাব্যের দ্বিচারিতায় অস্থির ছিলেন; সেইজন্য তাঁদের রচিত কাব্যের ইতস্তত গানের উপস্থিতি অথবা কবিধর্মে সংগীত-সংক্রাম লক্ষ করা যায়। কিন্তু যেহেতু তাঁরা কেউই একসঙ্গে শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠগীতিকার ছিলেন না তাই এ জাতীয় সমস্যা তাঁদের সৃষ্টিকর্মকে ব্যাহত করে নি; শুধু দ্বিধাগ্রস্ত করেছে এইমাত্র। অথচ, রবীন্দ্রনাথ একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ গীতকার ছিলেন বলেই বাংলা কবিতার দ্বিচারী সমস্যাটিকে এড়াতে পারেন নি। তার ফলে কবিতা ও গানের পারস্পরিক স্বরূপ, ঐক্য এবং বিরোধ-প্রসঙ্গ তাঁর সৃষ্টিভাবনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের বাণীসাধনায় কবিতা ও গান একই সঙ্গে উচ্ছ্রিত ও স্বীকৃত। কখনো তিনি কবিতার অনুক্ত কথাটুকু সুরের আভায় ব্যক্ত করেছেন, কখনো সুরের সীমাহীন ভাবের মধ্যে কবিতার সুনির্দিষ্ট রূপটি প্রক্ষেপ

করে দেখতে চেয়েছেন। সংগীত সম্পর্কে তাঁর এই বিশেষ ধরনের নিরীক্ষা ও প্রয়োগসিদ্ধি স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। বর্তমানে শুধু প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণীয় যে, তাঁর গান ও কবিতা বিষয়ে নানা পরীক্ষার ফলিত উদাহরণ গীতবিতানের অসংখ্য গানে ধরা পড়েছে কিন্তু সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার তাত্ত্বিক ও ঔপপাত্তিক নানা সমস্যা তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন 'ভারতী' ও 'সাধনা'-র পৃষ্ঠায়। সেগুলি সংকলন করে বিশ্লেষণ করলে দুটি বিষয় স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। প্রথমত, একজন সার্থক লিরিক কবি কেন গান লিখতে বাধ্য হলেন; দ্বিতীয়ত, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীতে নবভাবনার সাধনা কেমনভাবে একজন ব্যক্তি-শিল্পীর সৃষ্টির পথকে সব রকম আকীর্ণ ধূসরতা থেকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। আর, শিল্পীর ক্ষেত্রে মুক্তি মানেই তো আত্মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নবচেতনার উদ্বোধনে একজন পাশ্চাত্য চিন্তানায়কের স্পর্শ ছিল। ১৮৮০ খৃস্টাব্দে বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন করবার পর আকস্মিকভাবে হার্বার্ট স্পেনসরের এক প্রবন্ধ 'The Origin and Function of Music' পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের মনে সংগীত সম্পর্কে নবভাবনা জেগে ওঠে।[১৬] তার ফলে, এক দিকে তাঁর সৃষ্টি উৎসের নতুন দ্বার খুলে যায়— 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' প্রভৃতি রচনার সূত্রে; আরেকদিকে তাত্ত্বিক চিন্তা জেগে ওঠে। সেই তাত্ত্বিক চিন্তার প্রথম লিখিত রূপ 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধ। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ বেথুন সোসাইটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেন এবং 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সেটি পত্রস্থ হয়। সংগীত সম্পর্কে সেই প্রবন্ধে যে-নবভাবনা ব্যক্ত হয়েছিল তা যুগান্তরের বার্তাবাহী। তিনি লিখেছিলেন :

> 'সংগীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায়মাত্র। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি, তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়, সংগীত আর কিছু নয়, সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা।... আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই।... আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।'

'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের সমর্থনে পরের সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় (আষাঢ় ১২৮৮) রবীন্দ্রনাথ 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' নামে প্রবন্ধ লেখেন। 'আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতমরূপে প্রকাশ করিবার উপায়-স্বরূপে সংগীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি'— এই ছিল তাঁর বক্তব্য।

সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ 'সংগীত ও কবিতা' প্রকাশিত হয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার 'ভারতী' পত্রিকায়। সেই প্রবন্ধে তাঁর সংগীত বিষয়ক নবভাবনা সম্পূর্ণ উচ্চারিত হয়েছিল। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন :

> 'আমরা কবিতাকে যে চক্ষে দেখি, সংগীতকেও ঠিক সেই চক্ষে দেখিব। বলাবাহুল্য, আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি, তখন তাকে আমরা শুদ্ধমাত্র কথার সমষ্টি স্বরূপে দেখি না—

---

১৬ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৯৭ এবং জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ. ৩৮২

কথার সহিত ভাবের সম্পর্ক বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয় স্বরূপ। আমরা সংগীতকেও সেইরূপে দেখিতে চাই। সংগীত সুরের রাগরাগিণী নহে, সংগীত ভাবের রাগরাগিণী। আমাদের কথা এই যে, কবিতা যেমন ভাবের ভাষা, সংগীতও তেমনই ভাবের ভাষা।'

'ভারতী'-র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের লেখা সংগীত সংক্রান্ত রচনাগুলি পড়লে, সংগীতের ক্ষেত্রে একটি সমগ্র যুগ এবং সেই যুগের এক প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশের অদম্য অস্থিরতা অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্যে সমকালীন সাংগীতিক সমস্যার ইঙ্গিত ও সমাধানের চেষ্টা আছে। অবশ্য সে সমাধান নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত সামর্থ্যনির্ভর। তাতে পরিতাপের কারণ নেই, কেন-না সমগ্রের অভীপ্সা প্রায়শই একজনের মধ্যে রূপায়িত হয়ে থাকে।

'ভারতী'-র মতো 'সাধনা' পত্রিকাতেও [১৭] রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সংগীত বিষয়ক রচনা বা সংগীত সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক মন্তব্য আছে। সেগুলির মধ্যে থেকে একটি প্রবন্ধের একাংশ বিশেষ উদ্ধৃতিযোগ্য। 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' নামে প্রকাশিত প্রবন্ধটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

'উচ্চারণ হিসাবে বাংলা ভাষা বঙ্গদেশের সমতল-প্রসারিত প্রান্তরভূমির মতো সর্বত্র সমান।... শব্দের সহিত শব্দের সংঘর্ষণে যে বিচিত্র সংগীত উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণত বাংলা ভাষায় অসম্ভব। বাংলা শব্দের মধ্যে এই ধ্বনির অভাববশত বাংলায় পদ্যের অপেক্ষা গীতের প্রচলনই অধিক। কারণ, গীত সুরের সাহায্যে প্রত্যেক কথাটিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়া দেয়। কথায় যে অভাব আছে সুরে তাহা পূর্ণ হয়।... এইজন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে গান ছাড়া আর কবিতা নাই বলিলে হয়।'

রবীন্দ্রনাথের উপরে উদ্ধৃত মন্তব্যের মধ্যে বাংলা কবিতা সম্পর্কে তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির চমৎকার সূত্র। এই ধারাতেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের প্রকৃষ্ট মূল্যায়ন সম্ভব বলে মনে হয়।

সৌভাগ্যক্রমে, সংগীত সম্পর্কে এমনই মুক্ত চেতনা ও চিন্তার নবভাবনা এইসময়ে অন্যান্যদের লেখাতেও লক্ষ করা যায়। ১৩০১ বঙ্গাব্দের 'সাধনা' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর প্রবন্ধ 'সংগীত ও চিত্রবিদ্যা' এই প্রসঙ্গে অবিস্মরণীয় উদাহরণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই উপেন্দ্রকিশোর তাঁর ভাবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে বুঝতে পেরেছিলেন :

---

১৭ আরো অনেক পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথের সংগীত-সংক্রান্ত রচনাবলী ছড়িয়ে আছে। উৎসাহী পাঠকের অবগতির জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র ও কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাউল গান' ও 'আলাপ-আলোচনা' এবং ঐ পত্রিকার ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান'।

'সংগীত ও চিত্রবিদ্যা দুই বিষয়ের দুইটি মূল— শব্দ ও বর্ণ (আলোক)। তরঙ্গের রাজ্যে ইহারা প্রতিবেশী। এই তরঙ্গ মূলকত্বই ইহাদের ঘনিষ্ঠতার কারণ বলিয়া বোধ হয়।... সাত সুর; সাত রঙ। লোহিতাদি সাতটি রঙ, ইহারা ক্রমান্বয়ে চিত্রবিদ্যার "সা রি গা মা"র স্থানীয়।... চিত্রের পক্ষে যেমন স্থান, সংগীতের পক্ষে তেমনই সময়।... সীমারেখা চিত্রের পক্ষে যাহা করে, তাল সংগীতের পক্ষে তাহা করে।... কবিতা উভয়েরই সঙ্গিনী।'

উদ্ধৃত রচনাংশটুকু পড়লে বোঝা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে সংগীতের নবভাবনা ক্রিয়াত্মক ও ঔপপাত্তিক শাস্ত্রজ্ঞানে পরিসমাপ্ত না হয়ে সম্পূর্ণ ভাবাত্মক দৃষ্টিপ্রক্ষেপে সংগীতের প্রকৃতিসন্ধানে প্রযুক্ত হয়েছে। সৃষ্টি ও প্রজ্ঞার এই সমন্বয়ই রেনেশাঁসের মূল কথা।

সেইজন্যই মনে হয়, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীতের নব আদর্শসন্ধান, বিদেশী সংগীতের সংস্পর্শ, গীতরীতির রূপান্তর, অর্থাৎ সংক্ষেপে নবযুগের সংগীতরূপের উৎস-অগ্রগতি-পরিণতির সামগ্রিকতাটুকু তৎকালীন পত্রিকাগুলিতে সার্থকভাবে মুকুরিত। সংগীত-পত্রিকাগুলি সেই সূত্রে আরো স্পন্দমান এবং নিহিত সৃষ্টিশীলতায় মহৎ।

১৩৭২ *বৈশাখ*

রূপরসজ্ঞ শিল্পাচার্য নন্দলাল

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা

অতীত ও বর্তমানকালের য়ুরোপীয় শিল্পীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনকাহিনীতে তাঁহাদের ভাবনা চিন্তা আচরণ রূপসৃষ্টির আবেগের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রকাশিত হইয়া আছে। চীন ও জাপান -দেশীয় শিল্পীদেরও জীবন-ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু অতীতকালের ভারতীয় শিল্পীদের পরিচয় বা তাঁহাদের কর্মধারার কোনো বিবরণ কোনো স্থানে উল্লিখিত হয় নাই। বিগতকালে ভারতে যে অপূর্ব ও মহান শিল্পসৃষ্টি হইয়া গিয়াছে যাহার নিদর্শন অজন্তা ইলোরা মহাবলিপুরম এলিফেন্টা ও কোনারক মন্দিরের গাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের স্রষ্টাদের কোনো সংবাদ পাওয়া বর্তমানকালে আর সম্ভব নহে। তবে সেই-সব প্রাচীনকালের শিল্পীদের সম্বন্ধে স্বভাবতই মনে একটা ধারণা জন্মায় যে তাঁহারা নিশ্চয়ই উচ্চপর্যায়ের শিল্পী ছিলেন, তাহা না হইলে এইরূপ মহান শিল্প সৃষ্টি করা তাঁহাদের পক্ষে কখনো সম্ভবপর হইত না। সেই-সব দক্ষ অসাধারণ রূপস্রষ্টাদের আচার-ব্যবহার, চিন্তার মান, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক স্তর, এমনি করিয়া তাঁহাদের জীবনচিত্রের পূর্ণ রূপটি পাইবার আজ আর-কোনো উপায় নাই।

এই বিচ্ছিন্ন ঐতিহ্যকে বহন করিয়া বর্তমানকালে এমন একজন ভারতীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছিল যাঁহার জীবনাদর্শে প্রাচীন ও বর্তমান শিল্পীদের সমুদায় গুণাবলীর পূর্ণ মিলন ঘটিয়াছিল। প্রাচীন শিল্পসৃষ্টিগুলিকে বুঝিবার ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট এবং তাহাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল অসীম অথচ তিনি নিজে ছিলেন অত্যাধুনিক শিল্পী। এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও মহান শিল্পী আচার্য নন্দলাল বসুর পরিচয়ে সর্বপ্রথমেই বলিতে হয় তিনি ছিলেন একজন মহান শিল্পী, শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিবার মতো সকল গুণই তাঁহার মধ্যে ছিল। দেশী বিদেশী সব রকমের ভালো শিল্পের কাজকেই বুঝিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইতে আনন্দ পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, এই বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই উন্নত ও উদার। কিন্তু যেখানে শিল্পধারার কথা বলা হইত সেইখানে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় শিল্পী বলিয়া পরিচয় দিতে আনন্দ বোধ করিতেন। তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে আদর্শ ভারতীয় শিল্পীর প্রতীক। তাঁহার শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথকে যে নিষ্ঠার সহিত তিনি শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালোবাসিতেন তাহা এই যুগে খুবই বিরল। আবার নিজের ছাত্রদের প্রতিও ছিল তাঁহার অসীম ভালোবাসা ও স্নেহ। গুরু শিষ্যের আদর্শেরও প্রতীক ছিলেন নন্দলাল। তাঁহাকে দেখিয়া সেই অতীতকালের অনামী ভারতীয় শিল্পীদের কথা কল্পনায় ভাবা যায়, মনে হয় হয়তো

বা তাঁহারাও এইরকমই ছিলেন। নন্দলালের ছিল তীক্ষ্ণ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি, মানুষের জীবন-প্রবাহ, প্রকৃতির বৈচিত্র্য প্রকাশ— এই বিশ্বের যাহা-কিছু সুন্দর ও অসুন্দর সকলই বুঝিতে পারিতেন। সুন্দরকে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হইতেন, তাহাকে প্রকাশ করিতেন নিজের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে। অনেক সময় কথার প্রসঙ্গে কৌতুকচ্ছলে নিজের ছাত্রদের এবং বন্ধুদেরও এই আনন্দের ভাগী করিতেন। তাঁহার চলন বলন ভাবনা হাসি ঠাট্টার মধ্যে শিল্পীর সরসতার গুণটি পরিস্ফুট। তাঁহার বাসগৃহ, তাহার চারি পাশের বাগান, চিত্র অঙ্কনের স্থানটি যেখানে তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত শিল্পচিন্তায়, রূপসৃষ্টির কাজে, তাহাদের পরিপাটি বিন্যাসের সৌন্দর্য লক্ষণীয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে গুরু অবনীন্দ্রনাথের নিকট নন্দলালের চিত্র অঙ্কন শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত না হওয়ায় তখনো গুরুর সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে পারেন নাই। দেশের আবহাওয়া তখন স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত। যুবক নন্দলাল ইহার দ্বারা প্রভাবিত হইবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশের পুরাতন বা বর্তমানকালের মধ্যে যাহা-কিছু ভালো তাহাকেই গভীরভাবে বুঝিবার, উপলব্ধি করিবার একটা তীব্র প্রয়াস শিল্পীর সর্বকাজের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নন্দলালের প্রথম যুগের চিত্রগুলিতে ইহার সাক্ষ্য রহিয়া গিয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন চিত্রগুলির মধ্যে অজন্তা গুহা-চিত্র-রচনাশৈলীই এক সময়ে শিল্পীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। ইহার একটি প্রধান কারণ ইংরেজ মহিলা চিত্রশিল্পী লেডি হেরিংহামের দলভুক্ত হইয়া অজন্তা গুহাচিত্রগুলিকে নকল করিবার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। তখন ভালো করিয়া এই চিত্রগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া ইহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও দক্ষতা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। অজন্তা চিত্রের বৃহৎ রচনা-কৌশল, সীমিত রঙের প্রয়োগ, মূর্তি অঙ্কনে অপূর্ব পারদর্শিতা, তুলির রেখায় ছন্দোগতির দৃঢ়তা, সর্বোপরি চিত্রগুলিতে ভাবের প্রয়োগ নন্দলালকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি নিজে একজন কৌশলী দক্ষ শিল্পী, তাঁহার রুচিবোধের ও স্বভাবগত সামঞ্জস্য অজন্তার চিত্রগুলির মধ্যে যেন খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, সেই কারণেই তিনি অনেক সময় বলিতেন যে, "এই গুহাচিত্রগুলি পূর্বজন্মে আমরাই আঁকিয়াছি।" তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে তুলি-চালনার দক্ষতা লক্ষ্য করিয়া অনেক সময়ে মনে হইয়াছে যে তিনি যদি এ বিষয়ে আর একটু লক্ষ্য দিতেন তবে চীন দেশীয় শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের তুলি-চালনার ওস্তাদির সমকক্ষ অনায়াসে হইতে পারিতেন।

স্বদেশকে ভালোবাসিতেন বলিয়া দেশের লোকশিল্প কারুশিল্পের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দরদ ছিল। দরদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে আবার নূতন করিয়া গভীরভাবে এই শিল্পগুলিকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার নিজের চিত্রেও ইহাদের প্রভাব ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার জন্য তিনি আনন্দ ও গর্ববোধ করিতেন। কিছুদিন তিনি গ্রাম্যপটের নমুনায় চিত্র আঁকিয়াছিলেন, রঙ-তুলিও পটুয়া শিল্পীদের মতোই নিজে প্রস্তুত করিয়া

লইতেন এবং চিত্রগুলির মূল্য এমন সুলভ করিয়াছিলেন যাহাতে অতি সাধারণ লোকেরাও ক্রয় করিতে পারে। তবে এই প্রচেষ্টা বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। শিল্পী নন্দলালের প্রথমযুগের চিত্রগুলির বিষয়বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তখন স্বদেশপ্রীতি সর্বত্র অত্যন্ত প্রবল থাকায় অথবা অন্য কোনো কারণবশত দেশের কৃষ্টিকে, পূজাপার্বণাদির আনন্দকে চিত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট নূতন করিয়া দেখাইবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। প্রচলিত আখ্যান, প্রাচীন কাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, হিন্দু দেবদেবীর কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া শিল্পী তখন বহু সুন্দর সুন্দর চিত্র রচনা করিয়াছেন। বহুদিনের গতানুগতিক কিছু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির যে অশোভন রূপকল্পনা চলিয়া আসিতেছিল তাহার উন্নততর সংস্কার নন্দলালই করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যাত্রাদলের গোঁফ-দাড়িযুক্ত ভুঁড়িওয়ালা শিবের পরিবর্তে কি অপরূপ শিবসুন্দরের রূপ-কল্পনা আমাদের চোখের সম্মুখে নন্দলাল ধরিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে উমা অগ্নিদেবতা রাম লক্ষ্মণ সীতা অন্নপূর্ণা আরো বহু দেবদেবীর আকৃতি আধুনিক রুচিসম্মত রূপ পাইয়াছে। তাঁহার গুরু অবনীন্দ্রনাথ দিল্লির মুঘল বাদশাহ, সাহজাদীদের রহস্যাবৃত রঙিন জীবনকাহিনীকে অবলম্বন করিয়া যখন রূপকথার জাল বুনিয়া চিত্র আঁকিতেছিলেন তখন নন্দলাল গ্রাম্য সরল জীবনের প্রতি, পানা পুকুরে স্নানরতা গ্রাম্য বধূদের জটলা, পুরাতন গৃহের অর্ধভগ্ন প্রাচীরের গাত্রে সতেজ নবীন অশ্বত্থবৃক্ষের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের চিত্র আঁকিয়াছেন। বাদশাহ বেগম বা উচ্চতর শৌখিন আভিজাত্যের বিষয়বস্তু তাঁহার চিত্রে খুব কমই স্থান পাইয়াছে। তিনি নিজে যেমন সরল জীবনযাত্রা পালন করিতেন তেমনি গ্রামের সাধারণ সরল জীবন প্রকাশের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তাঁহার এই যুগের চিত্রগুলির বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে বলিতে হয় ভালো ও উচ্চপর্যায়ের চিত্রের সকল গুণই ইহাদের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। যেমনটি ইহাদের রচনাভঙ্গি, অঙ্কনবিন্যাস, উৎকৃষ্ট ড্রইং তেমনই ইহাদের বর্ণপ্রয়োগ ও সমাপক বা ফিনিশিং। ভাবপ্রয়োগেরও কোনো অভাব নাই, এক কথায় বলিতে হয় নিখুঁত চিত্র।

শান্তিনিকেতনে আসিবার পরবর্তীকাল হইতে তাঁহার চিত্রে আরো কতকগুলি গুণের সংযোগ হইয়াছিল তাহা হইল প্রকৃতির সৌন্দর্য-রসের আস্বাদনের আনন্দ, মানবজীবনের বৈচিত্র্য প্রকাশে বহু রূপের সন্ধান, চিত্রে অঙ্কনের আড়ষ্টতা অতিক্রান্ত সহজ স্বচ্ছন্দতা। তবে সমালোচক কঠোর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করিতে গেলে হয়তো দেখিতে পাওয়া যাইবে নন্দলালের প্রথম যুগের প্রশংসিত চিত্রগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক চিত্র আছে যাহাদের পরবর্তী দীর্ঘকালের কষ্টিপাথরে পরীক্ষায় খ্যাতির সামান্য তারতম্য হইবার আশঙ্কা রহিয়া গিয়াছে। যে-সব চিত্র কাব্যিক প্রেরণায় রচিত নহে কিন্তু কেবল মাত্র বর্ণনাধর্মী চিত্র (illustrative) তাহাদের আবেদন সমকালীন বা বিশেষ কালোপযোগী। কাব্যিক গুণসম্পন্ন চিত্রসৃষ্টির আবেদন চিরকালের— কারণ মানুষের মনে এই ভাবের

আবেগ চিরকালের। অনেক চিত্র আছে যাহার মধ্যে শিল্পীর গুণপনার সন্ধান না করিয়াই অঙ্কন-বিষয়বস্তুর মোহে আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে বঙ্গভঙ্গের সময় শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত ভারতমাতা চিত্রটি যেভাবে তখনকার বঙ্গবাসীদের মনে আলোড়ন আনিয়াছিল তাহার প্রধান কারণ এই চিত্রে বিষয়বস্তুর সহিত তখনকার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি সামঞ্জস্য ছিল। বর্তমানকালে ইহার আবেদন পূর্বের মতোই রহিয়াছে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ আছে।

রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ নন্দলাল পাইয়াছিলেন যখন তিনি শান্তিনিকেতনে কলাভবনের কার্যে শিল্পীশিক্ষকরূপে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সুযোগকে শিল্পী নন্দলাল পরম সৌভাগ্য, পরম লাভ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি একবার এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন যে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার তৃতীয় নয়ন বা অন্তর্দৃষ্টি লাভ হইয়াছিল। এতদিন ধরিয়া যে দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বিশ্বজগৎ তাঁহার নিকট প্রকাশিত এখন তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আরো গভীরভাবে সরসতা সহকারে যেন ইহাকে দেখিতে ও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কবির ভাষায় বলিতে হয় "রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি।" শিল্পীকে দেখিয়াছিলাম কি গভীরভাবে সম্পূর্ণভাবে এই অরূপরতনের আশায় রূপের সাগরে তিনি ডুব দিয়াছিলেন। সেই আনন্দের প্রকাশ তাঁহার পরবর্তী সকল চিত্রের মধ্যে ধরা পড়িয়াছিল। শহর হইতে দূরে প্রকৃতির সমাবেশে শান্তিনিকেতন, তাহার আশপাশের উন্মুক্ত প্রান্তর, খোয়াই, কোপাই নদী— ইঁহারা যেন একটি বন্ধনহীন মুক্তির আবহাওয়া শিল্পীর নিকট আনিয়াছিল। সহজ সরল বীরভূমি গ্রাম্যজীবন, সাঁওতালদের সরল আত্মপ্রকাশের সৌন্দর্য, রাঙামাটির রাস্তা ধরিয়া গোরুগাড়ির চলন, হাটের লোকের চলা নন্দলালকে সত্যিই মুগ্ধ করিয়াছিল। চৈত্রশেষের প্রবল বালির ঝড়, কালবৈশাখীর ঝোড়ো পাগলামি, আবার শরতে সবুজ মাঠে ফুলের আস্তরণ শিল্পীর দৃষ্টিতে অবহেলিত হয় নাই। শান্তিনিকেতনে বসবাসের পরবর্তীকালে নন্দলালের চিত্রের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রপূর্ব ও রবীন্দ্রোত্তর -কাল নির্দেশ করিয়া শিল্পীর সমস্ত চিত্রকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পূর্ববর্তীকালে অঙ্কন-বিষয়বস্তুকে হিন্দু দেবদেবী, হিন্দুর কৃষ্টি, পুরাণ আখ্যানগুলি বিশেষ স্থান পাইয়াছিল, আবার পরবর্তীকালে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও তাহার বহুমুখী প্রকাশ, জনগণের জীবনধারা, পশুপাখি ফুল গাছ লতা পাতা কাব্যিক মনের প্রেরণা। তাঁহার নিকট গুরুগম্ভীর অথবা সামান্য বিষয় দুইয়ের মধ্যে আর বিশেষ প্রভেদ রহিল না, শিল্পীর রচনায় দুইই সমান গুরুত্ব লাভ করিত। নন্দলাল যেন স্পর্শমণি লাভ করিয়াছিলেন। সামান্য বিষয়ও তাঁহার তুলির স্পর্শে অপরূপত্ব লাভ করিত। এই সময়ে শিল্পীর বিষয়বস্তু-নির্বাচনের সীমা বহুভাবে প্রসারিত। তিনি যুক্তির ক্ষমতা, সৌন্দর্যবোধ ও দার্শনিকের দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। আমৃত্যু এই পথেই তাঁহার শিল্পসাধনা পরিচালিত হইয়াছিল।

এই স্বনামধন্য শিল্পীর প্রথম দর্শন পাইয়াছিলাম ১৯১৪ সনে ছাতিমতলায়, ইহার বৃক্ষাদি অঙ্কনরত অবস্থায়। তখন আমরা শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র। পূর্বাহ্লে আম্রকুঞ্জে গুরুদেব তাঁহাকে মান-পত্র প্রদান করিয়াছেন, এই উপলক্ষেই নন্দলালের শান্তিনিকেতনে প্রথম আগমন। তখন কল্পনাও করিতে পারি নাই যে ভবিষ্যতকালে তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া চিত্রবিদ্যায় শিক্ষালাভ করিব। ১৯১৯ সনের গোড়ার দিকে তিনি শান্তিনিকেতনে ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন ও কয়েকটি ছাত্রকে চিত্র অঙ্কনে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। ধীরে ধীরে বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ছাত্রদের দল আসিয়া তাঁহার নিকট একত্র হইতে লাগিল। এমনি করিয়াই কলাভবনের প্রতিষ্ঠা হইল। নন্দলালের শিল্পশিক্ষার আদর্শে ও পদ্ধতিতে কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, যথা গুরু শিষ্যের পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্বন্ধ, শিল্প বিষয়ে আলোচনা ও ইহার বিষয়ে জ্ঞানলাভ এবং কলাশিল্পের চর্চা। নন্দলাল, অতীত ও বর্তমানকালের সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও দৃষ্টি যাহাতে থাকে তাহার প্রতিও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রদানের অন্য বৈশিষ্ট্য হইল তিনি কখনো ছাত্রদের চিত্র অঙ্কনকালে তাহাদের স্বাধীন ভাবনায় বা চিন্তায় কোনোপ্রকার বাধা সৃষ্টি করিতেন না বরং ইহাতে উৎসাহিত করিতেন। ছাত্রদের চিত্রের একমাত্র সংশোধন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, উপরন্তু তাহাতে উৎকর্ষ আনয়ন করিতে সর্বদা চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সকল ছাত্রছাত্রীগণ একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে শিক্ষক হিসাবে নন্দলালের সমকক্ষ পাওয়া খুবই দুরূহ। তাঁহার নিকট শিক্ষালাভের সুযোগ পাওয়া একটি সৌভাগ্যের বিষয়। চারি পাশের গাছপালা বাড়িঘর পশুপাখি মানুষ সকল স্কেচ করিতে তিনি নিজে যেমন আনন্দ বোধ করিতেন তেমনি ছাত্রদেরও এই বিষয়ে উৎসাহিত করিতেন। ছবি আঁকিবার ঘরে বসিয়া যে শিক্ষা হয় ইহাতে সম্পূর্ণতা লাভ হইতে পারে না, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই ছাত্রদের সঙ্গে লইয়া প্রতি শীতকালে গ্রাম, গ্রামাঞ্চলে ও শিল্পপ্রধান স্থানগুলি যেমন অজন্তা ইলোরা মহাবলিপুরম বুদ্ধগয়া পুরী কোনারক এবং ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থান রাজগৃহ নালন্দা ইত্যাদিতে শিক্ষা-ভ্রমণে যাইতেন। বর্তমানকালে স্কুল কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি বৎসর শিক্ষা-ভ্রমণে যাইবার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। হয়তো এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে নন্দলালই সর্বপ্রথমে শিক্ষা-ভ্রমণ এই দেশে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এইরূপ ভ্রমণের সুযোগে ছাত্রগণ প্রভূতভাবে উপকৃত হইয়া থাকে। শিক্ষাকালে ক্লাসঘরে শিক্ষক ও ছাত্রদের পরস্পরের আচরণের মধ্যে যে একটা ব্যবধান থাকিয়া যায় ইহার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি হইয়া থাকে এই সময়ে। যাহা-কিছু দর্শনীয় আকর্ষণীয় অধ্যাপকগণ ইহাদের স্কেচ করিতেন; তখন তাঁহাদের কাজ করিবার ধরন ছাত্রগণ দেখিতে পাইত। যতক্ষণ পর্যন্ত দিনের আলো থাকিত ততক্ষণ স্কেচ করার কাজ চলিত। সন্ধ্যার দিকে নিজেদের তাঁবুতে সকলে ফিরিয়া তাঁবুগুলির মধ্যেকার উন্মুক্ত স্থানে জ্বলন্ত আগুনের চারি পাশে জটলা করিয়া গান গাহিয়া, নৃত্য কৌতুক অভিনয়াদি করিয়া আনন্দ করা হইত। এই

সময়ে অনেক ছাত্রছাত্রীদের স্বাভাবিক গুণের পরিচয় ধরা পড়িত যাহা বিদ্যালয়ে থাকাকালীন কেহই জানিত না। গুরু নন্দলাল আলাপ ও গল্পচ্ছলে ছাত্রদের নিকটে শিল্পে সৌন্দর্যবোধের, অঙ্কন পদ্ধতির এবং আরো অনেক বিষয়ের কথা ব্যক্ত করিতেন। ঋতুরাজের সমাগমে পলাশ শিমুল ফুলের রক্তিম রাগে যখন গাছপালায় আগুন ধরাইয়া দেয় তখন এই সৌন্দর্যকে দেখিবার সুযোগ করিয়া দিতেন কোপাই নদীর পারে বনভোজনের আয়োজন করিয়া।

আজ হইতে পঁয়তাল্লিশ বৎসরেরও পূর্বেকার কথা, তখন শিল্পশিক্ষার কেন্দ্র কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। নন্দলাল শান্তিনিকেতনে গুরুপল্লীর পূর্বপ্রান্তে একটি মাটির দোতলা গৃহে সপরিবারে বাস করিতেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা তখন সচ্ছল না থাকায় এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকগণের আর্থিক অবস্থাও খুব ভালো ছিল না, অবশ্য ইহার জন্য কেহই খুব একটা অসন্তুষ্ট ছিলেন না। কলাভবনের ছাত্র হিসাবে তাঁহার গৃহে আমাদের যাতায়াত ছিল। মাটির গৃহ, খড়ের চালা, প্রয়োজনীয় সাধারণ আসবাবপত্রেরও অভাব তবু সমস্ত বাড়িটি যেন শিল্পীর সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধের স্পর্শে শ্রীমণ্ডিত। গৃহের দক্ষিণ দিকের অপরিসর বারান্দায় একটুকু স্থানকে কাঠ দিয়া ঘিরিয়া ছবি আঁকিবার স্টুডিয়োতে পরিণত করা হইয়াছিল। নন্দলালের বহুবিখ্যাত চিত্রগুলি এই স্টুডিয়োতে অঙ্কিত হইতে দেখিয়াছি। প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমীর দিনে বিকাল বেলায় কলাভবনের ছাত্রগণকে চা পানের নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ দক্ষিণের বারান্দায় বসাইতেন। ছাত্রসংখ্যা তখন দশ বারো জনের বেশি হইবে না। সঙ্গে এসরাজ লইয়া যাইতাম, গুরুদেবের রচিত বসন্তকালোপযোগী গান গাওয়া হইত একের পর এক। গুরু নন্দলাল অভিভূত চিত্তে গান শুনিতেন। রবীন্দ্রসংগীত তাঁহার নিকট অতি প্রিয় ছিল। সংগীত চলার মধ্যে এক সময়ে ছোটো ছোটো রেকাবিতে করিয়া কিছু আম্রমুকুল, শালফুল, পলাশফুল প্রত্যেককে পরিবেশন করা হইত। ইহাদের নিরীক্ষণ করিয়া ইহাদের সৌন্দর্য সুগন্ধ ও এই বৎসরের বসন্তঋতুর আগমনের বার্তাবহনকারী বলিয়া এই ফুলগুলিকে উপস্থিত সকল শিল্পীগণ সমাদর করিতেন। সর্বশেষে অবশ্য নানা প্রকার আহার্যে সকলকে পরিতৃপ্ত করিবার ব্যবস্থা থাকিত। এই-সব আয়োজনের দ্বারা ছাত্রগণের মনে নিজেরা শিল্পী বলিয়া আত্মবোধ জাগ্রত হোক, প্রকৃতি অভিব্যক্তিকে অন্তরে উপলব্ধি করুক গুরু নন্দলাল ইহাই চাহিয়াছিলেন।

পূজা অথবা গ্রীষ্মাবকাশে ছাত্রগণ নিজেদের বাড়িতে ছুটির দিনগুলি অতিবাহিত করিবার জন্য শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া যাইত। তখন গুরু নন্দলালের সহিত ছাত্রগণের পত্রালাপ হইত পোস্টকার্ডে ছবি আঁকিয়া। ইহার প্রচলন কলাভবনের পুরাতন ছাত্রগণের মধ্যে এখনো দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানি শিল্পী টাইকান সানকে ছবি আঁকিয়া চিঠিপত্রাদি সর্বপ্রথমে লিখিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। প্রাচীরচিত্র বা ফ্রেস্কো পুনঃপ্রচলনে তাঁহার ছিল অত্যন্ত উৎসাহ। গোয়ালিয়র গভর্নমেন্টের দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া ১৯২১ সনে বাগগুহার প্রাচীরচিত্রগুলি নকল করিবার

জন্য চিত্রশিল্পীত্রয় সুরেন্দ্রনাথ কর, অসিতকুমার হালদার ও নন্দলাল গোয়ালিয়র রাজ্যে গিয়াছিলেন। চিত্রগুলি নকল করিয়া শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করিবার পর হইতেই নন্দলাল শান্তিনিকেতনের প্রধান লাইব্রেরিগৃহে, চীনা ভবনে, কলাভবনের ছাত্রছাত্রীগণকে লইয়া প্রাচীরচিত্র অঙ্কন করিয়া শিল্পী অধ্যাপকগণকে ও ছাত্রছাত্রীদের এই অঙ্কনরীতিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বহু অভিনয়াদি শান্তিনিকেতনে ও কলিকাতার নাট্যমঞ্চে অভিনীত হইবার সময়ে মঞ্চসজ্জা, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের রূপসজ্জায় নন্দলালের অভিনব অবদান সর্বজনপ্রশংসিত। বর্তমানকালে অভিনয়াদিতে ইহার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করার মধ্যে সামান্য অবসর পাইলে নিজের খুশি খেয়াল মতো কাজ করিতে ভালোবাসিতেন। পরিত্যক্ত ছোটোখাটো দ্রব্যাদি কুড়াইয়া তাহাকে কাটিয়া ঘষিয়া নিজের পছন্দমতো একটি শিল্পবস্তুতে পরিণত করিতে শিল্পী বড়োই আনন্দ বোধ করিতেন। অনেক সময় রাস্তার ধারে উই-খাওয়া পুরাতন তালের আঁটিকে কুড়াইয়া নিজের নকশায় সুন্দর জল উঠাইবার ছোটো একটি পাত্র গড়িতেন। পুরাতন বাঁশের টুকরাকে এইরূপে মান-পত্র প্রদানের সুন্দর একটি আধার প্রস্তুত করিতে একবার দেখিয়াছিলাম। দক্ষ শিল্পীর গুণই হইল কেবলমাত্র চিত্র অঙ্কনের মধ্যে সৃষ্টির ক্ষমতা সীমিত হইবে না, কিন্তু দ্রব্যের গুণাগুণের ঊর্ধ্বে একমাত্র শিল্পীর কৌশলী হস্তস্পর্শ ও চিন্তায় অপূর্ব কলাসৃষ্টির রূপ গ্রহণ করিবে। শেষবয়সে তিনি তাঁহার চিত্রে রঙ ব্যবহার করা এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রঙ গোলার পরিশ্রম করিতে অসুবিধা বোধ করিয়া রঙের পরিবর্তে চীনা কালি ব্যবহার করিতে পছন্দ করিতেন। এই সময়ে কিছুদিন ধরিয়া সাদা কাগজ কোনো একটা আকারে ছিঁড়িয়া রঙিন কাগজের পটভূমিতে আঠার দ্বারা আঁটিয়া চিত্ররচনার কাজ চলিতে লাগিল। প্রয়োজন বোধে কালি দিয়া একটুকু রেখার সংযোগও তাহাতে হইত। অনেক সময় ইহার বিপরীত পদ্ধতিতে রঙিন কাগজ ছিঁড়িয়া সাদা কাগজের পটভূমিতে আঁটিয়া দেওয়া হইত। জীবনের দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি চিত্রের বহু করণ-কৌশলের মাধ্যমে চিত্ররচনা করিয়া গিয়াছেন। নূতন নূতন অঙ্কন-পদ্ধতিতে পরীক্ষা করিতে কখনো পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। প্রাচীন বর্তমান দেশী বিদেশী সকল শিল্পসৃষ্টির মধ্যেই যদি কোনো শিক্ষণীয় বিষয় লক্ষ করিতেন নিরলসভাবে তাহা গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইতেন। এই অনুসন্ধিৎসার গুণটি নন্দলালের মধ্যে ছিল বলিয়া তাঁহার শিল্পজ্ঞান যেমন ব্যাপক ছিল তেমনি করণ-কৌশল দক্ষতাও বহুভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

শিল্পীর সুদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময়ই শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত হইয়াছে। ইহার গাছপালা পারিপার্শ্বিকের প্রতি যেমন আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তেমনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন জীবন তাহাদের আনন্দ-উৎসবাদির সহিত ওতপ্রোতভাবে নিজের জীবনকেও একই সুরে বাঁধিয়াছিলেন। আশ্রম বিদ্যালয়ের সর্ব অনুষ্ঠানেই যোগদান করিতে তাঁহাকে দেখা যাইত। অনুষ্ঠানের স্থানগুলিকে আলপনায়

শ্রীমণ্ডিত করিবার জন্য কলাভবনের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের লইয়া কাজ করিতে ভালোবাসিতেন। বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকগণের প্রতি স্নেহশীল ও বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাঁহার বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার জন্য এইখানের সকলেরই নিকটে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল বড়ো কিছু কাজ করা বা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা যত বড়ো প্রতিভাবান ব্যক্তি হোন না কেন একজনের পক্ষে তাহা করা সম্ভব নহে। উপযুক্ত সহকর্মী ছাত্রছাত্রী সকলের মিলিত চেষ্টার দ্বারাই সেই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯৬৪ সনের মার্চ মাসে কলিকাতার সরকারি চারু ও কারু-কলা মহাবিদ্যালয়ে শিল্পাচার্য নন্দলালের একটি চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। এই প্রদর্শনীতে শিল্পীর বহু চিত্রের সমাবেশ হওয়াতে শিল্পীর কার্যের একটি পূর্ণ পরিচয়ের আভাস পাইবার সুযোগ হইয়াছিল, এক কথায় বলা যাইতে পারে ইহা ছিল নন্দলালের প্রতিনিধিত্বমূলক সার্থক প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর পরের দিনে কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রাতঃকালে গুরু নন্দলালের বাসভবনে গিয়াছিলাম প্রদর্শনীর সাফল্য ও চিত্রগুলির প্রশংসার সংবাদ তাঁহাকে জানাইবার উদ্দেশ্যে। তিনি তাঁহার স্টুডিয়োতে বসিয়াছিলেন। খুব আগ্রহ সহকারে আমার নিকট হইতে প্রদর্শনীর বিস্তারিত সংবাদ শুনিলেন। তাহার পরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "দেখো, এই সাফল্যে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। এই কার্য আমার একার দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। ইহার পিছনে আমার গুরু অবনবাবু, গুরুদেব, তোমরা সকলেই আছ বলিয়াই সম্ভব হইয়াছে। যদি একা আমার দ্বারা ইহা হইত তাহা হইলে এখন আর করিতে পারিতেছি না কেন।" এই কথা বলিতে বলিতে একটু যেন ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন। আবার বলিলেন, "দেখো, আমার ভারতীয় egoism আছে। যাহাই আঁকি-না কেন তাহা ভারতীয় হওয়া চাই। নূতন কিছু না হইয়া যদি ভারতীয় tradition-এর নকল হয় তাহাও ভালো। Tradition হইল বীজের ভিতরের নবপ্রাণের বহিরাবরণ। এই আবরণ না থাকিলে বীজের ভিতরের নবপ্রাণ রক্ষা পাইতে পারে না। জল বৃষ্টি তাপ ও অন্য রকমের ধ্বংসের হাত হইতে tradition-রূপী আবরণ রক্ষা করিয়া থাকে। আবরণ কঠিন হইলেও যথাসময়ে তাহাকে ফাটাইয়া নূতনভাবে প্রাণবীজের প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন। আর্টেও তাহাই হইয়া থাকে, tradition ভাঙিবার শক্তি থাকা চাই, তবেই নতুন আর্টের সৃষ্টি হইবে। এইখানে tradition ও New Art-এর পরস্পরের মধ্যে কোনো প্রকার বিরোধ নাই, কিন্তু একে অন্যের সহায়ক।"

তাঁহার বহু ছাত্রছাত্রী কৃতিত্ব সহকারে ভারতের বহু প্রদেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা বা শিক্ষকতা করিতেছেন। বহু বিদেশী ছাত্রছাত্রীও এই কলাভবনে শিক্ষালাভ করিয়া নিজেদের দেশে শিল্পী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কলাভবন নন্দলালের কীর্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি নিদর্শন।

শিল্পাচার্য দীর্ঘ জীবনব্যাপী বহু শ্রেষ্ঠ চিত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা খুবই শ্রমসাধ্য। শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির নকল মাসিক পত্রিকায় ও শিল্পবিষয়ক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে এবং ইহাদের অনেকগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনাও নানা জায়গায় হইয়াছে। বর্তমানকালে বিদগ্ধ সমাজে নন্দলালের চিত্র সুপরিচিত, জনসাধারণের মধ্যেও অনেকেই তাঁহার চিত্র দেখিয়াছেন এবং ইহাদের সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বা পত্রিকায় পড়িয়াছেন। শিল্পীর অসংখ্য রূপসৃষ্টির মধ্যে অপর একটি দিক রহিয়া গিয়াছে যাহার বিষয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইল শিল্পীর অঙ্কিত পোস্টকার্ডের চিত্রগুলি। ইহাদের অঙ্কন-বিষয়ের মধ্যে শিল্পীর আটপৌরে মনের ছাপটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়া আছে। এই চিত্রগুলির প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য হইল নিজের বক্তব্য বা মনের ভাবকে সহজ করিয়া অপর একজনের নিকট প্রকাশ করা, এই কারণে অনেক সময়ই শিল্পীর আত্মসচেতনতার বিলুপ্তি লক্ষিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ চিত্রে এই স্বচ্ছন্দ ভাবটিকে সব সময় পাওয়া যায় না। কবির কাব্যরচনায় আর তাঁহার চিঠিপত্রের মধ্যে একই ব্যক্তির যে পৃথক পরিচয়টি দেখিতে পাওয়া যায় শিল্পীর সম্বন্ধেও সেই একই কথা। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র পড়িয়া অনেক সময় নন্দলালের অঙ্কিত পোস্টকার্ডের চিত্রগুলির কথা মনে পড়িয়া যায়। এই দুইয়ের মধ্যে খুবই সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আত্মসংশ্লিষ্ট সকল ছোটো বড়ো ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া চিত্রে রূপ দিতে শিল্পীরা অনেক সময় দ্বিধাবোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু পোস্টকার্ডে ইহাদের অঙ্কিত করিতে কোনো প্রকার বাধা নাই, কারণ ইহাতে আপনাকে ব্যক্ত করাই প্রধান উদ্দেশ্য। শিল্পীর এই ধরনের চিত্রগুলিতে দৈনন্দিন জীবনের বহু ঘটনার ছাপ, কোপাই নদীর তীরে বন-ভোজনে কলাভবনের ছাত্রগণকে লইয়া খোয়াইয়ের মধ্যে দিয়া চলন, গোয়ালপাড়ায় শীতের উষাকালে আলো-অন্ধকারের মধ্যে খেজুর বৃক্ষরাজির তলায় ইহার রসপিপাসুদের জটলা, আশেপাশের নানা প্রকার ফুল লতা পাতা পাখি জন্তু মানুষের কর্মমুখর অভিব্যক্তি অঙ্কিত হইয়া আছে। এই ধরনের চিত্রগুলি নন্দলালের বহু ছাত্রছাত্রী ও বন্ধু ব্যক্তিদের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। ইহাদের একত্র করিয়া একটি প্রদর্শনী করিতে পারিলে তাঁহার শিল্পীমনের যথার্থ পরিচয় পাইবার পক্ষে সহায়তা হইত।

আর্টের বিষয়ে তাঁহার মতামত কি, শিল্পাচার্য এ সম্বন্ধে নানা আলোচনায় ও তাঁহার লেখায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। একবার ঔৎসুক্যবশত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম মডার্ন আর্টের সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কি। সংক্ষিপ্তভাবে উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, মডার্ন আর্ট তিনি খুব ভালোভাবে এখনো বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে সর্বদাই বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন ও এ বিষয়ে তাঁহার খুবই আগ্রহ আছে। যদি এই শিল্পপদ্ধতির মাধ্যমে মডার্ন শিল্পীরা সৃষ্টির যথার্থ ভাষা পাইয়া থাকে, আনন্দ লাভ করিয়া থাকে তবে এই পদ্ধতি বাঁচিয়া যাইবে। আর যদি তাহা না হইয়া কেবলমাত্র একটি ফ্যাশান বা ইজ্‌মের বশবর্তী হইয়া থাকে তাহা হইলে ধীরে ধীরে স্তব্ধ হইয়া যাইবে। তবে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, সব নূতন প্রচেষ্টা বা আলোড়নের

মধ্যে ভালোও কিছু-না-কিছু থাকিয়া যায়, সকলই বৃথা হয় না। এই মডার্ন আর্টের আলোড়ন হয়তো সমষ্টিগত শিল্পের ধারায় কিছু প্রগতি আনয়ন করিবে।

প্রাচীনকালের চীনা শিল্প সমালোচকগণ বলিতেন যে, বৃদ্ধ চিত্রশিল্পীদের চিত্র রচনার মধ্যেও এমন-সব গুণ নিহিত থাকে যাহাকে শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিতে হইবে। এই বাক্য নন্দলালের শেষবয়সে অঙ্কিত চিত্রগুলির প্রতিও প্রযোজ্য। শিল্পীর যথেষ্ট বয়স হইয়াছিল, শক্তি ক্ষীণতর, হস্তে পূর্বেকার দৃঢ়তার অভাব, মনের মধ্যে চিত্রের অঙ্কন বিষয়কে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ও যুক্তি প্রয়োগ করিয়া কাগজের উপরে চিত্র রচনা করিবার ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা ম্লান। তবু চিত্র অঙ্কনের প্রেরণা মনের কোণে রহিয়া গিয়াছে। এই চিত্রগুলিকে রূপকথার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে রূপকেরই প্রাধান্য, যুক্তি গৌণ। কিন্তু মনের কল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় করিয়াই ইহাদের সৃষ্টি। জীবনের অতীতকালের এক সময়ে শিল্পী তাঁহার মনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী ও সৌন্দর্যের অভিব্যক্তিকে ভালোবাসিয়াছিলেন, তাহা হইতে আনন্দ পাইয়াছিলেন, আজ দীর্ঘ দিনের ব্যবধান হইলেও তাহাদের বিলুপ্তি ঘটে নাই, মনের কোণে তাহারা বাসা বাঁধিয়া আছে। তুলির টানে স্মৃতিলিখনের মতো তাহারা আবার শিল্পীর নিকটে খুঁটিনাটির বাহুল্যবর্জিত হইয়া ধরা দিল। নন্দলালের এই চিত্রগুলির আবেদন সহজ সরল হইলেও দৃঢ় ও আনন্দদায়ক।

১৩৭৩ নন্দলাল বসু-সংখ্যা

যুগের শিল্প

অমিয় চক্রবর্তী

প্রকাশের গভীর সহজ ভঙ্গি শুধু বাংলায় নয়, বর্তমান যুগের বিবিধ দেশীয় সাহিত্যে লক্ষণীয়। সেইদিক থেকে বলা চলে শব্দের অতিমাত্রা, পৌরাণিক বা নবযুগের দামামাধ্বনি শিল্পের বহির্গত। বীটনিকের পশ্চিমী বাক্যস্রোত নতুন যুগে অবান্তর : মিলটনের গরিমা তাতে নেই, শুধু ঘোষণা বিদ্যমান। সংস্কৃত-বহুল জটিল শব্দবিলাস বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতিহীন; প্রচারের অজস্রত্বে ধরা পড়ে প্রয়াস, ছড়িয়ে থাকে কথার নুড়ি। প্রাণপ্রবাহিণী উৎকর্ষের ধারা অন্য।

চতুর্দিকের জাগ্রত শিল্পজগতে দেখতে পাই বৈরল্যের আঙ্গিক। নতুন ইস্পানি মার্কিনি চীন জাপানি যে-কোনো কবিতার বই খুললে মনে হয় কাব্যের পৃষ্ঠায় অক্ষরের ভার স্বল্প। কাব্যিক বা রাষ্ট্রিক প্রপাগান্ডার কথা বাদ দিচ্ছি। নতুন বাড়ি বানানোর ছাঁদে, এমন-কি বিরাট স্থাপত্যের গঠনে দেখি ঋজুতার আমেজ। কাঠে পাথরে কাঁচে সংহতির উদ্যম। হোক সে চণ্ডিগড়, জাকার্তার আধুনিক পাড়া, অপেক্ষাকৃত প্রাচীনের শেষতম অনুকরণে গাঁথা ডামাস্কাসের বা কাইরোর পুনরুজ্জীবিত নগর রচনা। ন্যুইয়র্কে বিরাট নতুন দৈত্য বাড়ি ঊর্ধ্বাকাশে হাল্কা হয়ে দাঁড়াতে চায়; অন্ততপক্ষে নতুন শৈলীর প্রেরণা সেই আঙ্গিকে। ছবির জগতে দেখি প্রাচুর্যের ঠাট সংগত হয়েছে মাধুরীর কঠিন রেখাপাতে, রঙের ব্যঞ্জনায়। সূক্ষ্মের মধ্য দিয়ে প্রবলকে উদ্ধৃত করে ইতালির চিত্রী আনন্দিত। মার্কিনেও তাই, ভারতবর্ষের নতুন প্রাচীন দৃষ্টান্ত আরো দেবো। শ্রুতি-জালের প্রচ্ছন্ন বা আপাত অনির্দিষ্ট বিন্যাসে দূর থেকে ক্যাস্টানেট বা ড্রাম বেজে ওঠে পশ্চিমী সংগীতে, মধ্যে মধ্যে বাঁশির ধ্বনিতে বাঁধা অনেকখানি স্তব্ধতা। ভেবে দেখুন, য়ুরোপীয় অর্কেস্ট্রার বিরাট আয়োজনে এ কোন্ নতুন পর্ব। ভারতীয় বীণার তান, ঝালার কাজের প্রভাব শেষ পর্যন্ত এ দেশেও দেখা দিল। আরণ্য আফ্রিকার রূঢ় কোমল উচ্চারণ বাদ্য পশ্চিমে প্রবেশ করেছে নিগূঢ় নৃত্যবাহন ছন্দে, অথচ সিম্ফনির মূল ধুয়োয় প্রমিত হয়ে। উগ্রজাতীয় jazz-এর সপক্ষে নয় উল্টো পথে এই অনুপ্রেরণা; পশ্চিমী নূতন মার্গসংগীতের কথা বলছি। এমন-কি jazz এবং রক্ অ্যান্ড রোলের তাণ্ডব-লোকে রবিশঙ্কর, আলি আকবর খাঁয়ের দূর প্রভাব পৌঁছল; তার আলোচনা এখানে নয়। শুধু উল্লেখ করি, রাশিয়ান সংগীতস্রষ্টা Shostakovitch-এর সঙ্গে একবার মস্কৌ-এ কথা হয়েছিল; ফরাসি Ravel, Debussy এবং মার্কিনি Gershwin-এর পূর্বদেশীয় ও আফ্রিকান প্রভাবান্বিত সংগীতের তারিফ করে তিনি বললেন ঐ মিশ্র ধারাই এগিয়ে

চলাবে। ঘটা করে আন্তর্জাতিকতার বাদ্য বাজে না এই রকমের আশ্চর্য স্বীকৃতি তাঁর কথায় ছিল; অন্তরঙ্গ মিলের ক্ষেত্র ভিড়ে ধরা দেয় না। সংগীতের কানে শোনা চাই মিলনের সূত্র।

যে ভাবেই দেখি, পৃথিবী জুড়ে একটি সূক্ষ্মচেতন শম্বিত সৃষ্টিবিদ্যার পথে আমরা চলেছি। সঙ্গে সঙ্গে সংহার এবং স্থূলতার ছায়াও চলেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভিয়েতনামে যতই অনাসৃষ্টি চলুক-না কেন মানুষের যথার্থ সৃষ্টি সেই সমবেত যান্ত্রিক এবং পাশবিক অভিরুচিকে ছাড়িয়ে যাবে এ বিশ্বাস এখনো আছে। আংকোর্‌ভাট সাইগন থেকে বেশি দূরে নয়, বীর বন্ধুদলও সে কথা জানেন। যুগে যুগে কম্বোডিয়ার শিল্পাক্ষর আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শুভ্রে সেই সাক্ষ্য প্রতিবেশীর এবং অভ্যাগতের বোমা-বারুদে চাপা পড়বে না।

বলা বাহুল্য, সংহতির প্রবণতা শিল্পে নতুন নয়, কিন্তু আজকের অভ্যাস বিশেষভাবে সূক্ষ্মতায় স্বীকৃত। বহুকাল থেকে চীনে বা জাপানে একটি পদ্ম বা দুটি বাঁশপাতার একাগ্র মূর্তি ছবির আকাশ জুড়েছে। নো-নাটকে প্রেক্ষাগারে, আখ্যায়িকা নিপ্পনের অবিশ্বাস্য স্থিতপ্রজ্ঞ শিল্পে বিবৃত; যা নিভৃত তাই যেন একত্বে বিচিত্র হয়েছে। জেন্‌-ধ্যানের সংগতি এইখানে। আয়তন জাপানি প্রথায় কত স্বল্প প্রসাধিত হতে পারে য়ুরোপ তা প্রথমে দেখেও ধরতে পারে নি। তার পর চীন-জাপানের উত্তরসাধক ফরাসি শিল্পী সাক্‌রেদ দল— এখানে নাম করা যায় Cezanne এবং অন্য প্রসঙ্গে Gaugin প্রভৃতি যোগধর্মী শিল্পীর— য়ুরোপ জুড়ে ছড়ালেন স্বচ্ছতার টেক্‌নিক। বস্তুভারাক্রান্ত শিল্প নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। ভার নামানোর বিদ্যা রঙ্গমঞ্চে চিত্রে চলচ্চিত্রে দূরতম এশিয়ার ইশারা বহন করে পশ্চিম যুগে এসেছিল সন্দেহ নেই। তার ক্রিয়া থামে নি।

স্বীকার করতে হবে পৌরাণিক ভারতীয় শিল্প এবং সাহিত্য জড়ের বহু অত্যাচার সহ্য করেছে। য়ুরোপের অনুজ্জ্বল পর্বের মতো আমাদের এপিকে মহাকাব্যে মন্দিরে বহুর বিরাট কীর্তন সহজিয়ার গভীর সন্ধান হারিয়েছিল। আজ পর্যন্ত আড়ম্বরের দৌরাত্ম্য পূজায় পার্বণে, কথকতায়, 'সাধু-ভাষা'য় অসামঞ্জস্যে শিল্পের জায়গা জুড়ে আছে। অথচ প্রাচীন আর্যাবর্তে দেখি শিল্পসূত্রের ধ্যান; এমন-কি মনু— হায় মনু— তাঁরও ভাবে না হোক বচনে সংযমের ছন্দ। ভারতীয় স্থাপত্যে ভাস্কর্যে অতিকথনের সাক্ষ্য অস্বীকার করব না— যদিও অত্যুক্তি পুনরুক্তির পিছনে বিশেষ চিরন্তন উক্তিকে মানা চাই— কিন্তু পাশাপাশি প্রবর্তিত হল ঐতিহ্যের শ্লোক। তা না হলে সারনাথের বুদ্ধ, কাংগ্রার ছবি দেখা দিত না; বৈষ্ণব পদাবলী লিরিকের তারে বাঁধা না হয়ে দোহার স্রোতে বইত। গ্রীক পারসিক প্রভাব ভারতীয় চেতনাকে সমৃদ্ধ সমাহিত করেছে কিন্তু বৈদিক সত্তা তারও পূর্বগামী। মধ্যযুগের সন্ত কবির ও মীরার ভাষা রত্নোজ্জ্বল অথচ হৃদ্‌রঞ্জিত, কোমলে কঠিনে রচিত ভক্ত নামাবলীর স্বধার্মিক। গঙ্গা-যমুনার তীরে তীরে জেগেছে ভজনের আশ্চর্য স্বাল্পিক গূঢ় পূর্ণতা। যেমন পদ্মানদীর বাউল-সংগীতে, ময়নামতীর লোককাব্যে। পুরোনো কালীঘাটের এবং যামিনী রায়ের নব উদ্ভাবিত পট একই পথ প্রদর্শক। অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নিপুণ ছবি 'লঙ্ঘন

লঘুমায়া'র দক্ষ উদাহরণ, আচার্য নন্দলাল বসুর সংহত স্কেচের এবং চিত্রের অজস্রত্ব বিশ্বের শিল্পে অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের গানে, 'লিপিকা'য় তাঁর স্ফটিকশুভ্র ঘন নিবিষ্ট শিল্পের উদাহরণ।

স্থানীয়, জাতীয় বা ব্যক্তিবিশিষ্ট পরিমণ্ডলে যে শিল্পাগ্রহ সেদিন পর্যন্ত দূরলগ্ন বা অসংলগ্ন রূপে দেখা দিয়েছে আজ তার ছোঁয়াচ একই যুগে দ্রুত বিস্তারিত। জগৎজোড়া প্রচলনের কালে শিল্পের মূল অভ্যাস, এবং তার নূতন উৎসারিত বিধি প্রভূত অলংকরণের পরিপন্থী, এই কথা উপরে লিখেছি। বিজ্ঞাপনের পাতায় বা টেলিভিশনের কাঁচে— অথবা রাস্তায় বেরিয়ে হেঁটে— স্পষ্ট চোখে পড়ে শাড়ি কিমোনোর হাল্কা ঐশ্বর্য যা পশ্চিমী মেয়েদের ফ্যাশানে গরিমার হিল্লোল এনেছে। একান্ত হ্রস্বতার বেশ সেই পূর্বীয় প্রসাধনের কাছে লজ্জা পায়; উৎকর্ষের সমন্বয় ক্রমে দেখা দেবে। এয়ার ইন্ডিয়ার বিজ্ঞাপন সুরুচি এবং আধুনিক দৃষ্টির মর্যাদা বহন করে এদেশে প্রশংসিত হল। প্লেনের কর্মরত ভারতীয় নারীমূর্তি জাপানি বা পশ্চিমী হোস্টেস্‌দের মতোই নম্র, সুন্দর। গৃহসজ্জায়, টালির রঙিন প্রাঞ্জল গাঁথুনিতে, নাইলনের বা নব সুগন্ধের মসৃণতায়, বাক্যের ঐশ্বর্যে আমরা খুঁজি বাহুল্যবর্জিত লক্ষণ। উৎকৃষ্ট ব্যবহারে আলাপে বক্তৃতায় তৃপ্তি আনে হৃদয়ভরা অথচ অনুচ্চ স্পষ্ট আত্মপ্রকাশ, বেশির চেয়ে যা একটু কম। বাংলা কবিতায় আমরা কম্‌তির জাদু মেনেছি। যেখানে কথার প্রসাধন ঘনঘটায় দেখা দেয়, আমরা বলি 'আভরণে আজি আবরণ কেন তবে'। কাব্যে ধ্যানের ভাব আনতে হলে অতিবন্দনার দরকার নেই।

সূক্ষ্ম-সচেতনার প্রকাশ স্বল্পতার আশ্রয় নেবে এমন বাধ্যতা নেই; দীর্ঘ সংহতিও একই ধর্মসঙ্গত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপে নাম করা যায় 'পৃথিবী' কবিতার (রবীন্দ্রনাথের 'পত্রপুট' গ্রন্থে); সেখানে ঋক্‌-ধ্বনিময় দীর্ঘায়ত বন্দনা। কিন্তু বলিষ্ঠ, কালধর্মী অথচ শিল্প-সনাতন এই কারুসৃষ্টি নিখুঁত সমুদ্রশঙ্খের মতো একক, ধ্রুবপদের মতো তার ঐকধ্বনি। তবুও বলতে হবে এ রকম শিল্প বিশেষভাবে এবং সংকীর্ণ (অথচ সমৃদ্ধ প্রয়োগে) যুগ-সংশ্লিষ্ট নয়। ফ্রস্টের 'Nothing Gold Will Stay' Yeats-এর 'The Second Coming', রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম দিনের সূর্য', Eliot-এর Four Quartets-এর কিছু স্তবক বিবিধ অর্থে নতুন কালের লক্ষণাক্রান্ত।

শহরের রাস্তায় দেখি ক্ষুদ্র নিপুণ নিয়ন-আলোর বাতি পরিচ্ছন্ন অথচ সহস্রদীপান্বিত মালায় জ্বলছে; হয়তো এই পথে এজরা পাউন্ড হেঁটে যাবে। রাজামহারাজার যোগ্য আয়োজন অথচ যুগের পথযাত্রী যে-কোনো দেশের সর্বজন-হিতার্থে আলোর এই প্রসন্ন সংহত পদাবলী রচনা। প্রত্যেকটি আলো স্পষ্ট ও সুন্দর। মাটির প্রদীপও জ্বালব কিন্তু প্রগল্‌ভ ধনবিলাসী ঝাড়লণ্ঠন এবং ধ্বংসোদ্ধত জমিদারী প্রাসাদের প্রভূত মর্যাদা এবং আত্মপ্রচার পৌরাণিক বা ভিক্টোরিয় মধ্যযুগের অজস্র বাক্য-বর্ষণের মতো এখন বন্ধ থাক্।

১৩৭৩ *কার্তিক*

স্বর্ণকুমারী দেবীর গান

পশুপতি শাশমল

১

ঠাকুরপরিবারের মধ্যে সংগীতের অনুশীলন ও আয়োজন ছিল যেমন বিপুল তেমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে হিন্দু-মুসলমান ওস্তাদগণের বসত উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর, বরোদা গোয়ালিয়র অযোধ্যা দিল্লি আগ্রা মোরাদাবাদ প্রভৃতি স্থানের নিখিল ভারতীয় গুণীর সমাবেশ ঘটত সেখানে। উত্তরভারতীয় সংগীতপদ্ধতির ধ্রুবপদ খেয়াল প্রভৃতি গীতরীতি-বিশেষজ্ঞ বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের একজন বিদগ্ধ সংগীতশিক্ষক, এমন-কি বাংলাদেশের নিজস্ব গীতসম্পদ টপ্পা কীর্তন শ্যামাসংগীতেও তাঁর অসামান্য অধিকার ও সুগভীর আগ্রহ ছিল; তাঁর গানে তানের বাহুল্য ছিল না, কিন্তু সে অভাব পূর্ণ হয়েছিল কণ্ঠসৌকর্য ও প্রাণময় ভাবের আবেদনে। শ্রীকণ্ঠ সিংহ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসংগীতের অনুশীলন করতেন অনেক সময় একত্রে।[১] ভারতখ্যাত যদুভট্টের প্রসন্ন গম্ভীর ধ্রুবপদ ও ভজনগান সংগীতের আসরকে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। এ প্রসঙ্গে মৌলা বক্‌সের নামও উল্লেখ্য। ফলত ঠাকুরপরিবারের এই সাংগীতিক পরিবেশে হিন্দুস্থানী গীতকলার ঐশ্বর্যময় আঙ্গিক অলংকার-গমক এবং হ্রস্বলঘু সংযত তান ও মীড় এমন-একটি অপূর্ব রাসায়নিক সংমিশ্রণ বা অভিনবত্ব লাভ করে যার পরিণামে শাস্ত্রীয় রাগরাগিণীর আভিজাত্য ও লঘুভাবের গীতরীতি উভয়েই পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে চলে। এই বিশিষ্ট প্রকৃতির সংগীতানুশীলনের বাতাবরণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রতিভাবান গীতিকার সুরকার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন।

ঠাকুরবাড়ির বহির্মহলের এই আয়োজন অন্তঃপুর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। অন্দরমহলে সংগীতচর্চার সূত্রপাত সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী পরবর্তীকালে মন্তব্য করেছেন, "এক্ষণে সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ মহাশয় তাঁহার পত্নীকে ওস্তাদের নিকট গান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বাড়ীর ছোটোছোটো ছেলেমেয়েরা গানবাজনা লেখাপড়া সবরকমে বেশ ভালো করিয়া শিক্ষা পাইতে লাগিল।"[২] এরও বহুপূর্বে অন্তঃপুরের সংগীতানুরাগ যে প্রকাশিত হয়েছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ বর্তমান, স্বয়ং লেখিকা বলেছেন যে তাঁর জন্মের পূর্বে প্রত্যহ প্রভাতে জনৈক বহিরাগত বৈষ্ণবী অন্তঃপুরে বিবিধ প্রকারের কথকতা

---

১ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান, শারদীয় জনসেবক ১৩৭০, পৃ. ৮৪

২ সরলা দেবী, জীবনের ঝরাপাতা, ১৮৭৯ শক, পৃ. ২১৩

পুরাণপাঠ ও কীর্তন পরিবেশন করতেন।[৩] সে যা হোক, বাল্যকাল থেকে সংগীতের প্রতি একটা সহজাত আকর্ষণ অনুভব করতেন স্বর্ণকুমারী; সাহিত্য-স্রোত নামক গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে তিনি স্বীকার করেছেন যে অতি প্রত্যুষে তিনি বাগানে যেতেন পিতার জন্য পুষ্পচয়ন করতে, "যতরকম দেশীয় সুগন্ধ পুষ্পে বাগান ভরিয়া থাকিত। ভোরের বেলা মৌমাছির দল তাহার উপর গুনগুন করিয়া বেড়াইত। সেই অস্পষ্ট ঊষালোকে এই সুন্দর দৃশ্য আমার মনের মধ্যে ভারী একটা সুখের মোহ রচনা করিত।" সুরমুগ্ধ হরিণীর মতো চিত্তের এই বিহ্বল অবস্থা বিস্ময় উদ্রেক করে, বাল্যকালে এভাবে তাঁর মনে সংগীতের প্রভাব মুদ্রিত হয়ে যায় বলে তিনি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। আরো জানা যায়, "সংগীতের প্রতি অনুরাগ ছিল তাঁহার সকলের চেয়ে বেশি, কেহ বাঁশি বাজাইতেছে শুনিলে তিনি তন্ময় হইয়া পড়িতেন— তখন তাঁহার প্রাণে আপনা হইতেই কল্পনার বিচিত্র সুন্দর ছবি ফুটিয়া উঠিত, আপনা হইতে গানের সুর কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিত। কাহারো শিক্ষা এবং উপদেশ ব্যতিরেকেই তিনি গাহিতে পারিতেন এবং নব-প্রচলিত হারমোনিয়ম বাজাইতেও শিখিয়াছিলেন। একদিন তিনি আপনার মনে সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে গান গাহিতেছেন এমন সময় হঠাৎ সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন— 'স্বর্ণ! তুমি এমন সুন্দর গাইতে পার তা'ত জানতাম না।"[৪] সংগীতে সহজাত প্রতিভার প্রমাণ এবং তার স্বীকৃতির কথা এ সূত্রে জানা যায়। বাঁশি শোনার সঙ্গে প্রাণে কল্পনার ছবি ভেসে উঠত এবং গানের সুরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করত সেই ভাববস্তু অথচ এ সমূহ সম্ভব হয়েছিল 'শিক্ষা এবং উপদেশ ব্যতিরেকেই'। পরবর্তীকালের অনুশীলন এই সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করে মার্জিত বৈদগ্ধ্য দান করেছে।

অগ্রজ হিতাকাঙ্ক্ষী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহায়তায় সংগীতের ক্ষেত্রে তিনি অতঃপর দৃঢ়তার সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন। স্বামী জানকীনাথ ঘোষালের বিলাতগমনের ফলে স্বর্ণকুমারী মহর্ষি পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করতে থাকেন এবং ঐ সময় থেকে তিনি পারিবারিক সাহিত্যচর্চায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'একজন যোগ্য সঙ্গীরূপে' পরিগণিত হতে থাকেন। তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানো বাজিয়ে নানাবিধ সুর রচনা করতেন, "সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইত। স্বর্ণকুমারীও অনেক সময় আমার রচিত সুরে গান প্রস্তুত করিতেন। সাহিত্য এবং সংগীতচর্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত।"[৫] এ সংবাদও জানা যায়, পিত্রালয়ে স্বর্ণকুমারী অবস্থানকালে বাইরের তেতলায় তাঁর বসবার ঘরে একটি পিয়ানো বাজনা থাকত[৬], স্বর্ণকুমারীর ব্যবহৃত এই পিয়ানোতেই পরবর্তীকালে কন্যা সরলা সংগীত অভ্যাস

৩ আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার, প্রদীপ ১৩০৬ ভাদ্র

৪ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলা কবি, ১৩৬০, পৃ. ৪১

৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, ১৩২৬, পৃ. ১৫৫-৫৬

৬ জীবনের ঝরাপাতা, পৃ. ১৭

করেছিলেন। শেষবয়স পর্যন্ত লেখিকার সংগীতানুরাগের প্রমাণ পাওয়া যায় প্রফুল্লময়ী দেবীর স্মৃতিকথা থেকে [৭]; তাঁর রামবাগানস্থ বাড়িতে গিয়ে শরৎকুমারী চৌধুরানী তাঁকে প্রায়ই সেতার অভ্যাস করতে দেখেছেন। [৮] গার্হস্থ্যজীবনকে অস্বীকার না করেও যে সাহিত্য সংগীত প্রভৃতি চারু ও কারু-বিদ্যার অনুশীলন করা সম্ভব স্বর্ণকুমারী দেবী তার প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল। গৃহলক্ষ্মীর মাধুর্যের সঙ্গে কলালক্ষ্মীর শ্রীর একটি অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছিল তাঁর জীবনে।

২

সংগীতরসিক ও সুরকার স্বর্ণকুমারী গীতরচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সাধারণত তাঁর গানের আরম্ভে শাস্ত্রীয় রাগরাগিণী ও তালের নির্দেশ পাওয়া যায়। এর ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়, কোথাও রাগ ও তালের নির্দেশ বর্তমান, কোথাও তালের উল্লেখ নেই, আবার কোথাও রাগ বা তালের কোনো নির্দেশ নেই, কোথাও বাউলের সুর কীর্তনের সুর কিংবা রামপ্রসাদী সুর প্রভৃতি প্রদত্ত। কোনো কোনো গান উৎসব উপলক্ষে রচিত, কোনোটি বা উপন্যাস বা নাটকের মধ্যে পরিবেশিত হয়েছে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। তা ছাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বয়ংনির্ভর গানও পাওয়া যায়, বিশুদ্ধ গানের প্রয়োজনে তাদের সৃষ্টি।

কয়েকটি গান সম্বন্ধে কতগুলি আবশ্যকীয় তথ্যের অবতারণা করা যায়। সংগীতশতকের 'এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন' গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অশ্রুমতী নাটকে (১৮৭৯) স্থান পেয়েছে। [৯] জাতীয়-সংগীত গ্রন্থের 'কি আলোক জ্যোতি আঁধার মাঝারে' গানটির রাগ-তাল হল প্রভাতী-একতালা, অন্যত্র রাগনির্দেশে বলা হয়েছে গুজরাটি ভজন। [১০] উক্তগ্রন্থের 'তবু তারা হাসে'র কোনো রাগ বা তালের উল্লেখ নেই, একটি শিরোনাম আছে গানটির। ধর্মসংগীতের 'মা বলে আর ডাকব না' গানের রাগ-তালের নির্দেশ নেই কেবল বলা হয়েছে রামপ্রসাদী সুর, অথচ এর পরবর্তী দুটি শ্যামাসংগীতের ('দয়াময়ী নামে তোর, ওগো তারা দয়াময়ি') রাগ বা তালের উল্লেখ স্পষ্ট। সংগীতশতক গ্রন্থের 'সইলো মোর গঙ্গাজল' এবং 'ও প্রাণ মোর গঙ্গাজল' গান-দুটি পরস্পর নির্ভর, যদিও তাদের স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য; কারণ প্রথমটি প্রশ্ন আর দ্বিতীয়টি তার উত্তর; এই প্রশ্নোত্তরিকার মাধ্যমে গানে নাটকীয়তা এসেছে, আবার লঘুভাব ও চপল ভঙ্গির মধ্যে কবি-লড়াইয়ের ছায়াপাত ঘটেছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, স্বর্ণকুমারী একাধিক নাটকে রসিক রমণী কিংবা সখীর মুখে এই গান দুটি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

---

৭ আমাদের কথা, প্রবাসী ১৩১৭ বৈশাখ, পৃ. ১১২

৮ ভারতীয় ভিটা, বিশ্বভারতী পত্রিকা : ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ. ১১২

৯ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, বসুমতী সংস্করণ ৫ ভাগ, পৃ. ২১৬

১০ দেশ ১৫ এপ্রিল ১৯৪৪, পৃ. ২৭৮

'একসূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন'-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন'-এর প্রবল সাদৃশ্য বিদ্যমান, সম্ভবত অগ্রজা অনুজের দ্বারা এ ক্ষেত্রে প্রভাবিত, কারণ রবীন্দ্রনাথের গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে (১২৮৬) প্রথম মুদ্রিত হয়।[১১] পক্ষান্তরে স্বর্ণকুমারী গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় ভারতী ও বালক পত্রিকার ১২৯৬ সালের একটি সংখ্যায়। কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না হলেও 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি' গানটি যে রবীন্দ্রনাথকৃত সে সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিদেব ঘোষ দৃঢ় মত পোষণ করেন।[১২] প্রসঙ্গত বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের 'এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে'র কথা উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণকুমারীর গানটি স্নেহলতা উপন্যাসের [১৩] একটি গুপ্তসভার কার্যকলাপ বর্ণনাচ্ছলে প্রথম ব্যবহৃত; ঐ গুপ্তসভার পোয়েট লরেট নায়ক চারুর সঙ্গে সঞ্জীবনী সভার (হামচুপামুহাফ্) সদস্য কিশোর রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য স্বীকার্য— "স্নেহশীলা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী গল্পচ্ছলে প্রায় সব কথাই বলিয়াছেন ও সবটারই একটি বাস্তব ছবি আঁকিয়াছেন দেখা যায়।" [১৪] স্বর্ণকুমারীর গানের যে পাঠ গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয়ে এবং ভারতী ও বালক পত্রে পাওয়া যায় তার প্রথম দুটি চরণের পাঠান্তর পাওয়া যায় স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলীর (বসুমতী সংস্করণ) মধ্যে।

১২৯৯ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যার ভারতী ও বালকের ২৪৪ পৃষ্ঠায় বিবাহ-উৎসব নামক একটি গীতিনাট্যের প্রথম দৃশ্য মুদ্রিত হয়; ২৪৭ পৃষ্ঠায় ঐ দৃশ্যের যে স্বরলিপি প্রকাশিত তা প্রস্তুত করেছিলেন সরলা দেবী। 'কোনো পারিবারিক বিবাহ-উৎসবোপলক্ষে' [১৫] অর্থাৎ স্বর্ণকুমারীর প্রথম সন্তান হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহ উপলক্ষে সৃষ্ট এই গীতিনাট্য একটি যৌথ রচনা [১৬]; এই বিবাহ রবীন্দ্রনাথের পরিণয়ের (২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০) তিন মাস পরে সংঘটিত হয়।[১৭] উক্ত গীতিনাট্যের "মোট ৭টি দৃশ্য, ৪৫টি গান; তন্মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অক্ষয় চৌধুরী ও স্বর্ণকুমারী দেবীর কতকগুলি রচনা থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের রচনাই ২৮টি"।[১৮] প্রথম দৃশ্যের কেবল শেষগান 'নাচ শ্যামা তালে তালে' রবীন্দ্রনাথের রচনা ও ভগ্নহৃদয়ের (১২৮৮) গান [১৯], অবশিষ্ট

---

১১ সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২২১। "খুব সম্ভব ১৮৭৭ সনে 'সঞ্জীবনী সভা' প্রতিষ্ঠার কালে গানটি রচিত হয় এবং পরে 'পুরুবিক্রম নাটক'-ভুক্ত হয়।"

১২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-গ্রন্থপরিচয়, ১৩৪৯ পৌষ। "গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, ইহা আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিয়াছি।"— শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের একটি গান, দেশ ২৬ চৈত্র ১৩৫০, পৃ. ২৫৭

১৩ ভারতী ও বালক, কার্তিক ১২৯৬, পৃ. ৩৬৫

১৪ অখণ্ড গীতবিতান, আশ্বিন ১৩৬৭, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৯৮৭

১৫ ইন্দিরা দেবী, রবীন্দ্রস্মৃতি, বিশ্বভারতী পত্রিকা : মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩, পৃ. ১৯৪-৯৫

১৬ জীবনের ঝরাপাতা, পৃ. ৫৬

১৭ সমকালীন, ১৩৬৪, পৃ. ২০-২১

১৮ গীতবিতান, পৃ. ৯৭৬

১৯ গীতবিতান, পৃ. ৭৭১, ৯৭৫

গানগুলি লেখিকার বসন্ত উৎসব (১৮৭৯) থেকে গৃহীত। অর্থাৎ বসন্ত উৎসবের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক থেকে কয়েকটি গান নিয়ে ও সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের একটি গান দিয়ে বিবাহ-উৎসবের প্রথম দৃশ্যটি রচিত হয়েছিল। ভারতী ও বালকে মুদ্রিত উপযুক্ত স্বরলিপির প্রারম্ভে বলা হয়েছে, "গীতিনাট্যে একটি গানের অব্যবহিত পরেই তার পরের গানটি ধরা হয়। অনেক সময় পূর্বগানের তালের মাত্রার সহিত পরের গানের যোগ থাকে।" এখানে একটি তথ্য পরিবেশনযোগ্য— ১২৯৯ সালের ভারতী ও বালকের ৫২৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত একটি পাদটীকা থেকে জানা যায় যে ভাদ্র-আশ্বিনের ২৪৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিবাহ-উৎসবের 'এই মল্লিকাটি পরাইব চুলে' গানটির তালে যৎ-এর পরিবর্তে একতালা এবং ২৪৬ পৃষ্ঠার 'কেমন সখি আমার সাথে' গানটির খেমটা স্থলে কাওয়ালি হবে। এ-সকল তথ্য জানিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ সেন। বলা দরকার যে বসুমতী সংস্করণ গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত বসন্ত-উৎসব গীতিনাট্যে গান দুটির তাল সংশোধিত হয় নি।

বঙ্গের মহিলা কবি গ্রন্থে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন, "তাঁহার বিরচিত 'এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন' একটি সর্বজন-পরিচিত সংগীত" [২০]; তিনি 'নিঃঝুম নিঃঝুম গম্ভীর রাতে' গানটিকেও 'সর্বজনবিদিত ও সর্বজনপ্রিয়' বলে দাবি করেছেন; তাঁর 'শীতল শান্ত বেলা' গানটিতে শেষ-জীবনের করুণ আর্তি প্রকটিত বলে তিনি মনে করেন— প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘশ্বাসে ভরা স্বগতোক্তির মতো কবিতাটির বিশ্রস্ত চরণগুলি পাঠকহৃদয় দ্রবীভূত করে। [২১] এই একই ভাবধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় নিশীথ সংগীতের 'এক আমি যাত্রী'তে, ভারতী সম্পাদনা থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণের দিনে (১৩২২) তাঁর শান্ত ক্লান্ত দেহমনের নিবৃত্তি-লোলুপতা ও নিঃসঙ্গ চিত্তের অসহায়তার কথা পত্রিকার মধ্যে মূক-মুখর হয়ে আছে।

স্বর্ণকুমারীর স্বরলিপি রচনা সম্বন্ধীয় আলোচনার প্রারম্ভে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য পরিবেশনযোগ্য : "স্বর্ণকুমারী-রচিত গানের দুইখানি স্বরলিপি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। স্বরলিপিকার— শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী। অধিকাংশ গানের সুর সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন— গীত-রচয়িত্রী স্বয়ং।" [২২] গীতিগুচ্ছের (প্রথম প্রকাশ ১৮ জানুয়ারি ১৯২৩) মধ্যে প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডে ৫১টি ও দ্বিতীয় খণ্ডে ২০টি মোট ৭১টি গানের স্বরলিপি আছে, তন্মধ্যে অন্যূন ৩০টি গানের সুর স্বয়ং গীতিকারেরই রচনা। স্বর্ণকুমারী ও ব্রজেন্দ্রলাল ব্যতীত ইন্দিরা দেবী সরলা দেবী প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি গানগুলির স্বরলিপি রচনা করেছেন।

---

২০ অশ্রুমতী নাটকের মলিনার গানরূপে প্রথম ব্যবহৃত। ডোয়ার্কিন এন্ড সন্ লিমিটেডের পক্ষ থেকে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত স্বরলিপি গীতিমালার (৩য় সংস্করণ ১৩৪৮) তৃতীয় খণ্ডে গানটির স্বরলিপি বর্তমান। এ-সকল কারণে গানটির এত খ্যাতি।

২১ 'শীতল শান্ত বেলা' গানটির পাঠান্তর দ্রষ্টব্য : স্বর্ণকুমারী-রচিত গীতিগুচ্ছ প্রথম ভাগ, ৭১ সংখ্যক গান।

২২ সাহিত্যসাধক-চরিতমালা, ২৮ সংখ্যা, পৃ. ১৬

উক্ত গীতিগুচ্ছ প্রথম ভাগের 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ'-এর মধ্যে স্বর্ণকুমারী বলেছেন, "গীতিগুচ্ছের প্রকাশক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গসমাজের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়ক। এই পুস্তকের গানগুলি স্বরলিপি করিবার কালে যত্নের সহিত তিনি তাল লয় বিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন এবং অনেকগুলি গানে সুর সংযোগও তিনিই করিয়াছেন। বস্তুত তাঁহার যত্ন পরিশ্রমেই যে গানের এই বইখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, লেখনীমুখে আজি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে আমার পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। অন্য যাঁহারা গীতিগুচ্ছের কোনো কোনো গান সুরতানে শ্রুতিমধুর করিয়া দিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আমার আত্মীয় এবং সংগীতজ্ঞ গুণী। তাঁহাদের নাম গানের সুরের সঙ্গেই এই পুস্তকে সংযুক্ত আছে। তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যে নিবেদন অনাবশ্যক হইলেও তাহা কিছু কম আন্তরিক বা গভীর নহে।" ব্রজেন্দ্রলাল 'প্রকাশকের নিবেদনে' বলেছেন, "এই গ্রন্থে জাতীয় সংগীত ও ব্রহ্মসংগীতের সংখ্যাই অধিক। অন্যান্য ভাবের গান যাহা আছে তাহাও যৌবনসুলভ উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেমসংগীত নহে, অতএব এই স্বরলিপি গ্রন্থ নিঃসংকোচে বালকবালিকার হাতে দেওয়া যায়। দ্বিতীয় ভাগে দেবীর অন্যান্য সংগীতের সহিত তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে খাঁটি প্রেমভাবের ও হাস্যকৌতুক রসাত্মক সংগীতাদি সংগ্রহপূর্বক স্বরলিপি প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। এ গ্রন্থের অধিকাংশ গানই রচয়িত্রীর নব রচনা।" গান ও সুর রচনার কালানুক্রমে গ্রন্থে গানগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে, এজন্য 'ভাবের ধারাবাহিকতা অনুসারে গানগুলি পরে পরে ক্রমসংবদ্ধ হইতে পারে নাই।' প্রস্তাবিত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্বেষণ করে পান নি বলে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় স্বর্ণকুমারী রচিত প্রেম-গীতি শীর্ষক অন্য একটি স্বরলিপি পুস্তককে গীতিগুচ্ছের দ্বিতীয় ভাগ বলে মনে করেছেন। 'প্রকাশকের নিবেদন' থেকে এরূপ ধারণা সমর্থিত হয়, কারণ এ পুস্তকে জাতীয় সংগীত বা ধর্মসংগীত নেই অথচ প্রেমভাবনা ও বিবিধ বিষয়ক গান আছে।

গীতিগুচ্ছের প্রথম ভাগের মূল গ্রন্থ শুরু হওয়ার পূর্বে 'আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা' দেওয়া হয়েছে। ডোয়ার্কিন এন্ড সন্-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি গীতিমালা (৩য় সংস্করণ ১৩৪৮) গ্রন্থের প্রথমে স্বরলিপির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। স্বর্ণকুমারী অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথকে স্বরলিপি-প্রবর্তক রূপে উল্লেখ করেছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হস্তে পদ্ধতিটি পরিমার্জিত হয়।[২৩] অন্যত্র এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "অধুনা প্রচলিত সাংকেতিক স্বরলিপির প্রথম প্রবর্তক ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।... জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই স্বরলিপি-প্রথার কিছু পরিবর্তন করিয়া সরল ও আধুনিক স্বরলিপি-প্রথার সৃষ্টি করেন। সৌরীন্দ্রমোহনের পদ্ধতিকে দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। যথা, র্সা র্রা র্গা। মাথায় দণ্ড দিয়া মাত্রার চিহ্ন দেওয়া হইত। পরে শূন্যমাত্রিক স্বরলিপি-প্রথা প্রবর্তন করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ।[২৪] যথা,

২৩ সাহিত্য-স্রোত, পৃ. ২৮২

২৪ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা'য় বলেছেন যে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'অঙ্ক দিয়ে এক এক রাগিণীতে গানের সুর মেপে নিতেন।' —রবীন্দ্ররচনাবলী ২৬ খণ্ড, পৃ. ৬২৫

স ০০০ র০ গ০। সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি-প্রথা প্রবর্তন করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। যথা, স১ র২ গ৩। এই প্রথা বেশ সরল, শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজবোধ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরে শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, শ্রীমতী সরলা দেবী ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এবং পরে অনেকেই এই প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন।" [২৫] ১২৯৫ সালের পৌষ সংখ্যার ভারতী ও বালকে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি স্বীকারোক্তি থেকে অনুমিত হয় তিনি ইতিপূর্বে সংখ্যামাত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এসেছেন। তিনি বলেছেন, "ইতিপূর্বে বালকে যে স্বরলিপিপ্রণালী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া নিম্নলিখিত সংকেত অনুসারে আমরা পুনর্বার ভারতীতে গানের স্বরলিপি প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছি।" [২৬] এবং এইটিই সংখ্যামাত্রিক প্রণালীর বিবর্তিত রূপ বা 'আকারমাত্রিক রীতি'। স্বর্ণকুমারী গীতিগুচ্ছ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি গীতিমালা গ্রন্থে এই রীতিপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের শূন্যমাত্রিকতা ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংখ্যামাত্রিকতার সমন্বয়ে এই পরিমার্জিত ও সংশোধিত আকারমাত্রিক প্রণালীর উদ্ভব ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে ১২৮৭ সালের ভারতী পত্রিকার শ্রাবণ ভাদ্র কার্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত স্বররহস্য-শীর্ষক প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা যায়। স্বরলিপি রচনায় লেখিকার আগ্রহ ছিল প্রশংস্য, স্বরকে ও সুরকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলার এই আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতি সম্বন্ধে তিনি আদৌ উদাসীন ছিলেন না, একদা ভারতী ও বালক [২৭] পত্রিকায় তিনি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন বালকে ব্যবহৃত বিস্তারিত স্বরলিপি সংকেতগুলি ভারতীতে পুনঃপ্রচারের ব্যবস্থা করে। এমন-কি নিজের কয়েকটি গানও তিনি স্বরলিপিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি গীতিমালার তৃতীয় খণ্ডে লেখিকার 'এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন' এবং 'জনমের মত সখা বিদায় দেহ গো মোরে' গান দুটি স্বরলিপি পাওয়া যায়, এর স্বরলিপিকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ; এমন-কি গীতিগুচ্ছের কোনো কোনো গানের সুর দিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [২৮] সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 'এখনো এখনো প্রাণ' সম্বন্ধে বলা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক পিয়ানো বাজিয়ে সুরের ইন্দ্রজাল রচনাপর্বে গানটি সম্ভবত রচিত, কারণ স্বরলিপি গীতিমালায় গানটির কথাকাররূপে স্বর্ণকুমারী এবং সুরকার হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম উল্লিখিত; তবে পরবর্তীকালে গানটিতে রচয়িত্রী কিছু তাল-সুরের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিলেন বলে মনে হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি গীতিমালা এবং সরলা দেবীর শতগানে (১৩৩০) গানটির তাল বলা হয়েছে মধ্যমান; কিন্তু রচয়িত্রীর সংগীতশতকে তাল হল আড়া। 'জনমের মত সখা' গানেও অনুরূপ ব্যাপার লক্ষণীয়, সংগীতশতকে ঐ গানের তাল আড়া অথচ স্বরলিপি গীতিমালায় ঝাঁপতাল ব্যবহৃত।

---

২৫ ভারতী ১৩১৮ মাঘ, পৃ. ৯৯৩-৯৪

২৬ ভারতী ও বালক ১২৯৫ পৌষ, পৃ. ৪৮৩

২৭ ঐ ১২৯৩, পৃ. ৪৬ পাদটীকা

২৮ গীতিগুচ্ছ, ১৪ সংখ্যক গান 'আয় রে ভাই', পৃ. ২৫-২৬

সরলা দেবীর শতগানে স্বর্ণকুমারীর নয়টি গানের স্বরলিপি আছে, গানগুলির পরিচয়-জ্ঞাপক একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল—

১ এখনো এখনো প্রাণ। 'সুর— প্রচলিত'। ভৈরবী, মধ্যমান; অন্যত্র আড়া
২ এমনি করে তারো কি। সুর— সরলা দেবী। কীর্তন, কাওয়ালি; অন্যত্র মিশ্র একতালা
৩ এ হৃদি নিভাতে চাহে। বেহাগড়া, ঝাঁপতাল; অন্যত্র আড়া
৪ ওহে পরাণ প্রিয়। সুর— স্বর্ণকুমারী। মিশ্র কানাড়া, একতালা; অন্যত্র কাওয়ালি
৫ কি আলোক জ্যোতি। সুর— গুজরাটি। প্রভাতী, একতালা
৬ নিঃঝুম নিঃঝুম গম্ভীর রাতে। সুর— স্বর্ণকুমারী। মল্লার, কাওয়ালি
৭ বহুক ঝটিকা ঝড়। সুর— হিন্দুস্থানী। ইমনকল্যাণ, আড়াঠেকা
৮ সখি নব শ্রাবণ মাস। সুর— সরলা দেবী। মল্লার, কাওয়ালি
৯ সে কেমনে চলে যায়। সুর— রসিকলাল ঘোষ। মিশ্রবেলাওল, একতালা

এই তালিকায় যেখানে রাগতালের ভিন্নতা দেখা দিয়েছে তার উল্লেখ করা হল, প্রধানত শতগান ও সংগীতশতকের মধ্যে এই পার্থক্য লক্ষিত হয়েছে। সরলা দেবীর এই স্বরলিপির কোনো কোনোটি সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'এ হৃদি নিভাতে চাহে' গানের স্বরলিপি ১৩০২ সালের ভারতীয় বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং এর সুর 'ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এস হে' গানের অনুরূপ বলে মন্তব্য করা হয়েছে সেখানে। 'সখি নব শ্রাবণ মাস'-এর স্বরলিপি সরলা দেবী প্রথম প্রকাশ করেন ১৩০২ সালের ভারতী পত্রিকায়।

৩

স্বর্ণকুমারীর গানের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হল। বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত গানের পুস্তকাবলী এবং আরো কয়েকটি গ্রন্থ অবলম্বনে এই তালিকাটি যদিও প্রস্তুত তথাপি তাঁর রচিত সমূহগানের উল্লেখ করা সম্ভব হল না, কারণ উপন্যাস নাটক প্রহসন কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এমন অনেক গান ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলি তাঁর কোনো সংগীতপুস্তকে স্থান পায় নি কিংবা এ-সকল পুস্তক মুদ্রিত হওয়ার পরে রচিত গান কোনো গ্রন্থের অন্তর্গত হতে পারে নি বলে সেগুলি এখনো ইতস্তত ছড়িয়ে থাকায় নিখুঁত ও সম্পূর্ণ তালিকাবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। গ্রন্থাবলীর মধ্যবর্তী জাতীয় সংগীত (৬), ধর্মসংগীত (১৪), প্রেম-পারিজাত : কবিতা ও গান (১৩) ও সংগীতশতক (৮৬) প্রভৃতি গ্রন্থের গানগুলির সংখ্যা একশো উনিশ; আবার সংগীতশতকের 'চোখের আড়াল হলে সব ভুলে যায়' গানটির উল্লেখ দুবার পাওয়া যায়, তবে উভয় গানের কথা এক হলেও রাগের স্বাতন্ত্র্য আছে কারণ গানটি

বেহাগে কিংবা জিলফে গীত হতে পারে যদিচ উভয় ক্ষেত্রে তাল আড়া। এ-সকল গানের সঙ্গে অন্যান্য সংগৃহীত গান ও উপন্যাস-নাটক-কাব্য প্রভৃতিতে ব্যবহৃত গীতের পরীক্ষামূলক সংকলন এ ক্ষেত্রে পরিবেশিত হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ডে ধৃত প্রেম-পারিজাতের প্রথম পাঁচটি রচনা বর্তমান তালিকা থেকে বর্জিত, কারণ গ্রন্থের আখ্যাপত্র থেকে জানা যায় উল্লিখিত পুস্তক কয়েকটি কবিতা ও গানের সমষ্টি এবং উপযুক্ত পাঁচটি রচনার কোনো রাগ তাল নির্দেশ না থাকায় এবং প্রত্যেকের শিরোনাম থাকায় ঐগুলি কবিতা হিসাবে গণ্য। মনের সাধে, কাঁটার ব্যথা, মহাযাদু, গিয়াছে তৃষা, লিখিতেছি দিনরাত— শিরোনামযুক্ত এই রচনাপঞ্চকের পর রাগ তালের উল্লেখসহ তেরোটি গান মুদ্রিত। ছয়টি গানের কোনো রাগ বা তাল নির্দেশ পাওয়া যায় না। সংগীতশতকের 'আমি কি করি বল সহচরি' 'ও প্রাণ মোর গঙ্গাজল' 'সইলো মোর গঙ্গাজল'-এর সম্বন্ধে 'কীর্তনী সুর' এবং ধর্মসংগীতের 'মা বলে আর ডাকব না'র সম্বন্ধে 'মিশ্ররামপ্রসাদী সুর' এরূপ উল্লেখ আছে; অবশিষ্ট দুটি গান হল জাতীয় সংগীতের 'তবু তারা হাসে' এবং 'বল ভাই বল'— শেষোক্তটি 'বাউলের সুরে' গেয়। এ সুরগুলি বাংলাদেশে সুপরিচিত কেবল 'তবু তারা হাসে' একেবারে নিরাভরণ। নীচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে তিনি গানের সুর-পরিকল্পনায় অর্ধশতাধিক শুদ্ধ বা মিশ্ররাগের আশ্রয় নিয়েছেন; ভৈরবী (৮), বেহাগ (৫), সিন্ধু ভৈরবী (৪) বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে; এতদ্ব্যতীত আলাইয়া জয়জয়ন্তী মল্লার সাহানা প্রভৃতিও ব্যাপক ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখ্য। ব্যবহৃত তালের সংখ্যা দশের অধিক, তন্মধ্যে আড়া (৪১), কাওয়ালি (২৯), এক তালা (১৯), যৎ (১২) প্রভৃতি প্রধান।

তালিকায় গানের প্রথম চরণের পাশে মূল গ্রন্থনাম, রাগ তাল এবং প্রাপ্ত প্রথম প্রকাশকাল দেওয়া হল—

অনাথ নাথ হে ভয় দুঃখহারি। ধর্মসংগীত
কানাড়ি-খাম্বাজ, একতালা

অশুভ এ কথা আজি কেন। বসন্ত উৎসব।
পিলু, যৎ

আকাশের ঐ মেঘ এখনি ত ছুটিবে।
সংগীতশতক। দেশমল্লার, আড়া

আকাশের পটে মধুর মুরতি।
ঐ গৌরসারং, যৎ

আজ ওরে বজ্র তোরে। ঐ কেদারা, আড়া

আনু কোয়েলে কুহু বলে।
ঐ মিশ্রমল্লার, কাওয়ালি

আ মরি লাবণ্যময়ী কে ও স্থির সৌদামিনী।
ঐ সিন্ধুভৈরবী আড়া

আমার সাধের পূর্ণিমার চাঁদ।
ঐ দেশ, কাওয়ালি

আমি কি করি বল সহচরি।
ঐ কীর্তনী সুর

আয় আয় আয় কে আছিস তোরা।
প্রেম-পরাজিত। বাহার, কাওয়ালি

আয় লো সরলে প্রাণের প্রতিমা।
ঐ খাম্বাজ, একতালা

আয় লো আয় লো আয় লো
মিলে সব।
সংগীতশতক। মাঝ, দাদরা

আয় লো বালা গাঁথব মালা।
ঐ ঝিঁঝিটখাম্বাজ, যৎ

আর না আর না সখি।
ঐ ভূপালি, কাওয়ালি
আহা কেন ঐ মুখখানি আজি।
ঐ আসোয়ারি, কাওয়ালি
আয় রে ভাই। গীতিগুচ্ছ প্রথম ভাগ।
মিশ্রসংকরা, একতালা।[২৯] ভারতী ১৩২৬, ১২৯
আমার গীতিকুসুম।
ঐ মিশ্রবাহার, কাশ্মীরী খেমটা
আমার মনের সাথে
ঐ বাউলের সুর, খেমটা
আমি মঙ্গল পঞ্চমী।
ঐ কর্ণাটীখাম্বাজ, কাওয়ালি
আমি আমার প্রাণের গানের ঝরণা।
ঐ মিশ্রভীমপলশ্রী, আদ্ধা
আমার ডাক পড়েছে।
ঐ মিশ্রভীমপলশ্রী, দাদরা
আমি কি চাহি।
ঐ মিশ্রকুকুভ, দাদরা
আমি বাঁধিলাম গান।
ঐ মিশ্রভৈবরী, জলদ একতালা
আহা মরি মরি।
ঐ ভাটিয়ালি সুর, কাহারবা
আমারো আঁখি ভাসে নয়ন জলে।
ভারতী ১৩০৫ ভাদ্র, ৪৩২
আমারো আঁখি কেন ভাসে।
কনেবদল
আমি কি যেমন তেমন ঘটকী।
পাকচক্র
আমার কেন গো আজি হেন উদাস প্রাণ।
ঐ মল্লার, রূপক
আমোদে কি আছে সখি।
বসন্ত উৎসব। পিলু কাওয়ালি।

আর না থামগো বালা।
ঐ ভৈরবী, যৎ
উথলিত অশ্রুবারি এ পোড়া নয়নে।
সংগীতশতক। ভীমপলাশী, আড়া
উদয় মধুর মধু কোথায় প্রাণের বঁধু।
ঐ মিশ্রমল্লার, আড়া
উদাসিনী রাখ গো এ জনে।
বসন্ত উৎসব। খাম্বাজ, কাওয়ালি
একি এ সুখের তরঙ্গ বহিছে।
সংগীতশতক। বসন্তবাহার, কাওয়ালি
এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন।
সংগীতশতক। ভৈরবী, আড়া[৩০]
এ জনমের মত সুখ। প্রেম-পারিজাত।
ভৈরবী, আড়া
এত বুঝাইনু কেন বোঝে না।
সংগীতশতক। মল্লার, ঝাঁপতাল
এমন বারি ঝরে এমন থরে থরে।
ঐ দেশমল্লার, একতালা
এমন যামিনী মধুর চাঁদিনী।
ঐ মেঘমল্লার, একতালা
এমনি করে তারো কি কাঁদে প্রাণ।
ঐ মিশ্র, একতালা[৩১]
এমনে কেমনে রব।
ঐ গোড়, ঠুংরি
এ হৃদয়-ফুলসখি শুকায়ে পড়েছে।
ঐ ললিত, আড়া
এ হৃদয় বুঝিল না কেহ।
ঐ পিলু বারোঁয়া, কাওয়ালি
এ হৃদি নিভাতে চাহে।
ঐ বেহাগড়া, আড়া।[৩২] ভারতী ১৩০২, ৪৫
এ হেন পাষাণ যদি।
ঐ তান, আড়া

২৯ স্বরলিপি গীতিমালা, ৩য় সংস্করণ ১৩৪৮ দ্রষ্টব্য
৩০ সরলাদেবী, শতগান ৩য় সংস্করণ ১৩৩০, ৯৬— ভৈরবী, মধ্যমান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি গীতিমালা দ্রষ্টব্য; অশ্রুমতী নাটকের চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চদশ গর্ভাঙ্কে ব্যবহৃত
৩১ শতগান, ১৯— কীর্তন, কাওয়ালি
৩২ ঐ ৩৩— বেহাগড়া, ঝাঁপতাল

---

৩৩ ঐ ৯৩— মিশ্রকানাড়া, একতালা

৩৪ বসন্ত উৎসবে গানটির পাঠান্তর আছে, রাগ তা উভয় গ্রন্থে এক

কে তুমি ওগো। ভারতবর্ষ ১৩৩৯ আশ্বিন, ৫৯৩-৯৪। মিত্র আসোয়ারি, একতালা [৩৫]
কেমনে বিদায় নেব। সংগীতশতক। ভৈরবী, আড়া
কেহ শুনিল না হায়। ঐ সিন্ধুকাফি, আড়া
কোথায় গেল কালরূপ। ঐ ভৈরবী, একতালা
কোন চুরায়লো তু মুঝ পরান বঁধুয়া। প্রেম-পারিজাত। কাফি, যৎ
কেমন কোরে বলব। গীতিগুচ্ছ প্রথম ভাগ। মিশ্রবিভাস, ঝাঁপতাল
কে উহারা নবীন। ঐ মিশ্র, কাশ্মীরী, খেমটা
কর নূতনবর্ষে। ঐ টোড়ি, একতালা
কে তুমি প্রেমিক বাদক। ঐ বাউলের সুর, খেমটা
কোথা হে তুমি ধর্ম্মরাজ। ঐ
কাঁদিতে পারি নে। ঐ মিশ্রখাম্বাজ, খেমটা
কে জানে সখি। ঐ কীর্তনের সুর, একতালা
কে আমারে বারে। ঐ কীর্তনের সুর
কে গো রমণী কালবরণী। কনেবদল
কে তোরা জামাই নিবি। পাকচক্র
কোথা তুমি প্রাণেশ্বরি। ঐ
কোথা ছিল সজনী লো। বসন্ত উৎসব। কালাংড়া, কাওয়ালি
কেমন সখি আমার সাথে। ঐ দেশ, কাওয়ালি
কেন মোরে এত লাজ। ঐ বেহাগ, আড়া
কোথা গো যোগিনী তুমি। ঐ জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল
কি কথা বলিলে বালা। ঐ ঝিঁঝিটখাম্বাজ, আড়াঠেকা
কি করিয়ে প্রিয়তমে মার্জনা চাহিব। ঐ ছায়ানট, আড়া
কি দেখিনু একটি লো সুখের স্বপন। ঐ ভৈরোঁ, ঝাঁপতাল
গাও জয় জয়। গীতিগুচ্ছ প্রথম ভাগ
ঘোষে বজ্র কড়মড়। সংগীতশতক। মেঘমল্লার, আড়া
চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য। সংগীতশতক। বাগেশ্রী, আড়াঠেকা
চল লো কাননে যাইব দুজনে। ঐ কালাংড়া, আড়খেমটা।
চলিনু জন্মের মত। ঐ কেদারা, যৎ
চলিলে প্রবাসে তবে। ঐ বেহাগ, আড়া
চেয়ে আছি কবে হইবে সেদিন। ঐ ভৈরবী, রূপক
চোখের আড়াল হলে। ঐ জিলফ, আড়া
চোখের আড়াল হলে সব ভুলে যায়। ঐ বেহাগ, আড়া
ছি ছি কেমন জামাই। ঐ মিশ্রঝিঁঝিট, একতালা
ছি ওকি কথা বল। বসন্ত উৎসব। কালংড়া পরজ, কাওয়ালি
জনন আমার শুধু। সংগীতশতক। বেলোয়ার, আড়া

---

৩৫ কথা স্বর্ণকুমারীর, স্বরলিপি অপরের

জনমের মত সখা।
ঐ ভৈরবী, আড়া [৩৬]
জ্বলিলে কেন এ হৃদে।
ঐ সরফর্দা, আড়া
জননী আমার।
গীতগুচ্ছ প্রথম ভাগ
জানি হে বঁধু জানি।
ঐ মিশ্রভৈরবী, তেওড়া
তবু তারা হাসে।
জাতীয় সংগীত
তারকা হারাতে পারে। সংগীতশতক।
গৌড়মল্লার, একতালা
তুমি স্বয়ম্ভু সুন্দর। ধর্মসংগীত।
মিশ্রবিভাস, যৎ
তোমার ছড়িয়ে পড়া। গীতিগুচ্ছ প্রথম ভাগ।
মিশ্রখাম্বাজ, দাদরা
তারা চললো ভেসে।
ঐ মিশ্র, দাদরা
তোমার আপনার জনা।
ঐ বাউলের সুর, কাহারবা
তোরা কাঁদিস সখি।
ঐ মিশ্রযোগিয়া, ঝাঁপতাল
তোমার সে তারাটি।
ঐ মিশ্র, কাশ্মীরী খেমটা
তুমি আমার কমলালেবু প্রাণ।
কনেবদল
তোম তোম তানা নানা।
ঐ
তবে বলব কিলো কি বেদনা।
বসন্ত উৎসব। ভৈরবী, আড়া
তোরে হায় কব না।
ঐ মিশ্র, ফেরতা
থাম থাম থাম হে।
ঐ মল্লার, যৎ
দয়াময়ী নামে তোর। ধর্মসংগীত।
খট্, যৎ
দিনের আলো নিভে এলো।
সংগীতশতক। ঝিঁঝিট, কাওয়ালি
দীন দয়াময় দীনজনে। ধর্মসংগীত।
পরজ, আড়া
দূর বিজনবনে একাকী।
প্রেম-পারিজাত। জয়জয়ন্তী, কাওয়ালি।
দোষ করেছিনু সখা।
ধর্মসংগীত। বেলাওল, কাওয়ালি
দেখ চেয়ে কি এসেছে।
গীতিগুচ্ছ প্রথম ভাগ। কীর্তনের সুর
দাঁড়াও গো রানি।
ঐ ভারতী ১৩২৬, ৪৫৮
দেখ সখি মেলি আঁখি
বসন্ত উৎসব। ঝিঁঝিটখাম্বাজ, কাওয়ালি
দেখ লো শোভা কতশত।
ঐ খাম্বাজ, দাদরা
দারুণ আঘাত লাগিল মরমে।
ঐ জয়জয়ন্তী, একতালা
দেবি নমি চরণে।
ঐ খাম্বাজ, দাদরা
দেবি এসেছি যোগিনী হব।
ঐ কাফি, আড়া
দিও না দিও না লাজ।
বসন্ত উৎসব। ছায়ানট, খেমটা
ধরনি গো মানবজনম। জাতীয় সংগীত।
দেশসিন্ধু, আড়া
ধর লো ধর লো ডালা।
বসন্ত উৎসব। বেহাগ, কাওয়ালি
নিঃঝুম নিঃঝুম গম্ভীর। প্রেম-পারিজাত।
মল্লার, কাওয়ালি
নিঠুর নয়নে কেন।
সংগীতশতক। জয়জয়ন্তী, কাওয়ালি
নমস্তে সতে তে। গীতিগুচ্ছ প্রথম ভাগ।
ভৈরোঁ, সুরফাঁকতাল।
নন্দন আনন্দ আভা।
ঐ মিশ্র, একতালা

৩৬ স্বরলিপি গীতিমালায় ভৈরবী, ঝাঁপতাল।

নমামি ত্বাং ভারতি।
ঐ মিশ্রবেহাগ, খেমটা
না না লুকাব না আর।
ঐ ভৈরবী, আড়া
নির্ভয় হও গো বালা। বসন্ত উৎসব।
জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল
পোহাইল বিভাবরী। সংগীতশতক।
বিভাস, যৎ
প্রাণ সঁপিলাম তোমায়।
ঐ সাহানা, যৎ
প্রিয়ে আজি এ কেমন।
প্রেম-পারিজাত। মিশ্রভূপালী, একতালা
প্রেমের অমৃত বিষে। সংগীতশতক।
মারু, আড়া
প্রাণের উচ্ছ্বাস বাঁধতে নারি।
পাকচক্র
পোহায় যামিনী মলিন চন্দ্রমা।
বসন্ত উৎসব।
ভৈরোঁ, একতালা
পোহাইল বিভাবরী।
ঐ বিভাস, যৎ
প্রিয়ে হৃদয়ের ধন।
ঐ ইমনকল্যাণ, আড়া
ফুরায়েছে হাসি সব। জাতীয় সংগীত।
টোড়ি, একতালা
ফোটা ফুলগুলি আনিয়াছি।
সংগীতশতক। পিলু, যৎ
ফুরায় ফুরায় রাতি। বসন্ত উৎসব।
রামকেলি, আড়া
বড় সাধ বড় আশা। জাতীয় সংগীত।
জয়জয়ন্তী, যৎ
বল ভাই বল।
ঐ বাউলের সুর
বহুক ঝটিকা ঝড়। ধর্মসংগীত।
ইমনকল্যাণ, আড়া
বিভু হে তোমারি আদেশে।
ঐ বাহার, কাওয়ালি

বিদায় প্রাণেশ। সংগীতশতক।
ভৈরবী, ঝাঁপতাল
বিরাগ ভরে অমন করে।
ঐ আলাইয়া, আড়া
বুঝি গো সে এল না।
প্রেম-পারিজাত। হাম্বীর, আড়া
বন্দেমাতরম্ বলে।
গীতিগুচ্ছ প্রথম ভাগ
বিদায় দেব কেমনে।
ঐ মিশ্রসাহানা, ঝাঁপতাল
বসন্ত জেগেছে।
ঐ বেহাগ, ঢিমে তেতালা
ব্রাদার হে তোমার।
কনেবদল
বাজা রে বাঁশরী বাজা।
ঐ
বল বল বল সখি একি নবভাব।
বসন্ত উৎসব।
ঝিঁঝিটখাম্বাজ, খেমটা
বেশ বেশ ভাই যাই চল।
ঐ পরজকালাংড়া, কাওয়ালি
বাণীর বীণাটি লইয়ে।
ঐ ভৈরবী, দাদরা
ভুলে যাও দুখিনীরে। সংগীতশতক।
সিন্ধুভৈরবী, আড়া
ভিক্ষাং দেহি। গীতিগুচ্ছ প্রথম ভাগ।
ভূপালি, ঝাঁপতাল
ভাইরে চিরদিন কি।
ঐ মিশ্র, দাদরা
মধুবসন্ত সখিরে। সংগীতশতক।
বারোঁয়া খাম্বাজ, একতালা
মরণের সাধ সখি।
ঐ সিন্ধুভৈরবী, কাওয়ালি
মনের উচ্ছ্বাসে হরয।
ঐ আশাবরী, আড়া
মধুর প্রভাতে মধুর রবি। ধর্মসংগীত।
প্রভাতী, একতালা

মা বলে আর ডাকব না।
ঐ মিশ্ররামপ্রসাদী সুর
মধুর আকাশে। গীতিগুচ্ছ প্রথম ভাগ।
মিশ্রললিতা, একতালা
মনটি ওরে ভাল করে।
ঐ মিশ্রঝিঁঝিট, তেওড়া
মম চিত্তকুঞ্জ কাননে।
ঐ সিন্ধুখাম্বাজ, ঢিমে তেতালা
মঙ্গল পঞ্চমী আজি।
ভারতী ১৩১৭, ৮২৮
মরি কি বাহাদুরি বলিহারি
পাকচক্র
মিনতি, নিদয়া, আর ও কথা বোলো না।
বসন্ত উৎসব। গৌরসারং, আড়া
মানিনু, মানিনু, হার তোর কাছে।
ঐ পিলু, কাওয়ালি
মালতী মালা খুলে নে খুলে নে।
ঐ জংলাপিলু, কাওয়ালি
যাও যাও যাও হে। সংগীতশতক।
মিশ্রবিভাস, কাওয়ালি
যাতনার এই দুখময় সুখ।
ঐ বেলোয়ার, আড়া
যাতনা-সমুদ্র মাঝে।
ঐ সিন্ধুড়া, আড়া
যে তোমারে চায় ওগো।
কনেবদল
যা যা তুলগে লো তোর সাধের কুসুম।
বসন্ত উৎসব। খাম্বাজ, একতালা
যাই সখি আমি যাই।
ঐ লচ্ছাসার, যৎ
যে আগুনে আজ জ্বলিছে পরান।
ঐ সিন্ধুভৈরবী, মধ্যমান
রিমঝিম ঘন বরিষে।
ছিন্নমুকুল [৩৭]

রণসংগীত।
ভারতী ১৩২৬, ২৮১
লুকাইবি যদি পুনঃ। সংগীতশতক।
মিশ্রপিলু, যৎ
লক্ষ ভায়ের।
. গীতিগুচ্ছ প্রথম ভাগ
লও এই লও লও প্রতিফল। বসন্ত উৎসব।
অহং, খেমটা
শতকণ্ঠের কর গান জননীর। মুক্তির গান, ৪৯
সংখ্যক। [৩৮]
ভারতীয় ১৩১২, ৫৮০
শুকাইতে রেখে একা।
সংগীতশতক। আলাইয়া, আড়া
শিখাও হে শিখাও। গীতিগুচ্ছ প্রথম ভাগ।
মিশ্র-ভৈরবী, একতালা।
শারদে শুভঙ্করী।
ঐ ভৈরবী, ঝাঁপতাল
শারদ সমীরে।
ঐ মিশ্র আসোয়ারি, কাহারবা
শীত শান্ত বেলা।
ঐ মিশ্রসারং, দাদরা ৩৯
শ্রাবণ ওহে গায়ন।
ভারতী ১৩১৬, ৬৭৫
সই লো মোর গঙ্গাজল। সংগীতশতক।
কীর্তনী সুর
সখি নব শ্রাবণ মাস।
ঐ শ্রাবণ মল্লার, কাওয়ালি।
ভারতী ১৩০২, ২০৬
সখি মোর বিরহ।
ঐ ঝিঁঝিটখাম্বাজ, কাওয়ালি
সখিরে ক্যায়সে বাজাওয়ে।
ঐ বেহাগ, আড়খেমটা
সখিরে তুল বোলো। প্রেম-পারিজাত।
পিলুবারোয়া, ঠুংরি

---

৩৭ শয়তানের স্বরলিপি বর্তমান। তুলনীয়— রবীন্দ্রসংগীত : রিমঝিম ঘন ঘন রে
৩৮ মুক্তির গান, সতীশচন্দ্র সামন্ত কর্তৃক সম্পাদিত, ওরিয়েন্ট বুক কোং, পৃ. ৫৭-৫৮
৩৯ পাঠান্তর দ্রষ্টব্য— যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বঙ্গের মহিলা কবি

সখি লো রিমঝিম ঘন বরিষে।
সংগীতশতক। মল্লার, কাওয়ালি
সখি সে কেমনে চলে যায়।
সংগীতশতক। শ্রাবণ বেলাওল, আড়া
সজনি নেহারো বসন্ত সাজে।
ঐ সোহিনীবাহার, কাওয়ালি
সজনি লো যমুনা পুলিনে। প্রেম-পারিজাত
যোগিয়া বিভাস একতালা
সহসা হাসিল কেন? সংগীতশতক।
সাহানা, আড়া
সাগরছেঁচা মাণিক আমার।
ঐ বারোয়াঁ ঝিঁঝিট, ঠুংরি
সারাদিন পড়ে মনে।
ঐ বেহাগ, যৎ
সুখের বসন্তে আজ।
ঐ বেহাগ, কাওয়ালি
সুখের স্বপনে ছিনু।
ঐ টোড়ি, আড়া
সুচারু চাঁহিমা মাখি।
ঐ সোহিনীবাহার, আড়া
সুশীতল মহীরুহ।
প্রেম-পারিজাত। সাহানা, কাওয়ালি
সেই ত কুসুম ফোটে। সংগীতশতক।
ঝিঁঝিটখাম্বাজ, কাওয়ালি
সে প্রেম সে ভালবাসা।
ঐ দেশসিন্ধু, কাওয়ালি
সফল কর। গীতিগুচ্ছ প্রথম ভাগ।
মিশ্রখাম্বাজ, একতালা
সে কেমনে চলে যায়।
শতগান। মিশ্র-বেলাওল, একতালা
সুনিবিড় ঘন।
ভারতী ১৩২৬, ৩৭২
সখি তোরা হেসে হেসে। বসন্ত উৎসব।
বসন্তবাহার, খেমটা
সরমে মরে যাই।
ঐ ঝিঁঝিট, একতালা
সখি চল চল যাই।
ঐ বেহাগ, কাওয়ালি
সখি তোরা আয় আয়।
ঐ কালাংড়া, কাওয়ালি
সখি হেরিতেছি আঁধারে একটি বিজলী।
ঐ দেশখাম্বাজ, ঝাঁপতাল
সুগভীর নিশি স্তব্ধ দশদিশি।
ঐ বেহাগ, ঝাঁপতাল
সুখে থাক ভাল থাক।
ঐ সাহানা, আড়া
সাবধান এ আস্পর্ধা।
ঐ অহং, খেমটা
সহসা একি এ হইল আমার।
ঐ শঙ্করা, আড়খেমটা
হাস একবার সখি। সংগীতশতক।
পরজ, আড়া
হায় রে হল না ত মালা গাঁথা।
সংগীতশতক। মিশ্রমূলতান, আড়া
হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা। ধর্মসংগীত।
সিন্ধু, একতালা
হের গো উদয় ঐ। সংগীতশতক।
ভূপালী, কাওয়ালি
হেরি তব মলিন। গীতিগুচ্ছ প্রথম ভাগ।
পঞ্চরাগ, খেমটা
হের গো হের।
ঐ মিশ্র, কাশ্মীরী খেমটা
হায় দেখিতে দেখিতে।
ঐ মিশ্রভীমপলশ্রী, একতালা।
ভারতী ১৩২৬, ৫৩১
হোথায় একটি গাছের আড়ালে।
বসন্ত উৎসব।
ঝিঁঝিট, একতালা

শিল্পশিক্ষার গতিপ্রকৃতি

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

১

শিক্ষার লক্ষ্য মানুষের পূর্ণ বিকাশ। মানবীয় চেতনার বিচিত্রমুখী গতিপ্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য হলেও এই লক্ষ্যে প্রায়ই মানুষ পৌঁছতে পারে না। কারণ বাধা পদে পদে উপস্থিত হয়। এই বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা থেকেই শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভব। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের বিকাশের পথে যে-সব বাধা উপস্থিত হয় সেগুলিকে কি করে অতিক্রম করা যেতে পারে তারই নির্দিষ্ট পন্থার অপর নাম শিক্ষাপদ্ধতি। কিন্তু কোনো শিক্ষাপদ্ধতি চিরস্থায়ী নয়। লক্ষ্য এক হলেও রীতি-পদ্ধতির পরিবর্তন বারংবার ঘটেছে। এই কারণে বলা যেতে পারে শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তনশীল। অধিকাংশ সময়ই এই বিবর্তনের মূলে থাকে সমাজের প্রভাব। এই কারণে শিক্ষাপদ্ধতির বিবর্তন অনুসরণ করতে হলে বা নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করার কালে সমাজের অবস্থা-ব্যবস্থার দিকে লক্ষ দিতে হয়।

যদিও সমাজ মানুষেরই সৃষ্টি তৎসত্ত্বেও সমাজ বারংবার মনুষ্যত্বের বিকাশের পথে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সমাজ সকল সময়ই অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ কথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য, অভ্যাস ছাড়া কোনো শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে না। অপর দিকে এ কথাও ঠিক যে, অভ্যাসকে অতিক্রম করতে না পারলে বৈচিত্র্যময় মানবজীবনের পূর্ণ বিকাশ কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। অভ্যাসের দ্বারা অর্জিত শিক্ষার দ্বারাই অভ্যাসকে ভাঙতে হয়। পুরানোকে ভেঙে নূতনের প্রবর্তন ব্যক্তিগত মানুষের ক্ষেত্রেই প্রথম অঙ্কুরিত হয়। ক্রমে তার প্রভাব প্রতিফলিত হয় সমাজজীবনে। ভাঙাগড়ার মুহূর্তে দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে এবং লড়াই লাগে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে।

মানবীয় জীবনের অন্যতম প্রকাশ রূপেই সমাজের উপযোগিতা। তবে কেন সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত মানুষের দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণভাবে আজও তিরোহিত হল না সে বিষয়ে প্রশ্ন স্বভাবতই জাগবার কথা।

এই প্রশ্নের জবাব অনেক জ্ঞানীগুণী দিয়েছেন। আলোচনার সঙ্গতি রক্ষার জন্য আমাদের এ বিষয়ে দু-এক কথা বলা দরকার। অভ্যাসের পথে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন তথা সমাজের সূচনা। অভ্যাসের দ্বারা যে শক্তি অর্জন করা হয় তার ফলে মানুষের মধ্যে একটা নিরাপত্তার ভাব আসে। জীবনধারণের সুশৃঙ্খল বিধিব্যবস্থা ও নিরাপত্তা যতই কাম্য হোক-না কেন অনেক সময় অভ্যাসের পরিণামরূপে যে সংস্কার গড়ে ওঠে

সেটিকে ভাঙার প্রয়োজন হয়। ভাঙবার মুহূর্তে নূতন অভ্যাস নূতন শিক্ষা মুহূর্তে প্রবর্তন অপরিহার্য। কাজেই মানবীয় বিকাশের পথে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন একাধারে সম্পদ ও অপর দিকে বিপদ-বাধা উপস্থিত করে।

সূক্ষ্ম বা গভীর মানবীয় চেতনার অন্যতম প্রকাশ শিল্পকলা। এই চেতনা সম্বন্ধে যে কোনো ভাবেই হোক মানুষ সচেতন থেকেছে। তাই শিল্পের প্রভাববর্জিত সমাজ কোথাও দেখা যায় না। জীবনধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বা সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ সম্বন্ধে চেতনা কখনো নিষ্প্রভ কখনো উজ্জ্বল কিন্তু সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় নি।

জীবনধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত শিল্পরূপের সঙ্গে সমাজের অবস্থা-ব্যবস্থার সম্বন্ধ কতটা ঘনিষ্ঠ সূক্ষ্ম বা গভীর অনুভূতিগ্রাহ্য শিল্পের সঙ্গে সামাজিক বিধিবিধানের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষভাবে অনুসরণ করা সকল সময় সম্ভব হয় না।

শিল্পের প্রধান তাৎপর্য অভিব্যক্তির দিক দিয়ে। হৃদয়হীন মানুষ শক্তিশালী হলেও যেমন তার বর্বরতা ঘোচে না তেমনি শিল্পাশ্রিত অভিব্যক্তির অবর্তমানে সমাজে বিশেষ রকমের বর্বরতার লক্ষণ দেখা দিতে বাধ্য।

এক সময় শিল্পকলার সৃষ্টির ক্ষমতাকে ঐশী শক্তির অন্যতম প্রকাশ বলে ধরা হত। ক্রমে শিল্পসৃষ্টি ব্যক্তিগত প্রতিভার অবদান রূপেই গৃহীত হয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার যতই বেড়েছে ততই শিল্পসৃষ্টির সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি অপেক্ষা নানা তথ্য জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে। এই মুহূর্তে যে শিল্পরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি তার লক্ষ্য প্রধানত উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

শিল্পের উদ্দেশ্য আদর্শ যেমন পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি শিল্পের শিক্ষার সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতবর্ষের জীবনে যে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে তারই অন্যতম প্রকাশ আধুনিক শিল্প ও শিল্পশিক্ষা-পদ্ধতি।

ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে যে সমাজ ভারতের বৃহত্তর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল সেই সমাজকে শিল্প সম্বন্ধে সজাগ করার জন্যই এ দেশে নূতন প্রতিষ্ঠিত শহরগুলিতে শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্রমে জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে চেতনা উদ্ভূত হওয়ার সঙ্গে শিল্পশিক্ষার আর-একটি অধ্যায় শুরু হল। এই দুই ভিন্নমুখী শিক্ষানীতির প্রভাবে আজকের দিনে ভারতীয় শিল্প ও শিল্পশিক্ষার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে।

শিল্পশিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে আজকের দিনের মতো আর ঊনবিংশ শতাব্দীর মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য অনেক।

শিল্প যে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ এবং শৈশবকাল থেকেই এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন এ কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পশিক্ষকদের লক্ষ্যের বাইরে ছিল বলেই শিল্পশিক্ষা অনেকদিন পর্যন্ত অপরিণত থেকেছে। শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আমাদের থাকা দরকার। দৈবক্রমে শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা তথাকথিত শিক্ষিত মহলেও দুর্লভ। সচরাচর তথ্য আহরণের সুযোগ-সুবিধা মুক্ত করাকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা শিক্ষার চূড়ান্ত আদর্শ বলে মনে করি। এরই অপর

নাম বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। এই জাতীয় শিক্ষাব দ্বারা মানুষের সকল রকমের বিকাশ হওয়া সম্ভব নয় বলেই বিজ্ঞান-প্রভাবান্বিত ইয়োরোপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেছে যে অনুভূতিগ্রাহ্য বিষয়গুলিও শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এই কারণেই শিল্প ও কলা আজ শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়েছে।

শিল্পকলাকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করার পরিকল্পনা এ দেশে শুরু হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর। এক শত বৎসরের তথ্যমূলক শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত ভারতবাসীর মন ও চিন্তা তথ্যের দ্বারা সে সময় ভারাক্রান্ত। এই কারণে নূতন পরিকল্পনা শিক্ষাব্রতীরা সেই সময় অনায়াসে গ্রহণ করতে পারেন নি। ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিদ্যালয়ের সময় থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত শিল্পশিক্ষার আদর্শ ও শিক্ষাদানের রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করাই এই আলোচনার লক্ষ্য। ইংরাজ-পরবর্তী ভারতের শিল্পশিক্ষা এই আলোচনার বিষয় হলেও পাশ্চাত্য প্রভাব বহির্ভূত ভারতীয় শিল্পশিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা দরকার। কারণ ভারতীয় শিল্পের জাগরণ ও শিল্পশিক্ষার পরবর্তী বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় শিল্পশিক্ষার অভিজ্ঞতাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগে শিল্পশিক্ষার লক্ষ্য ছিল কারিগর তৈরি করা। তথাকথিত fine art ও applied art উভয়ের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন শিল্পশিক্ষার আদর্শ ছিল। এই কারণে অভিজ্ঞ শিল্পীর অধীনে সহযোগিতা করে শিল্পশিক্ষা শুরু হত। ইংরাজ-প্রবর্তিত শিল্পশিক্ষার প্রভাবে কারিগরি-সুলভ মনোভাব থেকে তৎকালীন শিল্পশিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন। সে সময় কারুকলা সম্বন্ধে কঠিন অবজ্ঞা শিল্পরসিকদের মধ্যে জেগেছিল। কিন্তু কারিগরী শিক্ষার পথ অনুসরণ না করে যে নিস্তার নেই এ কথা আধুনিক কালে অনেকেই অনুভব করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পশিক্ষা বহু পরিমাণে সমাজবিমুখ। এই সমাজবিমুখতা থেকেই শিল্পীদের সমাজচেতন করে তোলার চেষ্টা থেকেই আধুনিক ভারতে শিল্পশিক্ষার নূতন অধ্যায় দেখা দিয়েছে। এই নূতন অধ্যায়ের অনুসরণ করার পূর্বে ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিদ্যালয়ের কর্মপ্রণালী ও আদর্শ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

মিশনারী ও ভারতীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরাজি শিক্ষার যে ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল সে ক্ষেত্রে শিল্পশিক্ষার কোনো স্থান ছিল না। মিশনারীদের শিক্ষাব্যবস্থার বহু পূর্বে থেকে এ দেশে ইয়োরোপীয় শিল্পী কিউরিয়ো ডিলারের যাতায়াত শুরু হয়েছিল। এই-সব পর্যটক শিল্পীদের প্রভাবে দেশীয় সমাজে পাশ্চাত্য শিল্পবস্তুর প্রচলন হয়েছিল। ক্রমে এই-সব শিল্পবস্তুর সংস্পর্শে এসে সম্ভ্রান্ত সমাজে রুচির পরিবর্তন ঘটে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে কলকাতা শহরে স্টুডিয়ো করে অনেক আর্টিস্ট যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দৌলতে সে সময় যাঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন, প্রধানতঃ তাঁরাই ছিলেন এই-সব শিল্পীর পৃষ্ঠপোষক।

এই-সব শিল্পীর সংস্পর্শে বাস্তবতায় যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তারই পরবর্তী প্রকাশ পাশ্চাত্যরীতিতে শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন। এই সময় নূতন ধরনের কারিগরেরও প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ছাপাখানার সঙ্গে যুক্ত নানা রকমের ছবি নক্‌শা ম্যাপ ইত্যাদি লিথো প্রেসে ছাপার ব্যবস্থা কলকাতা শহরেই প্রথম হয়েছিল। এই-সব ছাপাখানার দেশীয় কারিগররা হয়তো সহকারিরূপে নিযুক্ত হয়েছিল। তবে দেশীয় ভাষায় বই ছাপার জন্য যখন অক্ষর তৈরির আয়োজন হয়েছিল সেই সময় থেকে সত্যকারের পাশ্চাত্যরীতিতে শিল্পশিক্ষা শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে উইলকিন্স সাহেব ও তাঁর অধীনে শিক্ষিত কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রির নাম উল্লেখ করতে হয়। কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রি সম্ভবত স্বর্ণকার ছিলেন। উইলকিন্স সাহেবের কাছ থেকে তিনি অক্ষর কাটার কাজ শেখেন ও অল্পকালের মধ্যে নিপুণ কারিগররূপে পরিচিত হন। কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকেই তাঁর পুত্র ও জামাতা কাজ শেখেন এবং শ্রীরামপুরে চিত্রিত পঞ্জিকা ইত্যাদি ছাপাতে শুরু করেন। বলা যেতে পারে ছাপাখানাকে কেন্দ্র করেই বিদেশী শিক্ষা দেশীয় কারিগর সমাজে প্রচলিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক অবস্থার সুরাহা করবার জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কারিগরী শেখবার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের জন্যই এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার অবদান, এবং শিল্পবিদ্যালয় নাম দিয়ে যে প্রতিষ্ঠান শুরু হয় তা থেকে কলকাতা শহরে শিল্পশিক্ষার পত্তন হল বলা চলে।

তৎকালীন বিখ্যাত ধনী হীরালাল শীলের বাড়িতে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলে হিন্দু মুসলমান অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সকল রকমের ছাত্রই প্রথম নিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি না পেয়ে ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেয়েছিল।

সে সময় শিল্পবিদ্যালয়ে কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হত তার একটা তালিকা দেওয়া গেল :

1. Elementary drawing; drawing from models and natural objects and architectural drawing.
2. Etching, engraving on wood, metals and stone.
3. Modelling including pottery.

সিলেবাস দেখলেই বোঝা যাবে উচ্চাঙ্গের শিল্প শেখাবার জন্যে শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষার রীতি প্রবর্তনের কালে ভারতীয় অবস্থা-ব্যবস্থার কথা স্মরণ না রেখে তৎকালীন ইংলন্ডে টেক্‌নিক্যাল স্কুলের অনুকরণের চেষ্টা শুরু হল এই দেশে। দেশীয় কারিগরীর উন্নতি অপেক্ষা নূতন জাতের কারিগর তৈরি করাই এই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল। শিল্পবিদ্যালয়ের তৎকালীন অবস্থা-ব্যবস্থা নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যাবে—

"১৮৫৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে স্কুলের সংশ্লিষ্ট একটি সঙ্গী বিদ্যালয় খুলিবার কথা হইয়াছিল কিন্তু এ প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত হয়। সেই বৎসরের আরম্ভে ইংলন্ড হইতে

একজন কাঠের খোদাই শিখাইবার নিমিত্ত শিক্ষক আনা হয়। ঐ বৎসরই স্থির হয় যে স্কুলের তিনটি বিভাগ হইবে—

1. Modelling and Moulding Department.
2. Engraving and Lithographic Department.
3. Department of Higher Drawing and Painting.

এতদ্ব্যতীত Photographic painting শিখাইবারও বন্দোবস্ত হয়। ইট গড়ানো শিখাইবার কথা উঠে— স্থির হয় যে স্কুলে এ বিষয় শিক্ষা না দিয়া পাথুরেঘাটায় ("where pottery clay is abundant") ইহার নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র স্কুল খোলা হইবে। এরূপ স্কুল কখনো গঠিত হয় নাই। উপরে যে তিনটি বিভাগের কথা বলিলাম নিয়ম হইল যে ছাত্রেরা শিখিবার নিমিত্ত প্রতি বিভাগে আড়াই টাকা করিয়া মাসিক বেতন দিবে। তবে তাহাদিগের কর্তৃক নির্মিত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হইবে তাহার এক অংশ তাহারা পাইবে।

যখন স্কুলগুলি খুলিবার প্রস্তাব হয় তখন স্থির হইয়াছিল যে সাধারণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া স্কুলের ব্যয় নির্বাহ হইবে। প্রথম দুই বৎসর মাসে মাসে প্রায় ২০০৲ টাকা চাঁদা উঠিত। তদ্ব্যতীত, এককালীন দান হইতেও কিছু টাকা জমে। দুই বৎসরের পর চাঁদার টাকা অনেক কমিয়া যায়। পরে গভর্নমেন্টের সাহায্য স্কুল প্রতিপালনের প্রধান অবলম্বন হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের সময় গভর্নমেন্ট হইতে Grant-in-aid হিসাবে মাসিক ৬০০৲ টাকা দেওয়া হইত।

প্রথম বৎসর যখন স্কুলটি খোলা হয় তখন ২৬৩ জন ছাত্র ভর্তি হয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের অধিকাংশ ছাড়িয়া দেয়। বৎসরের শেষে ৫৩ জন মাত্র ছাত্র ছিল। গড়ে ৬০ জন করিয়া ছাত্র পড়িত। ১৮৫৪ সালের অগাস্ট মাসে স্কুলটি স্থাপিত হয়। ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসের শেষ পর্য্যন্ত সর্বশুদ্ধ ৫০৪ জন ছাত্র ভর্তি হয়।

ইউরোপীয়—	২
ফিরিঙ্গি—	১৩৭
বাঙ্গালী হিন্দু—	৩৫৬
বাঙ্গালী মুসলমান—	৭
হিন্দুস্থানী—	২
মোট—	৫০৪

...ইংলন্ড হইতে ২৫০৲ টাকা বেতনে ড্রইং ও উড্ এনগ্রেভিং শিখাইবার নিমিত্ত একজন শিক্ষক আনা হয়। ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে Moulding ও Modelling শিখাইবার নিমিত্ত আর-একজন ইউরোপীয় শিক্ষক M. Regand নিযুক্ত হয়। সেই সময় হইতেই স্কুলের অবস্থা হীন হইয়া আসে। ১৮৫৮ সালে পরিদর্শক Lt. Williams স্কুল পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন :—

I am disposed to recommend Government to undertake the entire management of the school connecting it perhaps in some way with the C. E. College and looking to it to ultimately become a normal school for native drawing masters." [১]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে শিল্পবিদ্যালয়ের তৎকালীন অনিশ্চিত অবস্থা সম্বন্ধে আমরা ধারণা করে নিতে পারি। এই অনিশ্চিত অবস্থা থেকে শিল্পবিদ্যালয়কে উচ্চাঙ্গের আর্ট স্কুলে পরিণত করার জন্য অধ্যক্ষ H. N. Locke-এর কৃতিত্ব স্মরণীয়।

অধ্যক্ষ লক আর্ট স্কুলে যোগদান করেন ১৮৬৪ সালে। এই সময় থেকে পেন্টিং মডেলিং বিভাগের উন্নতি শুরু হয়। অপর দিকে শিল্পবিদ্যালয়ে যে বিষয়গুলি শেখার ব্যবস্থা ছিল সেগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ অধ্যক্ষ লক স্কুলের শিক্ষা দুটি অংশে ভাগ করলেন। এক দিকে fine art অন্য দিকে applied art। গ্রীক রোমান রেনাসাঁ যুগের মূর্তির যথাযথ ছাঁচ (plaster cast) ও পাশ্চাত্য আদর্শে মূর্তি চিত্র ইত্যাদি (শেখবার) উপকরণের সাহায্যে শিক্ষা দেবার যে ব্যবস্থা অধ্যক্ষ লক করেছিলেন তার থেকে বড়ো রকমের কোনো পরিবর্তন ৩০ বৎসরের মধ্যে ঘটে নি। অর্থাৎ ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন অধ্যক্ষ লক। Oil Painting, Water colour drawing, Cast drawing, Life study প্রতিকৃতি অঙ্কন এগুলি ছিল চিত্রকলা বিভাগের ছাত্রদের শিক্ষার বিষয়।

Modelling বিভাগের ছাত্রদের ছাঁচ নেওয়া বিশেষভাবে শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। Free-hand drawing মেকানিক্যাল drawing আলঙ্কারিক নক্‌শার নকল এগুলি বাধ্যতামূলক ছিল।

Mr. Schaumburg, Ghilardi ও Jobbins এই তিনজনের প্রভাবে আর্ট স্কুলের অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটলেও লকের পরিকল্পনা কোনোদিনই কেউই বর্জন করেন নি। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে আর্ট স্কুলে কোনো অধ্যক্ষই দীর্ঘকাল অধ্যক্ষতার কাজ করতে পারেন নি। এই কারণে পরিচালনা এবং শিক্ষানীতির বারে বারে ব্যাঘাত ঘটেছিল। এই অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার ক্ষেত্রে Ghilardi ও Jobbins-এর প্রভাব বিশেষভাবে স্মরণীয়।

পোর্ট্রেট painting, still life ও oil paintingএর করণ-কৌশল অধ্যক্ষ Jobbins-এর আমলে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল। যে কোনো কারণে হোক modelling বিভাগে অনুরূপ উন্নতি সে সময় হয় নি।

যে সময়ের ইতিহাস আমরা আলোচনা করছি সে সময় আর্ট স্কুলে সরকারি ও বেসরকারি নানা চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই আর্ট স্কুলের উপযোগিতা সম্বন্ধে সরকারি মহলে কোনোরকম সন্দেহ ছিল না। মিউজিয়াম, বোটানিক্যাল গার্ডেন, এশিয়াটিক সোসাইটি, মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি নানা সরকারি প্রতিষ্ঠানের নক্‌শা

১ হিন্দুজাতি ও শিক্ষা, দ্বিতীয় ভাগ। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চার্ট plaster cast ইত্যাদি আর্ট স্কুলে শিক্ষক ও ছাত্ররা সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই চাহিদার কারণে এন্‌গ্রেভিং ও লিথোগ্রাফ বিভাগ সকল সময়ই সক্রিয় ছিল।

আর্ট স্কুলের শিক্ষার বিষয় ও বিধিব্যবস্থার আলোচনার সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষাপদ্ধতির যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। এই কারণে তৎকালীন শিক্ষার প্রণালী উল্লেখ করা দরকার। তৎকালীন আর্ট স্কুলের শিক্ষার বিধিব্যবস্থা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে সে শিক্ষা শিল্পদৃষ্টির অনুকূল ছিল না। বস্তুরূপে অনুকরণের দক্ষতা অর্জন করানোর দিকেই কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যই যতপ্রকারের ব্যবস্থা হতে পারে তার দিকে অধ্যক্ষ এবং ইংরেজ শিক্ষকরা লক্ষ রেখেছিলেন। এই কারণে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোনো অভাবনীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি সে সময়কার শিক্ষকদের। অভ্যাসের পথে কতকগুলি করণ-কৌশল আয়ত্ত করাই ছিল ছাত্রদের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার সহায়ক ছিলেন শিক্ষকরা। সংক্ষেপে মধ্যযুগীয় কারিগরদের মতো কতকগুলি নির্দিষ্ট করণকৌশল প্রথানুগতভাবে শিক্ষক থেকে ছাত্রদের মধ্যে প্রবর্তিত হত। প্রায় সকল বিভাগেই ইংরেজ শিক্ষক কোনো-না-কোনো সময় ছিলেন। ক্রমে স্কুলের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা শিক্ষকতার কার্যে নিযুক্ত হন। এ দিক দিয়ে অন্নদাচরণ বাগচির নাম বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। অন্নদাচরণ প্রথম যুগে শিল্পবিদ্যালয়ে এনগ্রেভিং-এর কাজ শিখেছিলেন। পরে অধ্যক্ষ লকের কাছে তিনি বিশেষভাবে ছবি আঁকা শেখেন। এবং কিছুকালের মধ্যে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে আর্ট স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদ পান। অন্নদাচরণ এবং তাঁর অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররাই স্কুলের নানা বিভাগে শিক্ষকের কাজ করেছিলেন। যে ভাবে ইংরেজ অধ্যাপকদের কাছ থেকে তাঁরা শিক্ষা পেয়েছিলেন সেই শিক্ষাপ্রণালী যতদূর সম্ভব তাঁরা অনুসরণ করেছিলেন। ছাত্রদের উৎসাহ বাড়িয়ে তোলার অসাধারণ ক্ষমতা অন্নদাচরণের ছিল। অন্নদাচরণের প্রভাব লক্ষ করতে হলে স্কুলের বাইরে তৎকালীন আর্ট স্কুলের শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ শিল্পীদের কর্মপ্রণালী অনুসরণ করার প্রয়োজন।

শিল্পবিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকে কলকাতা শহরে এন্‌গ্রেভিং-এর Studio লিথোপ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ক্রমে আর্ট স্কুলের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনভাবে Studio প্রতিষ্ঠা করেন। এইসব Studio-তে কিছু কিছু শিক্ষার্থী হাতে-কলমে এন্‌গ্রেভিং-এর কাজ শিখতেন। এইভাবে এন্‌গ্রেভিং-এর একটি পরম্পরা কলকাতা শহরে গড়ে ওঠে। হাফটোন ব্লক চালু হবার পূর্ব পর্যন্ত এ-সব কারিগররা বাজারের সকল রকমের ব্লক প্রস্তুত করতেন। এবং জনপ্রিয় ছবিও কিছু কিছু প্রকাশিত হয় এই-সব কারিগরদের সাহায্যে। ক্রমে আর্ট স্কুলের Fine arts বিভাগের এক দল ছাত্র অন্নদাচরণের নেতৃত্বে আর্ট স্টুডিয়ো প্রতিষ্ঠা করেন।

অন্নদাচরণ বাগচি ও তাঁর ছাত্র-সহকর্মীদের চেষ্টায় এই আর্ট স্টুডিয়ো দীর্ঘকাল কলকাতাবাসীর নানা চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে লিথো ছাপা ছবি এই স্টুডিয়োর প্রধান অবদান। আর্ট স্কুলে অ্যান্টিক স্টাডির প্রভাব এই-সব লিথোগ্রাফে লক্ষ করা যাবে। অপর দিকে লিথো পদ্ধতিতে ছাপা ভারতীয় মনীষীদের প্রতিকৃতি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন।

'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' নামে একখানি শিল্পপত্রিকা এই সময় প্রকাশিত হয় অন্নদাচরণের উৎসাহে। স্কেচিং ক্লাব, প্রদর্শনী ইত্যাদির নানা পরিকল্পনার দিকে এই শিল্পীগোষ্ঠী লক্ষ দিয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটির অবসান ঘটে বিদেশী বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে।

আর্ট স্কুলে যাঁরা সে সময় Portrait Painting শিখেছিলেন তাঁদের দিকেই শিক্ষিত সমাজের বিশেষ লক্ষ ছিল। অপর দিকে আর্ট স্কুলের কর্তৃপক্ষ এই বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। যদিও শিক্ষক ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ তৈলবর্ণের সাহায্যে প্রতিকৃতি অঙ্কনকে শিল্পের চরম সার্থকতা বলে মনে করতেন। কিন্তু প্রতিকৃতি অঙ্কনের সাহায্যে উপযুক্ত উপার্জন করার সৌভাগ্য সে সময় কম শিল্পীর ভাগ্যেই ঘটেছিল। ধীরে ধীরে ফোটো স্টুডিয়ো তথা ক্যামেরা প্রতিকৃতি-শিল্পীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এই কারণে অল্পকালের মধ্যে Portrait Painting ও ফোটোগ্রাফ প্রায় এক স্তরে এসে পৌঁছে এবং বহু ক্ষেত্রে প্রতিকৃতি-শিল্পীরা ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট কাজে লিপ্ত হন। তৎকালীন সমাজের সকল রকমের চাহিদা যুগপৎ আয়ত্ত করার সংকল্প নিয়ে আর্ট স্কুলে এই-সব শিল্পীরা আর্ট-স্টুডিয়ো প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক advertisement agency-র প্রথম সূচনা এই প্রতিষ্ঠান।

আর্ট স্টুডিয়োর দ্বারা প্রকাশিত ছবির চাহিদা সে সময় এতই হয়েছিল যে একদল ইংরেজ বণিক এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন এবং ইংলন্ড থেকে সস্তায় ছাপা অনুরূপ ছবি বাজারে সস্তায় চালু হবার ফলে আর্ট স্টুডিয়োর অবসান ঘটে।

এন্‌গ্রেভিং, লিথোগ্রাফ, তৈলচিত্র ইত্যাদির পরম্পরা এ দেশে ছিল না। এই কারণে এই শ্রেণীর কারিগর বা শিল্পীদের সঙ্গে সমকালীন প্রথানুগত কারিগরদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু মৃৎশিল্পের একটি পরম্পরা সজীব থেকেছে সকল সময়ই। এই কারণে আর্ট স্কুলের শিক্ষাপ্রাপ্ত মৃৎশিল্পীদের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভিন্ন রকমের হয়েছিল। ছাঁচ নেওয়ার নূতন পদ্ধতি মৃৎশিল্পী মহলে সে সময় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রতিকৃতি বা মূর্তি গঠনের ক্ষেত্রে নব্যকালের শিক্ষিত মৃৎশিল্পীদের অবদান যৎকিঞ্চিৎ। বারোমাসের তেরো পার্বণের দেশে প্রতিমা, সঙ ইত্যাদি নির্মাণের সুযোগ-সুবিধা ছিল যথেষ্ট। এই পথেই নব্যভাবাপন্ন মৃৎশিল্পীরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে বাস্তবতার আদর্শ প্রচার করার প্রয়াস করেছিলেন কখনো স্বেচ্ছায় কখনো পৃষ্ঠপোষকদের চাহিদায়। যে বাস্তব আদর্শ সে সময় শিল্পী ও রসিক মহলে জনপ্রিয় ছিল তার উত্তম দৃষ্টান্ত কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী। অপর দিকে পূজাপার্বণ উপলক্ষে এই-সব শিল্পী কি রকম কৃতিত্বের সঙ্গে বাস্তব আদর্শ অনুযায়ী মূর্তি নির্মাণ করতেন তার একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ এখানে উল্লেখ করা গেল—

"বারোইয়ারি প্রতিমেখানি প্রায় বিশ হাত উঁচু— ঘোড়ায় চড়া হাইল্যান্ডের গোরা, বিবি, পরী ও নানাবিধ চিড়িয়া সোলার ফুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো— মধ্যে মা ভগবতী জগদ্ধাত্রীমূর্তি—, সিংগির গা রূপলী গিল্‌টি ও হাতি সবুজ মখমল দিয়ে মোড়া। ঠাকুরুণের বিবিয়ানা মুখ— রঙ ও গড়ন আসল ইহুদী ও আরমানী কেতা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র দাঁড়িয়ে জোড়হাত করে স্তব কচ্চেন। প্রতিমের উপরে ছোটো ছোটো বিলাতি পরীরা ভেঁপু বাজাচ্চে— হাতে বাদশাই নিশেন ও মাঝে ঘোড়া সিংগিওয়ালা কুইনের ইউনিফরম্ ও ক্রেস্ট"।[২]

আর্ট স্কুল-প্রবর্তিত শিক্ষার অনুসরণে বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত স্কুলগুলিতে drawing শেখবার ব্যবস্থা শুরু হয় গত শতাব্দীর শেষ অঙ্কে। সে সময় drawing class-এর কোনো স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট ছিল না, drawing class-এর বিশেষ কোনো সাজ-সরঞ্জামও তখন ছিল না। অপরাহ্নে ড্রিল অভ্যাসের পরে drawing class শুরু হত। প্রায়ই ড্রিল ও ড্রয়িং একই শিক্ষক শেখাতেন। অভিজ্ঞ শিল্পী দৈবাৎ স্কুলে নিযুক্ত হতেন। ইংরাজি কপিবুক থেকে হাতের লেখা অভ্যাস করাই ছিল ছাত্রদের প্রধান কাজ।

স্কেল, divider, কম্পাস ইত্যাদির ব্যবহার শিখতে হত। কম্পাস দিয়ে ছোটো বড়ো নানা আকারের বৃত্ত ডিভাইডারের সাহায্যে নির্দিষ্ট ব্যবধানে লাইন টানা ইত্যাদি ছিল drawing class-এর দ্বিতীয় পাঠ। ক্রমে কাগজের উপর যতদূর সম্ভব কড়া পেন্সিলের সাহায্যে পরে পরে বিন্দু সাজিয়ে সেই বিন্দুগুলি জুড়ে সোজা লাইন টানতে হত। সে কালে এই অভ্যাসের নাম ছিল free-hand drawing।

স্কেল কম্পাস বিন্দুর সাহায্য না নিয়ে সোজা লাইন বা বৃত্ত টানতে পারাই ছিল এই শিক্ষার চরম লক্ষ্য।

ছবি আঁকার সহজাত বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ছাত্ররা অনেক সময় ঘরে বা ক্লাসে পাঠ্যপুস্তক থেকে ছবি নকল করতেন। কল্পনা থেকে ছবি করবার সুযোগের চিহ্নমাত্র ছিল না। সম্ভ্রান্ত পরিবারে drawing painting শেখাবার জন্য বিশেষ শিক্ষক নিযুক্ত হতেন। এ ক্ষেত্রেও অনুলেখন ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। সে সময় মধ্যবিত্ত পরিবারে বিলাতী print মদের বিজ্ঞাপন আঁকা ফ্রেমে বাঁধা আয়না সম্রাজ্ঞী ভিক্‌টোরিয়ার ছবি অনেক পরিবারে স্থান পেয়েছিল। এইসঙ্গে রবি বর্মা, বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বা আর্ট স্টুডিয়ো দ্বারা প্রকাশিত ছবির উল্লেখ করতে হয়। শৈশব কাল থেকে এই-সব ছবি দেখে নকল করা শিশু ও বালকদের মধ্যে শিল্পশিক্ষা সীমিত ছিল। সংক্ষেপে free activity কথাটি তখনো শিক্ষিত সমাজের কাছে পৌঁছয় নি।

পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালা শিল্পশিক্ষার আদর্শ ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই শিক্ষার প্রভাব সম্বন্ধে যে আলোচনা করা গেল তারই প্রক্ষেপ বোম্বাই মাদ্রাজ লাহোর আর্ট স্কুলে আমরা লক্ষ করি।

---

২ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত

এই আলোচনার প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈঠকখানা বা বাগানবাড়ি সাজাবার জনাই পাশ্চাত্য শিল্পবস্তুর প্রয়োজন হয়েছিল। এই প্রয়োজনের সঙ্গে ভেতরবাড়ির তথা অন্তঃপুরের শিক্ষা বা রুচির কোনো সম্বন্ধ ছিল না। নূতন শহর যেমন বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন তেমনি শিল্পের এই নূতন শিক্ষা ও সাময়িক রুচি জীবনযাত্রার ব্যাপক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এক দিকে পুজো-পার্বণ-ব্রত স্থানীয় দেশীয় কারিগরের অবদানের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়েছে, অপর দিকে বিলাসব্যসনের উপকরণ জুগিয়েছে পাশ্চাত্য শিল্পবস্তু ও শিল্পাদর্শ। যে বস্তুর আদর্শ সম্বন্ধে গত শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন সে আদর্শ আজ পাশ্চাত্য জগৎ থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে। এ দেশেও সে আদর্শের কোনো বিবর্তন ঘটে নি। অপর দিকে নূতন উপকরণ বা কারিগরি শিল্পশিক্ষার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে স্থায়ীভাবে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ নূতন উপকরণ ও বিভিন্ন করণ-কৌশল তথা technologyর শক্তিতেই পাশ্চাত্য শিল্প এ দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে, আদর্শের দ্বারা নয়।

শিল্প যে বিলাসিতার আনুষঙ্গিক নয়, জাতীয়-জীবনে শিল্পের গভীর তাৎপর্য এবং সে তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য সমকালীন শিল্পশিক্ষার বিধিব্যবস্থা যে অত্যন্ত প্রতিকূল এই কথাটি প্রথম উচ্চারণ করেন আর্ট স্কুলের অন্যতম অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাবেল।

তিন দেশের ভাস্কর্য নরওয়ে-সুইডেন-ডেনমার্ক

কাঞ্চন চক্রবর্তী

শুধু নান্দনিক বিচার দিয়ে শিল্পের কোনো আলোচনা শুরু ও শেষ করা আজকের দিনে অবিধেয়। সমাজ ও অর্থনীতির পটভূমিতে তার বিশ্লেষণ না করলে আধুনিক মনের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। তাই নরওয়ে-সুইডেন-ডেনমার্ক তিন দেশ নিয়ে ভাস্কর্যের মূল বক্তব্যে প্রবেশ করার আগে প্রাসঙ্গিক কতকগুলি আলোচনা করে নেওয়া সংগত মনে হয়।

নরওয়ে-সুইডেন-ডেনমার্ক ইয়োরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড নয়। কিন্তু এখানকার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যে সারা ইয়োরোপে এ দেশগুলি একটা স্বতন্ত্র গোষ্ঠী রচনা করেছে। দেশ হিসাবে এক-একটি প্রায় আমাদের বিভক্ত বাংলার সমান, আর লোকসংখ্যা এমনই কম যে সারা দেশ জুড়ে হয়তো কলকাতার মতো জনসংখ্যা পাওয়া যাবে। অথচ অনেক পুরানো ঐতিহ্যের দেশ এগুলি। এই তিন দেশে প্রকৃতি আবার তিনটি রূপে বিরাজিত। নরওয়ে একেবারে উত্তুঙ্গ রাজ্যের অভিসারী, ডেনমার্ক যেন সাগরগর্ভের দেশ, সুইডেন এই দুই প্রান্তের মাঝখানে নিয়েছে মধ্যপন্থাটি। তিন দেশের শিল্পপ্রয়াসে তাই তিনটি সুর বেজেছে আর সেই তিনটি সুর পশ্চিমী কনসার্টের মতোই একটা কনকর্ড বা সুরসাম্য তৈরি করেছে, তিন সুর তিনখানা হয়ে বাজে নি, একটা সিম্ফনি বা সুর-বিচিত্রার সৃষ্টি হয়েছে।

ঐতিহ্যের কথা ধরতে গেলে ভাইকিংদের আমল থেকেই শিল্পরুচির সূত্রপাত। ব্যবহারে সমস্ত রকম পাত্র-তৈজস থেকে শুরু করে ঢাল-তলোয়ার-বর্শা-বন্দুক পর্যন্ত সব কিছুকেই অলংকৃত করার দিকে ঝোঁক ছিল এদের। এরা ছিল শিকারী-গোষ্ঠী। সমস্ত শিল্পকর্মে তাই পশুমূর্তি নানান ঢঙে নানা ছাঁদে ঘুরে-ফিরে এসেছে। অলংকরণ-প্রিয়তা স্ক্যান্ডিনেভিয়ানদের রক্তের সঙ্গে তাই মিশে আছে। ভাইকিংদের আমলের পর রোমানেস্ক, গথিক, রেনেসাঁ তাবৎ বিপ্লবের ঢেউই এখানে এসে পৌঁচেছে। ইটালি-প্রণোদিত নিওক্লাসিজম থেকে রিয়ালিজম বা বাস্তব-ধর্মিতায় স্বাভাবিক উত্তরণ হয়েছে। আধুনিক কালের কুলীন-অকুলীন সব ধারার ঢেউও এদের আন্দোলিত করেছে। এই আন্দোলনকে আত্মস্থ করে নেওয়ার মতো দিক্‌পাল শিল্পীদেরও আবির্ভাব হয়েছে সে দেশে।

অর্থনীতির কথা ধরতে গেলে আমরা জানি স্ক্যান্ডিনেভিয়া স্বাচ্ছন্দ্যের দেশ। সেখানকার অর্থনীতির কাঠামো হল উন্নত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কৃষিরীতি অথবা বাণিজ্যিক শিল্প এবং সমবায়। বাপ-মা-ছেলে-মেয়েকে নিয়েই কো-অপারেটিভের পত্তন।

সবাই মিলে কাজ, সবাই লাভের অংশীদার। সমবায় এ সমস্ত দেশে বিত্তের এমন সহজ ও সুষম বন্টন সম্ভব করেছে যে সাধারণ কোনো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান গৃহস্থের কাছে আধুনিক সভ্য জীবনের কোনো চাহিদাই অলভ্য নয়। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া, রাশিয়ার ব্ল্যাক সি'র তীর, ইংলন্ডের লেকডিস্ট্রিক্ট অথবা ইটালি-স্পেনের রৌদ্র-স্নাত সাগরসৈকতে নিজেদের কেনা হলিডে ভিলায় স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরা ছুটি যাপন করতে যায়— কালেভদ্রে নয়— বেশ নিয়মিতই। ইয়োরোপের মধ্যে ক্রয়ক্ষমতা এ দেশে সবচেয়ে বেশি। ও দেশে একবার জুতো-পালিশের খরচে আমাদের দেশে দুবেলার ভূরিভোজ হয়ে যাবে! বিত্তের এই সুষম বন্টনের জন্যই এ দেশের জাতীয় সংগীত গাইতে পারে যে— 'অনেক আছে এমন লোকের সংখ্যাও যেমন কম, অল্প আছে তেমন লোকও আমাদের বিরল'।[১]

সামাজিক প্রগতির কথা বলতে হলে সেখানে সাধারণ কৃষকের ঘরের ছেলেমেয়েরাও ঘর থেকে পয়সা খরচ করে ফোক হাই স্কুলে (Folk High School) পড়তে আসে। এ-সমস্ত স্কুল কোনো ডিগ্রি বিতরণ করে না, এখানে পড়াশুনা করলে সমাজে তেমন কোনো বাহবা পাওয়ারও কিছু নেই, গোলামী করতেও সাধারণ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান লালায়িত নয় যে এই স্কুলের ছাপ তাদের চাকরিক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা এনে দেবে। আবার দুচার পয়সা খরচের ব্যাপার নয়। ছ মাসে তারা ঘর থেকে খরচ করে প্রায় পনেরো-বিশ হাজার টাকা। পাঠক্রম মূলত পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতিকে নিয়ে। কাজেই স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সাধারণ মানুষেরা দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে এমনই ওয়াকিবহাল যে, অন্য যে কোনো দেশের লোক তাদের সঙ্গে আলাপ করে যেমন তৃপ্তি পাবে, এমন বোধ-হয় আর-কোনো দেশেই নয়।

কল্যাণ রাষ্ট্রে (Welfare State) যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য আজকের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিঃসংশয় স্বীকৃতি অর্জন করেছে, স্ক্যান্ডিনেভিয়া অনেক দিনই তাদের কথা জেনে নিয়েছে। দাস-ব্যবসার অবসান, বৃদ্ধ বয়সের পেনসন, স্বাস্থ্য-বীমা, সার্বিক অবৈতনিক শিক্ষা, অকর্মণ্যদের প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য— এ-সব কিছুর সুরাহা ও-দেশে হয়েছে আজকে নয়— দেড়শো দুশো বছর আগেই। ডেনমার্ক আবার ইয়োরোপের প্রাচীনতম রাজ্য। সুইডেনের উপসালাতে ইয়োরোপের প্রায় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হয়েছিল— সে-ও তো প্রায় পাঁচশো বছরের কথা!

গোটা প্রথম-মহাযুদ্ধের আঁচ স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কোনো দেশেই লাগে নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও সুইডেন চতুরতার সঙ্গে এড়িয়ে গেছে। ফলে একটা বিরাট ও দীর্ঘ বিপর্যয় ও ধ্বংসের ছাপ এ-সব দেশকে আবিল করতে পারে নি।

প্রায় ছয়-মাস-রাত্রির দেশ স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় প্রকৃতি দাক্ষিণ্যের পসরা না নিয়ে এলেও সামাজিক জীবনে তারা পেয়েছে অখণ্ড প্রাচুর্য ও নিরাপত্তা। এই সংগ্রাম ও শান্তি

---

১ ডেনমার্কের জাতীয় সংগীতের একটি কলি।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ার মনীষাকে দিয়েছে বিচিত্র সৃষ্টিপ্রবণতা। এক-একটি ছোট্ট দেশ, কিন্তু জগৎজোড়া শিল্পীসাহিত্যিক-গুণীজনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

হ্যান্স অ্যান্ডারসনের গল্প পড়ে নি এমন শিশু সভ্য দুনিয়ায় কমই আছে এবং এমন ভাষাও নেই যাতে অ্যান্ডারসনের 'পরীর গল্প' না অনূদিত হয়েছে। ইব্সেনের নাটক শুধু বাঙালি দর্শকের সামনে হাজির হয়েছে এমন নয়, দুনিয়ার তাবৎ রসিকের সঙ্গেই তাদের পরিচয় হয়েছে। শেল্মা ল্যাগার্লফও দুনিয়ার প্রথম রমণী যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বকে সচকিত করেছিলেন। অভিনয়ের ক্ষেত্রে গ্রেটা গার্বোর মতো কোনো দ্বিতীয়া রমণীকে আজও আমরা পর্দায় দেখতে পাই না। ইন্গ্রিড বার্গম্যানের যশও আজ বিশ্বজোড়া। পরিচালক হিসাবে পর্দায় ইংগমার বার্গম্যানেরও জুড়ি মেলা ভার।

এ সমস্ত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, শিল্প-প্রকাশের ক্ষেত্রেও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলি সমান প্রতিভার চাওয়া-পাওয়ার প্রতিমূর্তি। নিত্যকারের লাভক্ষতির হিসাবে করা অবৃহৎ মনোবৃত্তির অধিকারী সাধারণ পুরুষ-রমণী এরা। ভাস্কর কোথাও তাদের পরিকল্পিতভাবে মহতোমহীয়ান করতে চান নি। কিন্তু কেমন যেন চিরকালের সুর আছে তাদের মধ্যে—চিরকালের ব্যথা-বেদনা-সংগ্রামের কথা তারা অগৌণে বলে চলেছে।

তাঁর কাজকে বিশেষ কোনো রীতির, বিশেষ কোনো যুগের বা বিশেষ ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত বলা চলে না, তারা স্বকীয়তার সার্থক প্রতীক। এদিক থেকে ভিগেলন্ড একেবারেই মৌলিক। ভিগেলন্ড স্ক্যান্ডিনেভিয়ার শিল্পীদের মধ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষণা পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি। অস্লো মিউনিসিপ্যালিটি তাঁর ব্যবহার ও কাজের জন্য সর্ববিধ সাহায্য ও সুযোগ করে দিয়েছে এবং স্টুডিয়ো হিসাবে একটা বৃহৎ অট্টালিকা তাঁকে দান করেছে। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর স্টুডিয়োটি ভিগেলন্ড মিউজিয়াম হিসাবে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। নরওয়েতে ভিগেলন্ড-শিষ্য ও ভাবশিষ্যের সংখ্যা কম নয়। এদিক থেকে ফ্রেডেরিকসন নগর-ভাস্কর্যের নানা সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

নরওয়ে থেকে যদি ডেনমার্কে যাত্রা করি তাহলে জাতীয় ভাস্কর্যের ব্যাখ্যাতা হিসাবে প্রথমেই পাই বিস্সেনের নাম। বিষয়ের দিক থেকে ইনি ভূমধ্যসাগর তীরের মানবীয় রোমান্টিক আদর্শ বাদ দিলেন। ভাস্কর্যে নাটকীয়গুণ প্রয়োগ করার দিকে ঝোঁক দিলেন বেশি। সাধারণ ড্যানিস সৈনিক তার উপজীব্য হল।

কিন্তু ডেনমার্কের প্রান্ত ছাড়িয়ে বাইরের জগতে যিনি মৌলিক কাজের জন্য যশ অর্জন করেছেন তিনি হলেন কাই-নিলসেন। মূলত বাস্তব-ঘেঁষা প্রকাশরীতির লোক ইনি। এঁর সৃষ্টির একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে রমণী। নারী ও শিশুমূর্তির রূপায়ণে ইনি এক বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গির অবতারণা করেছেন। ভিগেলন্ডের মতো নিলসেনের ভাবনাও সহজ খাতে বয়েছে। বিষয়কে অযথা কৃত্রিমতা দিয়ে ভারাক্রান্ত করেন নি, বলবার ভঙ্গির মধ্যে সহজ সাবলীলতা এসেছে। কিন্তু এই সহজিয়াভাবের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে ভাস্কর্যের গুণগুলি। ত্রিমাত্রার মধ্যে প্রক্ষোভ বা emotion-এর কথা বললে যদি আমাদের

কোনো ধারণা আসে, জীবনোষ্ণ পেলবতা বা Plasticity কথাটি আমাদের মনে যে ছাপ রেখে যায় নিলসেনের কাজে তার পূর্ণতার একটি প্রকাশ দেখতে পাই। অন্তর্লীন গঠন-সৌষ্ঠব বা Structure বেশ পরিকল্পিত। বহিরঙ্গের রূপাকার বা Form সেখানে সার্থকভাবেই গতায়াত করেছে।

ভিগেলন্ডের মতো নিলসেনও মূর্তিকলায় বিরাটত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন; মনে হবে ভাস্কর্য সত্যিই কোনো একজনের শিল্প নয়, একাধিক জনেরও নয়— একেবারে সর্বসাধারণের। তাই নিলসেনের কাজেও ব্যাপ্তির সুরটি রয়ে গেছে। কোপেনহেগেনের ব্লাগার্ডস প্লাড্স সড়ক জুড়ে নিলসেনের সার্থক সব কাজ দাঁড়িয়ে আছে। সেখানকার প্রাণোচ্ছল রমণীকুল নিলসেনের বলিষ্ঠ স্বকীয়তার কথা নিঃসংশয়ে জানিয়ে যায়। Vandmoderen বা জলমাতৃকা এবং Arhuspigen বা আরহুসকন্যার মতো একাধিক কাজ তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে।

সেরামিক (ceramic) ভাস্কর্য নিয়ে নানারকম ভাঙাচোরা যাঁরা করেছেন বা করছেন ও-দেশে, তাঁদের মধ্যে জিন গগা, জেই নিলসেন এবং অ্যাক্সেল সলটো বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজে আজ যিনি সর্বজনের পরিচিত তিনি হলেন রবার্ট জ্যাকবসেন। এঁর লৌহ-ভাস্কর্য (iron sculpture) ইয়োরোপ আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই সুবিদিত। গাবো, পেভ্সনারের দেখানো পথটিকে ইনি বেছে নিয়েছেন কিন্তু এঁর কাজে গঠনগত (structure) আবেদন শুধু ব্যাকরণিক বা ব্যাখ্যা-নির্ভর নয়, দর্শকের মনের সঙ্গে তাদের সহজ মিতালি হয়।

আমাদের যাত্রা-শেষের দেশ হল সুইডেন। ভাস্কর্যে সুইডেনের স্বকীয়তা যিনি প্রথম মুদ্রিত করেছিলেন তাঁর নাম জন বরজেসন। বাস্তবধর্মী ভাস্কর হিসাবেই এঁর পরিচয়। তাহলেও রূপাকার বা Form নিয়ে এত ভাঙচুর করেছেন এবং প্রকাশ বা expression-এর ক্ষেত্রে এমনই ব্যঞ্জনা এনেছেন যে তাঁর নিজস্বতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশের অবকাশ নেই বলা চলে।

তবে ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভায় শীর্ষচূড় সুইডিশ ভাস্কর হিসাবে একটি নামই করা চলে— তিনি হলেন কার্ল মিলেস। জীবনের প্রায় অর্ধেকটাই কাটিয়েছেন মার্কিন দেশে। মিচিগানের ক্র্যানবুক অ্যাকাডেমি অফ আর্টে স্থায়ী ভাস্কর হিসাবে তিনি যে-সমস্ত কাজ করেছেন আমেরিকার প্রধান সব শহরেই তার নিদর্শন আছে। অবশ্য সুইডেনের বড়ো বড়ো কোনো শহরও সেদিক থেকে বঞ্চিত হয় নি। বিশেষ করে উদ্যান-ভাস্কর্য, মুক্তাঙ্গন-ভাস্কর্য আর ফোয়ারার জন্য মূর্তির অভিনবত্ব নিয়েই তাঁর সমধিক প্রসিদ্ধি।

মিলেস মনে প্রাণে ভক্তিবাদী ছিলেন। তাঁর মূর্তিকলার মধ্যেও ধর্মভীরু আধ্যাত্মিকতার সুরটা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য গভীরে গেলেই তবে সে সুরের রেশ লাগে। বৃহৎ এক হাতের মাঝখানে পুত্তলিকাবৎ ঊর্ধ্বমুখী এক মানুষকে দেখলে আপাতদৃষ্টিতে বোঝা শক্ত হয়ে পড়ে যে ভাস্করের সত্যকারের বক্তব্য কি— কেনই বা সুউচ্চ বেদিকার (Pedestal) উপর হঠাৎ হাতটির আবির্ভাব। কিন্তু অনুধাবন করলেই বুঝতে ভুল হয় না

যে বৃহৎ হাতটি বোধ হয় বিধাতা অথবা প্রকৃতির প্রতীক! তাঁর হাতে মানুষ ক্রীড়নকমাত্র এবং মানুষের মুক্তির চাবিকাঠিটি বিধাতারই হাতে! আবার ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার কথা এল বলে তিনি ক্লাসিক বা রেনেসাঁ যুগের প্রকাশরীতিতে বাঁধা পড়েছেন এমন কথাও একেবারেই বলা চলে না; বরং তাঁর মধ্যে পথিক বা বারোক ভাবটি বেশি স্পর্শ করেছে। কিন্তু তা-ও ভাবনার দিক থেকে এমনই অভিনব এবং স্টাইলের দিক থেকে এতই নতুন যে সেগুলো মিলেসের মৌলিক প্রকাশভঙ্গি বলে মেনে নিতেই হয়। মিলেসের কৃতিত্ব হল এই যে, নানা সময়ে নানা ভাব অনুভাব তাঁকে মাতোয়ারা করেছে এবং তিনি সার্থকভাবে তাদের দাক্ষিণ্য বরণ করে নিয়েছেন। আদিম (আর্কেয়িক) গ্রীক ধারার ছায়ায় তিনি কাজ করেছেন, গথিক ও বারোক ভাবকে তিনি নিজের একটি বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছেন, কখনো বা বিচিত্র ও অদ্ভুত রূপাকৃতির প্রতি তাঁর ঝোঁক গেছে, এমন ধরনের ভাস্কর্যের খেলায় আবার মত্ত হয়েছেন যে পথে তিনিই প্রথম পথিক। ভাস্কর্যের গুণগুলি যেমন সেখানে বিদ্যমান, তেমনই বিষয় ও ব্যঞ্জনা-বৈচিত্র্যও সেখানে কম নয়। Meeting of the waters— Fountain কিংবা তাঁর অগণিত Naiads ও Tritons-এর মাঝে সে পরিচয় স্পষ্ট হয়ে আছে।

দশ বারো বছর হল মিলেস মারা গিয়েছেন। জীবনের শেষের দিকে স্টকহল্‌মের কাছে এক বাগানবাড়ি কিনে তিনি সাজাতে শুরু করেছিলেন। এখানে তাঁর সারাজীবনের প্রায় সমস্ত কাজের প্রতিরূপ স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ 'মিলেসগার্ডেন' ঘুরে এলে শুধু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে তাঁর কাজের সঙ্গে পরিচয় হবে তা-ই নয়, একই সঙ্গে বোঝা যাবে যে ভাস্কর্যের যেখানে স্থাপনা হচ্ছে সেই পরিবেশ পটভূমি নিয়ে মিলেস কত গভীরভাবে ভেবেছেন। উদ্যানে হোক, মুক্ত প্রকৃতিতে হোক, স্থাপত্যের পটভূমিতে হোক অথবা শুধু ফোয়ারার সজ্জীকরণে হোক, পরিপার্শ্বের উপর নির্ভরশীল যে রূপাকার ও যে মুন্সিয়ানা (form and treatment) তা সহজেই মিলেসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করবে।

মিলেসের কল্পনাপ্রবণ মনটি সৃষ্টির পিছনে নিয়ত বিচরণশীল থেকেছে। তাই পুঙ্খানুপুঙ্খতা (details) পরিহার করে রূপাকার বা Form-এর মধ্যে খানিকটা বিমূর্তি (abstraction) এনেছেন যার জন্য সহজেই ভাস্কর্য মণ্ডনধর্মী (decorative) গুণ পেয়েছে অর্থাৎ ক্ষুদ্র হোক বৃহৎ হোক মূর্তিরাজির মধ্যে একটি আপাত বিপুলত্বের মহিমা এসেছে। রূপাকার বা Form-কে তিনি নানাভাবে নানাছন্দে নানাগতিতে মুক্তি দিয়েছেন এবং ত্বক ও ঘনত্ব (surface and volume) তাদের পূর্ণ স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই পরিবেশ এবং পরিবেশনা আধুনিক ভাস্কর্যের যে দুটি চাহিদা তার একটা সার্থক সম্মিলন হয়েছে মিলেসের কাজে। তিনি যে রীতি যে ধারা বা যে ছায়াতেই কাজ করুন-না কেন, মিলেসের এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে আধুনিক করেছে এবং আজকের দিনের তরুণ ভাস্করদের শ্রদ্ধাবনত স্বীকৃতি পেয়েছে।

মিলেস আর-একটি দিক দিয়ে আধুনিকতার দাবি রাখেন : এমন কোনো উপাদান ছিল না যাতে না তিনি কাজ করেছেন। পাথর, কাঠ, ব্রোঞ্জ এ তো আছেই, সেরামিক নিয়েও

তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, এমন-কি শামুক পোড়ানো শক্ত চুনেও তাঁর ছেনি হাতুড়ি কাজ করেছে।

উনিশশো পঞ্চাশোত্তর ভাস্করদের মধ্যে আর্নে জোনস-এর নাম সবচেয়ে পরিচিত। ওঁর কাজ বিমূর্ত গোষ্ঠীর। কিন্তু তার মধ্যে সুরেলা একটা ভাব যেন আছে এবং ভাস্কর্য যে সর্বসাধারণের— তার যে একটা সামাজিক মূল্য আছে তিনি তা স্বীকার করেন।

একেবারে আধুনিক ভাস্করদের মধ্যে নতুন সব বৈজ্ঞানিক কায়দা-কানুন (technology) প্রয়োগের রেওয়াজ হয়েছে। পশ্চিমের সব দেশেই টেকনোলজির কিঞ্চিদধিক প্রয়োগ রয়েছে। কিন্তু সুইডেনের ক্ষেত্রে এটি শুধু একটি যুগোপযোগী রেওয়াজ হিসাবেই বিরাজ করছে না— সেখানকার চিন্তন-মনন ও প্রকাশনের সঙ্গে যেন টেকনোলজির একটি প্রাণের যোগ স্থাপিত হয়েছে। মূলত বৈজ্ঞানিক কৌশলাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এদেশের একটি নিজস্ব প্রতিভা আছে। এর জন্য কোনো দেশের কোনো পরম্পরার (tradition) কাছেই সে ঋণী নয়। তার ঋণ শুধু তার নিজের দেশের কাছেই। বহুপূর্ব থেকেই স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরা টেকনোলজির বহুল ব্যবহার করে আসছে। তাই বৈজ্ঞানিক সব কায়দা-কানুনে তারা শুধু সিদ্ধহস্ত নয়, রীতিমতো কেতাদুরস্ত (sophisticated) অথচ একেবারে মৌলিক। তাই অন্য দেশে যা সম্ভব হয় নি সুইডেনে তা নিতান্ত সহজেই সাধিত হয়েছে। একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় আমার বক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে।

আধুনিক ভাস্করদের মধ্যে এরিক ওলসন পুরোধা। ইনি প্রধানত সেরামিক ভাস্কর্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সেরামিকসের মধ্যে ইনি কৌশল করে এক বা একাধিক প্রিসম্ (prism) জাতীয় প্রতিসরণ খণ্ড অনুপ্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন। বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের আলোকপাতে ভাস্কর্য খণ্ড ঘিরে একটি বর্ণের যাদুকরী তৈরি হয়! এঁদের বক্তব্য ভাস্কর্যের মধ্যে চিত্রের গুণ একমাত্র প্রকৃতিই দিতে পারেন—প্রতিসরণ ফলক ঢুকিয়ে দিয়ে আমরা তো নিমিত্তমাত্র। বর্ণের রামধনু তো তৈরি করছেন প্রকৃতি নিজেই! ওলসনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচয় হয়েছিল একটি সেমিনারে। জিজ্ঞেস করেছিলাম— তোমার কাজের যেমন রীতি তাতে কি সত্যিকারের ভাস্কর্যের গুণ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না— এ-সব সস্তা জৌলুসের দিকে তোমাদের নজর কেন? আমাকে উত্তর দিয়েছিলেন, ভাস্কর্যের গুণ কাকে বলো— এ যুগের ভাস্কর্য-গুণ কি হবে তা তো আজকের ভাস্করদের উপর নির্ভর করছে। ইলেকট্রনিক সংগীত সৃষ্টি করছে নানা সুরের রঙ-বেরঙ দিয়ে। দু'দশ বছর পরের দুনিয়া হয়তো মানুষ গাইয়ে-বাজিয়ের চেয়ে ইলেকট্রনিকের সংগীতসুধাপানে বেশি পরিতৃপ্তি পাবে! সেই দুনিয়ায় বসে তখনো কি তুমি ছেনি হাতুড়ি চালাবে না ভাস্কর্যের ঐতিহ্য ভেসে গেল বলে হাহুতাশ করবে!

১৩৭৫ শ্রাবণ

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা

অনুপম গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার সূচনা তাঁর ক্যালিগ্রাফি থেকে। ছন্দোবদ্ধ কবিতার চার পাশে অসুন্দর কাটাকুটিকে তিনি ছন্দে উত্তীর্ণ করতে গিয়ে রূপসৃষ্টি শুরু করলেন। প্রথমে রেখার তরঙ্গে শুধু ছন্দের দ্যোতনা এল, কিন্তু তার প্রকৃতি ছিল একেবারেই নির্বস্তুক। কোনো বাস্তব রূপের আভাস তাতে মেলে না। ক্রমে সেই ছন্দিত কালো কালিতে আঁকা রেখার তরঙ্গে রূপের আভাষ এল কোথাও একটা চোখ অথবা কোথাও কোনো কাল্পনিক জন্তুর মাথা বা প্রত্যঙ্গের অস্পষ্ট ইঙ্গিতের মধ্যে। সুতরাং ছবি আঁকার প্রেরণার মূলে একটা অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে ছন্দের দিকে স্বভাবসিদ্ধ ঝোঁকের কথা উল্লেখ করা যায়। ছবির গুণগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও এই রেখায় ও রঙে, রূপের প্রকরণে এবং শিল্পীর তাগিদ অনুযায়ী গঠনের ভাঙাগড়ায় ছন্দোবদ্ধ প্রকাশভঙ্গি লক্ষণীয়। ছবির ছন্দ কি— এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র ছবির মধ্যেই খুঁজতে হবে। ছবির ভাষাকে শুধুমাত্র রেখায় ও রঙেই প্রকাশ করা যায়, কথায় তার অনুবাদ চলে না। তবে আলোচনার সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথের কিছু নির্দিষ্টভাবে ছান্দসিক ছবির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন, কালি-কলম আঁকা রজনীগন্ধা ছবিটি। রজনীগন্ধার পেলব শুভ্রতা, রঙের বুনুনি বা texture, তাছাড়া আমাদের ঋতু উৎসব ও মেজাজের সঙ্গে তার সম্পর্ককে রূপ দিতে গিয়ে তিনি রজনীগন্ধার ডাঁটকে তরঙ্গিত রূপ দিলেন। এখানে ডাঁটটির ঋজুগঠনকে আপন খেয়ালে, রূপসৃষ্টির বিশেষ তাগিদে রবীন্দ্রনাথ ভাঙলেন। তার পরিবর্তে এল বিশুদ্ধ ছন্দের দ্যোতনা, যেটা রজনীগন্ধার স্বীয় প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের একেবারে শেষ পর্বে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। এর আগে চিত্রকলায় তাঁর অনুশীলনের কোনো খবর আমরা পাই না। জীবনের বিভিন্ন পর্বে যখন কথা ও সুরের বিচিত্র ধারায় অনুভূতির ও উপলব্ধির ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে চলেছেন তখন ছবির জগৎ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে আমরা জানি না। কাজেই অভ্যাসসিদ্ধ দক্ষতা অর্জনের অবকাশ তিনি পান নি তখন। এখানে প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে অন্যান্য সমালোচকদের মতামত অনুধাবনযোগ্য—

> "সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে অসাধারণ অধিকার ছিল, ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর যে ব্যুৎপত্তি ছিল, চিত্রের ভাষা সম্বন্ধে তাঁর সে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল না। কিন্তু চিত্রের ভাষার মূল সত্যকে তিনি দেখেছিলেন অনায়াসে এবং সেই সহজ জ্ঞানকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন অনায়াসে।" [১]

অতএব কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য রূপের খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁর সচেতনা ও প্রকাশে দক্ষতা হয়তো ততটা ছিল না। প্রসঙ্গত 'সে' বইটির ছবিগুলির কথা উল্লেখ করা যাক। "তারো, তারো, তারো" অথবা "একি চেহারা তোমার" ইত্যাদি ছবিতে ভুরুর ভঙ্গি কপালের কুঞ্চন বা নাক ও ঠোঁটের পাশে ভাঁজ তুলে তিনি বিশেষ চিত্রগত ভাবটিকে প্রকাশের প্রয়াস পান নি। অথচ এই-সব সত্ত্বেও অভিব্যক্তির কি যেন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক সঙ্কেত ধরা পড়েছে, যার ফলে চিত্রগত ভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে ও দর্শকের মনে বিশেষ আবেগটি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের ছবির একটা প্রধান গুণ হল তার অভিব্যঞ্জনা। এইজন্য প্রচলিত সমাহিত ভারতীয় রীতির থেকে তাঁর ছবির ধরন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অনেক অস্থির চঞ্চল ও গতিশীল। 'সে' বইটির আর-একটি ছবিতে বাঘ গুড়ি মেরে আসছে, এর মধ্যে বাঘের ক্ষিপ্রতা ও হিংস্রতা অত্যন্ত স্পষ্ট ধরা পড়েছে। পাশাপাশি এই প্রসঙ্গে পশ্চিমের শিল্পী রেমব্রাঁ ও দ্যমিয়ের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। অথচ যাঁর কাজের পিছনে প্রথাগত অনুশীলনের নজির নেই তিনি এই সঠিক ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা কোথায় পেলেন? এখানে অনুরূপ এক প্রসঙ্গে ইয়োরোপীয় ভাস্কর জিয়াকমেতির উক্তি আমাদের সাহায্য করতে পারে—

"A man far away has no more individuality than a pin if we don't know him. If he's someone we know, we recognize him and he assumes an identity for us. Why? It's the relationship between his masses and quantities. If he's hollow eyed, the shadows on his cheeks are longer. If he has a large, bold nose, there's a stronger patch of light in that spot, and his no longer the anonymous pin. So it's the sculptor's job to make those humps and hollows create an identity by highlighting the essential points that tell us this is one person rather than another." [২]

অভিব্যক্তি প্রকাশের বেলাতেও এক কথা, সেই বিশেষ রেখাগুলিকে, আলোছায়ার ভাবনির্দেশক চিহ্নগুলিকে ধরতে হবে। এখানে রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ বোধশক্তি অনুশীলনে বিকল্প হিসাবে কাজ করল। ফলে অত্যন্ত গতিবেগ সম্পন্ন ভাব ও অভিব্যক্তিতে ছবিগুলি সমৃদ্ধ হল।

রবীন্দ্রনাথের ছবির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যই হল তার চাঞ্চল্য। জীবনের স্রোত হয় সেখানে স্পষ্টতই গতিশীল অথবা কোনো গভীর আলোড়নের সম্ভাবনা বহন করছে। ভারতীয় রীতিতে আঁকা ছবির মেজাজ সাধারণত স্থির, প্রকাশিত ভাব অত্যন্ত সমাহিত ও দর্শকের নিকট উপস্থাপিত ধারণা মোটামুটি ভাবে স্নিগ্ধ ও সুন্দর। অস্থিরতা ও গতিশীলতা ইয়োরোপীয় চিত্রকলার বিষয়বস্তু দীর্ঘকাল ধরে। অস্থির সঞ্চালনকে

---

১ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় : মনোরঞ্জন গুপ্ত লিখিত 'রবীন্দ্র-চিত্রকলা'র সমালোচনা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৮

২ Francoise Gillot : *Life with Picasso*, Signet Book (New American Library) p. 195.

ছবির বিষয়বস্তু করে মিকেলাঞ্জেলো থেকে জ্যাক্সন্ পোলোক্ পর্যন্ত সবাই ছবি এঁকেছেন ও আঁকছেন। এই অস্থিরতা ছবির মধ্যে প্রকাশ করতে হলে বস্তুর ভারসাম্যকে কিছুটা বিপর্যস্ত করবার প্রয়োজন হয়। সেখানে ভারসাম্যকে বিপর্যয়ের সীমায় এনে বিষয়বস্তুর জঙ্গমতাকে ধরবার রীতি। এ যুগের ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও অস্থির মানুষ পিকাসো নিজের আঙ্গিক সম্বন্ধে বলছেন—

"For me painting is a dramatic action in the course of which reality finds itself split apart. ... The pure plastic act is only secondary as far as I am concerned. What counts is the drama of that plastic act, the moment at which the universe comes out of itself and meets its own destruction...

"What people forget is that everything is unique. Nature never produces the same thing twice... That's why I stress the dissimilarity, for example, between the left eye and the right eye. ...So my purpose is to set things in movement, to provoke this movement by contradictory tensions, opposing forces, and in that tension or opposition to find the moment which seems most interesting to me." [৩]

বিঘ্নকারী চাঞ্চল্য রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ চিত্রগুলিতেও বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আলো সেখানে সব সময় পশ্চাতে। উজ্জ্বল হলুদ, লাল, সবুজ রঙের প্রলেপের উপর গাঢ় বাদামী, বেগুনী, ঘোর নীল রঙের প্রলেপ, এর ফলে ছবির একেবারে সম্মুখভাগ আলোর আড়ালে পড়ে গেছে। অন্ধকারের পরিপ্রেক্ষিতে আলো প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। ঠিক সামনের গাছ জমি জলধারা আলোকিত হলে যে সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবকে প্রকাশ করে, এক্ষেত্রে সেটা হল না। একটা স্থৈর্যকে আলোড়িত করে দেবার মতো রহস্যময় সম্ভাবনায় ছবিগুলি ভাষা পেল।

অতএব সর্বত্রই একটা অস্থির গতিবেগসম্পন্ন হল তাঁর ছবি। দ্রষ্টাকে মানসিক আলোড়নের সম্মুখীন হতে হল। গতিবেগ, এই রহস্যঘন পরিবেশ রচনার কারণ কি? সমালোচকদের মধ্যে অনেকে রবীন্দ্রনাথের অবচেতনের গভীরে এর কারণ অনুসন্ধান করেছেন, কেউ করেছেন তাঁর আগ্রহর ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে। এখানে বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করেও একটা বিষয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, শুধুমাত্র বস্তুর রূপপ্রকাশই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল না। রূপের ভিত্তিতে একটা বিশেষ উপলব্ধিকে অথবা ভাবকে তিনি প্রকাশ করেছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি—

"জগতে রূপের আনাগোনা চলছে, সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক একটি রূপ, অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে। সে প্রতিরূপ নয়। মনের মধ্যে ভাঙ্গাগড়া কতই জোড়াতাড়া; কিছু বা তার ঘনিয়ে ওঠে ভাবে, কিছু বা তার ফুটে ওঠে চিত্রে।" [৪]

ফলে রবীন্দ্রনাথকে অনেক ক্ষেত্রেই ইচ্ছা করে বস্তুর স্বাভাবিক গঠনকে ভাঙতে হল। চিন্তার ধারায় এগিয়ে তাঁর ছবি হল প্রচলিত ভাষায় যাকে বলে abstract। কিন্তু

৩ *Life with Picasso*, pp. 53-54.

৪ শেষ সপ্তক— পনেরো-সংখ্যক কবিতা।

এই abstraction বা বিমূর্ত প্রকৃতি থাকল প্রধানত বস্তুনির্ভর। প্রথম যুগের ক্যালিগ্রাফির কথা বাদ দিলে নির্বস্তুক ছবির দৃষ্টান্ত আর মেলে না। এখানে তিনি ভাব থেকে রূপে এলেন। রূপে এখানে অনেকটাই বিশেষ মানসিকতা (সচেতন বা অবচেতন) অথবা ধারণার বাহন। অনেকটা সাহিত্যে ব্যবহৃত objective correlative-এর মতো। পিকাসো চিত্রে এরই নাম দিয়েছেন attribute (ভাবপ্রতীক)। এখানে পিকাসোর একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

"The attributes were the few points of reference designed to bring one back to visual reality, recognizable to anyone... when they (অর্থাৎ দর্শক) see vaguely in their fog something they recognize, they think, "Ah, I know that." And then its just one more step to, "Ah, I know the whole thing." For me it is a vessel in the metaphorical sense just like Christ's use of parables. He had an idea, he formulated it in parables so that it would be acceptable to the greatest number. That's the way I use objects."[৫]

রবীন্দ্রনাথের বিমূর্ত ছবিতেও পরিচিত বিশ্বের উপকরণ নিয়ে ছবির ভাবচিত্র রচিত হল। বস্তুর সংস্থান গঠন আলোর উজ্জ্বলতা ও গাঢ়ত্ব কতগুলি চিহ্ন রচনা করল। এখানে রবীন্দ্রনাথের ছবি বিশুদ্ধ, বিমূর্ত চিত্রকলার থেকে স্বতন্ত্র নির্বস্তুক বিমূর্ত ছবিতে রঙের ও রেখার তরঙ্গটাই লক্ষণীয়। সেখানে সুরসঙ্গতি শুধু রচনা করা হয়ে থাকে একটা বিশুদ্ধ আবেগের প্রকাশরূপ হিসাবে। বস্তুর উপর নির্ভর না করে বস্তুবিশ্বের একটা স্রোত বা সেখান থেকে উদ্ভূত একটা মানসিকতার রূপায়ণমাত্র। পশ্চিমের মাতিস্-এর ছবিতে বা এদেশে গগনেন্দ্রনাথের ছবিতে, বিভিন্ন আঙ্গিকে, এই সুরসঙ্গতি রচনার আভাসটাই বড়ো কথা। কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথ ভিন্নপন্থী। ভাবপ্রকাশ প্রধান উদ্দেশ্য হলেও, বক্তব্য অনুভূতি ও উপলব্ধির জগতে জন্ম নিলেও প্রকাশভঙ্গী প্রধানত রূপাশ্রয়ী।

কিন্তু এখানেও আবার রবীন্দ্রনাথের যাত্রাপথ পিকাসো প্রমুখ অন্যান্য শিল্পীদের থেকে আলাদা। যে-সব শিল্পীর দক্ষতা অভ্যাসসিদ্ধ, রূপের গঠন ও ভঙ্গিকে ধরবার জন্য যাঁরা প্রথাগত অনুশীলনের পথ ধরে এসেছেন তাঁরা যখন ভাবের রাজ্যে প্রবেশ করেন তখন এতদিনের অনুশীলিত দক্ষতার পরিবর্তন ও বর্জনের প্রয়োজন দেখা দেয়। অনাবশ্যক খুঁটিনাটিকে এড়ানোর চেষ্টা দেখা যায় কখনো, কখনো বা তাঁদের মধ্যে প্রকৃতিকে অনুকরণ না করে বস্তুর বিন্যাসে পরিবর্তন এনে প্রকৃতিকে আবিষ্কারের চেষ্টা চোখে পড়ে। আগেই বলেছি যে, চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথের প্রথাগত শিক্ষা ছিল না, সুতরাং বস্তুর গঠন তাঁর কাছে অন্যান্য চিত্রশিল্পীদের মতো অতটা স্পষ্ট ছিল না। খুঁটিনাটি সম্বন্ধে উদাসীনতা এই সাক্ষ্য বহন করে। অতএব রবীন্দ্রনাথ যদি রূপকে ভাবপ্রতীক (attribute) হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন তবে সেটা প্রধানত ভাবকে রূপাশ্রয়ী করবার জন্য। ফলে, যেখানে সাধারণত চিত্রশিল্পীরা রূপ থেকে ভাবের রাজ্যে আসেন ভাবপ্রতীককে বাহন করে, রবীন্দ্রনাথ সেখানে ভাবপ্রতীকের ব্যবহার করলেন ভাব থেকে রূপের দিকে যাবার জন্য।

---

৫ Francoise Gillot : *Life with Picasso,* pp. 66-67.

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার আর-একটি বিস্ময়কর দিক, তার রঙ। সাধারণত তিনি প্যালেট ব্যবহার করতেন না, বিশুদ্ধ রঙ সোজাসুজি কাগজের উপর লাগাতেন। দীর্ঘকাল ধরে ইয়োরোপে ছবিতে পরিপ্রেক্ষিত ও বস্তুর ঘনত্ব ফুটিয়ে তুলবার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পীরা প্রতিযোগিতা করেছেন। বিভিন্ন রঙের মিশ্রণে এবং একই রঙের মাত্রা উঠিয়ে নামিয়ে ছবিতে দৃশ্যমান জগতের গভীরতা ও ঘনত্ব আনার চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু রঙের উজ্জ্বলতায় প্রকৃতির আলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন কোনও রঙ শিল্পীর ভাণ্ডারে নেই। ফলে লাল ফুলের দুই প্রান্তে ক্রমশ ছায়া ফেলে বস্তুর ঘনত্বকে ফুটিয়ে তুলবার এই সুদীর্ঘকালের চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে এই নূতন পথে বর্ণবিন্যাসের কথা ভাবতে হল। পরিপ্রেক্ষিত রচনার কিংবা বস্তুর ঘনত্বকে গড়ে তুলবার বিশেষ ঝোঁক ভারতীয় শিল্পীদের ছিল না কোনোকালেই। তার পরিবর্তে রঙের সংঘাত ও জোটকের মধ্য দিয়ে তাঁরা প্রায় সমান জমিতে বিষয়বস্তু সাজাতেন। ফলে রঙের মাত্রা বা টোনের পরিবর্তন করবার প্রয়োজন ছিল অনেক কম, এবং বিভিন্ন রঙ প্যালেটে না মিশিয়ে সরাসরি ছবির জমিতে ব্যবহৃত হত। রবীন্দ্রনাথ আঙ্গিকের দিক থেকে এখানে সম্পূর্ণ ভারতীয়। স্তরে স্তরে বিভিন্ন রঙের প্রলেপ দিয়ে ছবির জমিকে দৃঢ়সংবদ্ধভাবে গড়ে তুলতেন। হালকা বাদামী বা সিপিয়ার উপর সবুজ তার উপর কালো রঙের প্রলেপ। উপরের রঙকে ভেদ করে নীচের রঙ ফুটে উঠছে কখনো কখনো। এছাড়া পাশাপাশি উজ্জ্বল রঙ ও গাঢ় রঙ, আলো ও অন্ধকারের বিন্যাসে ছবি স্তব্ধতাকে অতিক্রম করে বাঙ্ময় রূপ পেল।

রবীন্দ্রনাথের ছবিতে রঙের ব্যবহার এক দিকে যেমন ছবিকে বলিষ্ঠ গঠনের গুণ -সংবলিত করেছে অন্য দিকে তেমনই অস্থির ও গতিশীল করেছে। গভীর আলোড়নের ইঙ্গিত নিয়ে ছবিগুলি দ্রষ্টার মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। সেখানে রবীন্দ্রসাহিত্যের সুকুমার পরিপূর্ণতা নেই। রবীন্দ্রসংগীতের সুন্দর প্রশান্ত উদার পরিবেশ থেকে তাঁর ছবির মেজাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন। রঙের ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমনের অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে স্পষ্ট। রঙের উপর রঙ বসিয়ে গিয়েছেন ব্যগ্রতার সঙ্গে। একই ছবিতে পোস্টার কলার, জল রঙ, অয়েল প্যাস্টেল ও কালি-কলম ব্যবহার করতে তাঁর কুণ্ঠা নেই। সেখানে শিল্পীর অতৃপ্তি ও ব্যগ্রতা অত্যন্ত স্পষ্ট। তা ছাড়া বস্তুর গঠনে খেয়ালখুশিমতো রূপ সংযোজন ও পরিবর্তন এই অস্থিরতারই স্বাক্ষর বহন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের আঁকা কাল্পনিক ও প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ছবি। সেখানে হয়তো পরিচিত বিশ্বের কোনো একটি জন্তুর ছবি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই অন্য একটি জন্তুর শরীরের কোনো অংশ সংযোজিত হয়েছে। অনুরূপ প্রসঙ্গ তুলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

"ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি, আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকি নে— দৈবক্রমে একটা কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চল্‌তি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনক-রাজার লাঙলের ফলায় যেমন জানকীর উদ্ভব। কিন্তু সেই একটিমাত্র আকস্মিককে নাম দেওয়া সহজ ছিল, বিশেষত সে নাম যখন বিষয়সূচক নয়। আমার যে অনেকগুলি— তারা অনাহূত এসে হাজির— রেজিস্টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন্ উপায়ে।" [৬]

একদিকে ছবির বিষয়বস্তুতে এই আকস্মিকতা অন্য দিকে অস্থিরতা ও অত্যন্ত দ্রুতবেগে ছবি এঁকে ফেলবার তাগিদ। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ছবিতে অস্বস্তিকর পরিবেশ ও গঠনে পরিপূর্ণতা ও নিটোলত্বের অভাব স্পষ্টত চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅশোক মিত্র লিখছেন—

"রবীন্দ্রনাথ গেলেন বাস্তবের চেয়েও বাস্তব হ'তে, বাস্তব থেকে তার আসল সত্যরূপ ফুটিয়ে বের করতে।... প্রত্যেক মহৎশিল্পীর মতো রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম কর্তব্য হল মিষ্টি মিষ্টি সুন্দরপানা ছবি বিষবৎ বর্জন করা, ছবিতে অসুন্দর বিষয়কে সচেতনভাবে এনে তার চিত্রগত সৌন্দর্য, সুষমা ও সামঞ্জস্য ফুটিয়ে তোলা।... রবীন্দ্রনাথে আমরা এমন একজন শিল্পী পেলুম যিনি সজ্ঞানে 'সুন্দর' মুখ, 'সুন্দর' দেহ, 'সুন্দর' মায়ায় ঘেরা দৃশ্য ঠেলে ফেলে দিয়ে, সাধারণ, বিশ্রি, নোংরা বিষয়, সাধারণ 'অসুন্দর' মুখ, 'অসুন্দর' দেহ, এমন-কি অসুস্থ বিভীষিকাময় পরিবেশের প্রবর্তন করলেন।" [৭]

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, সাহিত্যে সংগীতে তিনি দক্ষ ও সচেতন স্রষ্টা হয়েও যেখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিপূর্ণতার সৃষ্টিকে বাঁধলেন সেখানে ছবিতে অসুন্দর পরিবেশ রচনায় তিনি ব্রতী হলেন কেন? গভীর উপলব্ধি, বিরাট জীবনবোধ ও প্রজ্ঞা তো রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্য-সৃষ্টিতেও সর্বদা পরিচালিত করত। কবিতা গান ও গদ্য রচনায় তাঁর সচেতনতা যতটা থাকবার কথা তার থেকে বেশি সচেতনতা বা সতর্কতা তাঁর ছবিতে থাকবার কথা নয়। অতএব 'অসুন্দর' মুখ, 'অসুন্দর' দেহ ইত্যাদি রচনাকালে তাঁর সচেতন প্রয়াস সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। 'রবীন্দ্রনাথ গেলেন বাস্তবের চেয়েও বাস্তব হতে'— অর্থাৎ সুররিয়ালিস্ট, এই ধরনের বক্তব্য সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মনে হয় না। বরঞ্চ সচেতন ও অসচেতন অস্তিত্বর গোধূলিতেই তাঁর ছবিগুলি মূর্ত বলে মনে হতে পারে। এখানে প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃত করছি—

"আমি পঞ্চাশ বছর ধরে ভাষার সাধনা করছি। সুতরাং তার সমস্ত কৌশল, তার গতিবিধির নিয়ম, সে একরকম জেনে নিয়েছি। কিন্তু এই ছবি যা অকস্মাৎ আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হয়েছে, তার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ চেনাশোনা হয় নি। তার স্বৈরাচার আমাকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু স্বৈরাচারের অন্তর্নিহিত যে নিয়ম তাকে ভিতরে ভিতরে চালনা করে, সে আমার কাছে অত্যন্ত গোপনে আছে।" [৮]

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন মাধ্যমে বিচিত্র উপকরণ দিয়ে অজস্র ধারায় সৃষ্টি করেছেন। সেই সৃষ্টি যেমন বিপুল তেমনই মহান। তাঁর চিত্রকলা সেই বিরাট সৃষ্টিধারার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ অংশ। ছন্দে ভাবে বর্ণসুষমায় জীবনবোধের স্বাক্ষরে রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলি ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকলার আসরে নিজেদের স্থান দাবি করে।

মাঘ ১৩৭৫

---

৬ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠির অংশ— চিঠির তারিখ ২রা পৌষ ১৩৩৮

৭ অশোক মিত্র : 'ভারতীয় চিত্রকলা', পৃ. ২৮৯

৮ শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়কে লিখিত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড

নন্দলাল বসু

অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর কলাভবনের অধ্যক্ষ ড. নন্দলাল বসু ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান স্তম্ভ। দেশবিদেশ হইতে বহু বিদ্যার্থী নন্দলাল বসুর নিকট কলাশিল্পের পাঠ লইয়া তাঁহার চিত্রকলার প্রশংসা দেশেবিদেশে প্রচারিত করিয়াছেন। একাদিক্রমে তেষট্টি বছর তাঁহার তুলিচালনা ভারতের তথা সমস্ত বিশ্বের কলাসাধনার শ্রেষ্ঠদানে উজ্জ্বল হইয়া আছে। তাঁহার দীর্ঘজীবনের অসংখ্য কলাসৃষ্টির উল্লেখমাত্র এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তাঁহার জীবনকথাও অতি বিচিত্র ও বিস্ময়কর।

১৮৮৩ খৃস্টাব্দে খড়্গাপুরে নন্দলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন সেখানে দ্বারভাঙ্গা স্টেটের ম্যানেজার। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা হয় খড়্গাপুরের মিড্‌ল্‌ ভার্নাকুলার স্কুলে— তিনি হিন্দি ভাষাতেই শিক্ষা পাইয়াছিলেন। পনেরো বছর পর্যন্ত এখানেই কাটে। পরে তিনি কলিকাতায় ক্ষুদিরাম বোসের স্কুলে (সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল) ভর্তি হন ও কুড়ি বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একুশ বছর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়।

বাংলাদেশের সৌভাগ্য যে নন্দলাল লিখিত-পড়িত বিদ্যার মোহে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন নাই।

এন্ট্রান্স পাস করার পর— একদিন তিনি অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। সঙ্গে ছিল তাঁর আঁকা কয়েকখানি চিত্র। অবনীন্দ্রনাথ চিত্র দেখিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন— "ইস্কুল পালিয়ে আসা হয়েছে?" উত্তর, "না, এন্ট্রান্স পাস ক'রে এসেছি।" "বিশ্বাস হয় না, সার্টিফিকেট দেখতে চাই।" নন্দলাল certificate দেখাইয়া ভর্তি হন।

আর্ট স্কুলে অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন— তিনি নন্দলালের চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ। ঈশ্বরীবাবুর নিকট ডিজাইনের ক্লাসে নন্দলাল ভর্তি হইলেন— তিনিই ছিলেন ডিজাইনের class-এর প্রথম ছাত্র। ভর্তির সময় ঈশ্বরীবাবু পরীক্ষা করিলেন, গণেশ আঁকিতে দিলেন, নন্দলালের কাজ দেখিয়া অবনীন্দ্রনাথ বলিলেন, "হাত পোক্ত হ্যায়।" তাহার পর ধাপে ধাপে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার বিকাশ হইল। এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার রূপ-সৃষ্টি সমস্ত বিশ্বে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল।

চিত্রকলার জগতে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ বাংলা দেশে এক নূতন চিত্রপদ্ধতির প্রবর্তন করিয়া, এক নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া, বাংলার নাম পৃথিবীর শিল্পজগতে স্মরণীয়

করিয়া রাখিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথের আন্দোলন তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী নন্দলাল বসুর সহকারিতা না পাইলে সম্যক সিদ্ধিলাভ করিত কি না সন্দেহ। অনেক সময় গুরুর সম্মানের ছটায়, শিষ্যের প্রতিভার আলোক খর্ব হইয়া যায়। নন্দলালের লেখনী ভারতের চিত্রশিল্পকে কত উচ্চ আসনে উন্নীত করিয়াছে, ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার কলাবুদ্ধি এখন এদেশে কমই আছে।

তাঁহার অঙ্কিত প্রথম মহৎ চিত্র হইল, 'সতীর সহ-মরণে অলৌকিক কল্পনা'। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়াসে এই দেশে 'সতীদাহ'-প্রথা নিষিদ্ধ হয়। সুতরাং নন্দলাল 'সতীদাহ' কখনো চাক্ষুষ করেন নাই। কিন্তু অলৌকিক কল্পনার বলে তিনি 'সহমরণে'র আদর্শ এবং ভারতের নারীর পাতিব্রত্য এমন উজ্জ্বল করিয়া আঁকিয়াছেন, তাহা নবীন-কলার ভারতীয় চিত্রে একটি চিরস্থায়ী অবদানরূপে চিরকাল প্রশংসিত হইবে। এই চিত্রখানি জাপানি রীতির রঙিন প্রতিলিপিতে মুদ্রিত হইয়া দেশেবিদেশে প্রচারিত হইয়া ভারতীয় নবীন রীতির শ্রেষ্ঠ চিত্র বলিয়া দেশেবিদেশে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় চিত্র 'কৈকেয়ী ও মন্থরা'। সবুজ রঙের শাড়ি-পরা ভরতের জননী ঈর্ষার জ্বলন্ত প্রতিমূর্তিরূপে নন্দলালের তুলিকায় উজ্জ্বল হইয়া আছে— ও মৌলিক ও বলিষ্ঠ কল্পনায় উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

রামায়ণী কথার চিত্রাবলীর মধ্যে বোধ হয় তাঁহার শ্রেষ্ঠ masterpiece হইল 'অহল্যার পাষাণমুক্তি'। এই চিত্রের অদ্ভুত কল্পনা সৃষ্টির এবং নাট্যরসের অলৌকিক অভিব্যক্তি দেশেবিদেশে সমস্ত কলারসিকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল।

তাহার পর তাঁহার কলাসৃষ্টির নূতন পর্যায় হইল শিবলীলার চিত্রায়ণ। শৈবপুরাণের চিত্রায়ণে নন্দলাল যে অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে তাহা চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। শিবপার্বতীর নূতন রূপকল্পনায় নন্দলাল নিশ্চয়ই মধ্যযুগের শৈব ভাস্কর্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু এই উপাদানকে যে মৌলিক কল্পনায় নূতন রূপ দান করিয়াছেন, তাহা ভারতের রূপ-শিল্পের ইতিহাসে এক নূতন ও মূল্যবান যোজনা— এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার শিবচিত্রের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য— 'শিবের ধ্বংসনৃত্য', 'শিবের বিষপান', 'পার্বতীর শোক' পার্বতীকে ক্রোড়ে করিয়া শিবের যুগ-যুগ-ব্যাপী ধ্যানে মগ্ন শোকের চিত্র— শিবের এই মুখের কল্পনা নন্দলালের উচ্চ চিন্তার শ্রেষ্ঠ পথ। শিবচিত্রে এইরূপ মহান কল্পনা ইতিপূর্বে কোনো শিল্পী সার্থক করিতে পারেন নাই। যোগীশ্বর শিবের যে বিরাট শোকের মূর্তি উক্ত চিত্রে যে অলৌকিক রসের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার বিপরীত রসের কল্পনা হইল শিব ও পার্বতীর চমৎকার শান্তিরসের প্রতিকৃতি— 'বর্ষফলকথন'। এই চিত্রখানি আচার্য রচনা করেন, বাংলা দেশের পঞ্জিকার প্রবাদ অবলম্বন করিয়া। প্রবাদ আছে যে, পার্বতী শিবকে বৎসরের ফলাফল প্রশ্ন করিলে শিব যে ফলাফল

উচ্চারণ করেন, পঞ্জিকাকার সেই ফলাফল পঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন। এই ব্যাপারে একটি অতি প্রচলিত শ্লোক আছে--

কৈলাস-শিখরাসীনং হরং পপ্রচ্ছ পার্বতী।
অধুনা ব্রূহি মে নাথ নব-পঞ্জী-ফলাফলম্॥
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নব-পঞ্জী-ফলাফলম্
যস্য শ্রবণমাত্রেণ দিব্যজ্ঞানং লভেন্নরঃ।।

কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে'র তৃতীয় সর্গে বর্ণিত মদনভস্মের উপাখ্যান নন্দলালের আর-একটি শ্রেষ্ঠ চিত্রের চমৎকার রূপায়ণ। মদনভস্ম করিয়া পার্বতীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া শিব প্রস্থান করিয়াছিলেন— শিল্পী শিবের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি কৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার দ্রুতগমনের সময় তাঁর রুদ্রাক্ষমালার হাত হইতে ভূমিতে পতনে। তাহার পর "শৈলসুতাও দেখিলেন যে, তাঁহার পিতার উচ্চ অভিলাষ পূর্ণ হইল না, আর তাঁহার নবীনা সৌন্দর্যও বিফল হইল। সখীদ্বয়ের সম্মুখে এইরূপ অবমাননা হেতু অধিকতর লজ্জিতা ও শূন্যমনা হইয়া স্বীয় গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।" (৭৫ ॥ কুমারসম্ভব)

লজ্জায় ক্ষোভে অপমানে পার্বতী পিষ্ট পল্লবের মতো ভাঙিয়া পড়িলেন সখীর হাতের উপর। এইরূপ মর্মভেদী করুণ চিত্র বাংলার আর-কোনো শিল্পী এইরূপ হৃদয়গ্রাহী করিয়া চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। কবি পার্বতীর বিফলতার চিত্রে ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, নবযৌবন এবং কাম ও রতির সাহায্যে শিবের মতো মহাযোগীর চিত্ত জয় করা যায় না, তাহার জন্য চাই— সুদীর্ঘকালব্যাপী তীব্র তপস্যা।

শিবলীলার চিত্রে নন্দলালের সৃষ্টিশক্তির অপূর্ব পরিচয় আমরা পাই। বাংলাদেশে প্রাচীন পটে এবং যাত্রাগানের অভিনয়শিল্পে স্থূলোদর, শ্মশ্রুযুক্ত যে বৃদ্ধের আদর্শ শিবের প্রাচীন কল্পনাকে বিকৃত করিয়াছিল নন্দলাল সেই দুষ্ট পন্থা বর্জন করিয়া এক কমনীয়কান্তি, শ্মশ্রুহীন, চিরকুমার, অনন্তযৌবন অতিমানুষের চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যাহা মধ্যযুগের শিবমূর্তির কল্পনাকে নূতন মর্যাদা ও পরিণতি দান করিয়াছে।

আর-একটি চমৎকার চিত্র হইল নন্দলালের গুরু অবনীন্দ্রনাথকে অর্ঘ্যপ্রদান। ছবিটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছবিটির নাম দেওয়া যাইতে পারে "শিক্ষানবীশ"— 'গুরু শিষ্যকে আরতি করা শিখাইতেছেন'। কল্পনাটি অতি চমৎকার ও মর্মস্পর্শী। মন্দিরের পুরোহিত বৃদ্ধ হইয়াছেন, আরতি করিবার সময় দীপ সঞ্চালন করিতে তাঁহার হাত কাঁপে, সুতরাং একজন যুবককে শিখাইতেছেন মন্দিরে ভারতের শিল্পদেবতাকে কিরূপে আরতি করিতে হয়। চিত্রে আমরা পুরোহিতের মুখে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। ছোটো ছেলেটি যাহার মাথার উপর আচার্য সস্নেহে হাত রাখিয়াছেন তিনি হইলেন নন্দলাল।

নন্দলালের চিত্ররীতির সম্যক আলোচনা অল্প কথায় করা সম্ভব নহে। বিভিন্ন চিত্রে তিনি বিভিন্ন রীতির প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পনা সুচিন্তিত, রঙের সামঞ্জস্য পূর্বনির্দিষ্ট এবং রেখার টান অকম্পিত। উক্ত গুণসম্পন্ন শিল্পী ভারতে বিরল।

রবীন্দ্রনাথের অনেক গান ও নাটক তিনি চমৎকার রূপ দিয়া উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন— তাহার মধ্যে 'নটীর পূজার' চিত্র একটি অপূর্ব masterpiece—

আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো—
তোমায় স্মরি হে নিরুপম,
নৃত্যরস চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে।

এই শ্রেণীর আর-একখানি চিত্র হইল রবীন্দ্রনাথের Fruit Gathering (কল্পনা : রাত্রি) যে স্থানে কবি বলিয়াছেন—

মোরে করো সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা!
তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা
তোমার তিমিরতলে যে বিপুল নিঃশব্দ উদ্যোগ
ভ্রমিতেছে জগতে জগতে...

এই কবিতাটি নন্দলাল একটি সহজ, সরল চিত্রে জীবন্ত করিয়া দিয়াছেন।
রঙিন বর্ণাঢ্য অসংখ্য চিত্রমালা ছাড়াও তিনি সাদার উপর কালির আঁচড়ে বহু চিত্র আঁকিয়াছেন। তাহাদের আকর্ষণ কম নহে। এইগুলিতে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি এবং বলিষ্ঠ রেখাপাতের সৌন্দর্য উজ্জ্বল হইয়া আছে। আমরা এখানে তাঁহার একখানি সাদা-কালো রঙের স্কেচ উপস্থিত করিতেছি। ঘরের বধূ উনুনের উপর দুগ্ধ জাল দিতেছেন— তাহার মনোরম চিত্র। কালো কাপড়ের উপর সাদা রঙের রেখামালা চিত্রটিকে অলৌকিক রসে উজ্জীবিত করিয়াছে।

নন্দলালের প্রতিভার আর-একটি বিশেষ দিক হইল তাঁহার শিক্ষাদানের চমৎকার পদ্ধতি। শিল্পীগুরু হিসাবে তিনি অনেকের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তিনি বাঙালি-অবাঙালি অনেক শিল্পীকে উপযুক্ত পথে চালিত করিয়া সফল শিল্পসাধনায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন— মাশোজী, ধীরেন্দ্র দেববর্মা, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং ইন্দ্র দুগার।

চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার গুরুর কথা কিছু কিছু নিবদ্ধ করিয়াছেন— একবার নন্দলালের সহিত রাজগৃহে (রাজগীরে) গিয়াছিলেন। তাঁহাকে নন্দলাল বলিয়াছিলেন, "দেখো এই গ্রামেই বুদ্ধদেব এসেছিলেন, এই পথেই তিনি এসেছিলেন, লোকের বাড়ির দাওয়ায় এসে বসতেন— এই তো সেই দাওয়া, কেমন দেখো এত বছরেও তো একটুও বদলায় নি।" শিষ্যের চোখ খুলিয়া দিবার তাঁহার অদ্ভুত শক্তি ছিল।

তাঁহার আর-এক শিষ্য ধীরেন্দ্র দেববর্মা বলিয়াছেন, "তিনি কত ছোটো-খাটো জিনিস কুড়িয়ে সুন্দর সুন্দর শিল্পবস্তু তৈরি করেছেন। তাঁর কাছে ছোটো পরিত্যক্ত অনাদৃত বলে কিছু নেই। শিল্পীর অন্তরতম মনের সুন্দর ছাপে সবই সুন্দর হয়ে ওঠে।"

সুতরাং নন্দলালের বহুমুখী প্রতিভা শুধু শিল্পসৃষ্টিতে নিঃশেষিত হয় নাই। তিনি শিল্পীও সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা স্বীকার করিবে। তিনি মৌখিক কথার বাক্যবীর ছিলেন না। তাঁর উচ্চতর ভাবনা এবং উচ্চতর কলাসৃষ্টি তাঁর তুলিকার মুখে মুখর এবং বাঙ্ময় হইয়া আছে।

শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু দার্শনিক তত্ত্ব তিনি সহজ ভাষায় একস্থানে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া বিশ্ববিখ্যাত রূপকার নন্দলালের এই অক্ষম আলেখ্য আমরা সমাপ্ত করিলাম।

"খেলা করা ও শিল্পসৃষ্টি করা এ দুয়েরই প্রবৃত্তির মূল একই। খেলা করলে মন প্রফুল্ল হয়, শরীর সুস্থ হয়, কিন্তু মানসিক প্রফুল্লতা ও শারীরিক সুস্থতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কয়জন খেলায় প্রবৃত্ত হয়? শিক্ষা বড়ো, না খেলা বড়ো, এর বিচার করবে শিক্ষক। কিন্তু শিল্পী বা কলাকার খেলাই করেন। তার খেলা নিত্যই নতুন; এ খেলায় সে নিজেই নিয়ম বানায়, নিজেই তা পালন করে, আর অন্যান্য খেলুড়ের সঙ্গে এই খেলার আনন্দ উপভোগ করে।

"মানুষের খেলার ইচ্ছার পেছনে থাকে সুস্থ শরীর-মন। যে জাতি শিল্পসৃষ্টিতে আনন্দ অনুভব করে বুঝতে হবে সে জাতি জীবিত।

"শিল্পসৃষ্টি কারো ফরমাস মতো হয় না। শিল্পরচনার সময় শিল্পী হয়ে পড়েন নির্ভয়, নিঃসংকোচ; কারণ, সে সময় তাঁর মনপ্রাণ আনন্দে তন্ময় হয়ে যায়। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে আনন্দের ধারা কখনো বস্তু হতে আবার কখনো মন হতে প্রবাহিত হয়। সেই আনন্দ শিল্পীর হৃদয়ের সঙ্গে বহির্লোকের যোগ স্থাপন করে, শিল্পীর হৃদয় ও বস্তুর মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠা করে, এবং এই ঐক্যবোধ থেকেই আনন্দের উৎপত্তি। পরে সেই আনন্দ শিল্পসৃষ্টি-রূপে প্রকাশিত হয়।

"শ্রেষ্ঠ শিল্প সজীব দেহের মতো সদাই উৎফুল্ল, প্রাণরসে পূর্ণ, চিরনূতন।

"শিল্পসৃষ্টিতে বিষয় এবং অঙ্কন-কৌশল ছাড়াও এক অপরূপ ভাব বিরাজ করে। অর্থাৎ ছবি আঁকবার বিষয় ও কৌশল দুটোই গৌণ এবং স্থূল। তারা কেবল অরূপভাব ও আনন্দ প্রকাশের ইঙ্গিত মাত্র। কিন্তু সমগ্র চিত্রের মূলভাব গ্রহণ করবার সময় অংশবিশেষকে আলাদা করে দেখা চলে না, কারণ একটি সংযোগপ্রধান চিত্রে বহু ভিন্নরূপী রসচিত্রের সমাবেশ হয়।

"শিল্পপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি শিল্পশাস্ত্র শিক্ষার্থীর জানা দরকার। এবং যাঁরা দর্শক হিসাবে তার রসগ্রহণ করতে চান তাঁদেরও—

ক. শিল্পসৃষ্টির মধ্যে একটি সম্পূর্ণতা আছে।

খ. শিল্পসৃষ্টি সরল, সহজ ও সুনির্দিষ্ট। হৃদয়ে রসের স্পর্শানুভূতি বা কোনো এক ছন্দের সম্পূর্ণ বিকাশ হলে শিল্পী নির্ভীক চিত্তে সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।

গ. যেমন একটি বৃত্তচাপ বৃত্তের ধারণা মনে জাগায়, তেমনই শিল্প মহতের ধারণা হৃদয়ে জাগায়।

ঘ. শিল্পরচনার একটি আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের ভাব নিহিত থাকে।

ঙ. উচ্চাঙ্গের শিল্পরচনা রচয়িতার ও দর্শকের মনে যে ভাবের উদ্রেক করে তা শান্ত একটি আত্মসমাহিত ভাব।

চ. শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে শেষ কথা— আনন্দ থেকেই এর শুরু। রচনাপ্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে রচনা শেষ পর্যন্ত এই আনন্দানুভূতি রচয়িতার মনে জেগে থাকে; সৃষ্টিসমাধানেই যে এই আনন্দের শেষ তা নয়, বস্তুত দর্শক ও রচয়িতার রসাবেশেই এই আনন্দের মুখ্যতা।”

১৩৭৩ *নন্দলাল বসু সংখ্যা*

বাংলার সংগীতশিল্পে রবীন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

১

দু-একটি বিরল এবং গদ্যধর্মী ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে, প্রাচীন ও মধ্য যুগের সমস্ত বাংলা কবিতাই একাধারে কবিতা এবং গান। বাংলা গানও তাই, চিরদিনই একাধারে গান এবং কবিতা। বাংলা সংস্কৃতিতে কাব্য ও গানের এই যুক্তবেণী আংশিকভাবে মুক্ত হয়েছে অষ্টাদশ শতকে, বিশেষ করে ঊনবিংশ শতকে, তার আগে নয়। এই ছাড়াছাড়ির গরজটা এসেছে কাব্যের তরফ থেকেই, গানের তরফ থেকে নয়। আধুনিক বাংলা কাব্য গান-বর্জিত কাব্য, কিন্তু আধুনিক বাংলা গান কাব্য-বর্জিত গান নয়। বাংলার সংগীত-সংস্কৃতিতে কাব্য-বর্জিত গান কখনোই খুঁজে পাব না। প্রাচীন কালেও না, আজও নয়।

বাংলা সংগীত চিরদিনই, আজকাল যাকে আমরা কাব্যসংগীত বলে থাকি, মোটামুটি সেই জাতের জিনিস। কাব্যগুণ কোথাও বেশি কোথাও কম, কোথাও সূক্ষ্ম কোথাও স্থূল, কখনো সুমার্জিত কখনো সরল সাদামাটা, কিন্তু নেই এমন কখনোই নয়। নিতান্ত অরসিক না হলে লোকসংগীতের কাব্যগুণকে আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারব না, এবং তা যদি না পারি, তা হলে অনায়াসেই বলব যে, বৌদ্ধ সহজিয়াদের চর্যাগান থেকে শুরু করে বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী ও পালাকীর্তন, শাক্ত সাধক-কবিদের আগমনী বিজয়া কালীকীর্তন বা সাধনতত্ত্বের গান, বাউল-দরবেশীদের গান, নিধুবাবুর প্রণয়সংগীত থেকে নজরুল ইসলামের গজল, কিংবা একেবারে হাল আমলের আধুনিক-মার্কা গান, এর সবই কাব্যসংগীত। অন্যদিকে সারি-জারি-ভাটিয়ালী গান, নানা রকমের আনুষ্ঠানিক বা ক্রিয়াকর্ম-আশ্রিত গান, একটু বিস্তৃত অর্থে ধরলে এরাও কাব্যসংগীত। এই-সব নানা জাতের নানা মূল্যের কাব্যসংগীতের বাইরে, আর কোনো স্বতন্ত্র সংগীতধারার এমন কোনো সংগীত যাকে স্বপ্রতিষ্ঠ ধ্বনিশিল্প বলতে পারি তার অস্তিত্ব বাংলাদেশে সম্ভবত কোনো কালেই ছিল না। বাংলা গানের আবেদন সব সময়ই কথা ও সুরের মিলিত আবেদন, কখনোই কেবল সুরের আবেদন নয়।

সংগীত জিনিসটা অবশ্য দু'রকমেরই হতে পারে। এক-রকম হচ্ছে বিশুদ্ধ ধ্বনিশিল্প, কেবল ধ্বনিকে নিয়ে রূপ-নির্মাণ। দ্বিতীয় হচ্ছে ধ্বনির রূপ আর বাণীর রূপ উভয়কে মিলিয়ে এমন যৌগিক চরিত্রের রূপ-নির্মাণ যা কেবল ধ্বনিরও নয়,

কেবল বাণীরও নয়।[১] বাংলার সংগীত-সংস্কৃতিতে এই দ্বিতীয়টির সাক্ষাৎ পাই, প্রথমটির পাই না।

আদৌ পাই না বললে হয়তো একটু বাড়িয়ে বলা হবে। কিন্তু যেভাবে পাই তাতে অনায়াসে বলা যায়, তা বাঙালির নিজস্ব জিনিস নয়, উত্তর-ভারত থেকে আমদানী-করা বস্তু। এটা নিন্দা-প্রশংসার কথা নয়, ইতিহাসের সত্য। বাংলা গানের এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের মূলে একদিকে আছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতির গ্রামীণতা এবং অন্য দিকে আছে বাঙালির জাতীয় স্বভাবের টান।

সংগীতের এই দুই ধারার মধ্যে, বিশুদ্ধ ধ্বনিশিল্প আর ধ্বনি-বাণীর মিলিত শিল্প, এদের মধ্যে কোন্‌টি যে মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীনতর, তা বলা কঠিন। খুব সম্ভব শেষোক্তটিই। অর্থাৎ ধ্বনি ও বাণীর মিলিত রূপটিই সম্ভবত সংগীতের গোড়াকার রূপ। সংগীতের উদ্‌ভবের বিষয়ে সংগীতবিদ্যার গবেষকদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু, সংগীতের জন্ম যে ভাবেই হোক, তার প্রাথমিক বিকাশ যে আদিম রিচ্যুয়্যালে, গোষ্ঠীজীবনের সম্মিলিত ক্রিয়াকাণ্ডে, এ বিষয়ে প্রায় সব গবেষকই অল্পবিস্তর একমত। এই আদিম সংগীত নিশ্চয়ই খাঁটি ইস্থেটিক বস্তু ছিল না, ছিল মুখ্যত ব্যবহারিক। কিন্তু শিল্পও তার মধ্যে মিশে ছিল। তা ছিল একই সঙ্গে আনন্দ এবং ইন্দ্রজাল; একই সঙ্গে প্রার্থনা এবং ফলপ্রাপ্তি; একই সঙ্গে গান নাচ এবং অভিনয়; একই সঙ্গে বাক্য এবং বচনাতীত আকুতি।

এই জটিল সংমিশ্রণের মধ্যে থেকে তিনটি অঙ্গকে বিশেষভাবে লক্ষ করতে পারি; এদের প্রত্যেকটিকে নিয়েই পরে স্বতন্ত্র শিল্প গড়ে উঠেছে। এই তিনের একটি হল সুর-সম্বলিত কথা, বা গান। দ্বিতীয় নৃত্য। তৃতীয় অভিনয়। যেমন করে নৃত্য ও অভিনয়ের আপন আপন পৃথক শিল্পরাজ্য স্থাপিত হয়েছে, গানের শিল্পরাজ্যও তেমনি করে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। গানের এই স্বতন্ত্র স্বপ্রতিষ্ঠ রূপেই শিল্প হিসেবে সংগীতের প্রাথমিক আত্মপ্রতিষ্ঠা।

সংগীতের এই প্রাথমিক শিল্পরূপের উপাদান কিন্তু অমিশ্র নয়। ধ্বনি যেমন তার উপাদান, কথাও তেমনি তার অপরিহার্য উপাদান। তা ধ্বনি ও বাণীর যৌগিক-শিল্প।

কথারও অবশ্য একটা আলাদা শিল্পরূপ আছে, আলাদা শিল্পজগৎ আছে— যাকে বলি কাব্যজগৎ। সে জগতে সংগীতের ধ্বনির, সংগীতের সুরের প্রবেশ নেই। তা যদি হয়, তাহলে ধ্বনিরই বা আলাদা একটা শিল্পভূমি থাকবে না কেন, যেখানে ধ্বনিরই স্বাধিকার, কথার নয়?

গানের মধ্যে থেকে— কথা ও ধ্বনির যুক্তবেণীকে মুক্ত করে দিয়ে— কালক্রমে স্বতন্ত্র সুর-জগৎও গড়ে উঠল। এঁকে বলতে পারি সুর-লহরীর, সুর-সংগতির শিল্প,

---

১ উচ্চাঙ্গ সংগীতে 'বাণী' কথাটির একটি পারিভাষিক অর্থও আছে। এখানে 'বাণী' সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। কথা বা অর্থযুক্ত বাক্য— এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

বিশুদ্ধ ধ্বনিশিল্প। উপাদানের অমিশ্রতার দিকে তাকিয়ে একে 'বিশুদ্ধ-সংগীত' আখ্যাও দিতে পারি।

বিশুদ্ধ-সংগীতের উদ্‌ভব কিন্তু ধ্বনি ও বাণীর যৌগিক শিল্পরূপের বিকাশে কোনো বাধা ঘটায় নি। সংগীতের এই দুই ধারাই দীর্ঘকাল পরস্পরের পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে আজকের কালে এসে পৌঁছেছে। দুই ধারাই পরস্পরকে পুষ্ট করতে করতে এগিয়ে চলেছে। বিশুদ্ধ সংগীতের দানে ধ্বনি-বাণীর যৌগিক-শিল্পের— অথবা বলি গানের— সাংগীতিক ভিত্তি দৃঢ়তর হয়েছে, তার শিল্পরূপ ক্রমশ পরিচ্ছন্নতর ও সমৃদ্ধতর হয়েছে।[২] অন্যদিকে গানের দানে— অথবা বলতে পারি কাব্যগীতির দানে, এবং তার মধ্যে লোকসংগীতের দানও অবশ্য-গণনীয়, বিশুদ্ধ-সংগীতে ব্যাপকতা এসেছে, বৈচিত্র্য এসেছে, জনজীবনের সঙ্গে তার যোগ অক্ষুণ্ণ থেকেছে, তার মধ্যে অভাবিত প্রাণশক্তির সঞ্চার ঘটেছে।

উচ্চাঙ্গের সংগীতশিল্প সব দেশেই আজ বিশুদ্ধ ধ্বনি-শিল্প। দেশভেদে তার রূপ ও চরিত্র ভিন্ন। কিন্তু ধ্বনিই— ধ্বনি ও নীরবতাই— তার একমাত্র উপাদান। অন্য কোনো শিল্পের উপর সে নির্ভরশীল নয়। কবিতায় যাকে আমরা বলি অর্থ বা বাগর্থ— তা সে বাচ্যার্থই হোক আর ব্যঞ্জনাই হোক, তা তার লক্ষ্য নয়। যন্ত্রসংগীতেও তাই, কণ্ঠসংগীতেও তাই। তার একমাত্র লক্ষ্য ধ্বনির সহায়তায় বিশিষ্ট রূপ-নির্মাণ। কথা যদি আদৌ স্থান পায়, তো সে নিতান্তই অনুগামী বা অনুষঙ্গ হিসেবে।

কিন্তু কোনো দেশের সংগীত-সংস্কৃতিই কেবলমাত্র বিশুদ্ধ-সংগীতেরই সংস্কৃতি নয়। সব সভ্য দেশেই বিশুদ্ধ-সংগীতের পাশাপাশি গানের অর্থাৎ কথা ও সুরের যৌগিক-শিল্পেরও সাক্ষাৎ পাই। গান আছে, বিশুদ্ধ-সংগীত নেই, এমন সংস্কৃতির সন্ধান অনেক পাওয়া যাবে। বিশুদ্ধ-সংগীত আছে, গান নেই, এমন দেশ এমন সংস্কৃতি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নিতান্ত অনগ্রসর জন-গোষ্ঠীর কথা বাদ দিলে, প্রায় সর্বত্রই গানের ধারা, দুটি অল্পবিস্তর পৃথক খাতে প্রবাহিত হয়ে থাকে। তার একটি হল লোকসংগীতের খাত। দ্বিতীয়টির কোনো নাম নেই। এ গানের স্বভাবে উচ্চাঙ্গের বিশুদ্ধ-সংগীতের সাংগীতিক আভিজাত্য নেই বটে, কিন্তু এ গান লোকসংগীতের মতো অনভিজাতও নয়, একেবারে জনসমাজগতও নয়। এ হল মধ্যবর্তী স্তরের গান। সমাজের শিক্ষিত স্তরের গান। অনেক সময় এই মধ্যগা-সংগীতই উচ্চাঙ্গ সংগীত আর লোকসংগীতের মাঝখানের যোগসূত্র।

ভারতীয় সংগীত-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই তিন ধারাই— উচ্চাঙ্গ বা বিশুদ্ধ-সংগীত, মধ্যগা-সংগীত বা শিষ্ট সমাজের গান এবং লোকসংগীত বা জনসমাজের গান— অনেক কাল ধরে পাশাপাশি বয়ে চলেছে। এ দেশের উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচলিত নাম

২ অতঃপর এ প্রবন্ধে 'গান' কথাটির দ্বারা ধ্বনি ও বাণীর যৌগিক-শিল্পকেই বোঝানো হবে। অমিশ্র ধ্বনিশিল্প বোঝাবার জন্য 'বিশুদ্ধ-সংগীত' কথাটি ব্যবহৃত হবে। 'সংগীত' কথাটি সাধারণভাবে উভয়কেই একসঙ্গে বোঝানোর কাজে প্রযুক্ত হবে।

ক্লাসিক্যাল সংগীত বা রাগসংগীত। কখনো কখনো, সম্ভবত একটু ভুল করেই, একে মার্গসংগীতও বলা হয়ে থাকে। দক্ষিণের কথা বিস্মৃত হয়ে কেউ কেউ একে হিন্দুস্থানী সংগীতও বলে থাকেন।

উত্তর ভারতের বিশুদ্ধ-সংগীতের ধারাটি যেমন সুসমৃদ্ধ সেই তুলনায় এবং সেখানকার লোকসংগীতের তুলনায় মধ্যবর্তী স্তরের গানের ধারাটি লক্ষণীয় রকমের শীর্ণ। বাংলাদেশে তা নয়। এখানে লোকসংগীত এবং মধ্যবর্তী স্তরের সংগীত এই দুই ধারাই শক্তিশালী। বিশুদ্ধ-সংগীতের সন্ধান নেই। ব্যতিক্রমের মতো যদি কোথাও তাকে পাওয়াও যায়, তো সে না-পাওয়ারই সামিল। তা বাঙালির নিজের জিনিস নয়। উত্তর ভারত থেকে আমদানী-করা। বাংলাদেশের উচ্চ-নীচ সব সংগীতই গান— কথা ও সুরের যৌগিক-শিল্প।

যৌগিক-শিল্প যৌগিক বলেই যে শিল্প হিসেবে নীচু হবে, সব সময় এমন বলা যায় না। বেশির ভাগ অল্প-স্বল্প অনভিজাত ক্ষেত্রে হলেও, সব ক্ষেত্রে নয়। আসলে তুলনার কথাই ওঠে না। কেন-না যৌগিক-শিল্পের জাত আলাদা, স্বাদ আলাদা। গানের ক্ষেত্রে বলতে পারি, অভ্যস্তের কাছে তার আকর্ষণই আলাদা। যেমন বাঙালির কাছে। বাঙালি কথাকেও চায়, সুরকেও চায়, দুয়ে মিলে তবে তার কাছে গান পূর্ণ হয়।

গানে কথার আবেদন আসলে বাগর্থের আবেদন, বাচ্যার্থে ও ব্যঞ্জনার আবেদন। ঠিক যে-আবেদন কাব্যের। কথার আবেদন মানেই কাব্যগত আবেদন। কথা ও সুরের সংযোগ আসলে হল বাণীশিল্প আর ধ্বনিশিল্পের সংযোগ, কবিতা আর বিশুদ্ধ-সংগীতের যৌগিকতা। যৌগিক বলে যে অ-শিল্প তা মোটেই নয়। যৌগিক-শিল্প হলেও বাংলা গানের শিল্পত্ব আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

২

যৌগিক-শিল্প যৌগিকতার কম-বেশি নিয়ে নানা রকমের হতে পারে। নাট্যাভিনয় একটা বিচিত্র রকমের যৌগিক-শিল্প। তার মধ্যে সাহিত্য আছে, অভিনয়কলা আছে, সংগীত আছে, চিত্রশিল্পেরও দান আছে, এমন-কি তার দৃশ্য-পরিকল্পনায় স্থাপত্যেরও দান আছে। অনেকে বলবেন, প্রয়োগ-কলাই নাট্যাভিনয়কে ঐক্যে গ্রথিত করে, তাকে একটি সামগ্রিক শিল্পবস্তুতে পরিণত করে। নাট্যশিল্পে এদের সকলের গুরুত্ব নিশ্চয়ই সমান হয়, কিন্তু কে যে প্রধান, কার আপেক্ষিক গুরুত্ব কতখানি তা নিশ্চিত করে বলা সহজ নয়। তার মধ্যে আবার নাটকে-নাটকে ভেদ আছে।

গানের ক্ষেত্রে অবশ্য যৌগিকতাটা এমন বহু-শিল্পের নয়— মাত্র দুটি শিল্পের। কিন্তু সেখানেও গানে-গানে ভেদ আছে। যে-সব বিভিন্ন শিল্প-উপাদানকে সম্মিলিত করে যৌগিক-শিল্পের সমগ্রতা রচিত হয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, সমগ্রতার মধ্যে তারা সবাই তুল্যমূল্য নয়। একটিই প্রধান, অপরটি বা অপরগুলি তার অনুগামী। একটিকে আশ্রয় করেই মূল রস, অপরদের কাজ তার পুষ্টিসাধন, তার মধ্যে কিছু

স্বাদবৈচিত্র্যের সঞ্চার। গানের ক্ষেত্রেও তাই। অধিকাংশ সময়ই দেখতে পাব, গানে কথা আর সুর দুই-ই সমান প্রধান নয়। প্রায় গানেই দেখি, একটি মুখ্য, অপরটি অনুগামী। কিন্তু কোন্‌টি যে মুখ্য আর কে যে অনুগামী তার কোনো বাঁধা নিয়ম নেই। গানে-গানে ভেদ আছে। কথা বা সুরের আপেক্ষিক গুরুত্ব নানান রকমের হতে পারে। কোনো গানে কথাই মুখ্য, মূল রস কথাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে, সুর কেবল সেই কাব্যরসকে অধিকতর ব্যঞ্জনাময় করে তোলার কাজে ব্যাপৃত। আবার কখনো দেখি, ধ্বনিই রসের অবলম্বন, বাগর্থ তার মৃদু প্রতিধ্বনি মাত্র।

গানে-গানে এর নানান মাত্রাভেদ সম্ভব। বাগর্থ এমন গৌণও হতে পারে যে সে-গানকে বিশুদ্ধ ধ্বনিশিল্প বলে গণ্য করাই সংগত। যেমন অনেক হিন্দি গানে দেখতে পাই। সেখানে ভৈরবী বা ভৈরোঁ'র, বেহাগ বা বাহারের, কাফী বা কানাড়ার রাগ-রূপ প্রকাশের দিকে, তার বিশিষ্ট মেলডিক প্যাটার্নের প্রতিষ্ঠার দিকে গায়কের দৃষ্টি এতই একাগ্র যে, গানের কথার বিশুদ্ধির দিকে, তার অর্থের যথার্থতার দিকে অমনোযোগ অবশ্যম্ভাবী।

তাতে ক্ষতিও নেই। রাগরাগিণীর আত্মবিস্তারে শ্রোতার শ্রবণমন এমনভাবে আবিষ্ট যে, বাগর্থের ক্ষতিবৃদ্ধিতে তাঁর চৈতন্যে গানের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ ঘটে না। এ যেমন হয়, তেমনি কখনো কখনো ধ্বনি এমন গৌণও হতে পারে যে, সে গানকে আদৌ গান বলা যায় কি না, তা আদৌ সংগীতগোত্রের অন্তর্গত কি না, তাতেই সন্দেহ করা যায়।

কখনো কখনো এমনও হয়তো হয়, যেখানে কাব্যরস ও সংগীতরস উভয়ের মিলনটা পার্বতী-পরমেশ্বরের মিলনের মতো। অথবা বলি, অর্ধনারীশ্বরের মতো— দুয়ে-এক এবং একে-দুই।[৩] এমন যেখানে ঘটে— যদি সত্যিই এরকম ঘটা আদৌ সম্ভব হয়— সেখানে প্রধান অপ্রধানের কোনো প্রশ্নই নেই। এ মিলন পরস্পরের কাছে পরস্পরের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মিলন। যেখানে একের মধ্যে অপরের সম্পূর্ণ আত্মবিগলন ঘটে, সেই রকম মিলন।

গানে এই রকম মিলন সত্যিই সম্ভব কি না তা বিচারসাপেক্ষ। যদি সম্ভবও হয়, গান-বিশেষে তা হয়েছে কি না, তা অনুভব করা যেতে পারে, প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা দুঃসাধ্য। এ রকম মনে হতে পারে যে, কথা ও সুরের সমানাধিকারই এই মিলনের ভিত্তি। কিন্তু সে-অনুমান কতদূর তথ্য-ভিত্তিক হবে সন্দেহ আছে। সমানাধিকারের ভিত্তি ছাড়াও মিলন হতে পারে— এবং সার্থক শিল্পও হতে পারে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে তাকে অর্ধনারীশ্বর রূপ বলব কেন? বলব তাকেই, যার মধ্যে কথা ও সুর দুয়েরই সমান গৌরব।

---

৩ রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করি : "বাংলাদেশে সংগীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ।"—সংগীতচিন্তা, পৃ. ১৩৩

দু-একটি ব্যতিক্রম থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কথা ও সুরের সমান অধিকার প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাংলা গানের সচেতন বা স্বীকৃত আদর্শ কোনোকালেই ছিল না। আদর্শ যদি-বা হয়ে থাকে, তা কেবল নামেই আদর্শ। কথা ও সুরের সমান গুরুত্ব বাংলা গানের ক্ষেত্রে বাস্তব সত্য নয়। সুর যতই সুন্দর হোক না কেন, বাংলা গানে তার অধিকার সব সময়ই সীমাবদ্ধ। শিষ্ট বা মধ্যগা-সংগীতেও তাই, লোকসংগীতেও তাই। বিভিন্ন ধর্মীয় সংগীতেও তাই, অন্যান্য গানেও তাই। এ প্রসঙ্গে হয়তো কেউ কীর্তনের কথা তুলতে পারেন। ক্ষেত্রবিশেষে কীর্তনে সুরের অধিকার যে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সে অধিকার কখনোই বাগর্থের আবেদনকে ছাপিয়ে যায় নি, বাগর্থের সমকক্ষও হয় নি, গানের কাব্যগত আবেদনের প্রাধান্যকে তা কখনোই অস্বীকার করে নি।

সুরের অধিকার কথাটার বোধ করি একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। গানে কথার অধিকার যেমন আসলে কাব্যের অধিকার, সুরের অধিকার তেমনি বিশুদ্ধ-সংগীতের অধিকার। আমাদের দেশে বিশুদ্ধ-সংগীত বিভিন্ন রাগরাগিণীর মধ্যে দিয়েই বিকশিত হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে, সুরের অধিকার অর্থ রাগরাগিণীর আত্মপ্রকাশের অধিকার, বিশিষ্ট মেলডিক প্যাটার্নের রূপ-প্রতিষ্ঠার অধিকার। যন্ত্রে হোক কণ্ঠে হোক, বাণীযুক্ত হোক বাণীবর্জিত হোক, যে সংগীতে রাগরাগিণীর আত্মপ্রকাশ সম্পূর্ণ অব্যাহত, বুঝব— সুরের অধিকার সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত। সুরের পূর্ণস্বীকৃতি আমাদের দেশে ক্লাসিক্যাল সংগীতেই সম্ভব ও সার্থক হয়ে উঠেছে। একটি বিশিষ্ট ধ্বনি-প্যাটার্নকে প্রস্ফুটিত করে তোলা, মূল প্যাটার্নের ঐক্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে তার অন্তর্নিহিত বিবিধ রূপ -সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করে তোলা, শ্রোতার শ্রবণে-মনে সমগ্র ধ্বনি-রূপটিকে জীবন্ত করে তোলা, এই তো ক্লাসিক্যাল সংগীতের একমাত্র লক্ষ্য। রাগরাগিণীর অজস্র মিশ্রণ ঘটতে পারে, শাস্ত্রোক্ত রীতি-নীতির অনেক লঙ্ঘন ঘটতে পারে, পুরানো পরিচিত পথ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন রকমের সুরের প্যাটার্ন রচনা— নতুন রাগের সংরচন, তা-ও হতে পারে। তাতে সুরের অধিকার কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। প্রথারক্ষাটা লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হল শ্রবণমন-গম্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ধ্বনি-রূপের সমগ্রতাকে প্রতিষ্ঠিত ও জীবন্ত করা।

কোনো বিশেষ গানের ক্ষেত্রে সুরের অধিকার অব্যাহত আছে কি না বিচার করতে হলে দেখতে হবে, সে গানের লক্ষ্যটা কী। ধ্বনি-প্যাটার্নই যদি সে গানের চরম লক্ষ্য হয়, তা হলে তাকে ক্লাসিক্যাল বলি আর না বলি, তার ক্ষেত্রে সুরের অধিকার সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই নেই। সঙ্গে যদি কাব্য স্থান পেয়ে থাকে, তাতে আপত্তির কিছু নেই। অন্তত ততক্ষণ নেই যতক্ষণ কাব্যের টানে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হচ্ছে।

গানের ক্ষেত্রে সুরের এই রকম নিঃসপত্ন অধিকার কখনোই পুরোপুরি বজায় থাকতে পারে না। অথবা পারে মাত্র তখনই, যখন সে গান তার কাব্যগত আবেদনকে একেবারে গৌণ করে ফেলেছে। অর্থাৎ যখন সে যথার্থ গানই নয়, বিশুদ্ধ-সংগীতের বেনামদার। গানে যদি কাব্যের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, গায়কের বা

শ্রোতার মন যদি কাব্যের রসে আবিষ্ট থাকে, তা হলে সুরের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবেই।

সুরের আংশিক অধিকার কি হতে পারে না? তা হয়তো পারে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। ভালো গান কখনোই আধ-খানা কথা আর আধ-খানা সুরের যোগফল নয়; এরকম আক্ষরিকভাবে অর্ধনারীশ্বর নয়। ভালো গানে এই তো দেখি যে, তার মধ্যেকার কবিতা আরো যেন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে; সুরের সহায় পেয়ে কবিতার অধিকার যেন ষোলো-কলায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় সুরের আংশিক-অধিকারকে যথার্থ অধিকার বলা যায় কি?

বাংলা গানের ক্ষেত্রে ধ্বনি-রূপের প্রকাশ কখনোই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে নি। এমনকি অন্যতম লক্ষ্যও নয়। রাগরাগিণী যে কখনোই স্থান পায় নি তা নয়, কিন্তু রাগ-রূপকে পূর্ণ-প্রস্ফুটিত করে তোলা, এটা কখনোই বাংলা গানের অভীষ্ট নয়। হৃদয়ের যে আবেগ গানের বাণী-রূপের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে, রাগরাগিণী অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মতো সেই শকুন্তলাকেই স্ফুটতর করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। বাংলা গানে সুর কাব্যের আকৃতিকেই ব্যাপকতর গভীরতর ও তীব্রতর করে, হয়তো তাকে বহুগুণায়িতও করে, যেমন আমরা রবীন্দ্রসংগীতে দেখতে পাই। বাংলা গানে সুর কখনোই গানকে রাগরাগিণীর নিজস্ব এলাকার দিকে, রাগরাগিণীর নিজস্ব রস-রূপের দিকে টেনে নিয়ে যায় না। এরও প্রমাণ আমরা রবীন্দ্রসংগীতেই দেখতে পাব। কিন্তু সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে।

৩

চর্যাপদই বাংলা কবিতা ও বাংলা গানের প্রাচীনতম নিদর্শন। চর্যাপদের শিরোনামায় রাগরাগিণীর নাম দেওয়া আছে। সম্ভবত পদগুলি কোনো সময় রাগরাগিণীতেই গাওয়া হত। এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। যদি ধরেই নিই যে সত্যিই তাই হত, তা হলেও একটা কথা কিন্তু ভুললে চলবে না। রাগরাগিণীকে আশ্রয় করে গান গাওয়া আর রাগরাগিণীর রূপকেই প্রকাশ করা এক কথা নয়। চর্যাগীতি সাধন-সংগীত। তা স্পষ্টতই সাধন-তত্ত্ব ও সাধন-পদ্ধতির বর্ণনা। সাংগীতিক রূপ-নির্মাণ তার লক্ষ্যই নয়। সাংগীতিক আবেগের অবকাশ তার মধ্যে যৎসামান্য।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও রাগরাগিণীর নাম আছে। অনুমান করা হয়তো অসংগত নয় যে, এক সময় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও রাগরাগিণীতেই গাওয়া হত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সংগীত হিসেবে বাংলাদেশে কতখানি প্রচলিত ছিল তা আমরা জানি না। তার গীত-রীতিও আমাদের অজানা। মনে হয়, সংগীত-মূল্যের বিষয়ে চর্যা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার অনেকখানিই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কেও প্রযোজ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অবশ্য সাধন-সংগীত নয়, কিন্তু কাহিনীর আবেদন সেখানে এমনই সর্বগ্রাসী যে, সংগীতশিল্পের পক্ষে নিতান্ত গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া সেখানে আর কোনো গত্যন্তর নেই।

পদাবলী-কীর্তন সম্পর্কে কিন্তু মোটেই এ রকম বলা চলবে না। পদাবলী-কীর্তনের সঙ্গে রাগরাগিণীর ব্যবহারিক যোগ অনেক ঘনিষ্ঠতর।

তা সত্ত্বেও কীর্তনকে ক্লাসিক্যাল সংগীত বলা সংগত হবে না। তার কারণ, কীর্তনও ধর্মসংগীত। তা সাধন-সংগীতেরই নামান্তর। কেন-না কীর্তনে সংগীতই সাধনা এবং সাধনাই সংগীত। কীর্তন সংগীতের জন্য সংগীত নয়, ধ্বনি-রূপের প্রকাশ তার অভিপ্রায়েরই অন্তর্গত নয়। কীর্তনের বাণী-আশ্রিত ভাব-সম্পদ অসামান্য। এই ভাব-সম্পদের প্রকাশই তার মুখ্য লক্ষ্য।

কীর্তনের সঙ্গে রাগরাগিণীর যোগ যতই ঘনিষ্ঠ হোক, তা গ্রহণের যোগ, যথার্থ একাত্মতা নয়। রাগসংগীত এবং লোকসংগীত এই দুই দিকেই কীর্তনের দরজা খোলা। কেবল আখরের পথ দিয়েই নয়, নানা পথে নানা ভাবে তার মধ্যে লোকসংগীতের অনুপ্রবেশ বড়ো কম হয় নি। যা তার বাণী-ব্যঞ্জনার অনুকূল তাকেই সে বিনা বাধায় স্বাঙ্গীকৃত করে নিয়েছে। গীত-পদ্ধতিটি তার নিজস্ব বস্তু। ক্লাসিক্যাল গীত-পদ্ধতি তার বাণী-ব্যঞ্জনার অনুকূল নয়। ক্লাসিক্যাল গীত-পদ্ধতিকে ক্লাসিক্যাল মেজাজকে সে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেয় নি।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

> "বাংলা দেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না।...। অথচ হিন্দুস্থানী সংগীতের রাগরাগিণীর উপাদান সে বর্জন করে নি, সেসমস্ত আপন নূতন সংগীতলোক সৃষ্টি করেছে।" [৪]

নিয়েই সে অপর একটি চিঠিতে লিখেছেন—

> "কীর্তনসংগীত আমি অনেককাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর-কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানি নে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড় ...কখনো কখনো কীর্তনে ভৈরোঁ প্রভৃতি ভোরাই সুরেরও আভাস লাগে, কিন্তু তার মেজাজ গেছে বদলে— রাগরাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক।" [৫]

রবীন্দ্রনাথের নিজেরও রাগরাগিণীর রূপের প্রতি মন নেই, তাঁরও ঝোঁক ভাবের রসের প্রতিই। কিন্তু সে কথায় আমরা পরে আসছি। আপাতত তাঁর চিঠি থেকে আরো একটু উদ্‌ধৃত করি।—

> "বাঙালির কীর্তনগানে সাহিত্যে সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল...। তার মধ্যে যে বহুশাখায়িত নাট্যরস আছে তা হিন্দুস্থানী গানে নেই।" [৬]

---

৪ সংগীতচিন্তা, পৃ. ১৭৩-১৭৪

৫ সংগীতচিন্তা, পৃ. ২৩৮-২৩৯

৬ সংগীতচিন্তা, পৃ. ১৭৬

কীর্তনের উদ্‌ভব যে সময়েই হোক, তার প্রসার চৈতন্যের সময় থেকে। কিন্তু সে-কীর্তন ছিল একই সঙ্গে গীত এবং নৃত্য, ভাব-সংক্রমণ এবং সমধর্মী-সম্মেলন, ধর্মাচরণ এবং ধর্মপ্রচার। তার মধ্যে ধ্বনিশিল্পের স্বাধীন আত্মপ্রকাশের অবকাশ খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না।

প্রাচীন কীর্তন যে ঠিক কী রকম ছিল, তা বলা কঠিন। পরবর্তীকালের যে-কীর্তনের সঙ্গে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত, যে-কীর্তনের সঙ্গে ক্লাসিক্যাল রাগরাগিণীর যোগের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, কীর্তন বলতে— অন্তত উচ্চাঙ্গের কীর্তন বলতে সাধারণ আমরা এই কীর্তনকেই বুঝে থাকি। এর প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষলাভে নরোত্তম ঠাকুরের দানের কথা সর্বজনবিদিত। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী এই কীর্তনের যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে মনে হয়, এ কীর্তন রীতিমতো গুরুভার এবং অভিজাত সংগীত, অর্থাৎ অনেক পরিমাণে ক্লাসিক্যাল বস্তু। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি কাল থেকেই বৃন্দাবনের সঙ্গে, এবং সেই সূত্রে সাধারণভাবে উত্তর ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বৈষ্ণবসমাজের যোগাযোগ বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। পরে, তিন বৈষ্ণব প্রধান শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের প্রসাদে এই যোগাযোগ তখনকার মতো বেশ একটি দূর-প্রসারী সংস্কৃতি-সংযোগে পরিণত হয়েছিল। কীর্তন গানে ক্লাসিক্যাল সংগীতের অনুপ্রবেশ এই পথেই ঘটেছে।

ঘটেছে বটে, কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে নয়। রাগরাগিণী যে পরিমাণে গৃহীত হয়েছে, ক্লাসিক্যাল গীত-পদ্ধতি সে পরিমাণে নয়। তালের উৎকর্ষলাভ ঘটেছে। কিন্তু তালের ঐতিহ্য বাংলাদেশের নিজেরই। নরোত্তম-প্রবর্তিত ধ্রুপদ চালের গরাণহাটি কীর্তনই সব থেকে উচ্চাঙ্গের, সব থেকে গুরুভার কীর্তন-ধারা। পরে যে মনোহরসাহি কীর্তন-ধারার উদ্‌ভব হল তা সরলতর এবং লঘুতর। রেনেটি এবং মন্দারিণী ধারা আরো সরল এবং আরো লঘু। কীর্তন লোকসংগীত না হলেও লোকপ্রিয় সংগীত। এই লোকপ্রিয়তার টানেই তার অঙ্গের আমদানী-করা ক্লাসিক্যাল ভূষণ— তার উচ্চাঙ্গ গাম্ভীর্য— আপনা থেকেই ধীরে ধীরে তার শরীর থেকে খসে খসে গিয়েছে। রাগরাগিণী ভূষণ মাত্র নয়, তা তার বাণী-ব্যঞ্জনার পক্ষে মূল্যবান সহায়। সেইটেই স্থায়ী হয়েছে।

লোকসংগীতের কথা বাদ দিলে সাধারণভাবে এ কথা বলা যায় যে, রাগরাগিণীকে বাংলাদেশ কখনোই বর্জন করে নি। এবং ক্লাসিক্যাল গায়ন-পদ্ধতিকে কখনোই সে পুরোপুরি গ্রহণ করে নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—

> "হিন্দুস্থানী গানের রীতি যখন রাজা বাদশাদের উৎসাহের জোরে সমস্ত উত্তর ভারতে একচ্ছত্র হয়ে বসল তখনও বাঙালীর মনকে বাঙালীর কণ্ঠকে সম্পূর্ণ দখল করতে পারে নি।" [৭]

---

৭ সংগীতচিন্তা, পৃ. ১১০

পারবার কথাও নয়। তার কারণ হিন্দুস্থানী গানের রীতি বাঙালির কাব্যসংগীতের পক্ষে, গানের বাণী-ব্যঞ্জনার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অনুপযুক্ত।

মাঝে মাঝে যে-সব সময় উত্তর ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের উপলক্ষ ঘটেছে, তখনই তার সংগীত-ধারায় কিছু ক্লাসিক্যাল সংগীতের ঢেউ-এর আঘাত লেগেছে। তখনকার মতো কিছু বাহ্য ভূষণাদির আমদানি যেমন হয়েছে, তেমনি সেই-সব সুযোগে তার সংগীতে রাগরাগিণীর প্রতিষ্ঠাও কিছু দৃঢ়তর হয়েছে। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠা কখনোই তাকে তার আপন লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে, একদিকে দুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্রবিপ্লব এবং অন্যদিকে উৎসব ও ব্যসন, এই বিচিত্র সমাবেশের মধ্যে আবার এক বৃহৎ যোগাযোগের পর্ব শুরু হয়েছে, যার ফলে আমরা আধুনিক কালকে পেলাম। এর সঙ্গে সঙ্গে, লোকসংগীতে নয়, বাংলার শিষ্ট বা মধ্যগামী সংগীত ধারায়— এখন থেকে এ'কে আমরা মধ্যবিত্তের সংগীত-ধারাও বলতে পারি— এক অভিনব রূপান্তর ঘটতে শুরু করল। এর মধ্যে দিয়ে যে নতুন ধরনের গানের জন্ম হল, অদ্যাবধি তার কোনো নামকরণ হয় নি। কিন্তু যে-অর্থে মধুসূদন থেকে বাংলাসাহিত্যকে আমরা আধুনিক বাংলাসাহিত্য বলি, সেই অর্থে একেও আমরা আধুনিক বাংলা গান নাম দিতে পারি।

এর আধুনিকতা প্রধানত ভাবের ক্ষেত্রেই পরিস্ফুট। এই প্রথম বাংলা গান ভাবের দিক থেকে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক হয়ে উঠল। এই প্রথম বাংলা গান খাঁটি ব্যক্তিগত শিল্পরচনার ব্যাপার হয়ে উঠল। অন্যদিকে, এই প্রথম বাংলা গান তার গ্রামীণ চরিত্রকে পরিত্যাগ করে শহুরে শিল্প হয়ে উঠল।

৪

আধুনিক বাংলা গান ধর্মের দিক দিয়ে অসাম্প্রদায়িক হলেও সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের দিক থেকে অসাম্প্রদায়িক বলা যায় না। এ গান বাঙালি 'ভদ্রলোক'-সম্প্রদায়ের গান, শহুরে মধ্যবিত্তের গান। এই বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্ম অষ্টাদশ শতকে, পলাশী যুদ্ধের অল্পকাল আগে-পরে। এর প্রতিষ্ঠা বা যৌবনকাল উনবিংশ শতকে। প্রৌঢ়-পরিণতি বিংশ শতকের প্রথম পর্বে। আধুনিক বাংলা গানে ভাবের যে নতুনত্ব দেখতে পাই, তা এই 'নবজাগ্রত' মধ্যবিত্তসমাজেরই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন।

আধুনিক শহুরে বাঙালির গান হলেও, তার ভাব-বস্তু অভিনব হলেও, গানের চিরকালীন প্রবাহের মধ্যেই সে জন্মলাভ করেছে, হঠাৎ শূন্য থেকে পড়ে নি। সে দিক থেকে দেখলে, বাংলার বরাবরকার সংগীত-ঐতিহ্যের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ দেখতে পাব।

এটাই স্বাভাবিক। গান জিনিসটা হৃদয়ের ভাষা, তার উৎসার চৈতন্যের মর্মমূল থেকে। তার পক্ষে হঠাৎ বিজাতীয় হয়ে ওঠা— এমন-কি হঠাৎ একেবারে সর্বাঙ্গীণভাবে

অভিনব হয়ে ওঠা— খুব সহজ নয়। চিন্তা বা আইডিয়ার ক্ষেত্রে স্বদেশী-বিদেশীর ভেদ সব সময় তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু গান তো বিশুদ্ধ আইডিয়া নয়, গানের ভাবও বিশুদ্ধ চিন্তা নয়, তার পক্ষে আপন-পরের ভেদ সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ। গানের পক্ষে রাতারাতি কায়মনবাক্যে আধুনিক হয়ে ওঠা— ছিন্নমূল আধুনিকতার অধিষ্ঠিত হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার।

অনেক দিক থেকে আধুনিক হলেও, নতুন কালের বাংলা গান সম্পূর্ণভাবে পূর্বসূত্রহীন নয়। ভাব রূপ ও সুরের দিক থেকে তার মধ্যে আমরা তিনটি বিশিষ্ট প্রভাবের সংযোগ দেখতে পাই।

এক, বাংলার নিজস্ব সংগীত-ধারার প্রভাব। এক দিকে পদাবলী কীর্তন পালা কীর্তন শ্যামাসংগীত ও অন্যান্য সুমার্জিত কাব্যসংগীত, আর অন্যদিকে বাউল প্রভৃতি গোষ্ঠীগত এবং অন্যান্য নানা ধরনের লোক-সংগীত, এই উভয়ের দানে এ গান পুষ্ট। কিন্তু এ'কে প্রভাব না বলে জাতীয় উত্তরাধিকার বলাই সংগত।

দুই, হিন্দুস্থানী ক্লাসিক্যাল সংগীতের প্রভাব। অন্য ক্ষেত্রে নয়, শুধু সুরের ক্ষেত্রে। এও জাতীয় উত্তরাধিকারই বটে। বাংলার একেবারে নিজস্ব জিনিস না হলেও সুদীর্ঘকালের সান্নিধ্যের ফলে এও বাঙালির আপনার হয়ে গিয়েছে।

এর দুটোই পুরানো, কিন্তু তৃতীয়টি সম্পূর্ণ নতুন। এইটেই বিশিষ্টভাবে আধুনিক। এ হল গানের ভাবের দিক। এই ভাবের উৎস শহুরে বাঙালির নতুন জীবনযাত্রায়, নতুন শিক্ষাদীক্ষায়, নতুন জীবন দর্শনে। এই ভাব আধুনিক জীবনের সেকুলারিটি, ব্যক্তিতান্ত্রিকতা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বাংলা গানে ভাব যেহেতু বরাবরই তার রূপকে অনেকখানি পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে আসছে, সেই কারণে আধুনিক বাংলা গানের রূপ-রীতিও অনেকখানি পরিমাণে এই ভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে আরম্ভ করেছে।

অন্যদিক থেকে দেখলে, এই আধুনিক ভাবকে আমরা রোমান্টিক ভাব বলেও আখ্যা দিতে পারি। সেদিক থেকে আধুনিক বাংলা গান রোমান্টিক স্বভাবের গান। এ রোমান্টিকতা সমকালের বাংলা সাহিত্যের সুপরিব্যাপ্ত রোমান্টিকতারই নিকট-আত্মীয়।

বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ের এই আধুনিক গানের পাশাপাশি বাংলাদেশে আরো কয়েকটি গানের ধারা ছিল। তার একটি, যা সকল কালেই ছিল এখনও আছে, সে হল বাংলায় লোকসংগীতের ধারা। যেমন— সারি জারি ভাটিয়ালী, কি টুসু ভাদু ঝুমুর, কিংবা গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, নানা রকমের আনুষ্ঠানিক গান, মেয়েলী গান— এই সব। বাউল, দরবেশী প্রভৃতি জনজীবনাশ্রিত সাম্প্রদায়িক গানকেও আমরা এই ধারার অন্তর্গত বলে ধরতে পারি।

এ যেমন ছিল, তেমনি অন্যদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল কবিগান যাত্রা পাঁচালী তরজা ইত্যাদি। এরা আধা-শহুরে আধা-গ্রাম্য। এরা লোকসংগীত নয়, কিন্তু লোকজীবনের

নিকটবর্তী। শহুরে সংগীতও নয়, কিন্তু প্রধানত শহরের পৃষ্ঠপোষকতাতেই পরিপুষ্ট। পাশাপাশি প্রবাহিত শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ের গানের সঙ্গে— অন্তত তার উন্মেষকালের প্রাথমিক প্রকাশের সঙ্গে— এ ধারার অনতিপ্রচ্ছন্ন যোগ অনেকেরই নজরে পড়ে থাকবে।

আরো একটি ধারা ছিল। সেটি হল আমদানী-করা ক্লাসিক্যাল ধারা। বলতে পারি নকল-দরবারী ধারা। সকলেই জানেন, উত্তর ভারতের ক্লাসিক্যাল সংগীত মুখ্যত রাজসভার সংগীত— দরবারী-সংগীত। তা ছিল নবাব, রাজা ও ভূস্বামীদের প্রসাদপুষ্ট। বাংলাদেশের কোনো বিশিষ্ট দরবারী ঐতিহ্য কোনোকালেই গড়ে ওঠে নি। যেটুকু ছিল, তা-ও মোগল আমলে ছিন্নভিন্ন এবং তার পর পলাশীর পরে আরো বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তা হলেও, তার সবটাই একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় নি। এখানে-ওখানে যে দু-একটি টুক্‌রো অবশিষ্ট ছিল তাদের আশ্রয় করে, এবং হঠাৎ-বড়োলোক নতুন-অভিজাতদের আশ্রয় করে শহরে-বাগানবাড়িতে কিছু নতুন দরবার গজিয়ে উঠছিল। বাংলা দেশে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের ক্লাসিক্যাল সংগীতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল এইসব দরবার বৈঠকখানা জলসাঘর বাগানবাড়ি। বাঁধা হিন্দুস্থানী ওস্তাদও থাকত, আবার উপলক্ষ-বিশেষে উত্তর-ভারত থেকে ওস্তাদদের শুভাগমনও ঘটত। আর ছিল নিত্য এবং নৈমিত্তিক, আবাসিক এবং অভ্যাগত বাঈজীর দল। ধ্রুপদও চলত, টপ্পা-ঠুংরিও কম চলত না।

এ গান বাংলার গান নয়, বাংলা গানও নয়। এর ভাষা হিন্দি, গীত-পদ্ধতিও সম্পূর্ণই উত্তর ভারতের। বাংলাদেশের সঙ্গে এ গানের ধারায় কখনোই কোনো প্রাণের সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি।

কিন্তু একেবারে কোনো সম্পর্কই ছিল না বললে একটু বাড়িয়ে বলা হবে। সেকালের কলকাতার আখড়াই গান এই আদর্শেরই বৈঠকী গান, তার মানটা হয়তো একটু নীচু। হাফ-আখড়াইও খানিকটা তাই। তার মান অনেকখানি নীচু। তখনকার দিনের আধুনিক বাংলা গানের সঙ্গেও এর একটা পরোক্ষ যোগ ছিল। যে যোগ রাগরাগিণীরও সঙ্গে পরিচয়-স্থাপনের যোগ, আহরণের যোগ।

ইতিহাসের নিয়মেই এই আমদানী করা ক্লাসিক্যাল ধারা ধীরে ধীরে শুকিয়ে এসেছে।[৮]

কিন্তু কোথাও কোনো পলি রেখে যায় নি বললে কিংবা সেই পলির মূল্যকে খুব ছোটো করে দেখলে নিশ্চয়ই ভুল করা হবে। তার কারণ এ পলি একদিনের নয়। অন্তত ষোড়শ শতক থেকেই এই সঞ্চয়ের সূত্রপাত হয়েছে। অল্পপরিসর ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও, এর মধ্যে থেকেই বাঙালির নিজস্ব-ধরনের দু-একটি ক্লাসিক্যাল ঘরানারও উদ্‌ভব ঘটেছিল। যেমন বিষ্ণুপুর ঘরানা। এই প্রক্রিয়া আধুনিককালের মুখে

---

৮ সম্প্রতি বাংলাদেশে ক্লাসিক্যাল সংগীতচর্চার নতুন উদ্যম দেখা যাচ্ছে। এর সঙ্গে সেকালের দরবারী গানের ইতিহাসের দিক থেকে কিছু যোগ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে যোগ যৎসামান্য।

এসেও একেবারে থেমে যায় নি। এই প্রসঙ্গে কলকাতার ঠাকুরবাড়ির কথা যদি উল্লেখ করি, এমন-কি রবীন্দ্রনাথের নামও যদি উল্লেখ করি, খুব বেশি ভুল হবে না।

ইতিহাসের দিক থেকে আধুনিক বাংলা গানকে আমরা তিনটি পৃথক পর্যায়ে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথম পর্যায়টা এর উন্মেষের কাল। আরম্ভের দিকটা স্বভাবতই অস্পষ্ট ও অনতিব্যক্ত। এই পর্যায়ের গানের মধ্যে নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রমুখ গীতকারদের প্রণয়-সংগীতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিধুবাবুর টপ্পা খাঁটি উত্তর ভারতীয় টপ্পা নয়, তা টপ্পা হয়েও বাঙালির টপ্পা। কবিগান পাঁচালী প্রভৃতি পাঁচ-মিশেলী গানকেও এ-ধারা থেকে একেবারে বাদ দেওয়া যাবে না।

আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্যায়েই ভাবের আধুনিকতার যথার্থ প্রতিষ্ঠা। এইখানে এসে বাংলা গানে সেকুলারিটি স্পষ্ট হয়েছে, নাগরিক বৈদগ্ধ্য স্ফুটতর হয়েছে, ব্যক্তিমনের সংস্পর্শ নিবিড় হয়েছে। এইখানে এসে বাংলা গানের রোমান্টিকতা ও শৈল্পিক আত্মচেতনা প্রখর হয়ে উঠেছে। এ পর্যায়ের গানের প্রথম প্রতিষ্ঠা বাংলা থিয়েটারে। পরে আসরে-বাসরে, গ্রামোফোন-রেকর্ডে, ঘরোয়া পরিবেশে, একলা ঘরে। এই পর্যায়ের সব থেকে উল্লেখযোগ্য নাম, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ।

এই পর্বের একটি বিশেষত্ব এখানে উল্লেখ করার মতো। সে হল বাংলা গানে পাশ্চাত্য-সংগীতের অনুপ্রবেশচেষ্টা। অপর উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বটি অবশ্য অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। তা হল লোকসংগীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংযোগস্থাপন। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিমেয়। দুঃখের কথা, ভাবীকালের বাংলা গানের পক্ষে এই দানের গুরুত্ব আমরা আজও ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি নি।

দ্বিতীয় পর্বে অবসান না ঘটতেই আধুনিক বাংলা গানের তৃতীয় পর্ব এসে উপস্থিত হয়েছে : হাল আমলের বাংলা গানের পর্ব। সিনেমা, রেডিও, বিচিত্রানুষ্ঠান ইত্যাদির প্রসাদে এ গান আজ জনপ্রিয়তার শিখরে।

চলতি কথায় কেবল এরই নাম 'আধুনিক বাংলা গান'। প্রয়োগটা এমনই প্রচলিত যে অপপ্রয়োগ হলেও এ নামকে এখন আর অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই। শুধু এইটুকু স্মরণ রাখতে হবে যে, এর মধ্যে এমন কোনো নতুন গুণের সঞ্চার হয় নি যার কারণে একে আলাদা করে আধুনিক বলে চিহ্নিত করা যায়। এর যা-কিছু নতুনত্ব সবই ঋণাত্মক, সবই বিয়োগ-বিচ্ছেদের ফল। রাগরাগিণীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, বাংলার সংগীত ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ, পূর্বসুরীদের সৃষ্টির সঙ্গে বিচ্ছেদ। বোধ করি নিজের বাঙালিত্বের সঙ্গেও বিচ্ছেদ।

৫

এইবারে রবীন্দ্রসংগীতের প্রসঙ্গ।

কীর্তনাদি পূর্বকালের কাব্যসংগীতের সঙ্গে রাগরাগিণীর ব্যবহারের দিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতের খুব বড়ো রকমের কোনো পার্থক্য নেই। যেটুকু আছে তাকে মৌলিক

বলা যায় না। স্টাইলের পার্থক্যটা কিন্তু বেশ বড়ো রকমেরই। কীর্তন গোষ্ঠীগত সংগীত, বড়ো আসরের উপযোগী। রবীন্দ্রসংগীত একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথেরই। তা আত্মগত, অন্তরঙ্গ গুঞ্জনের মতো। কীর্তনের সুর ও প্রকাশ-পদ্ধতি উচ্ছলিত আবেগ-প্রকাশের অনুকূল, তার রূপ আবেগের বিস্তারের দ্বারা নিরূপিত। রবীন্দ্রসংগীতে আবেগ গানের রূপগত ঐক্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তার প্রকাশে কঠিন সংযম।

আরো বড়ো তফাত ভাবের ক্ষেত্রে। এ তফাত একেবারে মৌলিক। ভাবের পার্থক্যই উভয় সংগীতের মধ্যে অনেকখানি রূপের পার্থক্য এনে দিয়েছে।

প্রচলিত অর্থে নয়, ঐতিহাসিক অর্থে যাকে আধুনিক বাংলা গান বলছি, তার সঙ্গে সুর বা ভাব কোনো দিক থেকেই রবীন্দ্রসংগীতের কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। তবু পার্থক্য অনেক। এ পার্থক্য প্রধানত স্টাইলের, রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার। এ পার্থক্যের উৎস রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের অসামান্য দীপ্তিতে।

আরো পার্থক্য আছে। তা হল উৎকর্ষের পার্থক্য। অসাধারণ উৎকর্ষের কারণেই রবীন্দ্রসংগীত অনন্য, দোসরহীন।

কিন্তু গোত্র-পরিচয়ের দিক থেকে দোসরহীন নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের গান যে গোত্রের, অতুলপ্রসাদের গান যে গোত্রের, নজরুলের গান যে গোত্রের, রবীন্দ্রনাথের গানও সেই একই গোত্রের। রবীন্দ্রকাব্য যেমন দ্বিতীয়-রহিত হয়েও আধুনিক বাংলা কাব্যধারারই অন্তর্গত, রবীন্দ্রসংগীতও তেমনি দ্বিতীয়-রহিত হয়েও আধুনিক বাংলা গানের ধারারই অন্তর্গত।

রবীন্দ্রসংগীতের উৎকর্ষের বিশিষ্ট পরিচয় পেতে হলে তিনটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের তিনটি ভিন্ন রকমের কৃতিত্বের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এক, সুরের ক্ষেত্রে। একদিকে ক্লাসিক্যাল রাগরাগিণীর বিপুল বৈভবকে এবং অন্যদিকে লোকসংগীতের সরল নিরাভরণ সুরগুলিকে, তার সহজ লাবণ্যকে সম্পূর্ণভাবে সাঙ্গীকৃত করে নেবার কৃতিত্বের দিক। দুই, বাণীর ক্ষেত্রে। গানের বাণী-অঙ্গের অসামান্য রসাত্মকতার দিক। আর তিন হল সুর ও বাণীর সমন্বয়ের দিক। সংগীত ও কাব্য এই দুই ভিন্ন শিল্পের ভিন্ন ধরনের রসাবেদনকে এক করে দেবার দিক।

প্রথম দুটি দিক নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু তৃতীয় ক্ষেত্রটি নিয়ে একটু প্রশ্ন উঠতে পারে। দুই ভিন্ন শিল্পের স্বতন্ত্র রসাবেদন কোন্ ভিত্তিতে মিলে এক হয়ে যেতে পারে?

রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুরের মিলন ঘটেছে, এই সত্যটাকে অস্বীকার করি না। কিন্তু এ মিলন সমান-অধিকারের ভিত্তিতে নয়। এ মিলন কথার প্রাধান্যের ভিত্তিতে, কাব্য-রূপের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। এইটেই বাংলা গানের চিরকালের লক্ষ্য। এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন পূর্বে কখনো সম্ভব হয়েছিল কি না জানি না। এটা জানি যে, মিলনের ভিত্তিটা চিরকালই এক রকম।

সুরের দ্বারা কথা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, সুরের প্রয়োজনে গানের রূপ নিরূপিত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রসংগীতের বিরাট ভাণ্ডারে যৎসামান্য। প্রথম দিকের শিক্ষানবিশী

পর্বে বিলিতি সুরের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে কথা বসাবার সাধনায় এবং পরে হিন্দি-ভাঙা কিংবা দক্ষিণী গানভাঙা সুরের দু-পাঁচটি গানে ছাড়া আর কোথাও এ-রকম দৃষ্টান্ত বিশেষ পাওয়া যাবে না। বিপরীত দৃষ্টান্তই সর্বত্র মিলবে।

রবীন্দ্রসংগীত বাণীশিল্প ও ধ্বনিশিল্প এই দুয়ের মিলন-সঞ্জাত যৌগিক-শিল্প। কিন্তু, আবার বলি, এ যৌগিকতা দুই শিল্পের সমানাধিকারের যৌগিকতা নয়। বাংলা গানের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

> "বাঙালির চিত্তবৃত্তি প্রধানত সাহিত্যিক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই...।" [৯]
> রবীন্দ্রসংগীত বাঙালির চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক পথকেই বেছে নিয়েছে। এর রসও প্রধানত সাহিত্যরস। তবে অমিশ্র সাহিত্যরস নয়, সংগীতসমন্বিত সাহিত্যরস।

গান যে কথা-প্রধান আর সুর-প্রধান দুরকমই হতে পারে এবং এ দুই যে রসের দিক থেকে পরস্পরের বিপরীত, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণমাত্রায় সচেতন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

> "সত্যের খাতিরে এ কথা মানতেই হবে যে, বিশুদ্ধ সংগীতে হিন্দুস্থান বাংলাকে এগিয়ে গেছে। যন্ত্রসংগীতে তার প্রধান প্রমাণ পাওয়া যায়। যন্ত্রসংগীত সম্পূর্ণই সাহিত্যনিরপেক্ষ।... পরজ রাগিণীতে একটা হিন্দি গান জানতুম, তার বাংলা তর্জমা এই : কালো কালো কম্বল, গুরুজি, আমাকে কিনে দে, রাম-জপনের মালা এনে দে আর জল পান করবার তুম্বী।
>
> ঐ ফর্দে উদ্‌ধৃত ফর্মাশী জিনিসগুলিতে সে সুগভীর বৈরাগ্যের ব্যঞ্জনা আছে পরজ রাগিণীই তা ব্যক্ত করবার ভার নিয়েছে। ভাষাকে দিয়েছে সম্পূর্ণ ছুটি। আমি বাঙালি, আমার স্কন্ধে নিতান্তই যদি বৈরাগ্য ভর করত, তবে লিখতুম—
>
> গুরু, আমায় মুক্তিধনের দেখাও দিশা।
> কম্বল মোর সম্বল হোক দিবানিশা।
> সম্পদ্ হোক জপের মালা
> নামমণির-দীপ্তি-জ্বালা,
> তুম্বীতে পান করব যে জল
> মিটবে তাহে বিষয়তৃষা।
>
> কিন্তু এ গানে পরজ তার ডানা মেলতে বাধা পেত। পরজ হত সাহিত্যের খাঁচার পাখি।" [১০]

বাঙালির গানে ভাব-প্রকাশের ভার রাগিণীর উপর নয়, সাহিত্যের উপর! রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

> "বাঙালি গাইলে—
>
> ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসি নে
> আমার যে ভালোবাসা তোমা বই আর জানি নে।...

---

৯ সংগীতচিন্তা, পৃ. ১৭৪

১০ সংগীতচিন্তা, পৃ. ১৭৪-১৭৫

> যা-কিছু বলবার, আগেভাগে তা ভাষা দিয়েই ব'লে দিলে, ভৈরবী রাগিণীর হাতে খুব বেশি কাজ রইল না।
>
> বাঙালির এই স্বভাব নিয়েই তাকে গান গাইতে হবে।..."[১১]

শেষের কথাটার একটা বাড়তি তাৎপর্য আছে। কেন-না রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাঙালির এই স্বভাব নিয়েই গান গেয়েছেন, তাঁর নিজের গানেও বাঙালির সাহিত্যিক চিত্তবৃত্তিরই জয় হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য একাধিক বার এ কথাও বলেছেন, বেশ জোর দিয়েই বলেছেন যে, গানে সুরের গৌরবকে কথার গৌরবের চেয়ে হীন করলে চলবে না। কিন্তু বললে কী হবে? বাঙালির স্বভাব যে গানে রাগরাগিণীর হাতে খুব বেশি কাজের ভার ছেড়ে দেয় নি, এ-ও তো তিনি নিজেই বলেছেন। তাঁর নিজের গানের ক্ষেত্রেও কি আমরা এই জিনিসই দেখতে পাই না?

একটু আগেই আমরা দেখলাম, রবীন্দ্রনাথ পরজ রাগিণীতে একটি হিন্দি গানের প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সেখানে ভাবের ব্যঞ্জনাকে ব্যক্ত করবার ভার পরজ রাগিণীর নিজের, 'ভাষাকে দিয়েছে সম্পূর্ণ ছুটি'। ওই একই বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে 'গুরু আমায় মুক্তিধনের'— ইত্যাদি গানটি রচনা করে মন্তব্য করেছেন, এ গানে পরজ হত সাহিত্যের খাঁচার পাখি। অর্থাৎ এখানে ভাবের ব্যঞ্জনাকে ব্যক্ত করার পুরো ভার সাহিত্যের। এখানে পরজকেই ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাই যদি হয়, তা হলে একই গানে রাগিণী আর কাব্য সমান গৌরবের ভিত্তিতে মেলে কী করে?

এ-ও তো ঠিক যে পরজ যা ব্যক্ত করে, কোনো কবিতার সাধ্য নেই ঠিক সেই জিনিসকে ব্যক্ত করার। কবিতা যা বলতে পারে, কোনো পরজ কখনোই অবিকল সেই জিনিস বলে না, বলতে পারে না। দুয়ের রসরূপ এত ভিন্ন যে একটা আর-একটার বিকল্প কখনোই হতে পারে না। উভয়ে একসঙ্গে হাজির হলে মনকে শ্যাম অথবা কুল একটিকেই বেছে নিতে হবে। আর জোর যদি দুয়েরই সমান হয়, তাহলে শিল্পের শিল্পগত ঐক্যই নষ্ট হয়ে যাবে।

কথা ও সুরের মিলন অতি সুলভ উক্তি। কিন্তু ব্যাপারটাকে একটু ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার। মিলন হয় না, এমন কথা বলতে চাই না। আপাতত আমাদের প্রশ্ন মিলনের ভিত্তি নিয়ে, মিলনের চরিত্র নিয়ে। পূর্বেই এ প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে। এখানে তারই জের টেনে আমাদের বক্তব্যকে আর-একটু বিশদ করতে চেষ্টা করব।

সংগীতের আবেদন থেকে শুধু যে কবিতারই আবেদন ভিন্ন তা নয়, সংগীতের মধ্যেই রসাবেদনের অসংখ্য বৈচিত্র্য আছে। আমাদের দেশের রাগরাগিণীগুলির প্রত্যেকেরই সাংগীতিক আবেদনের নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে। ভৈরবীর রসাবেদন বেহাগের রসাবেদন থেকে ভিন্ন, রামকেলির রসাবেদন ছায়ানটের থেকে ভিন্ন,

---

১১ সংগীতচিন্তা, পৃ. ১৭৫-১৭৬

ভৈরোঁ-র রসমূর্তি আর পূরবীর রসমূর্তিতে মিল হবে না। মিল নেই বটে, কিন্তু আত্যন্তিক দূরত্ব না থাকলে কখনো কখনো পরস্পরের সঙ্গে মিলতেও পারে। মিলতে পারে, তার কারণ মিলনের ভিত্তিটা সাংগীতিক।

রাগরাগিণীর আবেদনের বিশিষ্টতা যে ঠিক কী, তা আর-কিছু দিয়ে বোঝানোর উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ ভাষা দিয়ে এই বিশিষ্টতার কিছু আভাস দিতে চেষ্টা করেছেন। যেমন—

> "...পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা; কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি; ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহ বেদনা...!" [১২]

ধরে নিতে পারি, যে-গানে ভৈরবী রাগিণী খাটবে, সেখানে পরজ বা কানাড়া খাটবে না। যার সঙ্গে পরজের মিল হবে, তার পক্ষে পরজ— এবং একমাত্র পরজই অনিবার্য। রবীন্দ্রসংগীতে অধিকাংশ সময়ই আমরা এই রকম একটা অনিবার্যতার ভাব অনুভব করি। কিন্তু সব সময় নয়।

কথা আর সুরের মিলন যদি সত্য হয়, তাহলে বুঝতে হবে, বিশেষ কথা বিশেষ সুরকেই চায়, আর কাউকেই নয়। রবীন্দ্রনাথ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কথার আবেদনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে রাগিণী নির্বাচন করেছেন। কিন্তু এই সমতা পরিমাপ করবার কোনো নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নেই, যন্ত্র নেই। সমতা হল কি হল না, কখনোই নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যাবে না। একটা মোটামুটি ধরনের সমতা হয়তো অনেক সময়ই অনুভব করা যায়। কিন্তু তা খুব অনিবার্যতার প্রমাণ দেয় না। রবীন্দ্রনাথ ভৈরবীতে বীররসের গানও রচনা করেছেন, বাগেশ্রীতে বর্ষার গানও রচনা করেছেন। একই রাগিণীতে এমন বিভিন্ন ধরনের গান রচনা করেছেন যাদের কাব্যগত আবেদন একের সঙ্গে অপরের কিছুমাত্র মিল নেই। কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি!—

'ভয় হতে তব অভয় মাঝে' আর 'বলি ও আমার গোলাপবালা' এই গান দুটির, অথবা ধরা যাক, 'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে' আর 'বিরহ মধুর হল আজি' এই গান দুটির কথার আবেদন নিশ্চয়ই আলাদা। কিন্তু সুরের আবেদন চারটি গানেরই মোটামুটি একরকম, চারটি গানই বেহাগ রাগিণীতে বাঁধা। 'সার্থক জনম আমার' 'ঝরা পাতা গো' আর 'জীবনের পরম লগন' অথবা 'নীলাঞ্জন ছায়া', এদের কাব্যগত রসরূপ পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সুরে এতটা দূরত্ব নেই, চারটিই ভৈরবী। 'অল্প লইয়া থাকি' আর 'আয় তবে সহচরী' দুটিই ছায়ানট। অথচ বাণী-ব্যঞ্জনায় এরা কত পৃথক! 'রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি' আর 'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত', দুই-ই খাম্বাজ। কথার দিক থেকে দেখলে, 'হৃদয়ে ছিলে জেগে' এক রকমের, আর 'বাদল বাউল বাজায়' সম্পূর্ণ আর-এক রকমের। কিন্তু সুর দুয়েরই গৌড় সারং-য়ে বাঁধা। 'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে' আর 'এসো শরতের অমল মহিমা' রাগিণীর রূপে এক

---

১২ সংগীতচিন্তা, পৃ. ৫৩-৫৪

হয়েও কাব্য-আবেদন কত স্বতন্ত্র! 'আমারে কর জীবন দান' আর 'কাঁদিতে হবে রে পাপিষ্ঠা' ভাবে কত আলাদা আর সুরে কত নিকট! রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কেদারা'র গান, বিভিন্ন পিলু'তে-বাঁধা-গান ভাব-ব্যঞ্জনায় প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র। 'কত অজানারে জানাইলে তুমি' এ-ও হাম্বীর, আবার 'মধ্য দিনে যবে গান', এ-ও সেই হাম্বীর। এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। অনিবার্যতার দাবি খণ্ডন করবার পক্ষে যে-কোনো একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

বিশেষ কথা যদি বিশেষ সুরেরই অপেক্ষা করবে, তাহলে এক-গানের মাত্র এক-রকমই সুর হত। রবীন্দ্রনাথ একই গানে একাধিক বিকল্প সুরও বসিয়েছেন। সেই বিকল্প সুরগুলির মধ্যে চরিত্রের মিল নেই। একটি হয়তো রাত্রে গাইবার, একটি ভোরে। যেমন, 'বাজাও আমারে বাজাও'। এই-সব গানের যখন যেটিকে যে-সুরে গাওয়া হয়, তখন সেইটিকে অনিবার্য বলে মনে হয়। এটা প্রকৃত অনিবার্যতার প্রমাণ নয়, সুরকারের অসাধারণ ক্ষমতারই প্রমাণ।

কবিতা হিসেবে দেখলে রবীন্দ্রনাথের কোনো গানেই রসের মধ্যে কোনো দ্বিত্ব বা বহুলত্ব নেই, সব গানই কাব্য-আবেদনে অখণ্ড একক। সুরের ক্ষেত্রে কিন্তু সব সময় তা দেখি না। যেমন 'হে নিরুপমা'-গানটি। এর ভাবে নিটোল ঐক্য, কিন্তু সুরে এক-এক স্তবকে এক-এক রাগিণী— মিশ্র বসন্ত, মিশ্র রামকেলি, সিন্ধু, দেশ। কিংবা, ধরা যাক, 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে' গানটি। এর সুরে কখনো খাম্বাজ, কখনো পরজ, কখনো কালাংড়া। বাণীকে আশ্রয় করে যে ভাবটি অভিব্যক্ত হয়েছে, সে কিন্তু অকম্পিত শিখার মতো একটিমাত্র সুস্থির কেন্দ্রেই অবিচল।

রবীন্দ্রনাথ বাণীর প্রয়োজনে রাগরাগিণীর ইচ্ছামতো মিশ্রণ ঘটিয়েছেন; ইচ্ছামতো রাগমালা গ্রথিত করেছেন; রাগরাগিণীগুলিকে তাদের আপন-আপন প্রথাসিদ্ধ প্রচলিত ভাবভূমি থেকে সরিয়ে, বাগর্থের সঙ্গে তাদের সমতা ঘটিয়ে, সম্পূর্ণ ভিন্নতর ভাবভূমিতে এনে তাদের বসিয়ে দিয়েছেন। তাঁর অসামান্য প্রতিভার সম্মোহনে রাগরাগিণীরা সানন্দে কাব্যের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। যাকে আমরা কথা ও সুরের মিলন বলি, রাগরাগিণীর এই আত্মস্বার্থ-বিসর্জনের মধ্যে দিয়েই তা রবীন্দ্রসংগীতে সম্ভব হয়ে উঠেছে।

এ চেষ্টা পূর্বে কখনো হয় নি এমন বলি না। বস্তুত, এইটেই বাংলা গানের বরাবরের লক্ষ্য। কিন্তু এতখানি সিদ্ধি এতাবৎ অলব্ধ ছিল। এ সিদ্ধি কেবল কবিত্বশক্তির গুণে হয় না। সুরকে দিয়ে এমনভাবে নিজের কাজ করিয়ে নেওয়া সাধারণ সুরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু রাগরাগিণীর ক্ষেত্রে নয়, লোকসংগীতের সুরকে এমন অনায়াসে নিজের করে নেওয়ার, নিজের মতো করে ব্যবহার করার ক্ষমতাও সুরকারের অসাধারণত্বেরই পরিচায়ক।

এই অসাধারণ শক্তির কারণেই রবীন্দ্রসংগীতকে পৃথক জাতের গান বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা সুরকারের ক্ষমতারই নিদর্শন, গোত্রগত স্বাতন্ত্র্যের নয়।

সুরের প্রশ্নটাও অবশ্য খুবই জরুরি। স্মরণ রাখতে হবে যে, কথার প্রাধান্য থাকলেও, রবীন্দ্রসংগীত কখনোই কবিতামাত্র নয়। তা যদি হত তাহলে তাকে যৌগিক-শিল্প বলতাম না। সব কবিতাতেই সুর বসানো যায় না। যদি বা যায়ও, সুরের সংযোগ ঘটলে তা আর সেই কবিতা থাকে না। কবিতা, বিশুদ্ধ-সংগীত আর গান, তিনটিই স্বতন্ত্র শিল্প, প্রত্যেকের স্বাদ আলাদা। রবীন্দ্রসংগীত কবিতা হয়েও গান, এবং যখন গান হিসেবে তাকে গ্রহণ করছি, সেই মুহূর্তে সে একেবারেই কবিতা নয়, খাঁটি গান। সুরের শক্তিতে কবিতা গান হয়। প্রাধান্য যারই থাক্, সুরের সংযোগ ঘটলেই তা সেই ইন্দ্রজালে পরিণত হয়, যা কেবল গানেরই ইন্দ্রজাল, আর কারো নয়।

আরো একটা কথা এখানে স্মরণ রাখা দরকার। সুরকে নিজের কাজে খাটানো আর সুরকে অবহেলা করা মোটেই এক জিনিস নয়। প্রাধান্য যারই হোক, সুরকে অবহেলা করার উপায় নেই। কাব্যসংগীতেও না। কথা যদি দুর্বল হয়, তাতে কাব্যসংগীত অবশ্যই দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু সে গানে যদি সুরের সম্পদ থাকে, তাহলে কথার অনেক দুর্বলতা ঢাকা পড়ে যায়। মাত্র কথার দুর্বলতায় গানের ভরাডুবি ঘটে না। অতুলপ্রসাদ অথবা নজরুলের কিছু কিছু বিখ্যাত গানেও এর প্রমাণ মিলবে। অপর অনেক গীতকারের গানেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যাবে। সে-সব ক্ষেত্রে গানের ক্ষতি হয়েছে বটে, কিন্তু ভরাডুবি হয় নি। অপর পক্ষে, সুরের দুর্বলতায় গানের ভরাডুবি, তা সে যে জাতেরই গান হোক। এর সব থেকে প্রত্যক্ষ উদাহরণ আজকের দিনের 'আধুনিক' বাংলা গান।

সুরের দৈন্যে গানের দৈন্য যতখানি অবশ্যম্ভাবী, কথার দৈন্যে ততখানি নয়। গানের ধ্বনিমূল্যের এই অপরিহার্যতা, সুরের সমৃদ্ধির সঙ্গে গানের উৎকর্ষের এই যে অত্যাগসহন সম্পর্ক, এ থেকে বোধকরি এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, যতই যৌগিক-শিল্প হোক, গান জিনিসটা শেষ পর্যন্ত ধ্বনিশিল্পেরই সগোত্র, কবিতার নয়। কাব্যের সম্পদ গানকে প্রায়শই ঐশ্বর্যশালী করে বটে, কিন্তু অনেক সময় তাকে স্বধর্ম-ভ্রষ্টও করে ফেলতে পারে। অতিরিক্ত কাব্যধর্মিতা তার পক্ষে— অন্তত গান হিসেবে তার পক্ষে— সবসময় হিতকর নয়। বাঙালির স্বভাব অনেক সময় তার গানকে যে পথে চালিত করেছে, তা ঠিক ধ্বনিশিল্পের পথ নয়, এমনকি যৌগিক-শিল্পেরও পথ নয়, তা কাব্যধর্মিতারই পথ। এই কাব্যধর্মিতার পথে গানের যে সিদ্ধি, তা সন্দেহজনক সিদ্ধি। কখনো কখনো তা বিপজ্জনক সিদ্ধি। অবশ্য, বিপজ্জনক হলেও তা যে মহৎ সিদ্ধি হতে পারে, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গানকে দিয়ে যে অসাধ্যসাধন করিয়েছেন, এ কেবল তাঁর মতো সুরসিদ্ধ মহাকবির পক্ষেই সম্ভব, সকলের পক্ষে নয়।

৬

আজকের দিনের বাংলা গান যে একেবারে ভরাডুবির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, সুরের দৈন্যই এর প্রধান কারণ। এর মূলে এক দিকে আছে রাগসংগীতের সঙ্গে অপরিচয়, অন্য দিকে আছে লোকসংগীতের সঙ্গে বিচ্ছেদ। কী ভারতীয় ঐতিহ্য, কী অভিজাত সংগীত-সংস্কৃতি, কী লৌকিক দেশজ সংগীত-সংস্কৃতি, সকল সংস্কৃতি, সকল ঐতিহ্য থেকেই আধুনিকেরা আজ বিচ্যুত। এই সংযোগের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ছাড়া বাংলা গানের বাঁচবার আর দ্বিতীয় পথ নেই। শুধু গানের নয়, সব শিল্পেরই।

কথার দৈন্যের দিকটাও অবশ্য নিতান্ত অবহেলা করবার মতো নয়। সেখানেও এই সাংস্কৃতিক নিঃসঙ্গতার অমোঘ পরিণাম থেকে শিক্ষিত বাঙালির আজ পরিত্রাণ নেই। তবু, অপরিচয়ের থেকেও সেখানে ব্যক্তিগত অক্ষমতার প্রশ্নটাই বড়ো। ইচ্ছা করলেই কেউ রবীন্দ্রনাথের মতো কবিতা বা গান লিখতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সংগীত-রচয়িতার পক্ষে কথার দিকে অধিকতর যত্নবান হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করার নেই।

কথার প্রসঙ্গে একটা জিনিস লক্ষ করবার মতো। কাব্যের প্রতি বাংলা সংগীতের যে অবিচল নিষ্ঠা, সংগীতের প্রতি বাংলা কবিতার— বিশেষ করে আধুনিক বাংলা কবিতার— সে নিষ্ঠা দেখতে পাই না। আধুনিক বাঙালি কবিরা নিজেদের উপর কবিতার নিঃসপত্ন অধিকার সানন্দে স্বীকার করে নিয়েছেন। আধুনিক কবিদের মধ্যে এমন কমই আছেন যিনি এমন-কি অবসর-বিনোদন হিসেবেও গানরচনায় উৎসাহী। আরো কম আছেন যিনি সেই সঙ্গে সংগীত-রসিক এবং সংগীতজ্ঞ। আধুনিক বলতে যদি একেবারে সদ্যস্তন কালকে না ধরি, তাহলে 'নবজীবনের গান'-এর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রই বোধ করি এর একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। হাল-আমলে ব্যতিক্রম কে আছেন জানি না।

আরো একটা কথা আছে। আজকের আধুনিক বাঙালি কবিরা যদি আন্তরিকভাবেই গানরচনায় ব্রতী হতেন, তাহলে তাঁরা যে-গান লিখতেন, গানের সেই আধুনিকতাকে শ্রোতারা কী ভাবে গ্রহণ করতেন বলা কঠিন। বাঙালি রসিক-সাধারণ কবিতার ক্ষেত্রে যে-বস্তুকে কবিতা বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত, অনুমান করি, গানের ক্ষেত্রে সেই ধরনের বস্তুকে তাঁরা গানের বাণীরূপে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবেন না। আজকের দিনের আধুনিক কবিতা গানের বাণী হবার পক্ষে কতটা উপযোগী সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, গান জিনিসটা আজকাল প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ব্যবসার কুক্ষিগত, ব্যাপক উৎপাদন ও ব্যাপক ভোগের বাজারী পণ্য। আজকের দিনে গানের হতশ্রী নিঃস্ব দশার আসল কারণ আমাদের সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক দৈন্যের মধ্যেই নিহিত। শুধু গান নয়, সমস্ত শিল্পেরই।

সংগীত-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যবসায়িকতার কৃষ্ণমেঘে ক্ষীণ যে রজত-রেখাটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সে হল এই যে, ক্লাসিক্যাল সংগীত আজ দরবারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সংগীত-সম্মিলনীতে নেমে এসেছে। মুক্তি পেয়েছে ঐতিহাসিক কারণেই— তার

গতি ব্যবসারই অভিমুখে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ক্লাসিক্যাল সংগীত ষোলো-কলায় কমার্শিয়াল হয়ে উঠবার অবকাশ পায় নি। আজকের দিনের সংগীত-রসিক, গীতকার ও সুরকারদের পক্ষে ক্লাসিক্যাল সংগীতের সঙ্গে সংযোগ আগের তুলনায় অনেক সহজসাধ্য হয়েছে। আশা করি, আজ যাঁরা নিছক সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের আকর্ষণে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে ভিড় করছেন, তাঁদের সঙ্গে অনেক গীতকার সুরকারও আছেন এবং কালক্রমে এর থেকে তাঁরা অনেক বিত্ত সঞ্চয় করতে পারবেন। ভরসা করি, সেই সঞ্চয় একদিন বাংলা গানের পুষ্টির কাজে লাগবে।

লোকসংগীতেরও একটা ব্যবসায়িক শাখা গড়ে উঠেছে। জনসংস্কৃতির হিতৈষীদের সমাদরে এই শাখা দিনে দিনে পুষ্ট হয়ে উঠছে এবং লোকসংগীতের ইতরীকৃত একটা চেহারা উত্তরোত্তর স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে।

সমস্যাটা যত-না লোকসংগীতের নিজের, তার থেকে অনেক বেশি তথাকথিত ভদ্রসম্প্রদায়ের পক্ষে— ভদ্রসম্প্রদায়ের গানের পক্ষে। তবে সমস্যাটা নিছক সাংগীতিক নয়। সমাধানও নিছক সংগীতের পথে হবার নয়। এর সমাধান সত্যিকারের জনসংযোগ। তার পথ কী তা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়।

আধুনিক সুরকারেরা পাশ্চাত্য সংগীতের সুর আহরণে এবং বাংলা গানে পাশ্চাত্য সংগীতের হার্মনি প্রয়োগে বিশেষ উৎসাহী। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথও এক সময় খুব আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত খুব বেশি দূরে অগ্রসর হন নি।

এ ব্যাপারে আত্যন্তিক বাধা কিছু নেই, কিন্তু সতর্কতার কারণ আছে। ভারতীয় সংগীতের আনুভূমিক (horizontal) সুর-লহরী— যাকে বলা হয় মেলডি, তার সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীতের উল্লম্ব (Vertical) সুর-বিন্যাস, অর্থাৎ সুর-সংগতি বা হার্মনি সত্যি কতটা শিল্প-সৌষম্যে সংগত হতে পারবে, তা বিবেচনা করে দেখা দরকার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সংগীতে অভিজ্ঞ আর্নল্ড বাকে-র একটি উক্তি এখানে উদ্‌ধৃত করি।—

> "Mistaken attempts to foist the finished Western system of harmony on to the perfect modal system of Indian monophony have been made for the last hundred years, not only by missionaries but also by enthusiastic Indian admirers of European culture. In this process the delicate structure of Indian music is crushed out of existence." [১৩]

আহরণ দোষের নয়, কিন্তু যে-কোনো সময়ে যে-কোনো আহরণ লাভজনক হয় না। সব আহরণ সব সময় পরিপাকও করা যায় না। আহরণ অমৃতও হতে পারে, আবার বিষও হতে পারে। বাকে-সাহেবের কথা মানি, কিন্তু পুরোপুরি মানি না। প্রাণশক্তি প্রবল থাকলেও বিষও অমৃত হয়ে উঠতে পারে না।

১৩ New Oxford History of Music, Vol I-গ্রন্থের (Egdon Wellesz সম্পাদিত) A. Bake-কৃত The Music of India প্রবন্ধাংশ, পৃ. ২২৫।

একদিন ভারতের ক্লাসিক্যাল সংগীতের প্রাণশক্তি যখন প্রবল ছিল, তখন অসংখ্য উৎস থেকে সে অবাধে আহরণ করেছে, সমস্ত সংগ্রহকে আত্মস্থ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। এ আহরণে দেশ-বিদেশ বা জাতিবর্ণের ভেদ ছিল না। শুনেছি, প্রাচীনকালের ভীরবা নামের কোনো অনার্য গোষ্ঠীর গানই নাকি আজকের দিনের ভৈরবীতে পরিণত হয়েছে। কলিঙ্গের কোনো আদিবাসী জাতির চতুঃস্বরের গান পরিস্রুত ও পরিবর্ধিত হয়ে আজকের কালাংড়া হয়েছে। গোপ আভীর জাতির লোকগীতি আহিরী হয়েছে। এখনকার মালকোষের আদি উৎস নাকি আর্যেতর মালব জাতি। শুনতে পাই, ইমন এসেছে ইরান থেকে। জিলফ্-ও তাই।

খাম্বাজ সম্ভবত ভারতের পশ্চিমের কোনো দেশ থেকে আগত। আশাবরীও নাকি তাই। সর্ফর্দা-র পূর্ব-পরিচয় তার নাম থেকেই খানিকটা আন্দাজ করতে পারি।

ক্লাসিক্যাল সংগীতের আহরণের তালিকা বহুবিস্তৃত। আজ যা লোকসংগীত, কাল তা ক্লাসিক্যালের ভাণ্ডারে গিয়ে ঢুকেছে। গোয়ালিয়র অঞ্চলের গোয়ালিনীদের গীত-রীতি কালক্রমে ক্লাসিক্যাল উচ্চাঙ্গ গীত-রীতিতে পরিণত হয়েছে। মরুভূমির উষ্ট্রচালকদের কম্পিত-কণ্ঠ গীত-রীতি সাদরে গৃহীত হয়েছে। আজ ক্লাসিক্যাল সংগীতের সে প্রাণশক্তি নেই। আজ তার লক্ষ্য কেবল টিঁকে থাকা, কেবল পুনরাবৃত্তি করা। কিন্তু তার ভাণ্ডারে বিপুল সম্পদ। আধুনিক গানে যেদিন প্রবল প্রাণশক্তির সঞ্চার ঘটবে, সেদিন সে অবাধে আহরণ করবে, কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। কিন্তু এই প্রাণশক্তি সঞ্চারের প্রাথমিক শর্তই হল ক্লাসিক্যাল সংগীতের বিপুল ঐশ্বর্যের যতটা সম্ভব নিজের মধ্যে সঞ্জীবিত করে তোলা, জাতীয় উত্তরাধিকারকে আত্মস্থ করা।

বলা বাহুল্য, বাংলা গান গানই থাকবে। বাংলা গান ইমন বা কেদারাকে, বেহাগ বা বাহারকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার দায়িত্ব কখনোই নেবে না। কিন্তু ইমনে-কেদারায় বেহাগে-বাহারে নিজেকে প্রকাশ করার শক্তি তাকে অর্জন করতে হবে। অন্য পথ নেই।

দ্বিতীয় শর্তটি প্রথমটির থেকে, জানি না, হয়তো সহজসাধ্য। কিন্তু কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সে হল লোকসংগীতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, লোকজীবনের অফুরন্ত সংগীত-উৎস থেকে নিজের মধ্যে প্রাণরসের সঞ্চার করা।

আহরণে নয়, দোষ শক্তিহীন অনুকরণে। আধুনিক বাংলা গান সারা বিশ্ব থেকে আহরণ করুক। কিন্তু তার আগে তাকে সেই দৃঢ়ভিত্তি আত্মতা অর্জন করতে হবে, যার শক্তিতে বিবিধ উৎস থেকে সংগ্রহ করা উপাদানকে সে অনায়াসে নিজের করে নিতে পারবে।

১৩৭৬ *বৈশাখ*

রবীন্দ্রনাথের গানে বিলাতি সংগীতের প্রভাব

শান্তিদেব ঘোষ

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গানে ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রভাব নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমাদের ভালো করে দেখে নিতে হবে যে, এই সংগীতের চর্চা বা তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁর মধ্যে কতখানি ছিল এবং কীভাবে তা তিনি লাভ করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজের উক্তি এবং আত্মীয়স্বজনদের স্মৃতিকথাই হল আমাদের একমাত্র অবলম্বন। ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রথম-পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন—

"At seventeen, when I first came to Europe, I came to know it intimately, but even before that time I had heard European music in our own household. I had heard the music of Chopin and others at an early age."

অন্যত্র বলেছেন—

"As a young boy I heard European music being played on the piano; much of it I found attractive, but I could not enter fully into the spirit of the thing."

এই দুটি উক্তি থেকে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে তাঁর পরিবারে ইয়োরোপীয় সংগীতের চর্চা ছিল। এবং সেই সাংগীতিক পরিবেশ তাঁর বাল্যজীবনকে যথেষ্ট আকৃষ্টও করেছিল। প্রথম ভালো গান শোনার বিষয়ে তিনি লিখছেন—

"I first heard European songs when I was 17-year old, during my first visit to London. The artist was Madame Nilsson, who used to have a great reputation in those days."

১৭ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমবার ইংলন্ডে যান ১৮৭৮ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। সেখানে সবসমেত মোট ১ বৎসর ৫ মাস ছিলেন। এই সময়ে ইংলন্ডে তিনি কেবল পড়াশোনাই করেন নি, ইয়োরোপীয় সংগীত শুনেছেন নানা উপলক্ষে এবং কণ্ঠসংগীতেরও চর্চা করেছিলেন উৎসাহের সঙ্গে। তাঁর তখনকার চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে, প্রায়ই তিনি Evening Party, ফ্যান্সিবল ও অন্যান্য নাচগানের নিমন্ত্রণে পিয়ানো বাঁশি বেহালা ইত্যাদি যন্ত্রের সংগতে 'Gallop' এবং 'Lancers' নাচ নেচেছেন। ব্রাইটনে কোথাও আমোদ-উৎসব হলে মিস্ K গুরুদেবদের সকলকে খবর দিতেন, সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন, অবসর পেলে তাঁদের সঙ্গে গল্প করতেন এবং ছেলেদের গান শেখাতেন। জীবনস্মৃতিতেও তিনি সে-কথা লিখেছেন,

"ব্রাইটনে থাকিতে সেখানকার সংগীতশালায় একবার একজন বিখ্যাত গায়িকার গান শুনিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার নামটা ভুলিতেছি— মাডাম নীলসন্ অথবা মাডাম আলবানী হইবেন। কণ্ঠস্বরের এমন আশ্চর্য শক্তি পূর্বে কখনো দেখি নাই।"

এইখানেই Dr. M.-এর বাড়িতে সন্ধ্যার নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন গানবাজনা আমোদপ্রমোদে যোগদানের জন্যে। তাঁদের অনেকের অনুরোধে 'প্রেমের কথা আর বোলো না' এবং আরো দুটি বাংলা গান তিনি গেয়েছিলেন। গানবাজনা আহারাদিতে সেই সন্ধ্যা তাঁর আনন্দেই কেটেছিল। পরে লন্ডনে Mr. K.-র পরিবারে এসে উঠলেন। সেখানে দেখলেন তাঁর তৃতীয়া কন্যা Miss A. প্রায়ই গানবাজনা করেন, গানের চর্চাও আছে। এখানকার কথা বলতে গিয়ে লিখছেন,

"এই পরিবারে আমি বেশ সুখে আছি। আমি ইতিমধ্যে অনেক ইংরাজি গান শিখেছি। জাঁক করতে চাই না কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এখানকার লোকে আমার গলার বেশ প্রশংসা করে। আমি গান করি। Miss A. বাজান। Miss A. আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন।"

জীবনস্মৃতিতে তাঁর সে-দিনের এই সংগীত-জীবনের আরো কিছু বর্ণনা আমরা পাই। যেমন—

"ডাক্তার স্কট নামে এক ভদ্রগৃহস্থের ঘরে আমার আশ্রয় জুটিল। [মিসেস্ স্কট] গৃহস্থালির সমস্ত কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়াশুনা গানবাজনায় তিনি সম্পূর্ণ যোগ দিতেন।"

"আইরিশ মেলডিজ্ আমি সুরে শুনিব, শিখিব এবং শিখিয়া আসিয়া অক্ষয়বাবুকে শুনাইব, ইহাই আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল।... আইরিশ মেলডিজ্ বিলাতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম কিন্তু আগাগোড়া সব গানগুলি সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আর রহিল না।"...

"দেশে ফিরিয়া আসিয়া এই-সকল এবং অন্যান্য বিলাতি গান স্বজনসমাজে গাহিয়া শুনাইলাম। সকলেই বলিলেন, রবির গলা এমন বদল হইল কেন, কেমন যেন বিদেশী রকমের, মজার রকমের হইয়াছে।"

শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী গুরুদেবের প্রথম বিলাত-বাস -কালীন সংগীত-জীবনের কথা স্মরণ করে বলছেন—

"আমরা মায়ের সঙ্গে অনুমান ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে গিয়ে পৌঁছই বিলাতে, পরে বাবা ও রবি কাকা ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে আসেন। সেই সময় থেকেই বিলিতি সংগীতের সঙ্গে তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] পরিচয় হয়, এবং শুনেছি তাঁর সুরেলা, জোরালো তারসপ্তকের চড়াগলা, যাকে ও দেশে বলে 'টেনর্'— শুনে ওরা মুগ্ধ হত।... মনে আছে যে,

"Won't you tell me, Molly darling",
"Darling, you are growing old",
"Good-bye, sweet heart, Good-bye."

প্রভৃতি তখনকার জনপ্রিয় গানগুলি তিনি গাইতেন।"

১৮৮০ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরে এলেন বিলাতি সংগীতের গভীর প্রভাব নিয়ে। দেশে ফেরার কিছুকাল পরেই দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে তাঁকে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যটি রচনা করতে হল "বিদ্বজ্জন সমাগম সভা" নামে বাড়িতে প্রচলিত একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠানে, নিমন্ত্রিত খ্যাতনামা সাহিত্যিক অতিথিদের নাটকের অভিনয়ের দ্বারা চিত্তবিনোদনের ইচ্ছায়। ১৮৮১ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' প্রথম অভিনীত হয়। এই ঘটনার কথা স্মরণ করে তিনি লিখছেন—

"...দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে।... সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল।... গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া।... বিলাতি সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপগানে বসাইয়াছি। বস্তুত, বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা; অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে।— য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকিপ্রতিভা তাহা নহে, ইহা সুরে নাটিকা; ... ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।"

ভারতীয় সংগীতে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' যে নূতন পরীক্ষা তা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের দেশে প্রাচীন ধারার নানাপ্রকার পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য আজও সুপ্রচলিত। ইতালীয় অপেরার অনুসরণে কলকাতার ন্যাশানাল থিয়েটারে অভিনীত 'কামিনীকুঞ্জ' বা রবীন্দ্রনাথের গৃহে 'বসন্ত-উৎসব' নামে গীতিনাট্য ইতিপূর্বে অভিনীত হয়েছে। এ-সবের চরিত্রগুলির কথোপকথন গানের সুরে তালে লয়ে নিখুঁতভাবে বাঁধা বলে অভিনয়ের ঢঙে অভিনেতারা তা গান নি। গাওয়া হয়েছিল প্রচলিত গানের ঢঙে, রাগিণী এবং তালের সম, ফাঁক ও মাত্রার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে। বাল্মীকি-প্রতিভার জন্যে গুরুদেব হিন্দি ও প্রচলিত নানাপ্রকার বাংলা ঢঙের গান রচনা করলেন কিন্তু তার গাইবার রীতি, অর্থাৎ তালের সম, ফাঁকের নিয়ম লঙ্ঘন না করে রাগরাগিণীর বিস্তার দ্বারা গান গাইবার যে প্রচলিত রীতি আছে তাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করলেন। এই নাটকের অভিনয়ের সময়ে বিভিন্ন চরিত্রগুলি সাধারণ কথার ছন্দে বা কথা বলার ঢঙে রাগরাগিণী যুক্ত গানকে নতুন ভাবে প্রকাশ করলেন। এখানে প্রশ্ন উঠবে যে, এইপ্রকার গীতপদ্ধতির চিন্তা গুরুদেবের মনে এল কী করে? এর উত্তর পাব তাঁর নিজেরই লেখা থেকে। জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন—

"হার্বাট স্পেন্সরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত, রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষসাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন। আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমানসংগত রীতিমতো সংগীত নহে। ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ; ইহাতে তালের কড়াক্কড় বাঁধন নাই, একটা লয়ের মাত্রা আছে; ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য, কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা, কোনো বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকি-প্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।"

১৮৮১ খৃস্টাব্দে 'বাল্মীকি-প্রতিভায়' বিলাতি সুরের অনুকরণে দস্যুদলের মত্ততার যে দুটি গান রচনা করেছিলেন তার একটি হল, 'কালী কালী বলো রে আজ', অপরটি হলো 'তবে আয় সবে আয়'। আইরিশ সুরে রচিত বনদেবীর বিলাপের গানটি হল 'মরি ও কাহার বাছা'। এ গানটি প্রথমবারে ছিল না। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে নাটকটির পুনরাভিনয় কালে এটি রচিত।

বাল্মীকি-প্রতিভায় দেশী ও বিদেশী সুরের চর্চায় অভিজ্ঞতার ফলে সংগীতরচনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে তখন যে-সব চিন্তার উদয় হয়েছিল তার থেকে সমগ্রভাবে রবীন্দ্রসংগীতের বিচারের সঠিক পথ পাওয়া যেতে পারে বলেই আমাদের ধারণা। সেই সময়কার তাঁর ঐ সংগীতচিন্তাকে তিনি প্রকাশ করেছিলেন বিস্তারিত ভাবে একই বছরে পর পর প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধ-কটির উপর এখনো পর্যন্ত আমরা তেমন দৃষ্টি দিই নি বা তা নিয়ে বিস্তারিত ভাবে তেমন কোনো আলোচনাও আমরা করি নি। অথচ এই তিনটি প্রবন্ধের মধ্যেই গুরুদেবের সমগ্রজীবনের নানা প্রকার সংগীতসৃষ্টির মূল রহস্য লুকিয়ে আছে। একথা চিন্তা করে, পাঠকদের সুবিধার্থে, প্রবন্ধ-কটির বক্তব্য বিষয় একটু বিস্তারিত ভাবেই উদ্ধৃত করব।

বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয়ের প্রায় মাস-দুই পরে, অর্থাৎ এপ্রিল মাসে, কলিকাতার বেথুন সোসাইটির এক অধিবেশনে তিনি সংগীত বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি 'সংগীত ও ভাব' [১] নামে ভারতী পত্রিকার ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গানের উদাহরণ সহ বক্তৃতাটিতে তিনি যা বলেছিলেন তার অংশ বিশেষ প্রকাশিত প্রবন্ধটি থেকে তুলে দিচ্ছি।

---

১ দ্র. সংগীত-চিন্তা (বৈশাখ ১৩৭৩)

"অল্পদিন হইল বঙ্গসমাজের নিদ্রা ভাঙিয়াছে, এখন তাহার শরীরে একটা নব উদ্যমের সঞ্চার হইয়াছে।...

"আমাদের বঙ্গসমাজে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, এমন-কি সে আন্দোলনের এক-একটা তরঙ্গ য়ুরোপের উপকূলে গিয়া পৌঁছাইতেছে। এখন হাজার চেষ্টা করো-না, হাজার কোলাহল করো-না কেন, এ তরঙ্গ রোধ করে কাহার সাধ্য! এই নূতন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে সংগীতের নব অভ্যুদয় হইয়াছে। সংগীত সবে জাগিয়া উঠিয়াছে মাত্র, কাজ ভালো করিয়া আরম্ভ হয় নাই। এখনো সংগীত লইয়া নানাপ্রকার আলোচনা আরম্ভ হয় নাই; নানা নূতন মতামত উত্থিত হইয়া আমাদের দেশের সংগীত শাস্ত্রে বদ্ধ জলে একটা জীবন্ত তরঙ্গিত স্রোতের সৃষ্টি করে নাই।

"আমাদের সংগীতশাস্ত্র... মৃতশাস্ত্র।... বিবিধ বিচিত্র ভাবের লীলাময়, ছায়ালোকময়, পরিবর্তনশীল মুখশ্রী দেখিতে পাই না।...

"আমার ইচ্ছা যে, কবিতার সহচর সংগীতকেও শাস্ত্রের লৌহকারা হইতে মুক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হউক।...

"রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য কী ছিল? ভাব প্রকাশ করা ব্যতীত আর তো কিছু নয়। আমরা যখন কথা কহি তখনো সুরের উচ্চনীচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে।... সেই সুরের উচ্চনীচতা ও তরঙ্গলীলা সংগীতে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সংগীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র।... সংগীত আর কিছু নয়— সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা।... কথা কহিয়া যে ভাব অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করি, রাগরাগিণীতে সেই ভাব সম্পূর্ণতররূপে প্রকাশ করি। অতএব রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা মাত্র।... এখন রাগরাগিণীই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।... আজ গান শুনিলেই সকলে দেখিতে চান, জয়জয়ন্তী, বেহাগ বা কানাড়া বজায় আছে কিনা।... বৈয়াকরণে ও কবিতে যে প্রভেদ, উপরিউক্ত ওস্তাদের সহিত আর-একজন ভাবুক গায়কের সেই প্রভেদ।...

"এখন সংগীতবেত্তারা যদি বিশেষ মনোযোগ-সহকারে আমাদের কী কী রাগিণীতে কী কী ভাব আছে তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, তবেই সংগীতের যথার্থ উপকার করেন। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে একটা ভাব আছে, তাহা যাইবে কোথা বলো।...

"সংগীতবেত্তারা সেই ভাবের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করুন। কেন বিশেষ-বিশেষ এক-এক রাগিণীতে বিশেষ-বিশেষ এক-একটা ভাবের উৎপত্তি হয় তাহার কারণ বাহির করুন। এই মনে করুন— পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভৈঁরোতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে?...

"কোন্ সুরগুলি দুঃখের ও কোন্ সুরগুলি সুখের হওয়া উচিত দেখা যাক।... আমরা যখন রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্পই থাকে, রোদনের স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত টানা হয়। আমরা যখন হাসি— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা সুর একটিও

নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান, আর তালের ঝোঁকে ঝোঁকে সুর লাগে। দুঃখের রাগিণী দুঃখের রজনীর ন্যায় অতি ধীরে ধীরে চলে, তাহাকে প্রতি কোমল সুরের উপর দিয়া যাইতে হয়। আর সুখের রাগিণী সুখের দিবসের ন্যায় অতিদ্রুত পদক্ষেপে চলে, দুই-তিনটা করিয়া সুর ডিঙাইয়া যায়। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে উল্লাসের সুর নাই।... সহসা উত্থান বা সহসা পতন নাই। উচ্ছ্বাসময় উল্লাসের সুরই অত্যন্ত সহসা।... ঘোরতর উল্লাসের সুর ইংরাজি রাগিণীতে আছে, আমাদের রাগিণীতে নাই বলিলেও হয়। তবে আমাদের দেশের সংগীতে রোদনের সুরের অভাব নাই। সকল রাগিণীতেই প্রায় কাঁদা যায়। একেবারে আর্তনাদ হইতে প্রশান্ত দুঃখ, সকল প্রকার ভাবই আমাদের রাগিণীতে প্রকাশ করা যায়।...

"আমাদের যাহা কিছু সুখের রাগিণী আছে তাহা বিলাসময় সুখের রাগিণী, গদগদ সুখের রাগিণী। অনেক সময়ে আমরা উল্লাসের গান রচনা করিতে হইলে রাগিণী যে ভাবেরই হউক তাহাকে দ্রুত তালে বসাইয়া লই, দ্রুত তাল সুখের ভাব-প্রকাশের একটা অঙ্গ বটে।...

"তালও ভাবপ্রকাশের একটা অঙ্গ।... ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালও দ্রুত ও বিলম্বিত করা আবশ্যক— সর্বত্রই যে তাল সমান রাখিতেই হইবে তাহা নয়। ভাবপ্রকাশকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া, সুর ও তালকে গৌণ উদ্দেশ্য করিলেই ভালো হয়।... আমাদের সংগীতে যে নিয়ম আছে যে, যেমন-তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়। তালের সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট, তাহার উপরে আরো কড়াক্কড় করা ভালো বোধ হয় না। তাহাতে স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত হানি করা হয়।... যেমন তাল আছে তেমনি থাকুক, মাত্রা-বিভাগ যেমন আছে তেমনি থাকুক, কেবল একটা নির্দিষ্ট স্থানে সমে ফিরিয়া আসিতেই হইবে এমন বাঁধাবাঁধি না থাকিলে সুবিধা বৈ অসুবিধা কিছুই দেখিতেছি না। এমন-কি, গীতিনাট্যে, যাহা আদ্যোপান্ত সুরে অভিনয় করিতে হয় তাহাতে স্থানবিশেষে তাল না থাকা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে অভিনয়ের স্ফূর্তি হওয়া অসম্ভব।...

"রাগরাগিণী-আলাপ ভাষাহীন সংগীত।... আলাপেও... কেবল কতকগুলি সুর কণ্ঠ হইতে বিক্ষেপ করিলেই হইবে না, যে-সকল সুরবিন্যাস-দ্বারা ভাব প্রকাশ হয় তাহাই আবশ্যক। গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন, আমি সংগীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই; ...তাঁহারা গানের কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপরে দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।... সাধারণ কবিতা পড়িবার জন্য ও সংগীতের কবিতা শুনিবার জন্য।... গানের কবিতা পড়া যায় না, গানের কবিতা শুনা যায়।

"সংগীতবেত্তাদিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, কী কী সুর কিরূপে বিন্যাস করিলে কী কী ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে, তাহার বিজ্ঞান

অনুসন্ধান করুন।... দুঃখ সুখ রোষ বা বিস্ময়ের রাগিণীতে কী কী সুর বাদী ও কী কী সুর বিসম্বাদী তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন।... বিভিন্ন ভাবের নাম অনুসারে আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন নামকরণ করা হউক। আমাদের সংগীতবিদ্যালয়ে সুর-অভ্যাস ও রাগরাগিণী শিক্ষার শ্রেণী আছে, সেখানে রাগরাগিণীর ভাব-শিক্ষারও শ্রেণী স্থাপিত হউক।"

এই প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রকৃতি বিশ্লেষণ। বাল্মীকি-প্রতিভার নূতনভাবে পরীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি হল, এর প্রায় সব গানই নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র গান হিসেবে গাওয়া যায় না— কাব্য হিসেবে গানগুলি পড়ে উপভোগ করবার মতো জিনিসও এ নয়। এই কারণেই তিনি বলেছেন, এই নাটকটি 'গানের সূত্রে নাট্যের মালা'। নাটকে সুখ দুঃখ কান্না ভয় হাসি ঠাট্টা আনন্দ উল্লাস বিস্ময় ইত্যাদি নিয়ে নানা রকমের বাস্তব কথোপকথনকে অতি সহজেই নানাপ্রকার ভারতীয় সুরে ও রাগরাগিণীতে বেঁধে কথোপকথনের ঢং-এ গেয়েছিলেন। এতে রাগিণীগুলির রূপান্তর ঘটেছিল। প্রচলিত রূপের সঙ্গে তা মেলে নি। ঘোরতর উল্লাসের সুরের বেলায় বিলাতি সুর ও ঢং গ্রহণ করলেন যেহেতু আমাদের গানে দস্যুদলের উপযোগী উল্লাস বা মত্ততার গান প্রচলিত ছিল না। অধিকাংশ গানই সাধারণ কথাবার্তার ছন্দে গাওয়া হয়েছিল বলে তবলা, বা পাখোয়াজের তালের বাঁধন নেই। যে কারণে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ থেকে দেখা যায় যে, তার গানের মাথায় একমাত্র রাগরাগিণীর উল্লেখ ছাড়া তালের কোনো উল্লেখ নেই। অথচ সে-যুগে ও তার পরবর্তী বহু বৎসর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সব সংগীত গ্রন্থের অন্যান্য গানের সঙ্গে রাগ ও তালের উল্লেখ করা হত। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়ের ভিত্তি ছিল উপরোক্ত এই বিষয়গুলি।

বাল্মীকি-প্রতিভার নূতন পরীক্ষায় হাত দিয়ে তাঁকে পূর্ব-প্রচলিত গীতিনাটকের পথ থেকে অনেকখানি সরে যেতে হয়েছিল বলেই তিনি 'সংগীত ও ভাব' নামে বক্তৃতা ও প্রবন্ধটির দ্বারা এই নূতনত্বের সমর্থনে যুক্তি খাড়া করে বোঝাতে চাইলেন যে, সে যুগে ভারতীয় সংগীতে এইরূপ নূতনত্বের প্রয়োজন খুবই দেখা দিয়েছে।

'সংগীত ও ভাব' বক্তৃতা ও প্রবন্ধটির জের হিসেবে গুরুদেব পরবর্তী আষাঢ় সংখ্যায় 'ভারতী'তে প্রকাশ করলেন 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' [২] নামে আর-একটি প্রবন্ধ। প্রকৃতপক্ষে এই রচনাটি হল হার্বার্ট স্পেন্সরের 'The Origin and Function of Music' নামে একটি প্রবন্ধের ব্যাখ্যা। 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধটির যেখানে তিনি বলেছেন, "আমরা যখন কথা কহি তখনও সুরের উচ্চনীচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে। কিন্তু তাহাতেও ভাবপ্রকাশ অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই সুরের উচ্চনীচতা ও তরঙ্গলীলা সংগীতে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়।" এই মতকে, হার্বার্ট

২ দ্র. সংগীত-চিন্তা

স্পেন্‌সরের যুক্তি সমেত বিস্তারিতভাবে বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে। 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা'র মূল বক্তব্য বিষয় হল—

"আনন্দে বা বিষাদে বা অন্যান্য মনোবৃত্তির উদয়ে সকল প্রাণীর মাংসপেশীতে ও অনুভবজনক স্নায়ুতে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশিত হয়।... মনোভাবের বিশেষত্ব ও পরিমাণ অনুসারে কণ্ঠস্থিত মাংসপেশীসমূহ সংকুচিত হয়; তাহাদের বিভিন্ন প্রকারের সংকোচন অনুসারে আমাদের শব্দযন্ত্র বিভিন্ন আকার ধারণ করে; এবং সেই বিভিন্ন আকার অনুসারে শব্দের বিভিন্নতা সম্পাদিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, আমাদের কণ্ঠনিঃসৃত বিভিন্ন স্বর বিভিন্ন মনোবৃত্তির শরীরগত বিকাশ।...

"মনোভাবের বিশেষ উত্তেজনা হইলেই তবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক মাঝামাঝি সুর ছাড়াইয়া উঠি অথবা নামি।... বেগবান মনোবৃত্তির প্রভাবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার সুরের বাহিরে যাই।...

"...সচরাচর কথাবার্তার সহিত মনোবৃত্তির উত্তেজিত অবস্থার কথাবার্তার ধারা স্বতন্ত্র।... উত্তেজিত অবস্থার কথাবার্তার যে-সকল লক্ষণ, সংগীতেরও তাহাই লক্ষণ। সুখ দুঃখ প্রভৃতির উত্তেজনায় আমাদের কণ্ঠস্বরে যে-সকল পরিবর্তন হয়, সংগীতে তাহারই চূড়ান্ত হয় মাত্র।... গানের স্বরও উচ্চ, গানের সমস্তই সুর; গানের সুর সচরাচর কথোপকথনের সুর হইতে অনেকটা উঁচু অথবা নিচু হইয়া থাকে এবং গানের সুরে উঁচু নিচু ক্রমাগত খেলাইতে থাকে।... উত্তেজিত মনোবৃত্তির সুর সংগীতে যথাসম্ভব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তীব্র সুখ দুঃখ কণ্ঠে প্রকাশের যে লক্ষণ, সংগীতেরও সেই লক্ষণ।...

"সকল প্রকার কথোপকথনে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান আছে। কথা ও যে-ধরনে সেই কথা উচ্চারিত হয়। কথা ভাবের চিহ্ন (signs of ideas) আর ধরন অনুভাবের চিহ্ন (signs of feeling)। কতকগুলি বিশেষ শব্দ আমাদের ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে এবং সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে যে সুখ বা দুঃখ উদয় হয়, সুরে তাহাই প্রকাশ করে।... আমরা একসঙ্গে দুই প্রকারের কথা কহিয়া থাকি, ভাবের ও অনুভাবের।...

"সংগীত, আমাদিগকে অব্যবহিত যে সুখ দেয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবেগের ভাষার (Language of the emotions) পরিস্ফুটতা সাধন করিতে থাকে। আবেগের ভাষাই সংগীতের মূল।...

"...এমন একদিন আসিতেছে যখন আমরা সংগীতেই কথাবার্তা কহিব।...

"আমাদের দেশে সংগীত... স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলা সুরসমষ্টির কর্দম এবং রাগরাগিণীর ছাঁচ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে; সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে— তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই।...

"আমাদের দেশীয় অনুভাবশূন্য সংগীত নিকৃষ্ট শ্রেণীর।... যতক্ষণ আমরা তাহার মধ্যে অনুভাব না আনিতে পারিব, ততক্ষণে আমরা উচ্চশ্রেণীর সংগীতবিৎ বলিয়া গর্ব করিতে পারিব না।"

বাল্মীকি-প্রতিভার ব্যবহৃত হাসিকান্না ক্রোধবিস্ময়-মিশ্রিত নানারূপ কথোপকথনগুলি গানের সুরে বলবার সময়েও অনুভাবের সাহায্য নিয়েছিলেন। অর্থাৎ নাটকের হাসিকান্না ক্রোধ ইত্যাদি নানাভাবের কথা স্বাভাবিক অবস্থায় অভিনেতারা কণ্ঠে যেভাবে প্রকাশ করেন, কণ্ঠস্বরের সেই স্বাভাবিকতা এই নাটকে বজায় ছিল রাগিণী মিশ্রিত গানগুলি গেয়ে অভিনয় করার সময়। এইরূপ অনুভাব যুক্ত গীত পদ্ধতির অভাবে আমাদের ভারতীয় সংগীতকে নিকৃষ্ট শ্রেণী বলে সে যুগে গুরুদেব মনে করতেন।

পরবর্তী মাঘ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হল 'সংগীত ও কবিতা' নামে গুরুদেবের তৃতীয় প্রবন্ধটি। এটিতে বলছেন—

"আমাদের ভাবপ্রকাশের দুটি উপকরণ আছে— কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমন-কি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ভাবপ্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধান্য দিই ও সংগীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দিই।... কথোপকথনে আমরা যে-সকল সুর যেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি, সংগীতে যে-সকল সুর সেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি না, সুর বাছিয়া বাছিয়া লই, সুন্দর করিয়া বিন্যাস করি। কবিতায় যেমন বাছা বাছা সুন্দর কথায় ভাব প্রকাশ করে, সংগীতেও তেমনি বাছা-বাছা সুন্দর সুরে ভাব প্রকাশ করে। যুক্তির ভাষায় প্রচলিত কথোপকথনের সুর ব্যতীত আর কিছু আবশ্যক করে না, কিন্তু যুক্তির অতীত আবেগের ভাষায় সংগীতের সুর আবশ্যক করে। এ বিষয়েও সংগীত অবিকল কবিতার ন্যায়। সংগীতেও ছন্দ আছে। তালে তালে তাহার সুরের লীলা নিয়মিত হইতেছে।... কথোপকথনের সুরে সুশৃঙ্খল তাল নাই, সংগীতে তাল আছে। সংগীত ও কবিতা উভয়ে ভাবপ্রকাশের দুইটি অঙ্গ ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। তবে, কবিতা ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে যতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে, সংগীত ততখানি করে নাই। তাহার একটি প্রধান কারণ আছে। শূন্যগর্ভ কথার কোনো আকর্ষণ নাই, না তাহার অর্থ আছে, না তাহা কানে তেমন মিঠা লাগে। কিন্তু ভাবশূন্য সুরের একটা আকর্ষণ আছে, তাহা কানে মিষ্ট শুনায়। এইজন্য ভাবের অভাব হইলেও একটা ইন্দ্রিয়সুখ তাহা হইতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত সংগীতে ভাবের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। উত্তরোত্তর আস্কারা পাইয়া সুর বিদ্রোহী হইয়া ভাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।... সংগীতের ভূমি উর্বরা হওয়াতেই সংগীতের এমন দুর্দশা। মিষ্টসুর শুনিবামাত্রই ভালো লাগে, সেই নিমিত্ত সংগীতকে আর পরিশ্রম করিয়া ভাব কর্ষণ করিতে হয় নাই— কিন্তু শুদ্ধ মাত্র কথার যথেষ্ট মিষ্টতা নাই বলিয়া কবিতাকে প্রাণের দায়ে ভাবের চর্চা করিতে হইয়াছে। সেই নিমিত্তই কবিতার এমন উন্নতি ও সংগীতের এমন অবনতি।...

"কবিতা উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়াছে ও সংগীত নিম্নশ্রেণীতে পড়িয়া রহিয়াছে; কবিতার বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম ও প্রস্তরের ন্যায় স্থূল সমুদয় ভাবই প্রকাশ করা যায়, কিন্তু সংগীতে এখনো তাহা করা যায় না।...

Matthew Arnold বলেন— "মনের একটি মাত্র স্থায়ীভাব বাছিয়া লওয়া, ভাব-শৃঙ্খলের একটি মাত্র অংশের উপর অবস্থান করিয়া থাকা সংগীতের কাজ।... কবিতার কাজ আরো বিস্তৃত। চিত্রকরের ন্যায় মুহূর্তের বাহ্যশ্রীও তাঁহার বর্ণনীয়, গায়কের ন্যায় ক্ষণকালের ভাবোচ্ছ্বাসও তাঁহার গেয়। তাহা ছাড়া জীবনের গতিস্রোত তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়। ভাব হইতে ভাবান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে তাঁহাকে গমন করিতে হয়।... কেবলমাত্র স্থির দণ্ডায়মান আকৃতি তিনি চিত্র করেন না— এক সময়ের স্থায়ীভাব মাত্র তিনি বর্ণনা করেন না, গম্যমান শরীর, প্রবহমান ভাব, পরিবর্তমান তাঁহার কবিতার বিষয়।... চলনশীল ভাবের প্রত্যেক ছায়ালোক সংগীতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। সংগীত একটি স্থায়ী স্থির ভাবের ব্যাখ্যা করে মাত্র। কিন্তু আমরা এই বলি যে, গতিশীল ভাব যে সংগীতের পক্ষে একবারে অননুসরণীয় তাহা নহে, তবে এখনো সংগীতের সে বয়স হয় নাই। সংগীত ও কবিতায় আমরা আর-কিছু প্রভেদ দেখি না, কেবল উন্নতির তারতম্য।"

'সংগীত ও ভাব' নামে প্রথম প্রবন্ধের যেখানে তিনি বলেছেন, ভারতীয় সংগীত শাস্ত্রে স্থির অচঞ্চল-বিবিধ বিচিত্র ভাবের লীলাময় ছায়ালোকময় পরিবর্তনশীল মুখশ্রী দেখতে পাওয়া যায় না এটি মূলত তারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এখানে তিনি বললেন কবিতায় বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম ও প্রস্তরের ন্যায় স্থূল সমুদয় ভাব প্রকাশ করার যে সুবিধা আছে সংগীতে তা নেই। কবিতার মতো গতিশীল ভাব প্রকাশ করা সংগীতের পক্ষে এখনো সম্ভব হয় নি। ভাব প্রকাশে কবিতা যতখানি উন্নতিলাভে সমর্থ হয়েছে সংগীতে ততখানি হয় নি।

এই তিনটি প্রবন্ধ থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, 'গুরুদেব ইয়োরোপীয় সংগীত চিন্তাকে আদর্শরূপে সামনে রেখে বাল্মীকি-প্রতিভায় সংগীতের নূতন পরীক্ষায় হাত দিয়েছিলেন এবং এ যুগে তাঁর মনে এমন বিশ্বাসও জন্মেছিল যে, কতগুলি দিকে ভারতীয় সংগীত ইয়োরোপীয় সংগীতের তুলনায় অনেকখানি অনগ্রসর।

যৌবনের প্রারম্ভে সমগ্রভাবে ইয়োরোপের সংস্কৃতির প্রতি গুরুদেব যে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা জানা যায় সে যুগে প্রকাশিত তাঁরই "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' নামক বইটির বিভিন্ন পত্রে। বইটির ভূমিকায় তিনি কোনো প্রকার দ্বিধা না করে বলেছিলেন—

"বিদেশীয় সমাজ প্রথম দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে! কিন্তু ইহাতে আর-কোনো উপকার হউক বা না হউক, একজন বাঙালি ইংলন্ডে গেলে কিরূপে তাহার মত গঠিত ও পরিবর্তিত হয় তাহার একটা ইতিহাস পাওয়া যায়।"

সংগীতেও যে রবীন্দ্রনাথের মত ইযোরোপীয় ভাবধারায় অনেকখানি গঠিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল তার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় অভিনয় ও এই প্রবন্ধ কটি প্রকাশের পরে, ১৮৮২ খৃস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর তারিখে অভিনীত হল দ্বিতীয় গীতিনাট্য 'কালমৃগয়া'। এর কথা স্মরণ করে 'জীবনস্মৃতি'তে গুরুদেব লিখছেন— "বাল্মীকি-প্রতিভা'র গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটি গীতনাট্য লিখিয়াছিলাম।"

'কালমৃগয়া'তে বিলাতি গানের সুরে ও ছন্দে রচিত, বা যাকে বলে ভাঙা গান; তা ছিল মাত্র ছয়টি। যেমন—

১ ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে
২ সকলি ফুরালো
৩ মানা না মানিলি
৪ তুই আয়রে কাছে আয় (ও ভাই দেখে যা)
৫ ও দেখনি যে ভাই
৬ এসেছি মোরা, এসেছি মোরা

বাকি গানগুলি রচিত হল নানা ঢঙের ভারতীয় গানের সাহায্যে।

এ যুগে, গীতনাটকের জন্য নয় এমন বিলাতি গান-ভাঙা বাংলা গান সংখ্যায় বেশি পাওয়া যায় না। জানা যায়, প্রথমবারের বিলাতবাস থেকে পরবর্তী ছয় বছর, অর্থাৎ ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে এইরূপ ইংরাজি গান-ভাঙা বাংলা গান রচনা করেছিলেন মাত্র তিনটি। যেমন— 'ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয়' ব্রহ্মসংগীতটি আর 'পুরানো সেই দিনের কথা' এবং 'কতবার ভেবেছিনু' বিবিধ পর্যায়ের গান দুটি। ভাঙা-গানের সংখ্যার প্রতি লক্ষ করে দেখা যাচ্ছে যে, বিলাতি সংগীতের প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকলেও ভাঙা গান রচনার প্রতি গুরুদেবের তেমন আগ্রহ নেই।

১৮৮৬ খৃস্টাব্দে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র পুনরাভিনয় কালে 'মরি ও কাহার বাছা' গানটি বনদেবীর বিলাপের গান হিসেবে নতুন করে যুক্ত হল। 'কালমৃগয়া'-র 'মানা না মানিলি' গানটির সুরে। এবারের অভিনয়ে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' বহুপরিমাণে বর্ধিত হল। তাই গীতনাটকটির পুনর্মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন—

"অনেকগুলি নাম পরিবর্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্য হইতে গৃহীত।" 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন ('কালমৃগয়া') "গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম...।"

এই গীতিনাট্যের এবারের অভিনয়ে বিলাতি সুরের গান রেখেছিলেন মাত্র চারটি। যেমন—

১ কালী কালী বল রে আজ
২ তবে আয় সবে আয়

৩ এসেছি মোরা, এসেছি মোরা
৪ মরি ও কাহার বাছা

নাটকটির জন্যে প্রায় ২০টি দেশী ঢঙের গান রচনা করলেন নতুন করে আর ‘কালমৃগয়া’র মোট ৯টি গান যুক্ত হল এর সঙ্গে।

পর পর গীতিনাট্য দুটি রচনার সময়ে নতুন পরীক্ষার প্রতি তাঁর মনে যে উৎসাহ জেগেছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে ‘জীবনস্মৃতি’তে লিখলেন—

“বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যে-উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে-উৎসাহে আর-কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুরে বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে, এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম।”

“এইরূপ একটা দস্তুর ভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা। এইজন্য উহাদের মধ্যে তাল-বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি-বাংলার বাছবিচার নাই।... আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংগীত সম্বন্ধে উক্ত দুই গীতনাট্যে যে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কেহই কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই খুশি হইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন।”

জীবনস্মৃতির এই উক্তি কটি তাঁর ১৮৮১ খৃস্টাব্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ কটির কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অভিনীত হল তৃতীয় গীতিনাট্য ‘মায়ার খেলা’। প্রায় বছর খানেক আগে থেকেই এর গান রচনা তিনি শুরু করেছিলেন। বেথুন কলেজে মহিলারা অভিনয় করলেন, দর্শকও ছিলেন কেবলমাত্র মহিলারা। এই নাটকটির বিষয়ে গুরুদেব লিখছেন— ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’ ও ‘কালমৃগয়া’ রচনার “অনেককাল পরে ‘মায়ার খেলা’ বলিয়া আর-একটি গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্নমতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনার স্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, ‘মায়ার খেলা’ যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।”

এই গীতিনাট্যটির সঙ্গে পূর্বের দুটি গীতিনাট্যের প্রধান পার্থক্য হল এই যে, এর বহু গানই নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র গান হিসেবে গেয়ে উপভোগ করা যায়। এছাড়া তবলার তালের ছন্দও এর বহু গানে রক্ষিত হয়েছে। যার জন্যে এ-নাটকের

গানগুলির রাগিণীর উল্লেখের সঙ্গে তালেরও উল্লেখ দেখি। তা সত্ত্বেও, এটি পুরোপুরি গীতিনাট্য; এবং এর অভিনয়ের সময় অধিকাংশ গানই গাওয়া হয়েছিল পুরোপুরি কথোপকথনের ছন্দে তালের বাঁধাছন্দের নিয়ম লঙ্ঘন করে। এই গীতিনাটকে বিলাতি সুরের ভাঙা-গান আছে মাত্র একটি। গানটি হল 'আহা আজি এ বসন্তে'। পূর্বের 'মানা না মানিলি' গানটির সুরে এটি রচিত। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ১৮৮১ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৮৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই সাতটি বছরে গীতিনাটক রচনা এবং একই প্রথায় তার গান গেয়ে অভিনয় করার প্রতিই ছিল তাঁর ও তাঁর পরিবারের সকলের একমাত্র ঝোঁক। এ ছাড়া, বিলাতি গান-ভাঙা বাংলা গান মোট যে-কটির সন্ধান পাওয়া গেছে তা এই সময়ের মধ্যেই তিনি লিখেছিলেন। 'মায়ার খেলা' রচনার পর গীতিনাট্য রচনার প্রতি উৎসাহ আর যেমন দেখা গেল না, তেমনি দেখা গেল না বিলাতি ভাঙা বাংলা গান রচনার প্রতি আগ্রহ।

১৮৯০ খৃস্টাব্দের অগস্ট মাসে ঘটল রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বারের বিলাত যাত্রা। তখন তাঁর বয়স ২৯ বৎসর। খুবই উৎসাহ নিয়ে তিনি রওনা হয়েছিলেন, পৌঁছলেন সেপ্টেম্বর মাসে, কিন্তু দেশ ও বাড়ির জন্য মন খারাপ হওয়াতে মাত্র একমাস সে দেশে থাকার পর নভেম্বর মাসে দেশে ফিরে এলেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন তা আর সফল হল না, কিন্তু এই একমাস সে দেশের সংগীতের চর্চায় তাঁর সময় যে কী ভাবে কেটেছিল তার সুন্দর একটি পরিচয় পাই তাঁরই লেখা 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থে। এক মাসের বিলাত বাস এবং জাহাজে ফেরার দিনলিপিতে সংগীত চর্চার উল্লেখ করে তিনি জানাচ্ছেন—

"সন্ধের সময় আর-একবার গানবাজনা নিয়ে বসা গেল। Walter Mull বেশ Piano বাজায়। Miss Mull-এ আমায় মিলে অনেকগুলো গান গেয়েছি। এরা আমার গলার অনেক তারিফ করছে। Mull বলছিল, আমি যদি গলার চর্চা করি তাহলে St. James Hall Concert-এ গাইতে পারি— আমার রীতিমত উচ্চশ্রেণীর গলা আছে।...

"...সমস্ত দিন প্রায় গানবাজনায় কেটেছে।... Miss Mull গান শেখালে।... কতকগুলো নতুন গান (গানের স্বরলিপি) কিনে এনেছি সেগুলো গেয়ে দেখা গেল।...

"Tennis খেলে Oswalds-এর ওখানে গান গেয়ে এবং গানবাজনা শুনে বাড়ি এসে খেয়ে পুনশ্চ গানবাজনা করে শোবার ঘরে এসেছি।

"...Miss Mull আমাকে সব গানগুলো গাওয়ালে। 'Remember me' বলে একটা গানের পর সে আস্তে আস্তে আমাকে বললে, Mr. T, I shall remember you।

"Miss Mull-এর কাছে একটু গান শিখলুম। ...concert-এ আমাকে গান গাওয়ালে। বিস্তর বাহবা পাওয়া গেল।... একটি অত্যন্ত মোটা মেয়ে চমৎকার গান করলে। সেই আমার গানের accompaniment বাজিয়েছিল। Gounod-এর *Serenade* এবং *If* গেয়েছিলুম। আজকাল আমি অনেকটা সাহসপূর্বক গলা ছেড়ে গান গাই।...

"এখন অভ্যাসক্রমে য়ুরোপীয় সংগীতের এতটুকু আস্বাদ পাওয়া গেছে যার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে, যদি চর্চা করা যায় তাহলে য়ুরোপীয় সংগীতের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যেতে পারে।

"আজ রাত্তিরেও আমাকে অনেক গান গাইতে হল। তার পর নিরালায় অন্ধকারে জাহাজের কাঠরা ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে যখন গুন্ গুন্ করে একটা দিশি রাগিণী ভাঁজছিলুম ভারি মিষ্টি লাগল। ইংরিজি গান গেয়ে গেয়ে শ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলুম, হঠাৎ দিশি গানে প্রাণ আকুল হয়ে গেল।

"Mrs. Moeller আমাকে গান গাইতে অনুরোধ করলে, সে আমার সঙ্গে পিয়ানো বাজালে। Mrs. Moeller বললে : It is a treat to hear you sing। Webb এসে বললে What would we do without you Tagore — there's nobody on board who sings so well। যা হোক, জাহাজে এসে আমার গান বেশ appreciated হচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে এর আগে আমি যে ইংরিজি গানগুলো গাইতুম কোনোটাই tenor pitch-এ ছিল না তাই আমার গলা খুলত না। এবারে সমস্ত উঁচু pitch-এর music কিনেছি, তাই এত প্রশংসা পাওয়া যাচ্ছে।

"Schiller একজন জর্মান সহযাত্রী আমাকে বলছিল তুমি যদি তোমার গলার রীতিমত চর্চা কর তাহলে আশ্চর্য উন্নতি হতে পারে : 'you have a mine of wealth in your voice'।"

এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ১৭। ১৮ বৎসর বয়সে, প্রথমবার বিলাত-ভ্রমণে গিয়ে সেদেশের কণ্ঠসংগীতের যে চর্চা গুরুদেব করেছিলেন, প্রায় দশ বছরের ব্যবধানেও তা তিনি ভোলেন নি। তাই, এবারের এই অল্পদিনের চর্চায় তাঁর গান গাইবার শক্তির প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং গাইয়ে হিসেবে প্রশংসাও পাচ্ছেন। কিন্তু এবারে দেশে ফিরে আসার পর প্রথমবারের মতো বিদেশী সংগীতের উত্তেজনার কোনো পরিচয় পেলাম না। নতুন কোনো গীতনাট্য বা বিলাতি গান-ভাঙা বাংলা গান রচনারও কোনো খবর নেই। তবে, এটুকু জানা যায় যে, ১৯৮৩ খৃস্টাব্দের কোনো এক সময়ে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয় আর-একবার খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে করেছিলেন। এবারেও বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি স্বয়ং, দস্যুদলে ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুর-পরিবারের অনেকে। সরস্বতীর ভূমিকা নিয়েছিলেন ইন্দিরা দেবী, আর বালিকার ভূমিকায় ছিলেন অভিজ্ঞা দেবী। ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ল্যান্সডাউন-পত্নীর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে এই অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। ইন্দিরা দেবী তাঁর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' পুস্তকে এর একটু বিবরণ রেখে গেছেন—

"বাবা [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর] একবার বিলেত থেকে আসবার সময়ে তাঁর সহযাত্রী তখনকার লাটপত্নী লেডী ল্যান্সডাউনকে জোড়াসাঁকোর বাড়ি আসবার আমন্ত্রণ

জানিয়েছিলেন।... কলকাতায় আসবার পর লাটপত্নী এই নিমন্ত্রণ রক্ষার অভিপ্রায় জানালে তাঁর জন্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র একটি বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। লেডী ল্যান্সডাউনের সঙ্গে তখনকার ছোটো-লাটপত্নী লেডী এলিয়ট প্রভৃতি আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ ছিলেন।"

বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের যে ছবিটির সঙ্গে আমরা আজ পরিচিত সেটি তোলা হয়েছিল এইবারে, ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে। শোনা যায় যে, গুরুদেব বাল্মীকির সাজে যে গাউনটি কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত পিছনে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন সেটি ঐ সময়ে প্রথম ব্যবহৃত হয়, আগে নাকি তা ছিল না। গভর্নর জেনারেল-পত্নী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ইংরেজ অতিথিদের কথা চিন্তা করে নাকি দস্যুদলের রাজার চিহ্ন হিসেবে এবারের সাজের সঙ্গে এটি যুক্ত হয়। দস্যুদলের শরীর যথাসম্ভব জামা, পাজামা ও পাগড়িতে ঢাকা হয়েছিল, কাবুলিদের অনুকরণে, যাতে তাঁদের শরীরের কোনো অংশ বিশিষ্ট মহিলা অতিথিদের চোখে না পড়ে।

এই গীতনাট্য প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়ে বিশেষ করে বলার প্রয়োজন আছে। সে যুগের কলকাতা থিয়েটারগুলিতে বিলাতি আদর্শে সিন এঁকে এবং অন্য উপায়ে যেভাবে মঞ্চকে রিয়েলিস্টিক্ সাজে সাজানোর চেষ্টা করা হত তাঁদের বাড়ির মঞ্চসজ্জাতেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দের বাল্মীকি-প্রতিভার মঞ্চসজ্জার যে বর্ণনা রেখে গেছেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া' গ্রন্থে তাতে তার সাক্ষ্য মেলে। দুটো তুলোর বক, খড়ভরা একটা মরা হরিণ, সিনে আঁকা কচুবনে বরাহ ও বটের ডালপালা লাগানো হয়েছিল মঞ্চে। টিনের নল দিয়ে বর্ষার গানের সময় মঞ্চে জল ছাড়া, আয়না দিয়ে বিদ্যুতের আলো, টিন বাজিয়ে কড়্ কড়্ শব্দ, দোতলার ছাদ থেকে দুটো দম্বল গড়গড় করে এধার ওধার গড়ানো, টাট্টুঘোড়ার পিঠে লুঠের মাল নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ এবং ঘোড়াকে মঞ্চে ঘাসটাস খাওয়ানোর দৃশ্যে নিমন্ত্রিত মেম ও সাহেবরা মহাখুশি হয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে গুরুদেবের ৩২ বৎসর বয়স পর্যন্ত অভিনয়ে, সংগীতে ও সাজ-সজ্জায় বিলেতের প্রভাব কতখানি প্রবল। বিলাতি সংগীতের প্রতি সে বয়সেও তাঁর ভালোবাসা কতখানি গভীর ছিল তা জানা যায় তাঁর সে যুগের কয়েকটি চিঠি থেকে। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়—

"এবারে চলে আসবার আগে যেদিন একদিন দুপুর বেলায় স পার্ক স্ট্রীটে এসেছিলেন, তুই পিয়ানোয় বসেছিলি, আমি গান গাবার উদ্যোগ করেছিলুম...।"

আর-একটি চিঠিতে লিখছেন— "বেলি [প্রথম কন্যা] যদি দেশী এবং ইংরাজি সংগীতে বেশ ওস্তাদ হয়ে ওঠে তাহলে আমার অনেকটা সাধ মিট্‌বে।

"আমার ভারি ইচ্ছা করছিল আমি এই রকম করে শুয়ে থাকি আর পাশের ঘর থেকে কেউ আপন ইচ্ছামত পিয়ানোতে একটার পর একটা বাজনা বাজিয়ে যায়। তার মধ্যে আমার সেই Chopinটাও থাকে। মনের ভিতর এই রকম যে-ইচ্ছা জন্মায়, সেই ইচ্ছাটা অপরিতৃপ্ত থাকলেও তার ভিতরে একরকমের সুখ আছে।"

গুরুদেবের বিলাতি সংগীতানুরাগের কথা উল্লেখ করে ইন্দিরা দেবী লিখেছেন—

"আমি অবশ্য রবিকাকার অনেক বিলিতি গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজিয়েছি, সে-সব এখনো সেদিনের মূক সাক্ষী-স্বরূপ আমার গানের বাঁধানো বইয়ে পড়ে আছে, যথা,

'In the gloaming',
'Then you will remember me',
'Good night, good night, beloved',

সুইন্‌বার্নের '*If*' ইত্যাদি। এছাড়া বেন্ জন্‌সনের বিখ্যাত গান।

'Drink to me only with thine eyes' ভেঙে লিখেছিলেন 'কতবার ভেবেছিনু'। আর-একটা গান, রোমান ক্যাথলিকদের বিখ্যাত স্তব 'আভেমারিয়া', রবিকাকা পিয়ানো ও বেহালার যুগল সংগতে গাইতেন, সেটি আমার বড়ো ভালো লাগত।... 'Darling you are growing old' প্রভৃতি ইংরিজি গানের সুরও মজা করে টেনে টেনে গাইতেন।"[৩]

এইভাবে, ১৭।১৮ বৎসর বয়স থেকে ৩৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিলাতি কণ্ঠসংগীতের সার্থক চর্চার সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা পাই। এবং ইয়োরোপীয় সংগীত বিষয়ে তাঁর জ্ঞান যে বিলাতপ্রত্যাগত অন্যান্য শিক্ষিত ভারতীয়দের মতো শৌখিন ছিল না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই ইয়োরোপীয় সংগীতবিষয়ে তাঁর মতামতের মূল্য যথেষ্ট আছে বলেই মনে করি।

প্রথম-যৌবনে ইয়োরোপীয় সংগীতের পূর্ণ সমর্থনে ভারতীয় সংগীতের উদ্দেশ্যে বিরূপ মতামত তিনি প্রকাশ করেন, কিন্তু দেখা যায়, তিরিশ বছরের কাছাকাছি বয়সে তিনি প্রথম অনুভব করছেন যে, উভয় দেশের সংগীতের প্রকৃতি এক নয়, দুয়ের মধ্যে প্রচুর প্রভেদ বর্তমান। ১৮৯০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' থেকেই তা প্রথম জানতে পাই। সেই সময় থেকে তিনি উভয় দেশের সংগীতের প্রকৃত স্বরূপটি যে কী এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন। ডায়ারি বা দিনলিপির ১০ অক্টোবর তারিখে লিখছেন—

"...এখন অভ্যাসক্রমে য়ুরোপীয় সংগীতের এতটুকু আস্বাদ পাওয়া গেছে যার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে, যদি চর্চা করা যায় তাহলে য়ুরোপীয় সংগীতের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশী সংগীত যে আমার ভালো লাগে সে কথার বিশেষ উল্লেখ করা বাহুল্য। অথচ দুয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ জাতিভেদ আছে তার আর সন্দেহ নেই।"

এরই দিন ছয় পরে আবার লিখলেন—

"আমার কাছে ইংরাজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরাজি সংগীত লোকালয়ের সংগীত, আর আমাদের সংগীত প্রকাণ্ড নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় বিষাদের সংগীত।"

---

৩ রবীন্দ্রস্মৃতি

দুই দেশের সংগীতের তুলনামূলক গুরুদেবের এই চিন্তা প্রায় বছর চার পরে, ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের এক চিঠিতে আরো বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হল। তিনি লিখলেন—

"আমার মনে হয় দিনের জগৎটা য়ুরোপীয় সংগীত, সুরে-বেসুরে খণ্ডে-অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্মনির জটলা— আর, রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত, একটি বিশুদ্ধ করুণ গম্ভীর অমিশ্র রাগিণী। দুটোই আমাদের বিচলিত করে, অথচ দুটোই পরস্পর বিরোধী।... কী করা যাবে।... আমরা ভারতবর্ষীয়েরা সেই রাত্রির রাজত্বে থাকি— আমরা অখণ্ড অনাদি দ্বারা অভিভূত। আমাদের নির্জন এককের গান, য়ুরোপের সজন লোকালয়ের সংগীত। আমাদের গান শ্রোতাকে মনুষ্যের প্রতিদিনের সুখ দুঃখের সীমা থেকে বের করে নিয়ে নিখিলের মূলে একটি সঙ্গীবিহীন বৈরাগ্যের দেশ আছে সেইখানে নিয়ে যায়— আর য়ুরোপের সংগীত মনুষ্যের সুখ দুঃখের অনন্ত উত্থান-পতনের বিচিত্রভাবে নৃত্য করিয়ে নিয়ে চলে।"

ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় সংগীতের স্বরূপ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তা এর পর থেকে একই খাতে জীবনের শেষ পর্যন্ত বয়ে গেছে। ১৯১১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর জীবনস্মৃতি-র 'বিলাতি সংগীত' নামে পরিচ্ছেদে দুই দেশের সংগীতের এই পার্থক্যের পুনরালোচনা করে বললেন—

"য়ুরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তবজীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। তাই দেখিতে পাই, সকল রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া য়ুরোপে গানের সুর খাটানো চলে; আমাদের দিশি সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভুত হইয়া পড়ে, তাহাতে রস থাকে না। আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, এই জন্য তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য;...

...য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে একদিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত, এ সংগীত রোমান্টিক।... ইহা মানব জীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সংগীতে কোথাও কোথাও সে-চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে-চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই।"

এ ছাড়া তার প্রথম-যৌবনের যে বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, গায়কেরা "গানের কথার সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।" তখনকার তাঁর এই মতটি যে ভ্রান্ত, এবারেই প্রথম বিনা দ্বিধায় তিনি তা স্বীকার করছেন, এবং বলছেন—

"যে মতটিকে [১৮৮১ খৃস্টাব্দের বক্তৃতা] তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে-মতটি যে সত্য নয়, সে-কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহন মাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো; বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে?

বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এইজন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভালো। হিন্দুস্থানি গানের কথা সাধারণত এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রচার করিতে পারে। এইরূপে রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপ ভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সংগীতের উৎকর্ষ। কিন্তু বাংলাদেশে বহুকাল হইতে কথারই আধিপত্য এত বেশি যে এখানে বিশুদ্ধ সংগীত নিজের স্বাধীন অধিকারটি লাভ করিতে পারে নাই। সেই জন্য এ দেশে তাহাকে ভগিনী কাব্যকলার আশ্রয়েই বাস করিতে হয়। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাবুর গান পর্যন্ত সকলেরই অধীন থাকিয়া সে আপনার মাধুর্য বিকাশের চেষ্টা করিয়াছে।... গান রচনা করিবার সময় এইটে বার বার অনুভব করা গিয়াছে।"

পরবর্তী বাকি জীবন, সংগীত বিষয়ক বহু লেখায়, উভয় দেশের সংগীতের আলোচনার সময় তিনি একই অভিমতের পুনরুক্তি করে গেছেন নানা ভাবে। পূর্ণরূপে সুগঠিত এই মত। তাই এর কোনো পরিবর্তন আর ঘটে নি।

প্রভাবের এই আলোচনা থেকে যে কটি মূল তথ্য আমরা পেলাম, তা হচ্ছে—

১৮৮১ থেকে ১৮৮৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ইয়োরোপের সংগীতচিন্তার প্রভাবে গীতিনাটক রচনা ও তার অভিনয়ের প্রতি অত্যধিক আগ্রহ।

গীতিনাটকের গানগুলি, অভিনয়কালে গাইবার যে পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল তা প্রাচীন বা প্রচলিত কোনো প্রকার ভারতীয় গীতি নাটকের আদর্শ অনুযায়ী নয়।

গীতিনাটকের ভারতীয় সুরের গানগুলি ইয়োরোপীয় সংগীতচিন্তার প্রভাবে যে ভাবে রচিত এবং গীত হয়েছিল তাকে আমরা বলব সমন্বয়ধর্মী প্রভাবের ফল।

বিলাতি গান-ভাঙা যাবতীয় বাংলা গান গীতিনাটকের যুগেই রচিত হয়। সংখ্যায় বেশির ভাগ রচিত হয়েছিল গীতিনাটককে অবলম্বন করে।

অনেকে, ইংরাজি ভাঙা বাংলা গানকেই প্রভাবের একমাত্র লক্ষণ বলে মনে করেন। আমাদের মতে তা ঠিক নয়। এ গানের সংখ্যার স্বল্পতায় এবং রবীন্দ্রনাথের ৩৭ বৎসর বয়সের পর থেকে ভাঙা-গান আর রচিত না হওয়াতে, স্বভাবতই বলা যেতে পারে যে, আজীবন প্রেরণা যোগাবার মতো সুরের ঐশ্বর্যের সন্ধান তিনি এর মধ্যে আর পান নি। এ ছাড়া, ভাঙা-গানগুলি সুরের দিক থেকে হুবহু অনুকরণজাত বলেই গুরুদেবের মনে এভাবে গান রচনায় আর উৎসাহ জাগে নি। তাই ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রকৃত প্রভাব যে কোথায় তা খুঁজতে হবে অন্যত্র। গীতিনাটকের গান রচনার সময় তার সূত্রপাত এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত সেই প্রভাব রবীন্দ্রসংগীতে নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে। একে বলা চলে উভয় ধারায় সমন্বয়ধর্মী প্রভাব।

কালীঘাটের পট

বিমলকুমার দত্ত

শক্তিপূজার একান্নটি কেন্দ্রের মধ্যে কালীঘাট অন্যতম প্রধান। ১৮০৯ খৃস্টাব্দে আদিগঙ্গার তীরে শ্রীশ্রীকালীমন্দির-নির্মাণের সময় হইতে কলিকাতা নগরীর বিকাশপর্ব শুরু হয় এবং কলিকাতা নগরীর ক্রমোত্থান-ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে কালীঘাটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তীর্থক্ষেত্র হিসাবে কালীঘাটের যশ লোকের মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়ে এবং তীর্থযাত্রীদের আনাগোনায় কালীঘাট ও পার্শ্বস্থ অঞ্চল মুখরিত হইয়া ওঠে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই এ দেশের ধন জ্ঞান ও কর্মপ্রচেষ্টার উদ্‌ভব বিকাশ ও বিলয় তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করিয়া। সে কারণ তীর্থস্থান ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্ররূপে পরিণত হয় এবং তীর্থক্ষেত্রে দেবদেবীর মূর্তি ও চিত্রাদি বেচাকেনার সুযোগ-সুবিধা স্থায়ী হয়। ১৮২৫-২৬ সাল হইতে কালীঘাট-কেন্দ্রে দেবদেবীর পটচিত্র অঙ্কন ও অতি অল্প দামে তাহা বিক্রয় করা শুরু হয়। পটচিত্রের চাহিদাবৃদ্ধি লক্ষ করিয়া বাংলাদেশের নানান জেলা হইতে পটুয়ার দল এখানে আসিয়া ভিড় জমাইতে আরম্ভ করেন। এই-সকল রেখাসর্বস্ব পটচিত্র কালীঘাটের পট নামে খ্যাত।

কালীঘাটের শিল্পীগোষ্ঠী পটচিত্র ছাড়াও কাঠ ও মাটির খেলনা পুতুল ও দেবদেবীর মূর্তি তৈয়ারি করিতেন।[১] মাটির মূর্তিগুলির রেখা ঢং ও ডৌল পটচিত্রের মধ্যে বিশেষভাবে রূপায়িত। শুধুমাত্র কালীঘাট বা উহার পার্শ্বস্থ অঞ্চল সমূহেরই নয়, সারা বাংলাদেশের বিশেষত দক্ষিণ বাংলার মাটির পুতুল তৈয়ারির ঢং লক্ষ করিলে কালীঘাটের রেখাসর্বস্ব পটচিত্রগুলির জন্ম-ইতিহাসের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

কালীঘাটের শিল্পীদল পটুয়া নামে খ্যাত। ইঁহারা সূত্রধরের ন্যায় মন্দিরনির্মাণ, মাটির পুতুল ও খেলনা তৈয়ারি, নানাপ্রকার দেবদেবীর ও সামাজিক চিত্র রূপায়ণ এবং প্রতিমা ও মন্দিরের অলংকরণের কাজে দক্ষ ছিলেন। কলিকাতা শহরের যে অংশে মূলত তাঁহাদের বসতি ছিল তাহা আজও পটুয়াটোলা নামে খ্যাত।

কালীঘাটের পটুয়াদিগের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত আজিও সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। তবে এই শিল্পধারার প্রথম যুগের শিল্পীদিগের মধ্যে নীলমণি দাস, বলরাম দাস ও গোপাল দাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে নিবারণচন্দ্র ঘোষ, কালীচরণ ঘোষ

---

১ *The History of Bengal (1757-1905)* : University of Calcutta : p. 537

ও কানাইলাল ঘোষ পটচিত্র অঙ্কনে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শেষোক্ত তিনজন শিল্পী দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার গড়িয়া নামক স্থান হইতে আসিয়া কালীঘাটে পাকাপাকিভাবে বসবাস করেন; তাঁহারা ছিলেন জাতিতে সদ্‌গোপ। এই সময়ে বটকৃষ্ণ পাল, পরান দাস ও বলাই বৈরাগী নামে তিনজন শিল্পীরও উল্লেখ পাওয়া যায়।[২]

কালীঘাটের পটুয়ারা ছিলেন মূলত লোকশিল্পাশ্রয়ী, সে কারণ দেব-দেউলের ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের অধিকার তাঁহাদের ছিল না। তদানীন্তন দেব-দেউল ভিত্তিচিত্রের সন্ধান চব্বিশ-পরগনার বহড়ু গ্রামের শ্যামসুন্দর-মন্দিরে, বীরভূমের ইলামবাজার ও দুবরাজপুরে শিবমন্দিরে, হুগলীর গুপ্তিপাড়া বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরে, বাজিতপুরের দশভূজা-মন্দিরে পাওয়া যায়। বহড়ুর শ্যামসুন্দর-মন্দির ১২৩২ বঙ্গাব্দে নির্মিত হয় এবং উহার মধ্যস্থ ভিত্তিচিত্র নির্মাণ করেন দুর্গাচরণ ভাস্কর।

১৮২৫-২৬ হইতে ১৯২৫-২৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কালীঘাটের পটুয়ারা রেখাসর্বস্ব চিত্রকে কেন্দ্র করিয়া নিজেদের পসার জমাইয়াছিলেন। এতদিন তাঁহারা যে সমাজের উপর নির্ভর করিয়া ছিলেন সেই সমাজের কাঠামো ইয়োরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া দুর্বল হইয়া পড়িল এবং সস্তা বিদেশী ছাপানো পট আসিয়া হাতে-আঁকা পটের চাহিদা পূরণ করিতে লাগিল। ইহা ব্যতীত কলিকাতার নবপ্রতিষ্ঠিত আর্টস্কুলের ছাত্ররা দেবদেবীর লিথোগ্রাফ তৈয়ারি করিয়া স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে শুরু করিলেন। এই-সকল কারণে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতেই কালীঘাট-পটের চাহিদা হ্রাস পাইতে লাগিল এবং পটুয়াগোষ্ঠী প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কালীঘাট ছাড়িয়া নবদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থস্থানে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বৎসর কালের মধ্যে কালীঘাট-চিত্রশিল্পের ধারা ক্রমশ বিলুপ্ত হইল।

বিষয়বস্তু অনুযায়ী কালীঘাটের পটচিত্র মোটামুটি ছয়ভাগে ভাগ করা যায়—

১ পৌরাণিক চিত্র
২ ঐতিহাসিক চিত্র
৩ সামাজিক চিত্র ও প্রতিকৃতি
৪ পশুপক্ষীর চিত্র
৫ গল্পচিত্র
৬ ব্যঙ্গচিত্র

পৌরাণিক চিত্রগুলির মধ্যে কৃষ্ণলীলা, শিবদুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, জগন্নাথ রামায়ণের কাহিনী ও লৌকিক দেবদেবীর (যেমন শীতলা) রূপায়ণ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

লক্ষ্মীবাঈ, গোরা সৈন্যের চলাচল, আদালতে খুনের বিচার, শ্যামাকান্তের বীরত্ব প্রভৃতি চিত্রগুলি ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

---

২ ক ভারতের চিত্রকলা, অশোক মিত্র, পৃ. ২৫২

খ *Kalighat Pots Annals and Appraisal* : Prodyot Ghosh : pp. 16-17.

তদানীন্তন সমাজচিত্র, যথা, মোহন্ত-এলোকেশী রহস্য, নরনারীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিভিন্ন প্রকাশ, বহুবিবাহ ও স্ত্রৈণ স্বামী, মদ্যপ স্বামীর অত্যাচার ইত্যাদি কালীঘাট-পটে বিশেষ স্থান লাভ করে।

চতুর্থ গোষ্ঠীর মধ্যে বিড়াল, মাছ, বিড়ালের মাছ বা পাখি শিকার, অথবা সাপের ব্যাঙ শিকার, পায়রা, গাছের ডালে দুটি টিয়া, সিংহ, শিয়াল, হরিণ প্রভৃতির জীবন্ত চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লোকশিক্ষা-বিস্তারে উপদেশমূলক গল্পকাহিনীর বিভিন্ন ধারাও কালীঘাটের পটে লক্ষ করা যায়। ইহা ব্যতীত তদানীন্তন ধর্ম ও সমাজ-জীবনের নানাপ্রকার অনাচার ও কুসংস্কারকে কষাঘাত করার উদ্দেশ্যে কালীঘাটের পটুয়ারা ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়া সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই-সকল ব্যঙ্গচিত্র সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করিয়া দেয়।

এই-সকল পটচিত্রে বাঙালির মনের ধর্মবিশ্বাস, লৌকিক সংস্কার, সাধ-আহ্লাদ, আশা-ভরসা ও কামনা-বাসনার মূর্তি প্রতিফলিত। ইহাদিগের মধ্যে দুইটি মূল ধারা লক্ষ করা যায়— একটি ধর্ম-চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও অন্যটি পরিবেশ-চেতনার দ্বারা প্রভাবিত। কালীঘাট-পটে পৌরাণিক চিত্র ব্যতীত অন্য সকল চিত্রই পরিবেশ-চেতনার সক্রিয় বোধ ও প্রয়োজন দ্বারা চালিত।

পটচিত্রের মধ্যে দেবদেবী ও পৌরাণিক চিত্রের সংখ্যাই অধিক। কালীঘাট-শিল্পযুগের প্রথমপর্বে ধর্মস্থানের মাহাত্ম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ও পসার জমাইবার জন্য পটুয়ারা কেবলমাত্র দেবদেবীর চিত্র ও পৌরাণিক চিত্র আঁকিতেন। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে যে-সব শিশু আসিত তাহাদের জন্য পশুপক্ষীর চিত্রও আঁকা হইত। বাংলার সহজ সরল ধর্মভীরু মানুষ এই-সকল পটচিত্র অতি সুলভ মূল্যে কিনিয়া পূজাগৃহে রাখিয়া ধূপধুনা জ্বালাইয়া পূজা করিতেন। এইভাবে কালীঘাটের পটের ধারা ও চাহিদা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে তাহারা ঐতিহাসিক, সামাজিক, গল্পচিত্র ও ব্যঙ্গচিত্র রূপায়ণে তৎপর হন। এই সময় কালীঘাট-পটের চাহিদা ক্রমশ বাড়িতে আরম্ভ করে এবং বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইতে থাকে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে যখন ইহাদের চাহিদা হ্রাস পাইতে শুরু করিল তখন পটুয়ারা জীবনমরণ-সংগ্রামের মুখোমুখি আসিয়া পটগুলি অধিকতর চটক্‌দার করিবার উদ্দেশ্যে রেখার সহিত রঙের ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়কার পটচিত্রে কালো, হলুদ, নীল ও লাল রঙের ব্যবহার করা হইত। রঙের ব্যবহারে পটচিত্রগুলি রঙীন লিথোগ্রাফের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অধিকার লাভ করিল সত্য কিন্তু তাহারা পটচিত্রের সারল্য হারাইয়া ফেলিল।

ছন্দোময় বলিষ্ঠ রেখার একাত্মবোধ কালীঘাট-পটের বৈশিষ্ট্য। অশিক্ষিত গ্রাম্য পটুয়া সাধারণ তুলির স্পর্শে অবিচ্ছিন্ন গতিতে দেহের অঙ্গভঙ্গি, বলিষ্ঠ ও কমনীয়ভাব এবং মনের ও দেহের ভাবাবেগ কিরূপ সার্থকতার সহিত কাগজের উপর ফুটাইয়া তুলিতেন

তাহা অদ্যাবধি আমাদের বিস্ময় ও প্রশংসার উদ্রেক করে। রেখার আভিজাত্য, ছন্দোবোধ ও সহজ ধারা ইহাদিগকে শিল্পসমাজে কৌলীন্যের অধিকার দান করিয়াছে। মন্দিরের আশেপাশে অন্ধকার গলির ছোটো ছোটো দোকানঘরে বিক্রয় হইত বলিয়াই ইহাদিগকে হেটো ছবি বা Bazar Paintings বলিলে কালীঘাট-পটের মর্যাদা নষ্ট হয় না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, রেখাসর্বস্ব এই চরিত্র কালীঘাট-পট কোথা হইতে পাইল?

ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেই দেখা যায় যে ভারতীয় চিত্রধারার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে রেখার দক্ষতা, রেখার গতিছন্দ ও রেখার বলিষ্ঠতা। মডেলিং, আলোছায়া, দূরত্ব নির্ণয় ও রঙ— এ-সব গৌণ। ভারতীয় শিল্পীর সার্থকতা এই রেখার গুণাগুণ আয়ত্ত করা, রেখার মধ্য দিয়া ছন্দ ও ভাব প্রকাশ করা। ভারতীয় শিল্পের এই শক্তি ও তেজ অজন্তা ও বাগ গুহায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তী শিল্পধারায় সম্পূর্ণ বিবর্তিত।

বাংলার চিত্রশিল্পধারা সর্বভারতীয় ধারার অনুক্রম মাত্র। বাংলা দেশের পাল ও পরবর্তী যুগের পুঁথিচিত্র-শিল্পের ধারান্তর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রবহমান রেখার এই মণ্ডনায়িত গতিই এই ছবিগুলির মেরুদণ্ড। "রেখাগুলি পূর্ণ মণ্ডনায়িত এবং অপরূপ মাধুর্য ও সংবেদনশীলতায় জীবন্ত; বিন্যাসও নিখুঁত।"[৩] পুঁথিচিত্র ব্যতীত সুন্দরবন ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাম্রপটে উৎকীর্ণ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রেখাচিত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রথমটির বৃত্তান্ত ও প্রতিচিত্র আনন্দকুমার কুমারস্বামীর *Portfolios of Indian Art* নামক গ্রন্থে প্রকাশিত। দ্বিতীয় চিত্রটি রাজা ডোম্মনপালের সুন্দরবন তাম্রপটে এবং তৃতীয়টি চট্টগ্রাম জেলার মেহার গ্রামে প্রাপ্ত দেবরাজের তাম্রপটে অঙ্কিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে এগুলি সযত্নে রক্ষিত আছে। এগুলি ত্রয়োদশ শতকের বাংলার চিত্রশিল্প-ধারার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।[৪] ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের মতে "উভয় চিত্রেই তীক্ষ্ণ রেখার দ্রুত রূপায়ণ এবং সে রূপায়ণে সজীব প্রবহমানতা অব্যাহত; অবিচ্ছিন্ন গতিও অক্ষুণ্ণ। তবে বেশ বোঝা যায়, যেখানেই সামান্য সুযোগ পাইয়াছেন শিল্পী সেইখানেই চঞ্চল বঙ্কিম রেখাপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।... মনে হয়, শিল্পী যেন তীক্ষ্ণ দ্রুত রেখার বিলাসে প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, কারণ রঙের মণ্ডনায়িত রূপায়ণ যেখানে নাই সেখানে শিল্পীর হাতে রেখাই বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন। চঞ্চল দীর্ঘায়িত বঙ্কিম রেখা সৃষ্টির প্রচেষ্টার মধ্যে এই কামনা প্রত্যক্ষ।"[৫]

বাংলাদেশের পরবর্তী পাটাচিত্র, জড়ানো পটচিত্র, বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস প্রভৃতির বহিঃরেখার সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য এবং সাবলীল গতি লক্ষ করিলে বুঝা যায়

---

৩ বাঙ্গালির ইতিহাস, আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৮০৪

৪ *History of Bengal :* Dacca University (Chapter on Painting), Vol. 1

৫ বাঙ্গালির ইতিহাস, আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৮০৬

যে, প্রবহমান রেখাসৃষ্টির ধারাটি কিছুটা প্রচ্ছন্নভাবে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রবাহিত। এই যুগের উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশ রেখার প্রাধান্যকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করিলেও রেখা-বিন্যাসের ঐতিহ্য বর্ণসমাবেশের আড়ম্বরকে অধিকতর সুস্পষ্ট ও আবেগময় করিতে সাহায্য করিয়াছে।[৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত বীরভূমে জয়দেব কেন্দুলী ও বর্ধমানে বনকাটীর পিতলের রথের গাত্রে খোদিত চিত্রগুলি বাংলার রেখাচিত্রের গৌরব আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এই রথের গাত্রে খোদিত পৌরাণিক চিত্রগুলি অপূর্ব গতিশীল ছন্দোময় রেখায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত।[৭] একমাত্র রেখা অবলম্বনে সজীব ও গতিছন্দোময় এরূপ সংগীত পূর্বে আর কোথাও শ্রুত হইয়াছে কিনা তাহা জানা নাই। এই সংগীতের মূর্ছনা বাংলার ঢাকা, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ, মালদহ, রাজশাহি, বাঁকুড়া, বর্ধমান, নদীয়া ও চব্বিশ-পরগনার পটচিত্র, মাটির পুতুল, লক্ষ্মীসরা, মনসার ঘট প্রভৃতির মাধ্যমে তরঙ্গায়িত। ধর্ম ও অর্থের বিশেষ প্রেরণায় কালীঘাটে এই রেখাচিত্রের এক বিশেষ পরিণত রূপ লক্ষ করা যায়।

কালীঘাটের পটুয়া সাধারণ কাগজে সংবেদনশীল তুলির দ্রুতগতির সাহায্যে অতি অল্প সময়ে একান্ত বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে এক-একটি ছবি সম্পূর্ণ করিতেন। রেখার গতির মধ্যে কোথাও অবিশ্বাস, ক্ষণিকের দুর্বলতা বা শ্রীহীনতা লক্ষ করা যায় না। শিল্পী অতি স্বাচ্ছন্দ্যে একই রেখাকে দ্রুত চালনা করিয়া এক-একটি চিত্র সম্পূর্ণ করিতেন কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোথাও ছন্দোভঙ্গ হয় নাই, তুলির টানে অপ্রয়োজনে কালি মোটাসরু হয় নাই অথবা রেখার ছন্দ ও গতির মধ্যে কোনোরূপ বাদ-বিসম্বাদ হয় নাই। পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ হইতে সাহায্য করিয়াছে।

এখানে আর-একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়— সেটি হইতেছে রেখার বাস্তবতাবোধ রেখার মধ্য দিয়া শিল্পী পুরুষ-দেহের গতিশীল শক্তি, নারীর শান্ত ও সুকোমল শ্রী ও কমনীয়তা, জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থায় দেহরেখার দ্বিবিধ ভাব; ভক্ত ও সাধকের চোখের ও ঠোঁটের কোলে আত্মতৃপ্তি; শিকারী বিড়ালের গোঁফ ও চোখের মধ্য দিয়া পাওয়া ও না-পাওয়ার আশঙ্কা; সিংহের হিংস্র চক্ষু ও মঠমন্দিরের প্রাণহীন কঠিন সত্তা নিপুণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। নারীর শ্রীরূপ পরিপূর্ণ রূপায়ণে হাতের ও আঙুলের বাঁক অথবা শাড়ি বা কুন্তলের ভাঁজে রেখার মাধুর্য পরিস্ফুট।

কালীঘাটের রেখাসর্বস্ব পটচিত্র রূপ ও রসে ভরপুর; শ্রী ও শক্তির সার্থক ও পরিণত রূপ। ইহা বাংলার রেখাচিত্র-ধারার পূর্ণতম প্রকাশ এবং সর্বভারতীয় চিত্ররীতির একটি বিশিষ্ট গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

১৩৭৭ বৈশাখ

---

৬ *Old Bengal Painting :* Ajit Ghosh, J.I.S.O.A. July-Oct. 1926 p. 103

৭ *A Brass Chariot from Bengal :* by G. S. Datta. J.I.S.O.A. Vol. IX, 1941.

বাংলার ডোকরাশিল্প ও শিল্পীজীবন

বিনয় ঘোষ

বাংলার ডোকরা কামারদের ধাতুশিল্প একটি অতিপ্রাচীন লোকশিল্পের নিদর্শন তো বটেই, সাংস্কৃতিক সমান্তরতারও একটি বিশেষ উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত। মানবসভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের পূর্বকালের অনেক বড়ো বড়ো যুগান্তকারী আবিষ্কার (inventions) যেমন অগ্নি-উৎপাদন, কৃষি বা ফসল-উৎপাদন— অনেক ক্রমায়ত শিল্পকর্ম (traditional arts and crafts), যেমন কাঠখোদাইশিল্প মৃৎশিল্প ধাতুশিল্প— এবং জীবন ও পরিবেশগত অনেক রহস্যচিন্তা, যা থেকে ধর্মের উৎপত্তি— তার বিকাশ হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও ভৌগোলিক অঞ্চলে স্বতন্ত্রভাবে, মোটামুটি সভ্যতার সমস্তরে, জীবনযাত্রার অনুরূপ বাধ্যতায় ও প্রয়োজনে। দৈশিক দূরত্ব তার যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু কালিক দূরত্ব সামান্য। সংস্কৃতিবিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা বিচ্ছুরণবাদী (diffusionist), একদা তাঁদের ধারণা ছিল যে এই-সব জনকৃতির বিকাশ হয়েছে এক-একটি বিশেষ ভৌগোলিক কেন্দ্রে এবং অতঃপর সেখান থেকে অন্যান্য জনপদে তার প্রসারণ ও বিচ্ছুরণ হয়েছে। কিন্তু এই ধারণা আধুনিক মানববিজ্ঞানের গবেষণার আলোয় একরকম ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে বলা চলে। বিভিন্ন দেশে ও ভৌগোলিক কেন্দ্রে, সদৃশ সংস্কৃতিকর্মের স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল বিকাশের ধারা আধুনিক মানববিজ্ঞানীরা পর্যাপ্ত তথ্যসহযোগে প্রমাণ করেছেন, এবং এই ধারাকেই তাঁরা সাংস্কৃতিক সমান্তরতা (cultural parallel) বলেন। এই সমান্তর সংস্কৃতির ঐতিহাসিক নিদর্শন কৃষিকাজ, লিখনপ্রণালী (writing) ব্রোঞ্জ ইত্যাদির মতো মোমছাঁচ-গলানো ঢালাইরীতির ধাতুশিল্পও (lost wax বা *cire perdue* metal casting) অন্যতম নিদর্শন। বাংলার ডোকরাশিল্প এই বিশিষ্ট রীতি-অনুগামী ধাতুশিল্প, এবং এটি একটি অতিপ্রাচীন ভারতীয় জনকৃতিধারা, কোনো বিদেশাগত ধারা নয়। দৈশিক ব্যবধানের দিক থেকে দেখা যায়, ভারতবর্ষ থেকে মালয়-এশিয়া, প্রাচীন মিশর, আফ্রিকা থেকে সুদূর মধ্য-আমেরিকা পর্যন্ত এই lost-wax বা মোমছাঁচ-গলানো ধাতুশিল্পরীতির বিকাশ হয়েছে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে। কালিক সামীপ্যের দিক থেকে দেখা যায়, সভ্যতার প্রায় সমস্তরে, Neolithic Age বা নবোপলীয় যুগে কৃষিকর্মের উন্নত পর্বে, যখন কারিগরি ও শ্রমকুশলতার চর্চা সম্ভব হয়েছিল, তখন এই বিশেষ ধাতুশিল্পের বিকাশ হয়।

এই মোমছাঁচলোপী ধাতুশিল্পের প্রাচীনতার পরিষ্কার নির্দেশ পাওয়া যায় আমাদের

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র ও পুরাণাদি থেকে। মানসার, অগ্নিপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে এই ধাতুশিল্পরীতির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সংক্ষেপে শিল্পরীতিটি হল এই : স্থপক ও স্থপতি, অর্থাৎ শিল্পী প্রার্থনাদি ধর্মীয় ক্রিয়া-অনুষ্ঠান শেষ করে, ঢালাইয়ের জন্য চুল্লি এবং মূর্তির জন্য মোমছাঁচ তৈরির কাজ শেষ করবেন। মোমের সঙ্গে ধুনো ও তেলের আনুপাতিক মিশ্রণের কাজ সাবধানে করতে হবে। তার পর যে-মূর্তি গড়া হবে, সেটি শিল্পী বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে মোম-ধুনো-তেলের মিশ্রিত পিণ্ড দিয়ে তৈরি করবেন। ধ্যান করে নিখুঁতভাবে মূর্তি রূপায়িত করার কথা বলা হয়েছে শিল্পশাস্ত্রে। মোমছাঁচের উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে তাতে গলিত ধাতু ঢেলে দেওয়ার জন্য ছিদ্র রাখা হবে। তার পর চুল্লি থেকে বার করে, জলে ঠাণ্ডা করে, ছাঁচটিকে ভেঙে ফেললে ভিতরের ধাতুমূর্তিটি বেরিয়ে আসবে, বাকি থাকবে ঘষে মেজে ঠুকে পরিষ্কার করার কাজ।

এই শিল্পরীতির মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার আছে। শিল্পটি যদিও ধাতুশিল্প Metalcraft তা হলেও ধাতুর যে আসল নিরেট সত্তা তার যেন কোনো সক্রিয় ভূমিকাই নেই এর মধ্যে। অর্থাৎ ধাতুর স্বাভাবিক সত্তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই এই ধাতুশিল্পের আশ্চর্য বিকাশ হয়েছে। এমন-কি, এর যা-কিছু শিল্পকর্ম তার সঙ্গেও আসল ধাতুর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, যাবতীয় সম্পর্ক ধাতু-নয় এমন-সব বস্তুর সঙ্গে, যেমন মোম, ধুনো মাটি ইত্যাদি। ধাতুর প্রধান ভূমিকা হল এখানে নিজের কঠিন সত্তাটিকে আগুনের তাপে বিগলিত ও তরলিত করে ধাতুশূন্য ছাঁচের মধ্যে প্রবেশ করা এবং তারই অভ্যন্তরে রূপান্তরিত হয়ে পুনরায় নিরেট কঠিন হয়ে যাওয়া। প্রক্রিয়াটি আপাতদৃষ্টিতে খুব সরল মনে হলেও, ধাতুশিল্পের বিকাশের ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডোকরাশিল্প বা মোমছাঁচলোপী ধাতুশিল্পের আলোচনাকালে সাধারণত এই গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না। নবোপলীয় যুগের আদিম কৃষিজীবী মানুষ যখন দেখল যে কঠিন নিরেট ধাতু আগুনের তাপে গলানো যায়, তখন কীভাবে তাকে প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরির কাজে লাগানো যায়, সে-কথা তারা ভাবতে থাকল। তাদের ভাবনার সবচেয়ে সহজ সমাধান এই পন্থা বা রীতি, এবং সেটা অতি সহজেই তারা মৃৎশিল্পীর (clay-modeller's) অভিজ্ঞতা থেকেই উদ্‌ভাবন করল। কাজটা এক্ষেত্রে সবটুকুই প্রায় প্রধানত মৃৎশিল্পীর, এবং পরিষ্কার বোঝা যায় যে নবোপলীয় যুগের মৃৎশিল্প থেকে chalcolithic বা তাম্রপ্রস্তর যুগের ধাতুশিল্পে উত্তরণকালে এই মোমছাঁচলোপী ধাতুশিল্পরীতির বিকাশ হয়। ভারতের সিন্ধুসভ্যতা ও প্রাচীন মিশরের এই রীতির ধাতুশিল্প-নিদর্শন থেকে তা প্রমাণিত হয়। প্রত্নবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরাও এ কথা স্বীকার করেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে, বাংলার ডোকরাশিল্প একটি অতিপ্রাচীন ধাতুশিল্প, প্রত্নবিজ্ঞানের বিচারে প্রায় পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন, এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও এই সুপ্রাচীন লোকায়ত শিল্পধারা আজ পর্যন্ত বহমান রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে, যেমন বাংলাদেশে।

পশ্চিমবঙ্গে এই শ্রেণীর ধাতুশিল্পীদের 'ডোকরা কামার' বলা হয়। কেউ কেউ 'ঢোকরা' বলেন, কিন্তু কথাটা 'ডোকরা'। যারা লোহার কাজ করে তাদের বলা হয় 'কামার' বা 'কর্মকার' বা 'লোহার', আর যারা অন্যান্য ধাতুর কাজ করে, যেমন সোনা-রূপার, তাদের বলা হয় 'স্যাকরা'। পশ্চিমবঙ্গের ডোকরারা সাধারণত 'কামার' নামেই পরিচিত, কোথাও কোথাও তারা নিজেদের 'স্যাকরা' বলেও পরিচয় দেয়। কিন্তু তাদের 'ডোকরা' বলা হয় কেন? 'ডোকরা' কথার অর্থ ইতরজন, অন্ত্যজ, নীচকুলোদ্‌ভব, যেমন—

> কোথা হইতে বুড়া এক ডোকরা বামন
> প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ। —ভারতচন্দ্র

এই অবজ্ঞাসূচক অর্থেই বাংলার এই সুপ্রাচীন লোকশিল্পের উত্তরাধিকারীদের 'ডোকরা কামার' বলা হয়। বস্তুত ডোকরারা আজ আমাদের সমাজের নিম্নতম স্তরের জীব বললেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল সামাজিক মানমর্যাদার দিক থেকে যে নিম্নতম স্তরের তা নয়, দারিদ্র্যের দিক থেকেও এই ডোকরাদের সঙ্গে বাংলার চিত্রকর বা পটুয়াদের সামাজিক জীবনের অনেক দিক থেকে সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। সে কথা পরে বলব।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে, প্রধানত বাঁকুড়া পুরুলিয়া মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায়, বর্তমানে ডোকরা কামারদের বসতি সীমাবদ্ধ। তার মধ্যে দেখা যায়, মেদিনীপুরে কোনো কোনো অঞ্চলের (যেমন খড়্গপুর) এবং বর্ধমানের (যেমন আউসগ্রাম থানার দরিয়াপুর) ডোকরারা বাইরে থেকে— বেশির ভাগ বাঁকুড়া থেকে এসে বসবাস করছে। বিবাহসূত্রে অথবা ভ্রাম্যমান কর্মজীবনের টানে তারা এসেছে। এই ভ্রাম্যমানতা একদা ডোকরা জীবনের বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল, এখনো কিছু কিছু আছে পুরুলিয়া অঞ্চলে, তাই ডোকরাদের স্থায়ী বসতিকেন্দ্রের সংখ্যা বেশ কম। এখন তাদের প্রধান বসতিকেন্দ্র বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি গ্রাম। বর্তমানে বাঁকুড়ার বিক্‌না (বাঁকুড়া সদর থানা), লক্ষ্মীসাগর (খাতড়া থানা), বিন্ধ্যজাম ও নেতকাম্‌লা (সালতোড়া থানা) গ্রামে ডোকরাদের বসতি আছে। বিক্‌নায় দশটি পরিবার, লক্ষ্মীসাগর ও বিন্ধ্যজামে তিনটি করে পরিবার এবং নেতকাম্‌লায় পাঁচটি পরিবার বাস করে। ১৯৬৯-৭০ সালে আমার নিজের সমীক্ষার কথা বলছি। ১৯৭২ সালের মধ্যে পরিবারসংখ্যা কিছু কমে যাওয়া অসম্ভব নয়। কয়েক বছর আগে বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে রামপুরে যে ডোকরাদের বাস ছিল, সরকারী পোষকতায় শিল্পীসমবায়ের উদ্‌যোগে তাদের নতুন উপনিবেশ গড়া হয়েছে বিক্‌নায়। কিন্তু ১৯৭০ সালে বিক্‌নার এই নতুন উপনিবেশের যে চেহারা দেখেছি, তাতেও ডোকরাশিল্পীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব আশান্বিত হতে পারি নি। শ্রীমতী রুথ রিভ্‌স তাঁর *Cire Perdue Casting in India* গ্রন্থে বাংলার ডোকরাশিল্পীদের আলোচনাপ্রসঙ্গে কেবল রামপুরের ডোকরাদের (যারা এখন বিক্‌নাতে বাস করে) কথা

বলেছেন, তাদের অন্যান্য বসতিকেন্দ্র দেখেন নি। তার ফলে তাঁর বিবরণ থেকে বাংলার ডোকরাদের কথা সম্পূর্ণ জানা যায় না।

বিক্‌নার ডোকরারা এখন লক্ষ্মী গজলক্ষ্মী লক্ষ্মীনারায়ণ, গণেশ-কার্তিকসহ শিব-পার্বতী, হাতি ঘোড়া পেঁচা মাছ ময়ূর প্রভৃতি দেবদেবী ও পশুপক্ষীর মূর্তি তৈরি করে, প্রধানত শিল্পসমবায়ের ও সরকারের চাহিদা অনুযায়ী। এই পোষকতার জন্য তাদের আর্থিক অবস্থা অন্যান্য ডোকরাদের তুলনায় অনেকটা ভালো, অন্তত কয়েকজন দক্ষ কারিগরের। নেতকাম্‌লা ও বিন্ধ্যজামের ডোকরারা দেবদেবী পশুপক্ষীর মূর্তি গড়ে না, একসেরী থেকে একছটাকী পর্যন্ত নানা আকারের পাইকোনা (মাপের খুঁচি), পায়ের মল, নূপুর, সাঁওতালি নাচের ঘুঙুর ইত্যাদি তৈরি করে। লক্ষ্মীসাগরের ডোকরারা মূর্তি গড়ে এবং স্থানীয় বাজারে হাটের দিনে ও উৎসব-পার্বণের মেলায় বিক্রি করে। তবে স্থানীয় চাহিদা তেমন নেই। নেতকাম্‌লা ও বিন্ধ্যজামের ডোকরাশিল্পীরা নিজেদের 'ডোকরা' বলে পরিচয় দেয় না, 'ডোকরা' বললে ক্ষুব্ধ হয় এবং 'স্যাকরা' বলে পরিচয় দেয়। এটা সাম্প্রতিক ব্যাপার এবং এর কারণ পরে বলছি।

পুরুলিয়া (মানভূম) অঞ্চলে এই শ্রেণীর শিল্পীদের বিচ্ছিন্ন বসবাসের কথা শোনা যায়, কিন্তু তাদের খোঁজ পাওয়া মুশকিল। অনেক খোঁজখবর করে কয়েকটি মাত্র বসতির সন্ধান পেয়েছি, যেমন— নড়িহা (পুরুলিয়া টাউন থেকে মাইল দুই দূরে), আক্রো (বান্দোয়ান থেকে পাঁচ মাইল), পাবড়াপাহাড়ি (হুড়ার কাছে), কুলাবহাল (লোধুড়কার কাছে), নরকলি (মানবাজারের কাছে)। গড়ে তিন-চারটি করে শিল্পী-পরিবার বাস করে এই গ্রামগুলিতে এবং পরিবার-প্রতি দু-তিনজন কারিগর বা শিল্পী কাজ করে। পুরুলিয়ায় 'ডোকরা' কথার বিশেষ প্রচলন নেই, এই ধাতুশিল্পীরা সাধারণত 'মাল' ও 'মালহার' নামে পরিচিত। এই মাল ও মালহাররা বলে যে, বাঁকুড়া-মেদিনীপুর অঞ্চলে যারা ডোকরা ও স্যাকরা বলে কথিত, তারা একদা তাদেরই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। পরে উন্নত হিন্দুসমাজের সংস্পর্শে এসে তারা নিজেদের মাল ও মালহারদের থেকে উন্নত ভাবতে আরম্ভ করেছে। বাঁকুড়ার ডোকরাদের সম্পর্কে পুরুলিয়ার মালহারদের এই অভিযোগ আমি অনেক জায়গায় শুনেছি। অথচ বাঁকুড়ার ডোকরারা বলে যে মাল ও মালহাররা তাদের চেয়ে অনেক ছোটো জাত, আবার ডোকরা-রূপী স্যাকরারা বলে ডোকরারা ছোটো, যদিও বাঁকুড়ার হিন্দুসমাজের কাছে ডোকরাদের ও তাদেরই সগোত্র তথাকথিত স্যাকরাদের মতো ছোটো জাত এবং উপেক্ষা ও অবজ্ঞার পাত্র আর দ্বিতীয় কেউ নেই, চিত্রকররা ছাড়া। ডোকরারা যেখানে বাস করে, সমাজের সেই প্রায়ান্ধকার কানাচে পর্যন্ত এরকম সূক্ষ্ম জাতবিচার ও সামাজিক মানমর্যাদার মন-কষাকষির কথা ভাবলে বাস্তবিক অবাক হতে হয়। কিন্তু অবাক হলেও, মাল-মালহার-ডোকরা-স্যাকরাদের এই বিভেদবোধের মধ্যে সমগ্রভাবে ডোকরাশিল্পীদের জীবনের পর্বানুক্রমের আভাস পাওয়া যায়, অর্থাৎ মাল-মালহার থেকে ডোকরা-স্যাকরা পর্যন্ত বিকাশের স্তরগুলি বোঝা যায়।

ডোকরাশিল্পীদের সামাজিক জীবনের এই পূর্বানুক্রমের বিস্তারিত বিবরণের অবকাশ নেই এখানে, যদিও সেই বিবরণ অত্যন্ত মনোগ্রাহী। খুব সংক্ষেপে আমরা পরিবর্তনের ধারাটি উল্লেখ করব— ডোকরাদের বিশেষ ধাতুশিল্পরীতির পরিবর্তন নয়, কারণ তার কোনো পরিবর্তন হয় নি— শিল্পীদের সামাজিক জীবনের পরিবর্তন। প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল, দক্ষিণ বাঁকুড়ার ডোকরাদের সামাজিক সম্পর্ক (বিবাহ ইত্যাদি) মেদিনীপুর বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু উত্তর-বাঁকুড়ার ডোকরাদের সমাজের বিস্তার পুরুলিয়া সিংভূম ছোটোনাগপুরের ভিতর দিয়ে আরো দূর পর্যন্ত। এই দ্বিমুখী সামাজিক জীবনের প্রসারের তাৎপর্য পরিষ্কার। ছোটোনাগপুর-অভিমুখী সমাজ ডোকরাদের আদি ও অতীত জীবনের ধারা ইঙ্গিত করছে, দক্ষিণ বাঁকুড়া-মেদিনীপুর-বর্ধমান -অভিমুখী সমাজ হিন্দুসমাজের সান্নিধ্যজনিত ডোকরাদের পরবর্তী পরিবর্তিত জীবনধারা ইঙ্গিত করছে। আরো-একটি বিষয় লক্ষণীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় আচার-আচরণের দিক থেকে ডোকরা কামাররা না-হিন্দু না-মুসলমান, অথবা কোথাও হিন্দু, কোথাও-বা মুসলমান, যেমন পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকর-পটুয়ারা। এরকম সামাজিক জীবনের সাদৃশ্য এ দেশের আর-কোনো লোকশিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে আছে বলে আমার জানা নেই। এ ক্ষেত্রেও দেখা যায়, উত্তর-বাঁকুড়া থেকে ছোটোনাগপুর-অভিমুখী ডোকরাশিল্পীরাও আজও প্রকাশ্যে ইসলামধর্মী, অন্তত তারা যে মুসলমান সে-কথা বলতে তাদের কোনো দ্বিধাসংকোচ নেই। কিন্তু দক্ষিণ বাঁকুড়া-মেদিনীপুর -অভিমুখী ডোকরাশিল্পীরা মুসলমানত্ব স্বীকারই করতে চায় না, এ বিষয়ে ইঙ্গিত করলেও ক্ষুব্ধ হয়। তারা যে হিন্দু এ কথা বেশ জোর করেই তারা ঘোষণা করে, এবং কেউ একটু সন্দেহ প্রকাশ করে কোনো কথা বললে তৎক্ষণাৎ বসতিকেন্দ্রের তুলসীমঞ্চটি দেখিয়ে দেয়। এর জন্য অনুসন্ধানকালে মধ্যে মধ্যে আমাদের বেশ বিপদে পড়তে হয়েছে। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

বিক্‌নার নতুন সমবায়-উপনিবেশে শিল্পীদের ঘরদোর যাই হোক-না কেন, তুলসীমঞ্চটি বেশ সযত্নে স্থাপিত মনে হয়। শিল্পীদের উপাধি 'কর্মকার' এবং নাম রাজেন্দ্র ধনু যুগল উপেন্দ্র নব শম্ভু ইত্যাদির মধ্যে হঠাৎ জবর ও বাবুয়ার মতো দু-তিনটি নাম কানে লাগে। তুলসীমঞ্চের দিকে চেয়ে ভয়ে কোনো প্রশ্নও করা যায় না। নীরবে জব্বর কর্মকারের নামের সাংস্কৃতিক মাধুর্যের কথা চিন্তা করতে হয়। উত্তরে সুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে নেতকাম্‌লা ও বিন্ধ্যজাম গ্রাম। ১৯৬৭ সালে নেতকাম্‌লার ডোকরারা 'মাল' উপাধি ব্যবহার করত, ১৯৬৯ সালে তারা 'স্যাকরা' হয়ে গেল। সনাতন মাল হল সনাতন স্যাকরা, অথচ মালডাঙ্গা জায়গার নাম বাঁকুড়ায় এখনো আছে, সেটা স্যাকরাডাঙা করা সম্ভব হয় নি। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত যখন তারা 'মাল' ছিল, তখন তারা যে না-হিন্দু না-মুসলমান সে কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হত না। স্থানীয় গ্রামবাসীরা বলেন, দু-তিন বছর আগে কোনো হিন্দু সেবাশ্রমের সন্ন্যাসীরা এই-সব অঞ্চলের আধা-মুসলমানদের পুরো হিন্দু করার অভিযানে ব্রতী হয়েছিলেন এবং তার

ফলেই আধা-মুসলমান মালরা পুরো হিন্দু স্যাকরা হয়েছে। কিন্তু হলে হবে কি, এই পুরো হিন্দুত্বের চারি দিকে ছিদ্র, ডোকরা বা স্যাকরাদের পরিধানের বস্ত্রের মতো, এবং তালি দিয়ে তা ঢাকা যায় না। নেতকাম্‌লার 'স্যাকরা'দের অতিনিকট আত্মীয়স্বজন চার মাইল দূরে বিন্ধ্যজামে বাস করে। তাদের উপাধিও 'স্যাকরা', কিন্তু তারা যে মুসলমান সে-কথা তারা স্বীকার করে। পিতামহের নাম রহিম স্যাকরা, পিতার নাম সুচাঁদ স্যাকরা, পুত্রের নাম আলিজান স্যাকরা। পিতামহের নাম রহিম স্যাকরা, পিতা মতিলাল স্যাকরা, পুত্র দিলজান স্যাকরা। মেয়েদের নাম কমলা বিবি, বিলাসী বিবি, মুসুরি বিবি, লক্ষ্মী বিবি ইত্যাদি। বিবাহে ও ধর্মকর্মে মুসলমানী আচার তারা পালন করে, কাছে আরার মসজিদেই অনুষ্ঠান হয়। বিবাহিতা মেয়েরা সিঁথেয় সিঁদুর দেয়, হাতে নোয়া পরে (শাঁখা নয়)। সমাধি, ছুন্নৎ, তালাক বা ডিভোর্স, বিধবার পুনর্বিবাহ ইত্যাদিও পালিত হয়। নেতকাম্‌লা-বিন্ধ্যজামের ডোকরা-স্যাকরাদের আত্মীয়রা থাকে পুরুলিয়ার নডিহা আক্রো প্রভৃতি অঞ্চলে। তারা পুরো মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। শিল্পীদের নাম শেখ ইসমাইল, শেখ শম্ভু, শেখ দবিরুদ্দিন, শেখ ফকির ইত্যাদি। কিন্তু তারা ডোকরাদের পদ্ধতিতে দেবদেবীদের ধাতুমূর্তি গড়তে পারে, যা নেতকাম্‌লা-বিন্ধ্যজামের শিল্পীরা আজকাল আর পারে না, কেবল মল ঘুঙুর ঘাগর তৈরি করে। তা ছাড়া পুরুলিয়ার নডিহা প্রভৃতি অঞ্চলের ডোকরাশিল্পীরা পুরো মুসলমানত্ব স্বীকার করলেও হিন্দু দেবদেবীর মাটির প্রতিমাও গড়ে। বাংলার চিত্রকরদের সঙ্গে এক্ষেত্রেও এদের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। পুরুলিয়ার ডোকরাশিল্পীরা আবার আত্মীয়তাসূত্রে সিংভূম ছোটোনাগপুরের বিস্তৃত অঞ্চল পর্যন্ত আবদ্ধ। তারা হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান খানিকটা পালন করে বটে, কিন্তু মুসলমানত্বও অস্বীকার করে না। দেবদেবী পশুপক্ষী থেকে আদিবাসীদের মল ঘুঙুর গহনা পর্যন্ত সবই ডোকরা-রীতিতে তৈরি করতে পারে। এইভাবে উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ ও আরো দূর পর্যন্ত এই ধাতু-শিল্পীদের আত্মীয়তার যোগসূত্র প্রসারিত। উত্তর ভারতের কথা বলছি, দক্ষিণ ভারতের কথা স্বতন্ত্র।

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার ডোকরাশিল্পী যাদের আমি দেখেছি, তাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে প্রবীণ বিক্‌নার রাজেন্দ্র কর্মকার। ১৯৭০ সালে রাজেন্দ্রর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তার বয়স ছিল ৯৫ বছর। বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী রিভার্স (W. H. R. Rivers) তাঁর 'Ethnological Analysis of Culture' প্রবন্ধে (*Psychology and Ethnology* : London 1926) বিলীয়মান জনগোষ্ঠীর লুপ্ত ইতিহাস পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে অতিবৃদ্ধদের স্মৃতিকথাকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মতো মূল্যবান বলেছেন। রিভার্স লিখেছেন :

> In many parts of such a region as Melanesia, it is even now *only from the old men that any trustworthy information can be obtained,* and it is no exaggeration to say that with the death of every old man there and in many other places there goes, and goes for ever, knowledge, the disappearance

of which the scholars of the future will regret as the scholars of the past regretted such an event as the disappearance of the Library of Alexandria. (Italics বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের)।

রিভার্সের এই উক্তির কথা মনে করে বিক্‌নার অতিবৃদ্ধ ডোকরা রাজেন্দ্রর শরণাপন্ন হয়েছিলাম। প্রধানত আমি তাকে ডোকরাসমাজের মৌল গড়ন জানার উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করেছি, তার কারণ যে-কোনো জনগোষ্ঠীর সমাজের এই মূল কাঠামোটি বাইরের ভিন্ন জনসমাজের সংস্পর্শে ও সংঘাতে সহজে বদলায় না, দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। তাই সামাজিক গঠনবিন্যাস (social structure), রিভার্সের মতে, 'furnishes by far the firmest foundation on which to base the process of analysis of culture.' কিন্তু যেহেতু 'most of the essential social structure of a people lies below the surface', সেইজন্য ঠিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের মতো ধৈর্য ধরে প্রশ্ন করে করে তা উদ্‌ঘাটন করতে হয়। কতকটা আমাকেও তাই করতে হয়েছিল। প্রশ্নোত্তরে রাজেন্দ্র যা বলেছিল তার মর্ম এই :

ডোকরাদের আদি বাসভূমি হল নাগপুর বা ছোটোনাগপুর। সেখান থেকে রাজেন্দ্রর জন্মের প্রায় চার-পাঁচ পুরুষ আগে, অর্থাৎ প্রায় তিনশো বছর আগে, তার পূর্বপুরুষরা ঘুরতে ঘুরতে সিংভূমের রাঁচি চাইবাসা প্রভৃতি অঞ্চলে কিছুকাল বাস করে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের দিকে আসে। বিষ্ণুপুর টাউনের কাছে গোপালপুরে রাজেন্দ্রর পিতামহ এসে বাস করতে আরম্ভ করে। প্রায় দুশো বছর আগেকার কথা। বিষ্ণুপুরের রাজারা তাদের বাস্তু ও চাষের জমিজমা দিয়েছিলেন বলে তারা বেশ কিছুকাল সেখানে বসবাস করেছিল, যদিও কোথাও দীর্ঘকাল বসবাস করা তাদের রীতি নয়। কেন রীতি নয়? প্রশ্নের উত্তরে রাজেন্দ্র সরল ভাষায় বললে, 'কারণ আমরা ধাতুর জিনিস গড়ি, সহজে তা নষ্ট হয় না, কাজেই স্থানীয় লোকের চাহিদা মিটে গেলে আমাদের অন্য জায়গায় কাজের জন্য যেতে হয়।' ডোকরাশিল্পীরা প্রধানত ধর্মীয় শিল্পবস্তু ও অলংকারাদি ধাতু দিয়ে তৈরি করত, কর্মকার (লোহার) কুম্ভকার ও সূত্রধরদের মতো গ্রাম্যলোকের প্রয়োজনীয় জিনিস বিশেষ তৈরি করত না (মাপের পাইকোনা ছাড়া), তার উপর তাদের তৈরি জিনিস দীর্ঘস্থায়ী হত। কাজেই মার্কেট-পূর্ব যুগে স্বনির্ভর গ্রাম্যসমাজে তাদের স্থায়ী বসতির প্রয়োজন ছিল না। ভ্রাম্যমানতাই ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। এই ভ্রাম্যমানতার পর্বে মধ্যপ্রদেশের নাগপুর অথবা ছোটোনাগপুরের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বিষ্ণুপুর-গোপালপুর থেকে তারা বাঁকুড়া শহরের প্রান্তে রামপুরে আসে, সেখান থেকে বিক্‌নার কো-অপারেটিভ উপনিবেশে (১৯৬৮-৬৯)।

ডোকরাসমাজের মূল গড়ন সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে হলে সকলের আগে তাদের গোত্র (clan) ও উপজাতিভেদ (sub-castes) এবং পরস্পরের বিবাহরীতি সম্পর্কে জানা দরকার। এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে ডোকরাদের গোত্রভেদ ও উপজাতিভেদের কথা রাজেন্দ্র যা বলল তা এই :

গোত্র	উপজাতি
নাগ (নাগপুরিয়া)	ডোমার
বাঘ	চোরবন্দি
কর্কট	বান্‌থা
কচ্ছপ	কুলিয়ার

এই গোত্রগুলির মধ্যে বিবাহসম্পর্ক বহির্গোত্রীয় (exogamous)। বয়সে নবীন শিল্পী বৈকুণ্ঠ (জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত) গোত্রগুলি ঠিক বলে মেনে নিলেও, পূর্বোক্ত চারটি উপজাতির মধ্যে 'ডোমার' ও 'বান্‌থা'র বদলে 'মণ্ডল' ও 'চৌধুরী' নামে দুটি নতুন উপজাতির কথা উল্লেখ করল। বিভিন্ন গোত্রের শিল্পী বিক্‌নাতেই দেখা গেল, যেমন রাজেন্দ্রর গোত্র 'বাঘ', বৈকুণ্ঠর গোত্র 'কচ্ছপ', যুগলের গোত্র 'নাগ'। এর মধ্যে তিনটি গোত্র প্রাণীসূচক টোটেম (totem) আর-একটি স্থানসূচক, যেমন 'নাগপুরিয়া' থেকে 'নাগ'। উপজাতিগুলি সমাজকর্মসূচক (functional)। যেমন :

ডোমার

ডোমারকে বলা হয় 'ভাঁড়ারে'। কোনো উৎসব-পার্বণে ও অনুষ্ঠানে ভোজের ব্যাপার থাকলে যারা ডোমার তাদের উপর ভাঁড়ারের ভার থাকে। অনুষ্ঠানের আগে তাদের ডাকা হয় এবং ভোজের আয়োজন করতে বলা হয়। এটাই হল ডোমারদের প্রধান কাজ।

চোরবন্দি

নিমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়ন করা এবং ভোজনের সময় তাদের খাদ্য-পানীয় পরিবেশন করার দায়িত্ব থাকে চোরবন্দিদের উপর।

বান্‌থা

ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য যে-সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন, যেমন ফুলফল লতাপাতা তেল তেঁতুল ও অন্যান্য জিনিস তা সংগ্রহ করার দায়িত্ব বান্‌থাদের।

কুলিয়ার

কুলিয়ার হল গণবিচারক। গোষ্ঠীভুক্ত যে-কোনো ব্যক্তির অন্যায় অপরাধ ও অভিযোগের বিচারের ভার কুলিয়ারদের। গোষ্ঠীর প্রত্যেককে তার বিচার মেনে নিতে হবে, এই হল তাদের ঐতিহ্যগত অমোঘ নির্দেশ।

'মোহন্ত' নামে আর-একটি পঞ্চম উপজাতির কথা কেউ কেউ উল্লেখ করেছে, কিন্তু অনেকে তা স্বীকার করে না। মোহন্তদের কাজ হল হরকরাদের কাজ, অর্থাৎ গ্রামের ভিতরে বা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

হিন্দুসমাজের বৃত্তিগত জাতি-উপজাতিভেদের সঙ্গে ডোকরাদের পার্থক্য লক্ষণীয়। হিন্দু জাতি-উপজাতির মধ্যে স্বজাতিবিবাহ (endogamy) প্রচলিত, কিন্তু টোটেমিক

গোত্রবিভক্ত আদিম সমাজের মতো ডোকরাদের মধ্যে ভিন্ন উপজাতির সঙ্গে বিবাহসম্পর্ক প্রচলিত (exogamy)। পরিষ্কার বোঝা যায় যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও ডোকরারা কোনো সমাজেরই অঙ্গীকৃত হয় নি। ডোকরাসমাজের মূল গড়ন সেই আদিম টোটেমিক গোত্রবিভক্ত স্তরে বিরাজ করছে। অবশ্য 'টোটেম' আছে 'ক্লান' নেই এবং 'ক্লান আছে, 'টোটেম' নেই, এরকম আদিম জনগোষ্ঠীও অনেক আছে সে-বিষয় আপাতত আমাদের আলোচ্য নয়। এ যুগের বিখ্যাত ফরাসি নৃবিজ্ঞানী ক্লদ লেভি-স্ট্রৌজ (Claude Levi-Strauss) সম্প্রতি টোটেম, জাতি-উপজাতি ও সামাজিক বর্ণভেদ, এবং আদিম মানুষের চিন্তাধারার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে যে বিস্ময়কর গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, তা থেকে আমাদের ভারতীয় সমাজের বিকাশধারার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় (*The Savage Mind*, London 1966— চতুর্থ অধ্যায় 'Totem and Caste' এবং *Totemism*, Pelican 1969 ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। লেভি-স্ট্রৌজ বলেছেন :

> "The symmetry between occupational castes and totemic groups is an inverted symmetry. The Principle on which they are differentiated is taken from *culture* in one case and from *nature* in the other." (Italics বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকের)।

মোট কথা ডোকরারা আজও 'প্রকৃতির' আদিম স্তর থেকে 'সংস্কৃতি'র উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারে নি, সংস্কৃতিবান হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গণ্ডিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও। সেইজন্য নৃবিজ্ঞানী রিভার্স তাঁর সারাজীবনের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন— 'Even the whole religious cults can pass from one people to another without any real intermixture of peoples' (পূর্বোদ্ধৃত গ্রন্থ)। উন্নত 'সংস্কৃতি'র টানে হিন্দুসমাজে যেমন একাধিক লোকশিল্পীগোষ্ঠীর স্থান হয়েছে, অবশ্যই নিম্নস্তরে, ডোকরাদের ঠিক তেমন হয় নি, যেমন হয় নি বাংলার পটুয়াদের। তাই ডোকরারা, যেমন হিন্দুসমাজে তেমনি মুসলমানসমাজে, আজও ভেলার মতো ভাসমান। ডোকরাশিল্পের কত কদর, শিল্পরসিক ও নন্দনতত্ত্ববিদের কাছে তার কত মর্যাদা, স্বদেশে ও বিদেশে পর্যন্ত, কিন্তু ডোকরা-শিল্পীরা অন্ত্যজের দুর্বিষহ অভিশাপে দ্রুত বিলীয়মান। এক দিকে সামাজিক উপেক্ষা অবহেলা, অন্য দিকে চরম দারিদ্র্য, এই দুয়ের সাঁড়াশিচাপে, ডোকরাশিল্পের ক্রমাবনতির কাহিনীও অত্যন্ত করুণ।

আর্থিক দুরবস্থার সঙ্গে ডোকরাশিল্পের শুধু নয়, যে-কোনো লোকশিল্পের ক্রমাবনতির সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ, তা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়োজন হয় না, লোকশিল্পীদের বসতি ও জীবনযাত্রা স্বচক্ষে দেখলেই বোঝা যায়। বাংলার অধিকাংশ পটশিল্পী দারুশিল্পী মৃৎশিল্পী আজ নিজেদের শিল্পকর্ম ছাড়া ক্ষেতমজুরের কাজ করে জীবনধারণ করে, কারণ শিল্পকর্ম করে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে জীবনধারণ করা সম্ভব হয় না। ডোকরাশিল্পীরাও তাই করে। তাদের সমস্যা আরো কঠিন, কারণ তাদের শিল্পকর্মের উপাদান প্রত্যেকটির

বাজার মূল্য খুব বেশি, যদিও কাজকর্মের যন্ত্রপাতিগুলি (tools) সরল ও সুলভ। মৌল উপাদান ধাতুর কথাই ধরা যাক :

পাইকোনা ইত্যাদি	বিক্রয় মূল্য	ধাতুর পরিমাণ
একসেরী	১৫্ টাকা	১৫০০ গ্রাম (প্রত্যেকটির জন্য)
আধসেরী	৮্ টাকা	৯০০ গ্রাম
একপোয়া	৫্ টাকা	৫০০ গ্রাম
আধপোয়া	৩্ টাকা	৩০০ গ্রাম
একছটাকী	২্ টাকা	২০০ গ্রাম
নূপুর	৯্ টাকা জোড়া	৭০০ গ্রাম (একজোড়ার জন্য)
ঘুঙুর	১্ টাকা (৮টি)	৫০০ গ্রাম (৭২টির জন্য)

ধাতু ছাড়াও অন্যান্য উপাদান যা লাগে, তেল ধুনো কয়লা মোম ইত্যাদি, তার প্রত্যেকটির দাম যথেষ্ট বেড়েছে এবং ক্রমে বাড়ছে, কমছে না। অথচ ডোকরাশিল্পীদের আর্থিক সঙ্গতি আদৌ বাড়ে নি। বিক্‌নার ডোকরারা, সরকারি ও আধাসরকারি পোষকতা সত্ত্বেও, ৩্ টাকা থেকে ৬্ টাকা পর্যন্ত দৈনিক মজুরি পায় (১৯৭০), অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পীদের (বাঁকুড়া, পুরুলিয়া) দৈনিক আয় গড়ে ২্ টাকা থেকে ৩্ টাকা। এই আয় থেকে শিল্পকর্মের জন্য মূলধন বিনিয়োগ সম্ভব নয়। তাই পুরুলিয়া চাকুলিয়া (সিংভূম) প্রভৃতি অঞ্চলে সস্তা মিশ্রধাতু (অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি) দিয়ে শিল্পীদের নানারকমের জিনিস তৈরি করতেও দেখা যায়। দেবদেবী পশুপক্ষী ইত্যাদির মূর্তিও ক্ষুদ্রাকারে যে-কোনো প্রকারে গড়া হয়, উপাদানের অভাবের জন্য। কাজেই কুলানুক্রমিক শিল্পকর্মে ডোকরাশিল্পীদের আর মন নেই, নিষ্ঠা নেই, আগ্রহ নেই। সামাজিক পরিবেশ এত দ্রুত এবং এত দূর বদলে গিয়েছে যে শিল্পীর জীবনের সঙ্গে শিল্পকর্মের কোনোরকম সংযোগ রক্ষা করাই আর সম্ভব হচ্ছে না।

ডোকরাশিল্পীদের বসতি-বিস্তার, ভ্রাম্যমানতা, সামাজিক গড়নবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে যে বিবরণ আগে দিয়েছি, সংক্ষিপ্ত হলেও তার ভিতর থেকে এই ধাতুশিল্পীগোষ্ঠীর জীবনের ঐতিহাসিক পর্বানুক্রমের একটা খসড়া এইভাবে করা যেতে পারে :

আদি পর্ব

নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষিকর্মের উন্নত পর্বে, ভারতবর্ষে তাম্রপ্রস্তর যুগে, এই ডোকরা-রীতির মোমছাঁচলোপী ধাতুশিল্পের বিকাশ হয়েছিল, যেমন হয়েছিল পৃথিবীর আরো অন্যান্য দেশে, প্রায় সমকালে। ভারতবর্ষেও কোনো বিশেষ কেন্দ্র থেকে এই ধাতুশিল্পের অন্যত্র বিচ্ছুরণ হয় নি, প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সমস্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে সমান্তরাল বিকাশ হয়েছিল। তার মধ্যে পূর্বভারতের ছোটোনাগপুর-উত্তররাঢ় বা বাংলার পশ্চিমাংশ একটি

প্রধান অঞ্চল। এটি হল ডোকরাশিল্পের আদি পর্বের প্রথম স্তর। এই পর্বে তারা 'মাল-মালহার' নামে পরিচিত ছিল।

আদি পর্বের দ্বিতীয় স্তরে প্রাচীন বৈদিক ও হিন্দুযুগে, প্রাক্-আর্য জনগোষ্ঠীকে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করার যে সমস্যা দেখা দেয়, তার সমাধান করার জন্য যে-সব পন্থা উদ্ভাবন করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল— পেশা বা বৃত্তিভিত্তিক জাতিবর্ণবিন্যস্ত (occupational caste-hierarchy) সমাজ-গঠন। এই বৃত্তি-ভিত্তিক জাতিবর্ণবিন্যাসে সমাজে নিম্নস্তরের সোপানগুলিতে প্রাক্-আর্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা স্থান পায়, তাদের মধ্যে লোকশিল্পীরা নিঃসন্দেহে প্রধান গোষ্ঠী। তার পর্যাপ্ত নিদর্শন আজও হিন্দুসমাজে লোকশিল্পীদের সামাজিক অবস্থানের মধ্যে রয়েছে। সমাজের উপরতলা দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ইতিহাসের স্রোত বয়ে গেছে, কিন্তু সমাজের নিম্নসোপানে 'হিন্দু' নামে গৃহীত ও অধিষ্ঠিত এই লোকশিল্পীদের জীবন ও বৃত্তিগত শিল্পকর্মের কোনো পরিবর্তন হয় নি, মধ্যে মধ্যে কেবল তারা সংকীর্ণ জীবনবৃত্তের মধ্যে দু-এক ধাপ উপরে উঠে পরস্পর মর্যাদাবৃদ্ধির চেষ্টা করেছে মাত্র। এই হিন্দুপর্বেই তাদের একাংশের নাম হয় 'ডোকরা কামার'।

মধ্য পর্ব

মধ্য পর্বে মুসলমানযুগে, হিন্দুসমাজের অন্যান্য আরো অনেক অন্ত্যজ বর্ণের মতো, লোকশিল্পীরাও অনেকে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে, প্রধানত উচ্চবর্ণের নিপীড়ন ও অবজ্ঞা থেকে মুক্তির প্রত্যাশায়। যেমন ইংরেজযুগে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের একটা বড়ো অংশ খৃস্টান হয়েছিল তেমনি। লোকশিল্পীরা অনেকে মুসলমান হয়েছিল কিন্তু কোনো শিল্পীগোষ্ঠী খৃস্টান হয়েছিল বলে, অন্তত বাংলাদেশে, আমার জানা নেই। মুসলমান হলেও লোকশিল্পীরা তাদের পূর্বাচরিত হিন্দু আচার-অভ্যাসগুলি ছাড়তে পারে নি, এবং তার ফলে মুসলমানসমাজেও তাদের সাঙ্গীকরণ অসমাপ্ত থেকে যায়। একূল ওকূল দু-কূল হারিয়ে তারা সমাজের উপেক্ষিত প্রান্তে ভাসতে থাকে। এরকম হিন্দু-মুসলমান দুকূল-হারানো ভাসমান লোকশিল্পীদের মধ্যে বাংলাদেশে প্রধান হল ডোকরাশিল্পী ও চিত্রকররা।

আধুনিক পর্ব

আধুনিক পর্বে তাদের এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি, বরং স্বাভাবিক অবনতি হয়েছে। মানব-বিজ্ঞানী রিভার্সের পূর্বোদ্ধৃত উক্তি অনুযায়ী বলা যায় যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে-কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সমগ্রভাবে আদানপ্রদান হলেও, তাদের পরস্পর মিলনমিশ্রণ ও সামাজিক অঙ্গীকরণ সম্ভব না হতেও পারে। তাই দেখা যায়, নমাজ ছুন্নৎ কবর ইত্যাদি প্রথা গ্রহণ করা সত্ত্বেও যেমন ডোকরাশিল্পীরা

মুসলমানসমাজে স্বজন বলে গৃহীত হয় নি, তেমনি বর্তমানে হরিসভা সংকীর্তন তুলসীমঞ্চ ইত্যাদির অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও তারা প্রকৃত হিন্দুজন বলে গৃহীত হচ্ছে না। জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ছাড়া কোনো সমাজেই বাংলার লোকশিল্পীদের মতো অনুন্নত জনগোষ্ঠীর সাঙ্গীকরণ ও স্বজনমর্যাদালাভ সম্ভব হবে না। আপাতত আমাদের সমাজে তার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলে মনে হয়।

জীবনের সঙ্গে শিল্পকর্মের প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠ সংযোগ নিশ্চয় শুদ্ধাচারী শিল্পরসিকরাও স্বীকার করবেন। যে ডোকরাশিল্পীদের জীবন বংশপরম্পরায় চরম সামাজিক অবজ্ঞা ও দারিদ্র্যের অভিশাপে জর্জর, তাদের শিল্পকর্মের স্ফূর্তি ও ক্রমোন্নতি নিশ্চয় কল্পনা করা যায় না। উপরন্তু যে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন-প্রেরণার তাগিদ তাদের শিল্পকর্মে উৎসাহ দিয়েছে এককালে, আজ সেই প্রয়োজন ও প্রেরণা কোনোটাই নেই। অবশ্য ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডোকরাশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য বিশেষ উদ্‌যোগী হয়েছেন এবং কয়েকটি পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন। প্রায়বিস্মৃত ডোকরাশিল্পকে তাঁরা যে অন্তত লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরেছেন এবং তার শৈল্পিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছেন, তার জন্য ডোকরাশিল্পী ও শিল্পরসিকরা নিশ্চয় তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সেকালের স্বনির্ভর গ্রাম্যসমাজে অভাব-অনটন-অমর্যাদা প্রভৃতি যেমন কতকটা সহনীয় ছিল, বর্তমান সমাজের উৎকট আত্মসর্বস্ব পরিবেশে তার কোনোটাই তেমন সহনীয় নয়। এই অবস্থায় বর্তমানে ডোকরাশিল্প ও শিল্পী উভয়ই দ্রুত বিলীয়মান। ডোকরাশিল্পের অবনতিও মনে হয় অবশ্যম্ভাবী। বেশি নয়, একশো দেড়শো বছর আগেকার বাংলার ডোকরাশিল্পের যে সমস্ত নিদর্শন, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের প্রাচীন হিন্দুপরিবারে এখনো দেখা যায়— সেগুলির সঙ্গে সাম্প্রতিক ডোকরাশিল্পের তুলনা করলেই এই অবনতির পরিমাপ করা সম্ভব হবে। এবং এ-কথাও মনে হবে যে শিল্পীদের সামাজিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ছাড়া, তাদের প্রাপ্য সম্মান-মর্যাদা তাদের দেওয়া ছাড়া, আর এই শিল্পকর্মের প্রেরণা দিতে পারে এরকম নতুন সামাজিক চাহিদা (social demand) সৃষ্টি করা ছাড়া, কেবল বাইরের পোষকতায় ও লোকসংস্কৃতিসভার সহানুভূতিশীল বাহবায় ডোকরাশিল্প ও শিল্পীর পুনরুজ্জীবন সম্ভব হতে পারে কি না!

১৩৭৯ শ্রাবণ

ওকাকুরা তেন্‌শিন ও অবনীন্দ্রনাথ

সত্যজিৎ চৌধুরী

কাকুজো ওকাকুরা তেন্‌শিন [১] (১৮৬৩-১৯১৩)-এর মৃত্যু উপলক্ষে একটি ছোটো শোক-নিবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> আচার্য ওকাকুরার যখন প্রথম পরিচয় লাভ করি তখন আমি আমার সারা জীবনের কাজটুকু সবেমাত্র হাতে তুলিয়া লইয়াছি, আর সেই মহাপুরুষ তখন শিল্পজগতে তাঁর হাতের কাজ সার্থকতার সমাপ্তির মাঝে সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া জীবনে দীর্ঘ অবসর লাভ করিয়াছেন এবং ভারতমাতার শান্তিময় ক্রোড়ে বসিয়া Asia is one এই মহাসত্যের— এই বিরাট প্রেমের বেদধ্বনি প্রচার করিতেছেন। [২]

এই প্রথম পরিচয়ের কাল ১৯০২ খৃস্টাব্দ। উক্তিটি থেকে মনে হয় বুঝিবা ওকাকুরা তেন্‌শিন-এর তখন প্রচুর বয়স। তা নয় কিন্তু, ১৯০২ সালে তেন্‌শিন-এর বয়স ছিল ৩৯, অবনীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৩১। তেন্‌শিন দীর্ঘজীবী হন নি, মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ৩৯ বৎসর বয়সের একজন মানুষকে প্রবীণ বলা যায় না, তবুও ভারতীয় সংস্কৃতি-জগতে তিনি জ্ঞান ও কর্মে অর্জিত কীর্তির গৌরবে প্রবীণ মনীষীর মর্যাদায় গৃহীত হয়েছিলেন। ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে জাপান সম্পর্কে তখন অপার কৌতূহল জেগে উঠেছিল। এশীয় জাতিগুলির মধ্যে জাপান স্বাধীন সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হল, য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করে নিয়ে দ্রুত এক আধুনিক শক্তিমান জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করল। য়ুরোপের শোষণে জর্জর এশিয়ারই একটি জাতির এই স্বাতন্ত্র্যময় অভ্যুদয় খুব স্বাভাবিকভাবে ভারতীয়দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। জাপান তার শক্তির অব্যর্থ প্রমাণ দিল রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪-০৫) জয়ী হয়ে। এশিয়ার

[ওকাকুরা তেন্‌শিন সম্পর্কে জাপানি ভাষায় লেখা বইপত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীমতী ওয়াকাকো উসুদা এবং শ্রীমাসাইয়ুকি উসুদা। এঁদের আনুকূল্য ভিন্ন এ প্রবন্ধ তৈরি করা সম্ভব হত না। উসুদা-দম্পতির কাছে আমি অশেষ ঋণে ঋণী। লেখক]

১ Kakuzo Okakura নিজের লেখায় Ten-Shin ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। তেন্ = স্বর্গ, শিন্ = হৃদয়, শব্দটির ব্যঞ্জনা : স্বর্গীয় হৃদয় যার এমন মানুষ। জাপানে তাঁকে তেন্‌শিন নামে উল্লেখ করাই রীতি।

২ "স্বর্গগত শ্রীমদ্ ওকাকুরা", ভারতী, কার্তিক ১৩২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮০২-০৩।

আত্মমর্যাদাবোধের প্রতীক হয়ে উঠল। তেন্‌শিন প্রথমবার ভারতে আসেন রুশ-জাপান যুদ্ধের দুই বৎসর আগে। স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে যাবার আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে তিনি ভারতে এসেছিলেন। স্বদেশে তখন তেন্‌শিন-এর খ্যাতি ও সম্মান কত ব্যাপ্ত ছিল তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায়[৩] আছে। বোম্বাই বন্দরে তেন্‌শিন একটি জাপানি জাহাজ দেখতে পেলেন। স্থির করলেন, সুরেন্দ্রনাথের জন্যে জাহাজ থেকে উৎকৃষ্ট জাপানি পানীয় 'সাকী' সংগ্রহ করে আনবেন। কাজটা আইনসিদ্ধ ছিল না। তাঁরা দুজনে জাহাজে উঠতেই জাহাজের অফিসারেরা জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাধা পেয়ে তেন্‌শিন শুধু নিজের নাম উচ্চারণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের লোকেরা সম্ভ্রমে নুয়ে নিজেদের জানু স্পর্শ করে বলে উঠলেন, 'ঘাস, ঘাস, আমরা আপনার পায়ের নিচের ঘাস।' তেন্‌শিন-এর কাজের ক্ষেত্র ছিল বিশেষভাবে শিল্পের জগতে। কিন্তু জাপানের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের এবং প্রাচ্য সংস্কৃতির শ্রেয়ত্বের উদ্‌গাতা রূপে তিনি স্বদেশে জনজীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। উত্তরকালে যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে জাপান ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এগিয়েছে, তার সমাজমানসে নানামুখী পরিবর্তন ঘটে গেছে কিন্তু তিনি জাপানের জাতীয় জীবনে জাতীয় আত্মসম্মানবোধের প্রতিভূরূপে আজও সম্মানিত। তেন্‌শিন সম্পর্কে জাপানি জাতির অক্ষুণ্ণ আগ্রহের একটি প্রমাণ, এই ৭০-এর দশকে, ১৯৭৫-এর মধ্যে তাঁর উপরে অন্তত পাঁচখানি বই প্রকাশিত হয়েছে।

স্বজাতির আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলায় কৃতী এই মনীষী ভারতীয়দের মধ্যেও অনুরূপ চেতনার পরিচয় পাবেন আশা করে এসেছিলেন। প্রথম আলাপেই সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, What are you thinking of doing for your country. সুরেন্দ্রনাথ কোনো স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেন নি। ভারতীয়দের ভারতের জন্য কী করা উচিত সে-বিষয়ে কোনো সুষ্ঠু ধারণা তখনো এদেশে গড়ে ওঠে নি। স্বাধীন জাপানের অর্জিত শক্তি ও আত্মমর্যাদাবোধ এবং উপনিবেশ-ভারতের সদ্য ঘুম-ভাঙা মনের জড়তায় প্রভেদ অনেক। এখানকার যুবকদের অনির্দিষ্ট উত্তরে, নৈরাশ্যে তেন্‌শিন ব্যথিত হতেন। একান্ত আলোচনায় উদ্দীপনা জাগাতে চেষ্টা করতেন। সেকালের ভারতীয় রাজনৈতিক ভাবনায় বৈপ্লবিক ঝোঁকের মূলে তাঁর কিছু প্রভাব ছিল। ঔপনিবেশিক চাপের মধ্যেও যাঁরা চৈতন্যের স্বাবলম্বন অর্জনের চেষ্টা করছিলেন, শিল্প-সাহিত্যে যাঁরা নতুন পথের সন্ধান করছিলেন, ওকাকুরা তেন্‌শিন-এর স্থিতপ্রজ্ঞ মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বে তাঁরা গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। অবনীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ উক্তিতে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছিল মনে করা যায়, অবশ্য তাঁর কাছে অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার কারণ আরো গভীর। শিল্পীজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তি উত্তরণে অবনীন্দ্রনাথ তেন্‌শিন-এর এবং তাঁর মাধ্যমে জাপানি

৩ Surendranath Tagore, "Kakuzo Okakura", *The Visva-Bharati Quarterly*, Vol. XI, Part II, August 1986.

শিল্পীদের সাক্ষাৎ সাহায্য পেয়েছিলেন। অবনীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ এবং অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা সংগঠনের দিক থেকে এ-যোগাযোগ তাৎপর্যময়।

২

অবনীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় চিত্রকলার আধুনিকতা বিষয়ে আলোচনায় সকলেই ওকাকুরা তেন্‌শিন-এর প্রসঙ্গ তুলেছেন, কিন্তু এই-সব আলোচনায় সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। এমন-কি তাঁর ভারতে অবস্থানের সাল-তারিখ নিয়েও সংশয় রয়েছে। এখানে তাই সংক্ষেপে তাঁর জীবনের তথ্যপঞ্জী উল্লেখ করা সংগত মনে করি।

১৮৬৩ : জন্ম ইয়োকোহামা-য়। ইংরেজি বইপত্রে জন্মতারিখ দেখানো আছে ২৬ ডিসেম্বর ১৮৬২। জাপানি মতে তাঁর জন্ম বুংকিউ পঞ্জিকার দ্বিতীয় বর্ষের দ্বাদশতম মাসের ২৬ তারিখে। খৃস্টাব্দের হিসেবে তারিখটি দাঁড়ায় ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩।

১৮৭৭ : তোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ।

১৮৭৮ : মার্কিন অধ্যাপক আর্নস্ট ফেনোল্লোসা দর্শন পড়াবার কাজ নিয়ে তোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। ইনি জাপানের প্রাচীন শিল্পকলা সংরক্ষণের আন্দোলন প্রবর্তন করেন। তেন্‌শিন তাঁর সঙ্গে, পরিচিত হয়ে তাঁরই প্রভাবে প্রাচীন শিল্প বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন।

১৮৮০ : স্নাতক হন এবং জাপান সরকারের শিক্ষামন্ত্রকে চাকরি নেন।

১৮৮১ : জাপানি শিল্প বিষয়ে গবেষণায় অধ্যাপক ফেনোল্লোসাকে সাহায্য করেন এবং তাঁর রচনা অনুবাদ করেন।

১৮৮২-৮৪ : কিয়োতো ও নারা অঞ্চলে প্রাচীন মন্দির সম্পর্কে গবেষণা।

১৮৮৬ : শিল্পগবেষণা কমিটির সদস্যরূপে অধ্যাপক ফেনোল্লোসার সঙ্গে য়ুরোপ যাত্রা।

১৮৮৯ : তোকিয়া বিজুৎসু গাক্কো নামক সরকারি শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং এখানে তেন্‌শিন রাজকীয় সংগ্রহশালার প্রধান পদে নিযুক্ত হন।

১৮৯০ : অধ্যাপক ফেনোল্লোসা আমেরিকায় ফিরে যান। তেন্‌শিন বিজুৎসু গাক্কো-র অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

১৮৯৩ : চীন যাত্রা।

১৮৯৭ : শিক্ষামন্ত্রকের কাছে শিল্পশিক্ষা সম্পর্কে নিজস্ব পরিকল্পনা উপস্থাপন।

১৮৯৮ : বিজুৎসু গাক্কো-র অধ্যক্ষপদ থেকে অপসারিত হন। কাউন্ট রিউইচি কুকি-র সমর্থনে তেন্‌শিন ঐ পদ পেয়েছিলেন। কুকি-র পত্নী হাৎসুকো হোশিজাকির সঙ্গে তেন্‌শিন-এর প্রণয়ের কথা রাষ্ট্র

হওয়ায় কুকি বিরূপ হন। এই প্রণয় ব্যাপার উপলক্ষ করে জাপানি শিল্পে পাশ্চাত্য রীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী উপদল তেন্‌শিনকে অপসারিত করেন। তেন্‌শিন শিল্পে নির্বিচারে পাশ্চাত্য আদর্শ মেনে নেবার বিরোধী ছিলেন। নীতিঘটিত বিরোধের চরম পর্যায়ে চারিত্রিক বিচ্যুতির অভিযোগ ওঠায় তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এই বৎসরেই ১৫ অগস্ট তারিখে তাঁর নিজস্ব শিল্পবিদ্যালয় নিপ্পোন্ বিজুৎসু-ইন প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজিতে 'নিপ্পোন্ বিজিৎসু-ইন্' লেখা হয়, জাপানিতে আছে 'নিপ্পোন্ বিজুৎসু-ইন'।

১৯০১-০২ : ১৯০১-এর ২১ নভেম্বর ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। কলম্বো হয়ে মাদ্রাজে পৌঁছন ১৯০২-এর ১ জানুয়ারি সকাল ৮টায় এবং ৪ জানুয়ারি মাদ্রাজ থেকে রওনা হয়ে ৬ জানুয়ারি কলকাতায় পৌঁছন। ১৯০২-এর ৩০ অক্টোবর জাপানের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তেন্‌শিন-এর সঙ্গে হোরি নামে একজন ছাত্র এসেছিলেন। তাঁর দিনলিপি থেকে এই তারিখগুলি পাওয়া যায়।

১৯০৩ : ইয়োকোইয়ামা তাইকান্ (১৮৬৮-১৯৫৮) এবং হিশিদা শুন্‌সোকে (১৮৭৪-১৯১১) তেন্‌শিন ভারতে পাঠান। এঁরা দুজনেই বিজুৎসু গাক্কোর প্রথম স্নাতক এবং তেন্‌শিন-এর ছাত্র।

১৯০৪ : তাইকান, হিশিদা ও শিসুইকে সঙ্গে নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে বস্টন মিউজিয়মে যান এবং এপ্রিল মাসে বস্টন মিউজিয়মে চীন-জাপান বিভাগে উপদেষ্টা নিযুক্ত হন।

১৯০৬ : দ্বিতীয়বার চীন যাত্রা।

১৯১১ : হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মাস্টার অব আর্টস ডিগ্রি দেন।

১৯১২ : ১৪ অগস্ট দ্বিতীয়বার ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। কলকাতায় পৌঁছন সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে। ১২ অক্টোবর বোম্বাই থেকে বস্টনের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

১৯১৩ : জাপানে ফিরে আসেন এবং ২ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল অবধি য়ুরোপীয় কোনো জাতির পদানত হবার আশঙ্কায় জাপান সতর্কভাবে বাইরের সংস্রব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিল। বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে ১৮৫৩-৫৪ খৃস্টাব্দে ম্যাথু ক্যালব্রেইথ পেরী-র (Matthew Calbraith Perry, ১৭৯৪-১৮৫৮) নেতৃত্বে মার্কিন নৌবহরের জাপান অভিযানের ফলে। আমেরিকার সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূচনা হল, জাপানের বন্দর বিদেশী

জাহাজের জন্যে খুলে দেওয়া হল। আমেরিকার মাধ্যমে আধুনিক য়ুরোপের সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জাপানে য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করার সর্বাত্মক তৎপরতা জেগে উঠেছিল। 'জাপান-যাত্রী' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন :

> এশিয়ার মধ্যে জাপানই এই কথাটি একদিন হঠাৎ অনুভব করলে যে, য়ুরোপ যে-শক্তিতে পৃথিবীতে সর্বজয়ী হয়ে উঠেছে একমাত্র সেই শক্তির দ্বারাই তাকে ঠেকানো যায়। নইলে তার চাকার নিচে পড়তেই হবে এবং একবার পড়লে কোনো কালে আর ওঠবার উপায় থাকবে না।

ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার অন্য দেশগুলির ইতিহাস পাশ্চাত্য শক্তির আঘাতে গুঁড়িয়ে যাবারই ইতিহাস, ব্যতিক্রম একমাত্র জাপান। অদ্ভুত দক্ষতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাপান শক্তিমান হয়ে ওঠার পশ্চিমী কলাকৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছিল। এমনভাবে 'এক দৌড়ে দু-তিনশো বছর হু হু করে পেরিয়ে' যেতে পেরেছিল বলেই য়ুরোপীয় কোনো শক্তির আঘাতে ভেঙে পড়ে নি, স্বাধীন সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছে। জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থায়, জীবনযাপন পদ্ধতিতে য়ুরোপীয় প্রভাব তীব্র হওয়া সত্ত্বেও দেশীয় ভাষা-সাহিত্যের শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত বা বিপর্যস্ত হয় নি। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অধীন প্রাচ্য জাতিগুলির জীবনে পাশ্চাত্য প্রভাবের সঙ্গে স্বাধীন জাপানের জীবনের পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় মৌলিক প্রভেদ ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রবণতার দোটানায় জাপানি সমাজও প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয়েছিল, কিন্তু সেই দ্বন্দ্বে জাপানের জাতিগত আত্মসচেতনতা যত দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠেছিল, ভারতের মতো উপনিবেশে তা ছিল সম্পূর্ণ অভাবনীয়। এই দিক থেকে ওকাকুরা তেন্‌শিন-এর ব্যক্তিত্বের বিকাশ আধুনিক জাপানের আত্মসচেতনতা বিকাশের প্রতীকের মতো মনে হয়।

প্রচণ্ড সামাজিক আলোড়নের মধ্যেই তেন্‌শিন-এর জন্ম। তাঁর পিতা কান্‌এমোন্ ওকাকুরা ছিলেন বিত্তবান ব্যবসায়ী শ্রেণীর মানুষ। এই শ্রেণীর মানুষেরা সন্তানসন্ততিদের য়ুরোপীয় শিক্ষাদীক্ষায় পারদর্শী করে তুলতে চাইতেন। বালক বয়সে তেন্‌শিন পাশ্চাত্যমুখী শিক্ষার ভেতর দিয়ে বেড়ে ওঠেন, কিন্তু ইংরেজির সঙ্গে তিনি মাতৃভাষা এবং চীনা ভাষা চর্চা করেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য প্রভাবের উভয়বলতা তাঁর চরিত্রে ক্রমেই সমন্বয়ের দিকে এগিয়েছে। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি তোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। মার্কিনী অধ্যাপক আর্নস্ট ফেনোল্লোসা (Ernest Fenollosa)-র সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। এই সময়ে পাশ্চাত্য রুচির আধিপত্যের ফলে পরম্পরাগত জাপানি শিল্প সম্পর্কে চরম উদাসীনতা দেখা দিয়েছিল। অধ্যাপক ফেনোল্লোসা ধর্মমন্দিরগুলির শিল্পসংগ্রহ ও অন্যান্য প্রাচীন শিল্পসম্পদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং রক্ষণাবেক্ষণের আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর গবেষণায় ও আন্দোলনে তেন্‌শিন প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। প্রাচীন শিল্পকলা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, ফেনোল্লোসার উৎসাহে ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে

কান্‌গা-কাই নামে একটি সংঘ গড়ে ওঠে। কান্‌গা-কাই-এ তেন্‌শিন নেতৃভূমিকা গ্রহণ করেন। ফেনোল্লোসার সহকারিতায় এবং স্বাধীন গবেষণায় কঠোর পরিশ্রমী যুবক কাকুজো ওকাকুরা জাপানের শিল্পকলা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞের মর্যাদা অর্জন করেন। মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে সরকারি প্রতিষ্ঠান বিজুৎসু গাক্কো-র শিল্পবিভাগের প্রধান পদে নিয়োগ এই স্বীকৃতিরই প্রমাণ। এর আগে য়ুরোপে গিয়ে তিনি পাশ্চাত্য শিল্পকলা সম্পর্কে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে চীন ভ্রমণের সুযোগ পেলেন। পূর্ব ও পশ্চিম দুই জগৎ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তেন্‌শিন আধুনিক জাপান বা সমগ্রভাবে এশীয় শিল্পের আধুনিক গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে গঠিত মতবাদ প্রচার ও আন্দোলন সংগঠনে নিজেকে উৎসর্গ করেন। জাপানের শিল্পীসমাজে এবং শিল্পসংক্রান্ত প্রশাসন কর্তৃপক্ষের চিন্তাভাবনায় পশ্চিমী রুচির হাওয়া দেশীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে যে উপেক্ষার মনোভাব জাগিয়ে তুলছিল, প্রখর ব্যক্তিত্ব-শক্তি নিয়ে তেন্‌শিন তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তাঁর চরিত্রে অনমনীয়তা ও সহজাত কর্তৃত্বশক্তির সঙ্গে মিলিত হয়েছিল নাটকীয়তার গুণ। পোশাক-পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্যে, বাগ্মিতার অসাধারণত্বে তিনি তরুণ শিল্পীদের হৃদয়ে এক মর্যাদাবান উপাস্য ব্যক্তিত্ব রূপে সহজেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। বালক বয়স থেকে তিনি পারিবারিক পরিবেশে পশ্চিমী প্রভাবের মধ্যে থেকেও প্রাচ্য ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে সশ্রদ্ধ ঔৎসুক্য পোষণ করতেন। কর্মজীবনে প্রবেশের পরে সেই দ্বিমুখী প্রবণতা ক্রমে সুনির্দিষ্ট সামঞ্জস্যে পরিণতি পায়। তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের এই বিশিষ্টতা সম্পর্কে এলিসি গ্রিল্লি মন্তব্য করেছেন :

> This dualism of interests formed the central threads in the fabric of his life, finally becoming firmly twisted into a single cord when, *precisely because he was able to absorb ancient ideas and express them in a new language*, he became a link between the cultures of two hemispheres. [8]

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১১ খৃস্টাব্দে 'মাস্টার অব আর্টস্' ডিগ্রি দেবার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর তাঁর মনীষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন :

> ...Okakura Kakuzo who has no equal in investigating thoroughly the depth of oriental arts, while willingly accepting the things which the west can give, and in studying intensely and respectfully the heritage of forefathers and who has a firm decision to preserve the traditional character of Japanese art. [৫]

তেন্‌শিন-এর ব্যক্তিত্ব ও মনীষা সম্পর্কে এই মূল্যায়ন যথার্থ। প্রাচ্য সংস্কৃতির শ্রেয়ত্ব

---

৪ Elise Grilli. "Okakura Kakuzo, A Biographical Sketch", Okakura, *The Book of Tea,* Tokyo 1957. উদ্‌ধৃতির ইটালিক বর্তমান লেখকের।

৫ Boston Museum Bulletin, Vol. IX, No. 52 (Aug 1911) পৃ. ২৯। দ্র. ইয়াসুকো হোরিয়োকা-র "ওকাকুরা তেন্‌শিন" (তোকিয়ো ১৯৭৪)।

বিষয়ে তাঁর অভিমানের কথাই বিশেষভাবে বিদিত, আমাদের এখানে তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে তাঁকে প্রাচীন প্রাচ্য শিল্পের পুনরুজ্জীবনবাদী রূপে দেখা হয়েছে। কিন্তু কখনোই তিনি আধুনিক কালের দাবি উপেক্ষা করে শিল্পের বিকাশধারা অবরুদ্ধ করতে চান নি। অবসিত অতীতের শিল্পভাষা আধুনিক মনের প্রকাশ মাধ্যম হতে পারে— এমন কোনো তত্ত্ব প্রতিপাদন করেন নি। জাপানের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের দ্বন্দ্বসংঘাতের কাল। বিশেষ করে শিল্পকলায় আধুনিকতার আন্দোলনের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় বিগত শতাব্দীর শেষ দুই দশক। জাপান বুঝেছিল শুধু ধার নিয়ে পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হওয়া যাবে না, ওদের বিদ্যা নিজেদের জীবনে জমিতে ফলবান করে তুলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, ‘প্রথম কিছুদিন ওরা য়ুরোপ থেকে শিক্ষকদের দল ভাড়া করে এনেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের প্রায় সমস্ত সরিয়ে দিয়ে, হালে এবং দাঁড়ে নিজেরাই বসে গেছে— কেবল পালটা এমন আড় করে ধরেছে যাতে পশ্চিমের হাওয়া তার উপরে পুরো এসে লাগে’। ওকাকুরা তেন্‌শিন এই যুগেরই মানুষ। জাপানি জীবনের ক্ষেত্রে আধুনিকতা আত্তীকরণের যে উদ্যোগ চলছিল, শিল্পকলায় সেই প্রক্রিয়া ফলবান করে তোলার দায়িত্ব তিনি নিজের উপরে তুলে নিয়েছিলেন। জাতীয় স্বভাব থেকে বিচ্যুত না হয়ে আন্তর্জাতিক আধুনিকতা আয়ত্ত করার আন্দোলন জাগানো তেন্‌শিন-এর বিশিষ্ট কীর্তি। যাঁরা নির্বিচারে পশ্চিমী আঙ্গিক অনুসরণের পরামর্শ দিচ্ছিলেন, কেবল ধার করা বিদ্যার উপরে নির্ভর করতে শেখাচ্ছিলেন, তিনি তাঁদের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। আত্মবিস্মৃতির ঘোর কাটাবার জন্যেই তাঁকে বিশদভাবে জাপানের পরম্পরাগত শিল্পকলার ঐশ্বর্যের দিক, গোটা প্রাচ্য শিল্পের বিশিষ্ট নৈপুণ্যের দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়েছিল। কঠোর পরিশ্রমে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে নিজেদের গৌরবময় ঐতিহ্যের মর্ম শিল্পীসমাজের সামনে তুলে ধরতে হয়েছিল। এই লড়াইয়ের সময়ে মোহগ্রস্তদের আঘাত করার জন্য তিনি কখনো কখনো এমনও বলেছেন যে জাপানি শিল্পের সমুন্নতির জন্যে য়ুরোপ থেকে কিছুই শিখবার নেই। তেন্‌শিন-এর ব্যক্তিত্বের ছিল আপসহীনতা, যুযুধান স্বভাব। নিজের প্রত্যয়গত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পথের বাধা বিধ্বস্ত করা তাঁর লক্ষ্য ছিল। ফলত পশ্চিমী আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণকামী শিল্পপ্রশাসকদের আঘাত করার উদ্দেশ্যে এক সময়ে উগ্রভাবে প্রাচ্য শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন। মতাদর্শের বিরোধ থেকে ক্রমে তাঁর সঙ্গে অনেকের ব্যক্তিগত শত্রুতার সম্পর্ক দাঁড়ায় এবং এজন্যে তাঁকে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল। কিন্তু এ-সব উগ্রমত ও অতিকৃতি সাময়িক আদর্শ সংঘাতেরই ফল।

১৮৯৮ খৃস্টাব্দে তেন্‌শিন সরকারি প্রতিষ্ঠান বিজুৎসু গাক্কো থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলেন এবং ঐ বৎসরই স্বাধীনভাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে নিপ্পোন্ বিজুৎসু-ইন্ প্রতিষ্ঠা করলেন। হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও বিজুৎসু গাক্কো-য় তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি বেরিয়ে আসায় প্রায় অর্ধেক ছাত্র তাঁর সঙ্গে নতুন প্রতিষ্ঠানে

চলে আসেন। নিপ্পোন্ বিজুৎসু-ইন্ বিদ্যালয় সম্পর্কে নিম্নের মন্তব্য দুটিতে জাপানের শিল্পকলায় আধুনিকতা বিষয়ে তাঁর পরিণত ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে :

> নিপ্পোন্ বিজুৎসু-ইন্ সিউডো-ক্লাসিক্যাল এবং সিউডো-য়ুরোপীয়ান— দুটি প্রবণতাকেই প্রতিরোধ করার প্রয়াস। শিল্প জাতীয় জীবনের অঙ্গ। ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হলে শিক্ষা বিপথে চালিত হবে। আমরা নিজেদের প্রাচীনপন্থী বা আধুনিকপন্থী কোনো নামেই জাহির করতে চাই না।'[৬]

> According to this school, freedom is the greatest privilege of an artist, but *freedom always in the sense of evolutional self-development.* Art is neither the ideal nor the real. Imitation, whether of nature, of the old masters, or above all of self, is suicidal to the realisation of individuality, which rejoices always to play an original part, be it of tragedy or comedy, in the grand drama of life, of man, and of nature.[৭]

তেন্‌শিন বুঝেছিলেন, আধুনিক কালের বাতাবরণে বাস করে কোনো শিল্পীর পক্ষে ক্ল্যাসিক্যাল শিল্প সৃজন সম্ভব নয়, তেমন চেষ্টারও কোনো উপযোগিতা নেই। অন্যপক্ষে জাপানি রক্তের উত্তরাধিকার অস্বীকার করে জাপানি শিল্পীর পক্ষে য়ুরোপীয় হয়ে ওঠার চেষ্টা একান্ত বিফল প্রয়াস। তিনি মনে করেন, আধুনিক কোনো শিল্পীর প্রধান চেষ্টা হওয়া উচিত আত্মসচেতনভাবে নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা, কোনো প্রথা বা প্রভাবের বশীভূত না হওয়া এবং নিজের কাজের পক্ষে সহায়ক সুযোগগুলির উপরে কর্তৃত্ব অর্জন করা। স্বাধীন আত্মবিকাশের ক্ষমতা শিল্পীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, realisation of individuality বা ব্যক্তিস্বরূপের সত্তা পরিচয় উপলব্ধি আধুনিক শিল্পীর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই আধুনিক ব্যক্তিস্বরূপ তার দেশ-কালের বাতাবরণ থেকে পুষ্টির, বিকাশের উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। সত্তার আশ্রয় বর্তমান— ইতিহাসের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো মায়াদ্বীপ নয়, অতীত পরম্পরারই উদ্‌বর্তনে আবির্ভূত এবং এই আধুনিক পর্ব আবার উদ্‌বর্তিত হবে ভবিষ্যতের দিকে। তেন্‌শিন সচেতন গ্রহণ-বর্জন ও আবির্ভূত সুযোগের সদ্‌ব্যবহারের উপরে গুরুত্ব দিতেন। নিজের উত্তরাধিকারের স্বরূপ চেনো এবং অতীতে অর্জিত সেই কীর্তির স্তর অতিক্রম করে নিজের প্রতিভা বিকাশের সূত্রে জাতীয় শিল্পের আধুনিক স্তর গঠন করে তোলো— ছাত্র ও শিষ্যদের তিনি এই উপদেশ দিয়েছেন। তরুণ শিল্পীরা কোনো অন্ধ মতবাদের প্রভাবে যাতে ভেসে না যায়, বিচারশীল আত্মস্থ ব্যক্তিত্বশক্তি ও আত্মমর্যাদাবোধ যাতে তারা অর্জন করতে পারে, স্বজাতির ও বৃহত্তর প্রাচ্যের ঐতিহ্য এবং আন্তর্জাতিক আধুনিকতার উৎস থেকে

৬ ইয়াসুকো হোরিয়োকা-র 'ওকাকুরা তেন্‌শিন' (তোকিয়ো ১৯৭৪) গ্রন্থে "Catalogue for Exhibition of Japanese Paintings of silk and lacquer, works of the Bijutsuin", Cambridge Mss. 1904 থেকে অনূদিত।

৭ Kakuzo Okakura, *The Ideals of the East*, Calcutta 1978, p. 184 উদ্‌ধৃতির ইটালিক বর্তমান লেখকের।

প্রয়োজনীয় উপাদান নির্বাচনের বোধ যাতে তাদের মধ্যে জেগে ওঠে— শিক্ষক হিসাবে তেন্‌শিন এই দায়িত্ব বহন করেছেন। তরুণদের নিবিড় মমতায় কাছে টেনে নিয়ে স্বাধীন আত্মবিকাশে তাদের সাহায্য করেছেন।

বিজুৎসু গাক্কো এবং নিপ্পোন্ বিজুৎসু-ইন্-এ তেন্‌শিন-এর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে যাঁরা কাজ শেখেন তাঁদেরই হাতের কাজে জাপানি শিল্পকলার নবজাগরণ সম্ভব হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ভারতে বিশেষভাবে পরিচিত এবং অবনীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ ইয়াকোইয়ামা তাইকান ও হিশিদা শুন্‌সো ছিলেন বিজুৎসু গাক্কোর প্রথমবারের স্নাতক। এঁরা দুজন এবং অপর খ্যাতিমান আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শিমোমুরা কান্‌জান্ (১৮৭৩-১৯৩০), কিমুরা বুজান, সেইগো কোগেৎসু (১৮৭৩-১৯১২)— সকলেই তেন্‌শিন-এর নির্দেশে নিবিষ্ট চর্চায় পরম্পরাগত জাতীয় চিত্রকলা থেকে গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি রূপায়ণের কলা-কৌশল আয়ত্ত করেন। এই চর্চায় এঁরা জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমিতে নিজেদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় আঙ্গিকও অনুশীলন করেন। প্রয়োজনে সচেতনভাবে য়ুরোপীয় আঙ্গিক ব্যবহারে তেন্‌শিন তাঁর ছাত্রদের কখনো বাধা দেন নি। তিনি শিল্পকলায় সিদ্ধি অর্জনকে যুদ্ধজয়ের তুল্য মনে করতেন। এ যুদ্ধে প্রকরণ মাত্রেই একান্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্র। শিল্পের ক্ষেত্রে অ্যানাটমি ও পার্সপেক্‌টিভ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে তিনি সামরিক বাহিনীর রসদের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, নিজের স্বভাবে অবিচল থেকে জাপানি শিল্প এই জ্ঞান আত্মস্থ করে নিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় স্বভাব থেকে পাওয়া শিল্পীর বিশিষ্ট মানসভঙ্গির গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর বলেছেন, সব উদ্যোগের আড়ালে থাকবে অবিচল, আত্মস্থ শিল্পীব্যক্তি, তিনিই এ-যুদ্ধে সার্বভৌম সেনাপতি। তেন্‌শিন-এর ভাষায় :

> Technique is thus but the weapon of the artistic warfare; scientific knowledge of anatomy and perspective, the commissariat that sustains the army. These Japanese art may safely accept from the West, without detracting from its own nature. Ideals in turn, are the modes in which the artistic mind moves, a plan of campaign which the nature of the country imposes on war. Within and behind them lies always the sovereign-general, immovable and self-contained, nodding peace or destruction from his brow. [৮]

উৎপাদন, প্রশাসন ও সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর জাপান কার্যকর-ভাবে য়ুরোপীয় অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করে নিয়েছিল। সেই বৈষয়িক সিদ্ধি তেন্‌শিন-এর উপমার ভিত্তি।

---

৮ পূর্বোক্তসূত্র, পৃ. 185। ইটালিক বর্তমান লেখকের।

৪

স্বদেশের শিল্পসংস্কৃতি জগতে কৃতকীর্তি ওকাকুরা তেন্‌শিনকে পূর্বোক্ত শোক-নিবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'জাপানের কালরাত্রির অন্ধকার পটে... তমোহন্ত্রী পূর্ণচন্দ্র'। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়ে অবনীন্দ্রনাথেরও চারপাশে নিবিড় তমিস্রা ঘনিয়ে ছিল। শিক্ষানবিশির পাট চুকিয়ে দিয়ে তিনি এর বছর সাতেক আগে থেকে স্বাধীন পরীক্ষায় আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার নতুন ভাষা উদ্ভাবনের চেষ্টা শুরু করেন। ১৮৯৫-৯৭-এর মধ্যে রাধাকৃষ্ণ লীলার বিষয় নিয়ে ২০ খানি ছবির একটি সিরিজ শেষ হল। কৃষ্ণলীলা আবহমান ভারতীয় চিত্রকলায় বহু ব্যবহৃত. কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের হাতের ছবিতে ঠিক পুরোনো আমলের প্রকাশরীতি অনুসৃত হয় নি। পশ্চিমী আঙ্গিকে অর্জিত দক্ষতায় এবং পশ্চিমী মিনিয়েচর পেইন্টিং-এর প্রভাবে এই সিরিজের ছবিতে এমন অভিনবত্ব ফুটল যাতে একে কিছুতে রাজপুত বা ক্যাংড়া কলমের অনুবর্তন বলা যায় না। এ ছবির বিশিষ্টতা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'দেশী বা বিদেশী ছবির করণকৌশল এতদিন অচল অবস্থায় ছিল, অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে দুই কৌশল একত্রিত হয়ে সক্রিয় হয়ে উঠল'।[৯] তাঁর নিজেরই উত্তরকালীন সৃষ্টির তুলনায় এ-ছবি দুর্বল রচনা, তবুও এই কাজগুলিতে তিনি প্রথম নিজের শক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হন। বোঝেন ভারতীয় উত্তরাধিকার অর্জন তাঁর কাম্য হলেও কোনো প্রথার কাছে মনের এবং হাতের স্বাধীনতা বাঁধা দেবার প্রয়োজন নেই। ১৮৯৭-এ অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেলের সংস্পর্শে আসেন। হ্যাভেলের উৎসাহে মোগল শৈলীর সূক্ষ্ম অলংকরণ, রঙ ব্যবহারের আশ্চর্য নৈপুণ্য নিবিষ্টভাবে অনুশীলন করেন। এইভাবে বিভিন্ন ভারতীয় শৈলীর রহস্য তাঁর আয়ত্তে এসে যাচ্ছিল এবং প্রাচীন শিল্পীদের দক্ষতার দৃষ্টান্তগুলি ভেঙে ভেঙে, মিলিয়ে মিশিয়ে তিনি নিজের বিশিষ্ট শৈলী উদ্ভাবনের পরীক্ষায় ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। অনুভব করছিলেন, তাঁরই হাতে ভারতীয় চিত্রকলার একটা নতুন অধ্যায়ের যথার্থ সূচনা হচ্ছে। তবুও ভেতর থেকে বাধা কাটে নি; ভারতীয় পরম্পরার সব কীর্তি আয়ত্তে এসে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁর মনে হত অতীতের শিল্পীদের হাতের কাজে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় আছে ঠিকই, কিন্তু সে নিপুণতা অনেকটাই অসাড়, নিষ্প্রাণ, কেবলই রীতিবদ্ধ চর্চার দক্ষতা। তাঁর আধুনিক চিত্তের প্রসার, অনুভূতির বৈচিত্র্য— ঐ স্থাবর আঙ্গিকের ছাঁচের মধ্যে পূর্ণত আধারিত করা অসম্ভব মনে হচ্ছিল। ভারতীয় সমাজ যেমন নিজের ভেতরের শক্তির দ্বন্দ্বে পুরোনো ছক ভেঙে উদ্‌বর্তিত হয় নি, তেমনি পুরোনো ঘরানার শিল্পীরাও চিরাগত করণ-কৌশলের ছক ভেঙে বেরিয়ে আধুনিকতার আলোয় এসে দাঁড়াতে পারেন নি। পুনরাবৃত্তিময় চর্চার যান্ত্রিকতায় সমস্ত উদ্দীপনা নিঃশেষ হয়ে গেছে। অথচ অবনীন্দ্রনাথ তাঁর

৯ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, "অবনীন্দ্রনাথ", বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ২-৩, পৃ. ১৭৯

সমকালীন অপর আধুনিকদের মতোই ভারতীয় পরিস্থিতির সংকীর্ণ সুযোগের মধ্যে বাইরের পৃথিবীর আলো হাওয়ার পুষ্টিকর প্রভাবে বেড়ে উঠেছিলেন। নান্দনিক রুচির আধুনিকতা, চৈতন্যের বিস্ফার, অনুভূতির অন্তহীন বৈচিত্র্য, প্রাণশক্তির গতি-বিভঙ্গ আস্বাদনের আনন্দ তাঁর শিল্পীব্যক্তিত্বে প্রচণ্ড উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলছিল। পরম্পরাগত ভারতীয় শিল্পের আঙ্গিকে সে-উদ্দীপনা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বাধা পাচ্ছিলেন, পীড়িত বোধ করছিলেন। বার বার তিনি এই সংকটের কথা, এই অতৃপ্তির কথা বলেছেন। যেমন :

> মোগল, পারশিয়ান, কাংড়া আর্ট নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করেছি, তাদের অপূর্ব নৈপুণ্য, অসামান্য কারুকার্য আমার মনকে মুগ্ধ করেছিল।... কিন্তু সত্যি বলতে কি, তাতে মনের তৃপ্তি হয় নি। এককালে চিত্র আঁকাকে শিল্পীরা বলত পুতলী বানায়। সত্যিই সেগুলো মানুষের পুতুল-মূর্তি ছিল। এইগুলিতে কারিকুরির অভিনব খেলা, কারুকার্যের চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা যেত, কিন্তু প্রাণ কই! পুত্‌লীর কারুকার্য নিয়ে ভারতীয় চিত্রকলা চিরদিন তো পরিতৃপ্ত থাকতে পারে না।... মন বললে, আমি কী করতে পারি, আমার কী দেবার আছে? ভেতর থেকে সাড়া পেলুম, সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[১০]

এ তাঁর ২৯-৩০ বৎসর বয়সের কথা। তীব্র সংকট বোধে পীড়িত শিল্পী তখন এক তমিস্রার স্তর অতিক্রম করে স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়েই, ১৯০২ খৃস্টাব্দে জাপানের 'তমোহন্ত্রী পূর্ণচন্দ্র'-র সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। স্বাধীন জাপানের তুলনায় উপনিবেশ-ভারতে শিল্পের সমস্যা ছিল অনেক জটিল, তমিস্রা নিবিড়তর। আত্মবিকাশের ব্যক্তিগত সমস্যা উত্তরণে এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় শিল্পের মুক্তির পথ চেনায় মনীষী ওকাকুরা তেন্‌শিন-এর কাছ থেকে অবনীন্দ্রনাথ গভীর সাহায্য পাবেন আশা করেছিলেন।

প্রথমবার ভারতে অবস্থানের সময়ে তেন্‌শিন তাঁর 'দি আইডিয়াল্‌স অব দি ইস্ট' বইখানি রচনা করেন। ১৯০৩ খৃস্টাব্দে এই বই ইংলন্ড থেকে প্রকাশিত হয়ে ভারতে পৌঁছয় এবং সরলাদেবী চৌধুরানীর ভাষায়, 'ওকাকুরার বইয়ের অন্তর্গত ভাব ও বাণী বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত মুখে মুখে প্রচার হতে থাকল, লাজপৎ রায় প্রমুখ প্রত্যেক দেশভক্তের লেখনীতে প্রতিফলিত হতে লাগল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মন্তব্য করেছেন :

> With the publication of the book, a furore went amongst the intellectuals of India. It was also alleged that he was the bearer of a Pan-Asiatic mission to unite the Asian countries against occidental imperialism.[১১]

---

১০ প্রতিমা দেবী, 'স্মৃতিচিত্র', সিগনেট প্রেস, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৯-৭০

১১ *Swami Vivekananda— Patriot-Prophet*. দ্রষ্টব্য নেপাল মজুমদার, 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ', প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৯৬১, পৃ. ১৮৩

উত্তরকালে এশীয় ঐক্যের বাণী এশিয়ার অন্যদেশগুলির উপরে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের স্লোগানে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু তেন্‌শিন যখন ভারতের মাটিতে বসে এশীয় ঐক্যের বাণী উচ্চারণ করেন তখনো জাপানের চিত্ত সাম্রাজ্য-বিস্তারের লালসায় কলুষিত হয় নি। তেন্‌শিন-এর বাণীর শুদ্ধ আন্তরিকতা ভারতীয় চিত্তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। অপর ভারতীয়দের মতো অবনীন্দ্রনাথও প্রাচ্য-প্রতিভার স্বকীয়তা বোঝার এবং তৎসাময়িক বর্তমানের দুর্দশার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টায় তেন্‌শিন-এর চিন্তাসূত্রগুলি পরম আশ্রয় মনে করেছিলেন। সূত্রগুলি, তেন্‌শিন-এর নিজের ভাষায় :

> Asia is one.
> Asiatic races form a single mightly web.
> The task of Asia to-day, then, becomes that of protecting and restoring *Asiatic modes*. But to do this she must herself first recognise and develop consciousness of these modes. For the shadows of the past are the promise of the future. No tree can be greater than the power that is in the seed. *Life lies ever in the return to self.*
> Victory from within, or a mighty death without.

'দি আইডিয়াল্‌স অব দি ইস্ট' বইখানি হাতে আসার আগে থেকেই অবনীন্দ্রনাথ তেন্‌শিন-এর মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন ধরে নেওয়া যায়, কারণ, তেন্‌শিন এখানে বেশিরভাগ সময় কাটাতেন নিবেদিতা ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্যে, আর এঁরা দুজনেই অবনীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পাশ্চাত্যের প্রভাবে অভিভূত না হয়ে নিজেদের ঐতিহ্যের জমিতে দাঁড়িয়ে প্রাচ্যের মানুষ আধুনিক বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে সম্মানজনক ভূমিকা নিতে পারে, বিশ্বে 'as a cultural and philosophical counterpoint' (এলিসি গ্রিল্লির ভাষা) প্রাচ্যের ভূমিকা সমূহ গুরুত্বপূর্ণ— তেন্‌শিন-এর এই প্রত্যয়ে অবনীন্দ্রনাথ নিজের ভাবনার দৃঢ় সমর্থন পেলেন; নিজের কাজে এতদিন তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের, Indian mode-এর তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করে এসেছেন। ভারতপন্থ বিষয়ে তাঁর জিজ্ঞাসা তেন্‌শিন-এর প্রভাবে আরো পরিব্যাপ্ত পটভূমিতে বিস্তৃত হল; Asian mode বা এশীয় পন্থ্-এর পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন। কিছু পরে, ১৩১৫ বঙ্গাব্দে লেখা 'পরিচয়' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য বোঝার প্রয়োজন নির্দেশ করে বলেন :

> পুরাকালে এই শক্তি (adapting) আমাদের শিল্পে কিরূপে কাজ করিতেছিল তাহা বুঝিতে হইলে প্রাচীন Asiatic Art-টার চর্চা করিতে হইবে। অর্থাৎ তুরস্ক হইতে জাপান, একদিকে চীন তাতারের উত্তর সীমা আর একদিকে দক্ষিণ মহাসাগর এই বিরাট ভূখণ্ডের খণ্ডশিল্পগুলার ক্রমচর্চা আবশ্যক, পরে বৌদ্ধযুগে যে মহাশিল্প এই খণ্ডশিল্পগুলাকে নিজ তেজে অনুপ্রাণিত করিয়া এক অখণ্ড অম্লান Asiatic Art রূপে প্রকাশ করিয়া গেছে সেটার প্রতি দৃষ্টিপাত করা চাই।... চীনে যাই, জাপানে চলি, তুরস্কের মরুপ্রান্তরেই বা সন্ধানে

ফিরি সেই শিল্প যে শিল্প আমাদের ভারত-স্তূপ ভাস্কর্যে মণ্ডিত, অজন্তাগুহা বিচিত্র চিত্রে রঞ্জিত করিয়াছে। সে যেখানেই গিয়াছে সেইখানেই নিজের ছাপ স্পষ্ট অঙ্কিত রাখিয়াছে অথচ সেই সেই দেশের শিল্পটাকে লোপ না করিয়া।[১২]

ঐতিহ্য বিচারে এশীয় পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে সচেতনতার জন্যে অবনীন্দ্রনাথ তেন্‌শিন-এর কাছে ঋণী। আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী তাঁর শ্রমসাধ্য গবেষণায় প্রাচ্য শিল্পের তথ্যগত পরিচয় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শুরু করার আগে তেন্‌শিন-ই এশীয় শিল্পের তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত করেন। জাপানি শিল্প-ঐতিহ্যের বিশ্লেষণ দেখান কীভাবে জাপান প্রকাশের ভাষার জন্যে চীন এবং আদর্শগত প্রেরণার দিক থেকে ভারতের উপরে নির্ভর করে এসেছে। তাঁর মতে জাপানের শিল্পকলায় এশিয়ার সম্মিলিত সংস্কৃতি প্রাণময় অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। জাপানি শিল্প-সংস্কৃতির স্বরূপ মহাদেশীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বোঝা যাবে না, তেন্‌শিন-এর এই অভিমত অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্য মূল্যায়নে কাজে লাগান। ধারণাটিকে আরো প্রসারিত করে তিনি বিভিন্ন শিল্পরীতির বিমিশ্রণে শিল্পীর স্বাধীনতার কথা বলেন। কোনো একটি শিল্পপ্রথা অনড় ভাবে আঁকড়ে থাকায় শিল্পীর ক্রিয়াকর্ম পঙ্গু হয়ে যেতে বাধ্য, বাইরে থেকে কোনো রীতি গ্রহণ করায় দেশীয় শিল্পের জাত যায় না। গ্রহণ-বর্জনের স্বাধীনতা ক্রিয়াবান শিল্পীরা সর্বদা পেয়ে এসেছেন এবং একালেও পাওয়া উচিত— এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পে নিরন্তর মেলামেশার দৃষ্টান্তে অবনীন্দ্রনাথের এই ধারণাগুলি বস্তুভিত্তি পায়।

তত্ত্বগত ভাবে যেমন অবনীন্দ্রনাথ তেন্‌শিন-এর ধ্যান-ধারণায় অভিপ্রেত অবলম্বন পেলেন, তেমনি সাক্ষাৎ শিল্পকর্মেও তাঁর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সাহায্য পেয়েছিলেন। ১৯০৩ খৃস্টাব্দে তেন্‌শিন তাঁর দুই কৃতী ছাত্র ইয়োকোইয়ামা তাইকান এবং হিশিদা শুন্‌সোকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। তখন পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ নিরন্তর অনুশীলনে অর্জিত নৈপুণ্যকে কোনো ব্যক্তিগত শৈলীর বিশিষ্টতায় উত্তীর্ণ করতে পারেন নি। তাঁর ব্যক্তিগত বিকাশের সেই ক্রান্তিকালে তিনি তাইকান হিশিদার মাধ্যমে জাপানি চিত্রকলায় প্রাচ্য-আধুনিকতার একটি নির্ভরযোগ্য আদর্শ পেলেন। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' স্মৃতিকথায় অবনীন্দ্রনাথ এঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করার কথা নিজেই বলেছেন। সব বড়ো শিল্পীর জীবনেই এমন অভিজ্ঞতা আসে : তাঁরা আত্মবিকাশের একটা স্তরে পৌঁছে অনুভব করেন, কলাকৌশল সবই মুঠির মধ্যে এসে গিয়েছে, কিন্তু প্রকাশে স্বাচ্ছন্দ্য আসছে না। কিছুতেই আয়ত্তে আসছে না সেই 'আপনার ভাষা' যাতে 'অন্তরে ধ্যানখানি' সম্পূর্ণ বাণীলাভ করবে। অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে 'প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত' প্রতিভার এই সংকটবোধের, যন্ত্রণাবোধের কারণ তাঁর দেশকালের, তাঁর শ্রেণীমানসের বাতাবরণেই নিহিত ছিল। সমৃদ্ধ, কিন্তু বিকাশের সম্ভাবনাহীন জাতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আকর্ষণ

১২ 'পরিচয়', ভারতী, চৈত্র ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৭৪

করে নেবার এবং ব্যক্তিগত প্রতিভার সামর্থ্যে উত্তরাধিকারকে আধুনিক বিশ্বের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ভাষায় অভিব্যক্ত করার যে দুরূহ ব্রত তাঁর উপরে বর্তেছিল, সেই ব্রত পালনে তিনি ব্যাপক সামাজিক সমর্থন পান নি। তিনি নিজে যে-শ্রেণীর মানুষ উপনিবেশের সেই নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর মানস ও রুচির আধুনিকতাও ছিল খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। অবনীন্দ্রনাথের ছবির সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকার বিদ্রূপময় মন্তব্যগুলি স্মরণ করলে বোঝা যায়, তাঁর পক্ষে রুচির প্রতিকূলতা ঠেলে এগোনো কত কঠিন কাজ ছিল। এমন পরিবেশে, এমন সময়ে তিনি তাইকান-এর মধ্যে সৃষ্টির আনন্দে তন্ময়, সদাউদ্দীপ্ত, নতুনকালের শিল্পীব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত দেখলেন। তাইকান-হিশিদার সান্নিধ্যে এবং আধুনিক জাপানি শিল্পের করণ-কৌশল সম্পর্কে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় এক নতুন উদ্দীপনা অনুভব করলেন, অবসাদ ও অসাড়তা কেটে গেল। এই উদ্দীপনায় তাঁর সমুদ্যত কিন্তু প্রতিহত শক্তি আত্মপ্রকাশের সচ্ছল ভাষা উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছিল, আয়ত্তে এসেছিল নিজস্ব শৈলী। প্রসঙ্গত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়-এর বিশেষজ্ঞ অভিমত স্মরণীয় :

> The Japanese influence changed Abanindranath's technical process altogether... In the Illustrations of Omar Khayyam we see for the first time Abanindranath's work showing a definite individual style. This series is a landmark in Abanindranath's style. For the first time we see texture, atmosphere, deep interest in portraiture and dramatic expression. [১৩]

অবনীন্দ্রনাথ স্থূলভাবে জাপানি রীতি কখনোই অনুসরণ করেন নি, যেমন মোগল বা য়ুরোপীয় রীতিও হুবহু অনুসরণ করেন নি। তাঁর নিজস্ব শৈলীর উপাদান তিনি আহরণ করেছিলেন মোগল, য়ুরোপীয় এবং জাপানি রীতি থেকে। এবং বিনোদবিহারীর ভাষায়, 'by dint of his wonderful talent he effected a fusion of western and oriental techniques and evolved a new style in painting. [১৪] জাপানি শিল্পীদের সংস্রবে ১৯০৩ সালেই তাঁর ছবির নতুন পর্ব শুরু হয়েছিল। 'দেয়ালি' (১৯০৩), 'ভারতমাতা' (১৯০৩/৪), 'ঊর্ধ্বাকাশে সিদ্ধদম্পতি' (১৯০৫)— ছবিগুলির ভেতর দিয়ে তাঁর নিজস্ব শৈলীর পূর্ণ বিকাশ ঘটে 'ওমর খৈয়াম' চিত্রমালায় (১৯০৬-১১)।

অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত শৈলীর বিকাশে জাপানি শিল্পীদের সাক্ষাৎ প্রভাব প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ওয়াশ পদ্ধতির কথা ওঠে : 'টাইকানের ছবি আঁকা দেখে দেখেই একদিন আমার মাথায় এল, জলে কাগজ ভিজিয়ে ছবি আঁকলে হয়।' ইংরেজ শিল্পীদের ধরনে জলরঙে আঁকতে অবনীন্দ্রনাথ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন, তেল রঙ বা ভারতীয় ছবির

১৩ Binodebehari Mukherjee, "A Chronology of Abanindranath's Paintings", *The Visva-Bharati Quarterly*, May-Oct 1942, pp. 125-26.

১৪ Binodebehari Mukherjee, "The Art of Abanindranath Tagore", *The Visva-Bharati Quarterly*, May-Oct. 1942, p. 115

চিরাচরিত টেম্পারা পদ্ধতি (আঠা বা ডিমের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে ব্যবহার) তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করে নি। তাইকানের দৃষ্টান্তে জলরঙের অভ্যস্ত রীতি অবনীন্দ্রনাথের হাতে সম্পূর্ণ নতুন তাৎপর্যের দিকে বাঁক নিল। শুকনো কাগজ আর ভিজে কাগজ রঙ-প্রয়োগের দিক থেকে যে উপাদান হিসেবে ভিন্ন হয়ে যায়, এই তথ্য অবনীন্দ্রনাথ তাইকানের কাজ দেখেই উপলব্ধি করেন। আগে কাগজে ছবির রূপরেখা ছকে নিয়ে এক পর্দা স্বচ্ছ জলরঙ প্রয়োগ, তার পর গোটা ছবি জলে ডুবিয়ে তুলে রোদে শুকিয়ে আবার রঙ প্রয়োগ— অবনীন্দ্রনাথ এই পদ্ধতিতে আঁকা শুরু করেন। তাইকান মোটা তুলি দিয়ে জল টেনে ছবি ভেজাতেন, অবনীন্দ্রনাথ গোটা ছবিটাকে জলে ডুবিয়ে নিতেন। রোদ-জল খাওয়ানোর ব্যাপারে কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম মানতেন না। বার বার জলে ভেজাবার ফলে কাগজের ভেতরে রঙ সুনিবিষ্ট হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন রঙের প্রান্তীয় স্বাতন্ত্র্য বিলীন হয়ে রঙে রঙে মিশে যায়। পটে অনুগ্র আলোছায়ার মায়া ছড়িয়ে পড়ে। পটের অপ্রধান অংশগুলি ছায়াছন্ন হয়ে ওঠে। পেছনের অংশে প্রায়শ দূরাভাস ফুটে ওঠে। প্রয়োজনে অবনীন্দ্রনাথ কাগজের মূল সাদা অংশ বাঁচিয়ে, এমন-কি, ঘষে ঘষে রঙ তুলে দিয়ে আলোর মাত্রা বাড়াতেন। ওয়াশ পদ্ধতিতেও তিনি নিরন্তর নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। কাঞ্চন চক্রবর্তী বলেছেন :

> Even a casual comparison will obviously speak that a Japanese wash-painter hardly demonstrates an evolution of his own in the technique while Abanindra-was-style displayed a phenomenal evolution throughout. He could innovate a new synthesis eventually to transform into a style entirely his own so that that could prove to be the most 'suitable vehicle to convey his sympathies.' [১৫]

অবনীন্দ্রনাথের মতো সমর্থ প্রতিভার পক্ষে এই তো স্বাভাবিক। সব প্রভাবই তাঁর সৃষ্টিময় স্বভাবে সংগত হয়ে যায়, তাঁকে আবদ্ধ করে না।

ওয়াশ পদ্ধতি ছাড়া আরো কিছু কিছু আঙ্গিক অবনীন্দ্রনাথ জাপানি সূত্র থেকে নিয়েছেন। তাইকানের কাছে জাপানি রীতিতে ধীরে ধীরে লাইন টানা অভ্যাস করেন, 'তার কাছেই শিখলুম এক একটি লাইন কত ধীরে ধীরে টানে তারা'। জাপানিরা যখন বড়ো পটে ছবি করেন তখন পটের বেশির ভাগ ফাঁকা রেখে দেন। কল্পিত বিষয়টি খুব স্পষ্ট ও জোরালোভাবে এঁকে ছেড়ে দেন, পারিপার্শ্বিক ফোটানোর নামে অবান্তর বিষয় পট জুড়ে বসে না। কোনো কোনো ছবিতে অবনীন্দ্রনাথ এই রীতি অনুসরণ করেছেন, যেমন 'কণারক-এর পথে' ছবিতে। পটের একেবারে ডান পাশে ক্রমোচ্চ জমির উপরে মন্দির, গোটা পটখানার মাঝ দিয়ে বালিয়াড়ির আভাস বোঝাতে শুধু একটি ভাঙা ভাঙা রেখা টানা। পাল্কিবাহকদের, মন্দিরটিকে আমরা কতদূর থেকে

১৫ Kanchan Chakraberti, "Wash Technique and Abanindraana", *Abanindranath*, Published by Abanindra Centenary Celebration Committee, Visva-Bharati, 1978, pp. 56-57.

দেখছি এই সুদূরতার ভাবটুকু পটের ধৌত ও লাঞ্ছিত অংশের অনুপাতের উপরে নির্ভর করে আছে বস্তুভারে ভরে না তুলে পটের অধিকাংশ ফাঁকা রেখে দেওয়ার এই জাপানি ধরন অবনীন্দ্রনাথের আরো অনেক ছবিতে দেখা যায়। 'নির্বাসিত যক্ষ' ছবিতে গাছ-পাতা আঁকা হয়েছিল প্রকৃতির ছবি আঁকার জাপানি রীতি মনে রেখে। জাপানি শিল্পীদের অনুসরণে অবনীন্দ্রনাথ ছবিতে সিল ব্যবহার শুরু করেন, সিলটি তাঁকে তেন্‌শিন উপহার দিয়েছিলেন।[১৬] অবনীন্দ্রনাথের কোনো কোনো ছবিতে এই সিল ছবির মূল বিন্যাসের অঙ্গ হয়ে উঠেছে, পটে সন্ন্যস্ত বিষয়ের ভারসাম্য বজায় রাখার সিলটি নানা কৌশলে ব্যবহার করেছেন। খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে অবনীন্দ্রনাথের মধ্যপর্বের কাজে আরো অনেক জাপানি উপাদান আকর্ষণ করে নেবার দৃষ্টান্ত দেখানো যায়। সবচেয়ে বড়ো কথা, শিল্পভাবনার দিক থেকে যেমন তেমনি শিল্পকর্মেও তেন্‌শিনের মাধ্যমে জাপানের সঙ্গে যোগাযোগে অবনীন্দ্রনাথ আত্মবিকাশের এক সংকটপর্ব অতিক্রম করে আসার জোর পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা উচিত, অবনীন্দ্রনাথ যেমন তাইকান-হিশিদার কাজের দৃষ্টান্ত থেকে অনেক শিখেছেন, তাইকান-হিশিদাও তেমনি অবনীন্দ্রনাথের কাছে ভারতীয় আঙ্গিকের পাঠ নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার অন্তরঙ্গ সম্পর্কই ছিল।

৫

তেন্‌শিন দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন ১৯১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং অক্টোবরে দেশে ফিরে যান। আগের বারের তুলনায় এবার অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পান। ১৯০২-০৩ থেকে ১৯১২-র মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ যেমন নিজের শিল্পী-জীবনের সংকটপর্ব অতিক্রম করে আত্মস্থ হয়েছিলেন তেমনি 'গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট'-এর শিক্ষক হিসেবে তরুণ শিল্পীদের একটি দলকে গড়েপিটে তৈরি করে তুলেছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯০৭-এ 'দি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' স্থাপিত হওয়ায় তাঁর কাজের ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয়। কিছুটা রাজপুরুষদের সহায়তায় এবং অনেকটাই গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের উদ্যোগ-উদ্দীপনায় সৃজন-প্রদর্শন-বিচারবিশ্লেষণ

---

১৬ তেন্‌শিন কলকাতা থেকে সাংহাই-তে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু নাগাও-উজানকে ৭ অক্টোবর ১৯১২ তারিখে সিল পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেন। লেখেন : "এখানে দুই ভাই আছেন যাঁরা ভালো শিল্পী। বড়ো জনের নাম স্বর্গের ইন্দ্র ['তেন্-তাইশাকু' (তেন=স্বর্গ, তাইশাকু=ইন্দ্র)], ছোটো জনের নাম ধরণীর ইন্দ্র ['চি-তাইশাকু' (চি=ধরণী)]। আমি তাঁদের সিল উপহার দিতে চাই। রত্নের উপরে দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে খোদাই করিয়ে তৈরি করিয়ো। রত্নটি যেন সুন্দর হয়। কিছু নক্‌শার অলংকরণ থাকতে পারে" (সিলের আকার এখানে তেন্‌শিন এঁকে দিয়েছিলেন)। হিদেতোকি শিমোমুরা -সম্পাদিত 'তেন্‌শিন তো সোনো শোকান্' (তেন্‌শিন এবং তাঁর চিঠিপত্র'), তোকিয়ো ১৯৬৪— সংকলনের ২০৮ সংখ্যক চিঠি।— অনূদিত।

মিলিয়ে বিংশ শতকের প্রথম দশকে কলাচর্চা একটা আন্দোলনের চেহারা পেয়েছিল। এই নবজাত শিল্পকলার কথা বিদেশেও কিছুটা প্রচারিত হয়। বিলেতের 'দি স্টুডিয়ো' পত্রিকায় হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথের কাজ সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন (অক্টোবর ১৯০২ এবং জানুয়ারি ১৯০৩)। জাপানের 'কোক্কা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় স্যার জন উড্রফ-এর 'এ মডার্ন স্কুল অব ইন্ডিয়ান পেইন্টিং' প্রবন্ধ (১৯০৮)। দ্বিতীয়বার কলকাতায় এসে নতুন জেগে ওঠা উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশে তেন্শিন তৃপ্তি পান। মন্তব্য করেন :

দশ বছর আগে যখন আমি এসেছিলাম তখন তোমাদের আজকালকার আর্ট বলে কিছুই দেখি নি। এবারে দেখছি তোমাদের আর্ট হবার দিকে যাচ্ছে। আবার যদি দশ বছর বাদে আসি তখন হয়তো দেখব হয়েছে কিছু।[১৭]

এই 'হবার দিকে যাওয়া' জায়মান নবীন শিল্পের মূল তন্ত্রধারক ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, আর অবনীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষে পরোক্ষে নানাভাবে উপকৃত হয়েছেন ওকাকুরা তেন্শিন-এর প্রেরণায়। সুতরাং জাপানের 'তমোহন্ত্রী পূর্ণচন্দ্র' ভারতেরও তিমির হননে একটা স্মরণীয় ভূমিকা পালন করে গেছেন মানতে হয়।

হিদেতোকি শিমোমুরা লিখেছেন :

তেন্শিন যখন ঠাকুরদের সঙ্গে বাস করতেন তখন শুধু শিল্পকর্ম ও সমালোচনায় প্রাজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ নয়, বেঙ্গল স্কুলে শিল্পীরা, যেমন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল বসু মাঝে মাঝেই তাঁর কাছে এসে বসতেন। স্বভাবতই তেন্শিন-এর সঙ্গে এঁদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং তিনি এঁদের প্রভাবিত করেন।[১৮]

অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ছাত্রদের স্মৃতিকথা থেকেও জানা যায় দ্বিতীয়বার কলকাতায় থাকার সময়ে তেন্শিন মাঝে মাঝে তরুণ শিল্পীদের নিয়ে বসতেন, উপদেশ দিতেন, কখনো কখনো ছবির ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিয়ে দিতেন। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় নানাজনের টুকরো স্মৃতির উপরে নির্ভর করে তাঁর 'আধুনিক শিল্পশিক্ষা' গ্রন্থে তেন্শিন-এর উপদেশগুলির সারসংকলন করে দিয়েছেন :

ছবির কম্পোজিশানের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে প্রখর বোধ প্রয়োজন।
দর্শকের মনে সদ্যোস্নানের শুদ্ধভাব জাগিয়ে তোলার রঙ প্রয়োগের চরমোৎকর্ষ।
বস্তু-সত্তার প্রকৃতিভেদে বস্তুর নিজস্বধর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত।
আঙ্গিকের উৎকর্ষ ভিন্ন শুধু ভাবের গৌরবে কোনো শিল্পরূপ পূর্ণতা পায় না।
শিল্পীজীবনে পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন tradition, nature, originality— এই তিন-এর সমন্বয়। ব্যক্তিগত প্রতিভার আশ্রয় ভিন্ন মৌলিকতা বা জীবনের স্পন্দন প্রকাশ পায় না।

---

১৭ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জোড়াসাঁকোর ধারে', বিশ্বভারতী, ১৯৬৩, পৃ. ১১৩।
১৮ হিদেতোকি শিমোমুরা -সম্পাদিত 'তেন্শিন তো সোনো শোকান্', তোকিয়ো ১৯৬৪, পৃ. ১১৬-১৭। অনূদিত।

অপরিণত তরুণ শিল্পীদের তত্ত্বজ্ঞান দেবার চেষ্টা না করে তিনি সরল শিল্পকর্মের মূলনীতিগুলি বুঝিয়ে দিতেন।

৬

পাশাপাশি উভয়ের উক্তি উদ্‌ধৃত করে তেন্‌শিন ও অবনীন্দ্রনাথের ভাবনার মিল দেখানোর বা প্রভাব দেখানোর হয়তো কোনো উপযোগিতা নেই, কারণ, অবনীন্দ্রনাথের সৃজনধর্মী ব্যক্তিত্বে কারো কোনো প্রভাব স্থূলভাবে চিরলগ্ন হয়ে থাকে নি। তাঁর অর্জন-উপার্জন সবই নিজের সৃষ্টির ভুবনে মিলে মিশে গেছে, তাঁর ভাবনার মুক্তিতে সংগত হয়ে গেছে। তবুও দুজনের চিন্তা-চেতনার পরিচয় পাশাপাশি সাজালে বোঝা যায় প্রাচ্যের প্রাচীন দুই দেশের এই দুই আধুনিক, সমকালবর্তী কৃতীপুরুষের সামনে একই ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তেন্‌শিন-এর ভাবনা ও কর্মপদ্ধতির দৃষ্টান্তে অবনীন্দ্রনাথ নিজের সমস্যা উত্তরণের উপযোগী কিছু ইঙ্গিত পেয়েছিলেন এবং কাজে লাগিয়েছিলেন। ঐতিহ্যের মৃত্তিকা থেকে বিচ্ছিন্ন আধুনিকতার কোনো যথার্থ মূল্য নেই— এই বোধ অবনীন্দ্রনাথের নিজেরই অভিজ্ঞতা থেকে নির্বাসিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট ধারণার আকার নিচ্ছিল। এ-ধারণা ব্যাপ্ত পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণতর করে তোলায় ঐতিহ্য অর্থে গোটা প্রাচ্য-ঐতিহ্য সম্পর্কে তেন্‌শিন-এর বিশ্লেষণ থেকে তিনি সাহায্য পেলেন। শিল্পীজীবনের প্রথম পর্বে অব্যবস্থিত নান্দনিক আদর্শের বিশৃঙ্খলায় অবনীন্দ্রনাথ বাইরে থেকে সাহায্য পাবার কোনো উপায় দেখেন নি। সেই দুঃসময়ে নতুন পথ খোঁজার স্বাধীনতায় শিল্পীর অক্ষুণ্ণ অধিকারের উপরেই তাঁকে জোর দিতে হয়েছিল। তাঁর নিঃসঙ্গ ব্রত উদ্‌যাপনের দিনে তিনি তত্ত্বগতভাবে বার বার তাই সকল আরোপিত বিধিবিধানের বাইরে এসে দাঁড়াবার কথা বলেছিলেন। শিল্পীর স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতা সম্পর্কে তাঁর এই ধারণার সঙ্গে তেন্‌শিন-এর ধারণার মিল পাওয়া যায়। নিপ্পোন্‌ বিজুৎসু-ইন-এর আদর্শ সম্পর্কে তেন্‌শিন যেমন বলেছিলেন : স্বাধীনতা এই প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের মহত্তম অধিকার, স্বাধীনতার অর্থ শিল্পীর সচেতন আত্মবিকাশ; ভারতীয় বাস্তবতায় শাস্ত্রবিহিত প্রথার এবং ঔপনিবেশিক শিল্প-শিক্ষাবিধির শাসনের বিরুদ্ধে অবনীন্দ্রনাথকেও তেমনিভাবে শিল্পীর স্বাধীনতার জন্যে তত্ত্বগত সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। তেন্‌শিন ও অবনীন্দ্রনাথ কখনো রীতিবদ্ধ চর্চায় শিল্পীর উদ্ভাবনীবৃত্তি শৃঙ্খলিত করার তত্ত্বে বিশ্বাস করেন নি। শুরুতে তাঁরা দুজনেই আধুনিকদের পক্ষে স্বজাতীয় প্রাচীন শিল্পকলা চর্চার উপরে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন— সে ছিল য়ুরোপীয় প্রভাবের বিপর্যয় ঠেকাবার একটা সাময়িক উপায়। কিন্তু অভিজ্ঞতাজাত প্রকৃষ্ট বোধে উভয়েই অচিরে বোঝেন, শিল্পকলায় 'পুনরুজ্জীবনবাদ' মুক্তির উপায় নয়। বোঝেন, উপস্থিত বর্তমানের দাবি আধুনিক শিল্পীর পক্ষে অবশ্যমান্য এবং কোনো অবসিত আঙ্গিক আধুনিক মনের অব্যর্থ ভাষা হয়ে উঠতে পারে না এবং ঐতিহ্যলগ্ন হয়েও সচেতনভাবে

ঐতিহ্যের উদ্‌বর্তন ঘটানোই একালের শিল্পীর স্বাধীন-দায়িত্ব। 'দি বুক অব টি' গ্রন্থে তেন্‌শিন যেমন বর্তমানের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করেন :

> The claims of contemporary art cannot be ignored in any vital scheme of life. The art of to-day is that which really belongs to us : it is our own reflection. In condemning it we but condemn ourselves... It is indeed a shame that despite all our rhapsodies about the ancients we pay so little attention to our own possibilities. ...The past may well look with pity at the poverty of our civilization; the future will laugh at the barrenness of our art. [১৯]

তেমনি অবনীন্দ্রনাথও স্পষ্ট বলেন :

> অতীতের শিল্পসম্পদ হারিয়ে বসা আমাদের শিল্পের পক্ষে দুর্ঘটনা, কিন্তু শুধু তাই রইল, একালের অর্জিত কিছুই রইল না, এটা শিল্পের বাঁচার পক্ষে অনুকূল অবস্থা মোটেই নয়। গাছের আগডালে যে নতুন মুকুল গাছের গোড়ায় অতীতের অন্ধকারে গাছের বীজটির প্রাণের স্রোতের সঙ্গে যুক্ত থেকে নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে যেভাবে মিলছে সেইরূপ মেলাই হল ঠিক। অতীতের শিল্পের সঙ্গে বর্তমান শিল্পের নতুন প্রকাশের এই হল স্বাভাবিক যোগ। [২০]

'শিল্পীর intention বা ধ্যান, তারি অনুপাতে' কালে কালে শিল্পক্রিয়া এগিয়ে চলে, 'শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়',— মৌল এই বিশ্বাসের ফলে শিক্ষকের আসনে বসা সত্ত্বেও অবনীন্দ্রনাথ কখনো ছাত্রদের উপরে নিজের প্রভুত্ব খাটান নি, বাঁধাবাঁধি শিক্ষাবিধির ছকে ফেলে কোনো গোষ্ঠী বা ঘরানা তৈরির কথা ভাবেন নি। তেন্‌শিন যেমন আধুনিক শিল্পীর 'Sense of evolutional self-development'-এর উপরে গুরুত্ব দিতেন, অবনীন্দ্রনাথও তেমনি শিল্পীর আত্মজ্ঞানকে মনে করতেন সবচেয়ে মূল্যবান। আধুনিক শিল্পীর প্রধান লক্ষণ আত্মসচেতনতা, এঁরা বার বার শিল্পীমানসের আত্মসচেতন বিচার ও বিকাশের কথা বলেছেন।

তেন্‌শিন ও অবনীন্দ্রনাথ দুজনেই সরকারি শিল্প-বিদ্যালয়ে চাকরি নিয়েছিলেন। 'বিজুৎসু গাক্কো' এবং কলকাতার 'গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট' প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে নিশ্চয়ই তুলনা চলে না। একটি স্বাধীন দেশের জাতীয় জীবনের চলমান ধারার সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠান, অপরটি উপনিবেশের প্রভুদের দাক্ষিণ্যে পুষ্ট,— অগত্যা বিদেশী শাসকদের স্বার্থের অনুকূল শিক্ষা-পরিকল্পনার গৌণ অঙ্গ। কিন্তু কার্যত তেন্‌শিন এবং অবনীন্দ্রনাথের চাকরি-জীবনের অভিজ্ঞতা প্রায় একই রকম। বিজুৎসু গাক্কোয় তেন্‌শিন পাশ্চাত্যপন্থী শিল্প-প্রশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশের মাটির সঙ্গে সংলগ্ন শিক্ষাবিধি চালু করেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে ছাত্রেরা তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করেন। এখানে

---

১৯ Kakuzo Okakura, "Art Appreciation", *The Book of Tea*, Tokyo, 1957 (প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৬-এ) p. 87

২০ 'শিল্পায়ন', সিগনেট প্রেস, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫২।

হ্যাভেল শিক্ষাবিধিতে ভারতীয় প্রবণতা বাড়ানোর নীতি কার্যকর করার জন্যে সহযোগী হিসেবে অবনীন্দ্রনাথকে চাকরিতে আনেন। অবনীন্দ্রনাথ স্বাধীনভাবে নিজের আদর্শমতো কাজ করতে পারবেন এই শর্তে চাকরি নিয়েছিলেন। সরকারি স্কুলে সুযোগ ছিল খুবই কম, তবুও হ্যাভেলের আনুকূল্যে এবং সাময়িকভাবে অধ্যক্ষের পদ পাওয়ায় তিনি কিছুদিন বেশ জমিয়ে কাজ করেন। অবনীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট রুটিন অনুসারে সিলেবাস ধরে ছাত্রদের পাঠ দেবার বিরোধী ছিলেন। নিজেদের প্রবণতা অনুসারে ছাত্রেরা স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাবে, বারংবার সংশোধনের চাপে কারো স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ করা হবে না— এই ছিল তাঁর শিক্ষাবিধির মূল নীতি। ভারতীয় মানসিকতার মর্মের সঙ্গে ছাত্রদের যোগ ঘটাবার জন্যে ছাত্রদের তিনি দেশের লোকসংস্কৃতি, পুরাণ-ইতিহাস, মহাকাব্যের আখ্যান ও সামাজিক আদর্শ সম্পর্কে অবহিত হতে উপদেশ দিতেন। বিনোদবিহারী বলেছেন, অবনীন্দ্রনাথ নিজের উদ্‌ভাবিত উপায়ে সাহিত্যধর্মী বর্ণনা ও নাটকীয় ভঙ্গির সাহায্যে আঁকার বিষয়-সম্পৃক্ত ভাবরূপ ছাত্রদের মনে জাগিয়ে তুলতেন। নিতান্ত বাধ্য না হলে কাগজে কলমে সংশোধন করতেন না। তাঁর সময়ের ছাত্ররা নিজেদের গরজে আর্ট গ্যালারির পুরনো ছবি দেখে অনুশীলন করতেন এবং প্রধানত ঈশ্বরীপ্রসাদের কাছে রীতিবদ্ধ আঙ্গিক চর্চা করতেন, অবনীন্দ্রনাথ হাতে ধরে কাউকে বিশেষ কোনো আঙ্গিক শেখান নি। কোনো আর্ট স্কুলে এতখানি স্বাধীনতা, এমন মুক্ত পরিবেশ পাওয়া প্রায় অভাবনীয় ব্যাপার। শিক্ষক হিসাবে আর্ট স্কুলে আসবার (১৯০৫) আগেই অবনীন্দ্রনাথ তেন্‌শিন-এর সঙ্গে পরিচিত হন (১৯০২)। প্রথমবারের পরিচয়ে তিনি শিল্পশিক্ষার রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কতটা আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন জানা যায় নি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে অবনীন্দ্রনাথের শেখানোর পদ্ধতির সঙ্গে তেন্‌শিন-এর পদ্ধতি মিলে যায়।

ইয়োশিমি তাকেউচি লিখেছেন :

> তেন্‌শিন-এর শিক্ষাপদ্ধতির মূল লক্ষ্য ছিল শিল্পীর আন্তর-উপলব্ধি উদ্‌বোধিত করা। তিনি মনে করতেন, ছবির সারবস্তু বর্ণ বা ছায়াতপ নয়, শিল্পীর চিৎপ্রকর্ষ।[২১]

তাঁর শেখানোর পদ্ধতি ছিল গভীর অভিভাবনাময়, Suggestive। কখনোই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিতেন না; মৃদু সংকেতে অভিপ্রায়টি ধরিয়ে দিতেন। তেন্‌শিন-এর ছেলে কাজুয়ো ওকাকুরার লেখা থেকে[২২] জানা যায় নিপ্পোন্ বিজুৎসু-ইন্-এ অনুষ্ঠিত নিয়মিত আলোচনাচক্রে উপস্থিত সভ্যেরা একই বিষয় নিয়ে আঁকার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতেন। তেন্‌শিন আঁকতে দেওয়া বিষয়বস্তু সাক্ষাৎভাবে ছবিতে না এনে তার আনুষঙ্গিক অনুভূতি প্রকাশ করতে বলতেন। যেমন 'উজ্জ্বল চাঁদ' বিষয় হলে ছবিতে

---

২১ ইয়োশিমি তাকেউচি, "ওকাকুরা তেন্‌শিন", 'নিহোন নো শিসোকা' ('জাপানি মনীষা') গ্রন্থমালা প্রথম খণ্ড, তোকিয়ো ১৯.২, পৃ. ৩৬১।— অনূদিত।

২২ কাজুয়ো ওকাকুরা, 'চিচি ওকাকুরা তেন্‌শিন' ('আমার বাবা ওকাকুরা তেন্‌শিন'), তোকিয়ো ১৯৭১, পৃ. ১৫৯

চাঁদ না এঁকে উজ্জ্বল চাঁদ যে অনুভূতি জাগায় সেই অনুভূতি ফোটাতে বলা হত। এইভাবে তিনি অভিভাবনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শেখাতেন। মাকাতো ঔওকা [২৩] বলেছেন : কোনো ছাত্র ছবির কোনো থিম্ তেন্শিন-এর গোচরে আনলে তিনি ইতিহাস ও সাহিত্যের সূত্র থেকে নানাপ্রসঙ্গ উত্থাপন করে কল্পিত থিম্‌টি ঋদ্ধ করে তোলার উপায় বলে দিতেন। তিনি বলতেন, শুধু আঙ্গিক আয়ত্ত করা যথেষ্ট নয়, দেশের ইতিহাস-সাহিত্য-দর্শন সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন ভিন্ন বড়ো শিল্প সৃজন অসম্ভব। শিক্ষক হিসেবে তেন্শিন ও অবনীন্দ্রনাথ দুজনেই চেয়েছেন, জাতীয় পুরাণ-ইতিহাস চর্চায় তরুণ শিল্পীদের মন সমৃদ্ধ হোক। ক্রমাগত নির্দিষ্ট আঙ্গিকের চর্চা না করে স্বাধীনভাবে নানা আঙ্গিকের পরীক্ষার ভেতর দিয়ে শিল্পীর স্বকীয় প্রকাশরীতি গড়ে উঠুক। তাঁরা মনে করতেন, পদে পদে নির্দেশ দেওয়ার ও সংশোধন করায় শিল্পীর মনের উদ্দীপনা নষ্ট হয়। গুরুর উচ্চ আসনের দূরত্বে নিজেকে সরিয়ে না রেখে তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্ক রচনা করতেন। অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, 'ছাত্র বলিনে, বলি পথ চলার সঙ্গী।'

প্রতিপক্ষের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তেন্শিন বিজুৎসু গাক্কোয় আট বছর (১৮৯০-৯৮) নিজের আদর্শে অবিচল থেকে কাজ করেন, একদল নিষ্ঠাবান তরুণ শিল্পী গড়ে তোলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত হন। নিজের আদর্শে কাজ করার জন্যে তাঁকে নিপ্পোন্ বিজুৎসু-ইন্ প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করতে হয়। হ্যাভেলের আমলের পরে সরকারি আর্টস্কুলে অবনীন্দ্রনাথকেও অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়েছিল। পরবর্তী অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন-এর সঙ্গে ক্রমে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিল। অবনীন্দ্রনাথ কখনো ছাত্রদের ক্লাসের নিয়ম-কানুনের মধ্যে বাঁধেন নি, 'ইচ্ছাসুখে' কাজ করার সুযোগ দিয়ে এসেছেন। অধ্যক্ষ ব্রাউন স্কুলের শৃঙ্খলা ভাঙা হচ্ছে বলে আপত্তি তুললেন। ক্রমেই তিক্ততা বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ দশ বছরের সরকারি চাকরি (১৯০৫-১৫) থেকে পদত্যাগ করে চলে আসেন। এর আগেই ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর পত্তন হয়েছিল, সেখানে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেলেন। আর ছিল জোড়াসাঁকোর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দা।

৭

ওকাকুরা তেন্শিন-এর মৃত্যুর কয়েকমাস পরে ১৩২১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথ 'চিত্রে ছন্দ ও রস', 'ভারত ষড়ঙ্গ' ও 'ষড়ঙ্গ দর্শন' নামে তিনটি প্রবন্ধ লেখেন, যা পরে 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' পুস্তিকায় সংকলিত হয়েছে (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ)। তেন্শিন-এর সংস্রবে অবনীন্দ্রনাথের মনে বৃহত্তর প্রাচ্যের শিল্পভাবনা সম্পর্কে যে আগ্রহ জেগেছিল, তার পরিণাম চীন জাপান ও

---

২৩ মাকাতো ঔওকা, 'ওকাকুরা, তেন্শিন', তোকিয়ো ১৯৭৫, পৃ. ২৩৫-৩৬

ভারতের চিত্রনীতি সম্পর্কে এই তুলনামূলক আলোচনা। বাৎস্যায়ন টীকায় যশোধর-এর সূত্র থেকে নেওয়া রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ— ছবির এই ছয় অঙ্গ অবনীন্দ্রনাথের আলোচনার ভিত্তি। রচনাটিতে তাঁর দীর্ঘ মননজাত সুস্থির সিদ্ধান্ত প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচ্যের প্রাচীন তিনটি জাতির পারস্পরিক ভাববিনিময়ের স্বীকৃত তথ্য থেকে মূল ভারতীয় ধারণার ক্রমিক বিস্তার-বিবর্তনের ধারাটি অবনীন্দ্রনাথ আশ্চর্য নৈপুণ্যে স্পষ্ট করে তুলেছেন; ভারত, চীন ও জাপানে অনুসৃত চিত্রনীতিগুলির আপাত-বৈসাদৃশ্যের অন্তর্গত একত্ব যুক্তিযুক্তভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। তেন্‌শিন 'দি আইডিয়াল্‌স্ অব দি ইস্ট' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, জাপানি সংস্কৃতি চীনের মাধ্যমে ভারত থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান আকর্ষণ করে নিয়ে পুষ্ট হয়েছিল। চিত্রনীতির ক্ষেত্রে এশীয় পন্থ-এর মর্ম উন্মোচনে অবনীন্দ্রনাথ এই ইঙ্গিত অনুসরণ করে প্রাচ্য শিল্পভাবনার উৎসরূপে ভারতীয় মনীষার মর্যাদা প্রতিপন্ন করেছেন। রচনাটির আরো গুরুত্বপূর্ণ দিক : পরিশীলিত আধুনিক রুচির আলোয় ঐতিহ্য-ধৃত ধারণায় সৃজনশীল মূল্যায়ন। তিনি যেভাবে ষড়ঙ্গসূত্রের মর্ম ব্যাখ্যা করেছেন তাতে সূত্রটি একালের শিল্পক্রিয়ারও মান্য আদর্শ হয়ে ওঠে। ভারতশিল্প বা প্রাচ্যশিল্প বিষয়ে জিজ্ঞাসু নন্দনতাত্ত্বিকেরা রচনাটিকে একটি প্রামাণ্য বিচারের মর্যাদা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-এর ইংরেজি অনুবাদে 'ভারত ষড়ঙ্গ' ও 'ষড়ঙ্গ দর্শন' প্রথমে 'মডার্ন রিভিয়্যু' (অক্টোবর ১৯১৫) পত্রিকায় এবং পরে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট থেকে প্রকাশিত পুস্তিকায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। ১৯২২-এ আঁদ্রে কার্পেলে তাঁর লেখা ভূমিকা-সংবলিত এর একটি ফরাসি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯৩০-এ বের্লিনের 'আট্‌লান্টিস' পত্রিকায় (নভেম্বর সংখ্যা) এর একটি সংক্ষেপিত জর্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

পরিশেষে উল্লেখ করি ওকাকুরা তেন্‌শিন ও অবনীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা অনুসরণ করতে গিয়ে মনে হয়েছে, প্রাচ্য-আধুনিকতার সমস্যা-বিচারে এবং শিল্পের ক্ষেত্রে আধুনিকদের কর্তব্য নির্ণয়ে মতামতের ঐক্য সত্ত্বেও উভয়ের মানসিক ঝোঁক কিছুটা ভিন্ন, দৃষ্টিভঙ্গি হুবহু এক নয়। তেন্‌শিন সর্বদা শিল্পের উৎকর্ষকে religious বা spiritual শুদ্ধতা মনে করেন। প্রাচ্যশিল্পের ঐতিহ্যকে তিনি প্রাচ্য ধর্মভাবনার ধারার সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করেন। ধর্মীয় আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার উপরিস্তরে এশীয় জাতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে তিনি যত আগ্রহী, প্রত্যক্ষ শিল্পধর্মের প্রকরণ-বিষয়ক জ্ঞান আদান-প্রদান বা উচ্চতর মানস-সংস্কৃতির বস্তুভিত্তি-স্বরূপ সামাজিক আধারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি তত উৎসাহী নন। অবনীন্দ্রনাথের রচনায় এ ধরনের ধর্মীয়-আধ্যাত্মক ঝোঁক নেই বললেই চলে। যেখানে ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক মানসিকতার প্রসঙ্গ আসে সেখানে বিষয়টিকে অবনীন্দ্রনাথ একটি বিচার্য তথ্য হিসেবেই গ্রহণ করেন, ঐ বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হন না। বিশেষত তিনি লোকসমাজের আচার-অনুষ্ঠানের বস্তুভিত্তির উপরে নির্ভর করে উচ্চতর ধ্যান-ধারণার তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করেন। ছড়া-গানে, ডাক-খনার বচনে, মানবপন্থ্-এর পথিক কবীর-এর মতো সাধনের দোঁহায় সংবদ্ধ লৌকিক প্রজ্ঞার

আলোয় নন্দনতত্ত্বের ব্যাসকূট ভেদ করেন। 'চিত্রে ছন্দ ও রস'-এর আলোচনায় 'রূপে রস, রসে রূপ' সম্প্রদানের রহস্য ব্যাখ্যায় 'দুই সুপর্ণের' রূপকের সাহায্য যেমন নেন, তেমনি স্ত্রী-আচারের দৃষ্টান্ত থেকে নিজের ধারণার সমর্থন সংগ্রহ করেন। জীবনাচরণের বাস্তবতা থেকে আহরিত তাৎপর্যময় ইঙ্গিতগুলির আলোয় অবনীন্দ্রনাথ ভারত-চীন-জাপানের চিত্রনীতির যে সৃজনশীল ব্যাখ্যা দেন তা বাওঈ (Bowie), বিনিয়ন (Binyon) বা কুমারস্বামীর লেখায় পাওয়া যায় না; তেন্‌শিনও এ-ভাবে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন না।

তেন্‌শিন-এর ভাবনায় ধর্মীয়তা-আধ্যাত্মিকতার ঝোঁক এত তীব্র কেন তা বোঝার একটি সূত্র পাই। জাপানের জাতীয় মানসিকতায় যা-কিছু সুদ্ধ সমুন্নত তাকেই religious-spiritual মনে করার প্রবণতা দেখা যায়। ব্যক্তিগত আচরণের শুদ্ধতা কিংবা কোনো বাস্তব কর্তব্যে নিষ্ঠার ঐকান্তিকতাকেও তাঁরা religious বলেন। 'নিপ্পোন্ বিজুৎসুশি' নামে মুদ্রিত একটি বক্তৃতায় তেন্‌শিন বলেছিলেন : শুধুই সুন্দর কিন্তু আপন কালের মহত্তম ধর্মচেতনার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত কোনো শিল্পকে মহৎ বলা যায় না।[২৪] শিল্পরস আস্বাদনের অভিজ্ঞতা কী অর্থে ধর্মীয় উপলব্ধির সদৃশ বোঝাতে গিয়ে অন্যত্র লিখেছেন :

> Nothing is more hallowing than the union of kindred spirits in art. At the moment of meeting, the art-lover transcends himself. Atonce he is and is not. He catches a glimpse of Infinity, but words cannot voice his delight, for the eye has no tongue. *Freed from the fetters of matter, his spirit moves in the rhythm of thing. It is thus that art becomes akin to religion and ennobles mankind. It is this which makes a masterpiece something sacred.*[২৫]

বোঝা যায়, এই আধুনিক জাপানি মনীষী তাঁর স্বজাতির আবহমান মননভঙ্গির প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত। 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' রসের প্রাচীন ভারতীয় ধারণার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথও পরিচিত ছিলেন, এই ধারণা তিনি নিজস্ব নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা বিশ্লেষণে কাজেও লাগিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মননে সেই তুরীয় রসধ্যানের প্রভাব সামান্যই। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের প্রত্যক্ষ রূপায়ণের দিক সম্পর্কেই বেশি আগ্রহী। এই কারণে তেন্‌শিন-এর তুলনায় অবনীন্দ্রনাথকে আমার আধুনিক অর্থে শুদ্ধতর শিল্পদৃষ্টির অধিকারী মনে হয়।

১৩৮৩ কার্তিক

---

২৪ 'তেন্‌শিন জেন্‌শু' ('তেন্‌শিন-এর রচনা সংগ্রহ'); তোকিয়ো ১৯২২, পৃ. ৩১১

২৫ "Art Appreciation", *The Book of Tea*, Tokyo 1957, p. 81-82 উদ্‌ধৃতির ইটালিক বর্তমান লেখকের।

ভারতে শিল্পশিক্ষা

কল্পাতি গণপতি সুব্রহ্মণ্যন

শিক্ষাকে মানবিক সংগঠনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে নেওয়া— এটা মানুষের স্বভাবধর্ম। মানুষ কখনোই সম্পূর্ণরূপে তার বংশগতির (Genetic Code) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। স্বাভাবিক ক্ষমতানুসারে সে নিজেকে এবং নিজের পারিপার্শ্বিককে পরিবর্তিত করতে সক্ষম। মানুষের আছে সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন বহুব্যবহারোপযোগী দুটি হাত, এমন একটি মন যা যুক্তিসম্মতভাবে চিন্তা করতে সক্ষম। এ ছাড়াও মানুষের আছে অন্য মানুষের সঙ্গে মিলিত হবার ও ভাব-বিনিময়ের সহজাত প্রবৃত্তি। এর থেকে জন্মে বিভিন্ন মানবিক কুশলতা, মানবিক জ্ঞান, মানবিক যোগাযোগ ও বিচিত্র কর্মের ধারা। পুরুষানুক্রমে মানুষ এই-সব বিদ্যা আয়ত্ত করে, এবং সেই বিদ্যার প্রকৃতি ও পরিধির পরিবর্ধন সাধন করে। অধীত বিদ্যা এবং সেই বিদ্যার প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত যা গড়ে ওঠে, তাকেই আমরা বলি সভ্যতা।

কিন্তু, মানুষের প্রকৃতি এমনই যে তার প্রত্যেক ব্যবহারিক প্রচেষ্টাই আপাতলক্ষ্যকে অতিক্রম করে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটায়। তাই, প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাই তার জ্ঞানের প্রসার ও কুশলতার উৎকর্ষ সাধন করে। পুরাতন সত্যের উপর আবির্ভাব ঘটে নূতন সত্যের, কুশলতার বৈচিত্র্যসাধন হয় এবং ক্রমাগত পরিবর্তন হয় যোগাযোগ ব্যবস্থার। প্রত্যেকটি ঘটনা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্টতা বাড়ায় এবং তাকে ঠেলে দেয় নূতন এক সম্পর্কজালের মধ্যে। এর ফলে মানুষ প্রশ্ন তোলে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে এবং প্রবৃত্ত হয় বিশ্বজগতে তার নিজের প্রকৃত স্থান খুঁজে নিতে। মানুষের উন্নত কুশলতা, প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি ও বর্ধিত সংশয়ের মাঝে নিজেকে জানার আগ্রহের ফলে অস্তিত্বের গুণগত উৎকর্ষ সাধিত হয়।

সুতরাং শিক্ষা এক দিকে পুরুষানুক্রমে জ্ঞান ও কুশলতার প্রচারের মাধ্যম এবং অপর দিকে তা হল অস্তিত্বের গুণগত উৎকর্ষসাধনের যন্ত্র। যে-কোনো যথার্থ শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন এই দুটি বৈশিষ্ট্যের যুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে গড়ে তোলা।

যদিও বহু প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষা মানবসমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বর্তমান, তবু কোনো যুগেই শিক্ষা (অন্তত তার প্রাথমিক পরিচয়ে) আধুনিককালের মতো সমাজে একটি বিশেষ কর্মধারা হিসেবে পরিগণিত হয় নি।

কোনো বিশেষ সংগঠনের মধ্যে বিধিবদ্ধ না করেও পিতামাতা, পরিবার, কর্মগোষ্ঠীসমূহ, সমাজ— এরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন স্তরে একটি প্রজন্মের মানুষকে

সাধারণভাবে তার ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও মূল্যবোধগুলির সঙ্গে পরিচিত করে দেয়। অপর দিকে, শিক্ষার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য দাবি করে নির্লিপ্ততা, বোধ এবং বিশেষ শিক্ষাপ্রণালী। স্বাভাবিকভাবেই, কিছু বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই এই দাবি পূরণ করতে পারেন। শিক্ষার প্রথম সাংগঠনিক রূপ সম্ভবত এই কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে ঘিরে গড়ে ওঠা কর্মকেন্দ্রগুলি। এগুলি প্রথমে ছিল ক্ষুদ্রাকার এবং বিচ্ছিন্ন— কতকগুলি শিষ্ট, অর্থাৎ "ভদ্রলোকের" (Elitist) সংগঠন। কিন্তু লিখিত ভাষার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, এবং গ্রন্থাগারগুলিতে বইয়ের সংগ্রহ বেড়ে যাওয়ায়, শিক্ষার বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল বিভিন্ন স্থানে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি যে তথ্য সরবরাহ করত, তা এত বেশি মাত্রায় বৈচিত্র্যসম্পন্ন ও বিরাট যে, কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে তা আয়ত্ত করা কঠিন হয়ে উঠল। শিক্ষকেরা তাই পরিণত হলেন বিশেষজ্ঞ বাহকে। তাঁরা শুধুমাত্র জ্ঞান বিতরণই করেন না, সে জ্ঞানের সমালোচনা ও পর্যালোচনাও করেন, আরো প্রশ্নের সৃষ্টি করেন এবং সুষম সিদ্ধান্তে উপনীত হন। যে-সমস্ত শিক্ষাপ্রণালীতে লিখিত শব্দের স্থান অল্প— যেমন কারু ও চারু-শিল্প এবং উৎপাদনশীল কারিগরিবিদ্যা— সেগুলি স্বাভাবিকভাবেই এই-সব প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তের বাইরে রইল।

কিন্তু যুগে যুগে শিক্ষাজগতের প্রসার বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। জানা গিয়েছে যে, বিগত তিন হাজার বছর ধরেই পৃথিবীতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্র ও শিক্ষকসমাজ বিদ্যমান আছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্বের ইতিহাসও বেশ কয়েক শতাব্দীর। সংখ্যায় এগুলি ছিল অল্প। এরা সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি অত্যন্ত ছোটো অংশ অধিকার করে ছিল। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত বিস্তার শুরু হয় বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে— বিশেষত ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে। শিল্পবিপ্লবের সৃষ্টি হয় ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উন্নতির ফলেই, এবং শিল্পবিপ্লবের ফলস্বরূপ 'জ্ঞান' পরিণত হয় 'ক্ষমতায়'। নূতন ব্যবস্থাগুলি মানুষকে গণ্য করে 'মানবসম্পদ' হিসেবে। এবং সেই সম্পদের উন্নতি বিধানের দায়িত্বও সে গ্রহণ করে। রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলি ক্রমে বুঝতে পারে যে, একটি সুসংবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক শাসনের শ্রেষ্ঠ উপায়। অপর দিকে, শিল্পবিপ্লব সমাজের প্রকৃতিতে ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমূল পরিবর্তন ঘটায়। নূতন সমাজব্যবস্থাগুলি পুরাতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে নিজের কাজ সুসম্পন্ন করতে পারল না। এর প্রথম কারণ, সমাজব্যবস্থাগুলির বৈচিত্র্য ও অস্থায়িত্ব। দ্বিতীয় কারণ, নতুন ধ্যানধারণার আলোকে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, অধিকাংশ ঐতিহ্যগত ধারণাই অযৌক্তিক।

বর্তমান সভ্য জগতে শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হল তার ব্যাপকতা ও সংবদ্ধতা। আগেকার সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান ও কুশলতা সম্পর্কে যে শিক্ষা সাধারণভাবে দেওয়া হত, বর্তমানকালে সেগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের— সে স্কুল অথবা কলেজ যাই হোক-না কেন— বিধিবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীতে পরিণত। আজকের স্কুলগুলি শিশুদের পরিচিত করে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, পারিপার্শ্বিক, এবং জ্ঞান আহরণের

প্রাথমিক যন্ত্রগুলির সঙ্গে। এক বিচিত্র গ্রাহকসমাজকে শিক্ষা দেওয়া হয় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হবার জন্য। সেজন্য স্বভাবতই এই প্রণালী অত্যন্ত বৃহৎ ও সাধারণ। এর পরে আমাদের উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রগুলি এবং কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি ছাত্রদের শিক্ষা দেয় বিভিন্ন বিষয়ে— যেমন কলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি। এই শিক্ষা সামান্য গঠনপ্রণালী থেকে নক্‌শা ও কারিগরি জ্ঞান, সাধারণ গার্হস্থ্যবিদ্যা থেকে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত। এর ফলে, সম্ভবত ধর্ম এবং কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী হস্ত-কুশলতার ক্ষেত্র ছাড়া, ব্যক্তিগত বা সামাজিক শিক্ষাদানের জন্য খুব অল্পই বাকি থাকে। এক দিক থেকে এটি অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানের ক্ষেত্র ও কুশলতার ব্যাপকতা আজ এত বেশি যে, স্বাভাবিকভাবেই তার প্রচার সম্ভব হয় কেবলমাত্র কোনো সাংগঠনিক ধারার মাধ্যমেই। একমাত্র এই প্রণালীর দ্বারাই সমগ্র জ্ঞানকে সংগঠিত করা এবং ধ্যানধারণার বিবর্তন ঘটানো সম্ভব। অপর দিকে, এই সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টি করে বিশেষীকরণ (Specialisation), যা অনেক সময়েই বাস্তব ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এই শিক্ষাপ্রণালী থেকে উদ্‌ভূত হয় এক সমান্তরাল পারিপার্শ্বিক, যার মধ্যে একমাত্র শিক্ষক ও ছাত্র ছাড়া আর কারোই অস্তিত্ব নেই। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। আজ যে কিছু শিক্ষাবিদ অ-সাংগঠনিক ও বন্ধনহীন শিক্ষার কথা বলছেন, অথবা পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতনতার উপর জোর দিচ্ছেন, তার কারণ উপরোক্ত সমস্যাগুলি। অবশ্য, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে বর্তমানকালের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সাংগঠনিক শিক্ষাপ্রণালীর সুবিধাগুলি অস্বীকার করতে পারি না কিন্তু একই সঙ্গে পারি না এই প্রণালী প্রয়োগের ফলে যে-সব সমস্যা উদ্‌ভূত হয়, তাদের সমাধানে নিশ্চেষ্ট থাকতে।

এই ভূমিকার প্রয়োজন হল এইজন্য যে বিশেষভাবে শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন। এটা না থাকলে হয়তো আমরা একটা অবাস্তব আদর্শ গড়ে তুলব। এক সময় আমরা এদেশে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে একটা কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রস্তাব করেছিলেন, ঐতিহ্যবাহী 'গুরুকুল' কেন্দ্রগুলিকে এর আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে। এই গুরুকুলগুলি হত গ্রামীণ শিক্ষাকেন্দ্র, নাগরিক সভ্যতার কুফল থেকে মুক্ত, এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। কতকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই আদর্শে গড়ে উঠেছিল ঠিকই। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, এগুলি ঐ রোমান্টিক নামটিই বজায় রেখেছিল; কার্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল কয়েকটি সাধারণ কলেজে। একই দুর্ভাগ্যের ভাগী হয় তিন দশক আগে প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্বেদিক ঔষধের কলেজগুলি, যেগুলি স্থাপিত হয়েছিল ভেষজ ঔষধ প্রচারের সদুদ্দেশ্য নিয়ে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপনের পিছনে যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও, বাস্তব অবস্থার সঠিক মূল্যায়নের অভাবে এগুলো সবই ব্যর্থ হয়ে যায়।

শিল্পশিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আজ অনেকেই অনেকরকম মতামত দেন। বহু সময়ে সেগুলি পরস্পরবিরোধী। অনেকের মতে শিল্পশিক্ষা হওয়া উচিত শিক্ষকের কড়া অনুশাসনে। অনেকে আবার ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষপাতী। কিছু ব্যক্তি মনে করেন শিল্পশিক্ষা হওয়া দরকার গোঁড়া এবং কঠিন সংগঠনের মাধ্যমে। অন্যেরা উদার ও মুক্ত পরিবেশে শিল্পশিক্ষা দিতে চান। অনেকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ তৈরি করার পক্ষপাতী; আবার অনেকে ছাত্রদের বিস্তারিত প্রভাবের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত রাখতে ইচ্ছুক। কিছু বিশুদ্ধবাদী (Purist) মনে করেন শিল্পশিক্ষা মনের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে। অপর দিকে অন্য অনেকে বিশ্বাস করেন হাত ও শরীরের কুশলতা বৃদ্ধির সঙ্গেই এর প্রধান সম্পর্ক। যে বিষয়ে এঁরা সকলেই একমত, তা হল, এঁরা সকলেই মনে করেন আজকের শিল্পশিক্ষার জগৎ গতযুগের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং গতযুগের তুলনায় অনেক বেশি বিস্তৃত। সুতরাং বর্তমানকালের শিল্প-শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রবণতা অনুসারে বাছাইয়ের সুযোগ বেশি। অতএব শিল্পশিক্ষার প্রকরণ যাই হোক-না কেন, এই-সব সুযোগের স্থান সেখানে অবশ্যই রাখা প্রয়োজন।

কিন্তু, মূলত যে-কোনো যথার্থ শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হল সমাজে সৃজনশীলতার বীজ বপন করা— সমাজের ও ব্যক্তির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে। যেহেতু আজকের শিক্ষাব্যবস্থা সমস্ত কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, সেই হেতু শিক্ষাব্যবস্থারই উচিত ঐ কর্মধারা সম্বন্ধে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত গড়ে তোলা এবং বাস্তবের সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করা। আমাদের শিল্পশিক্ষা-ব্যবস্থাগুলিতে যদি কোনো দুর্বলতা থাকে, তার প্রধান কারণ এই পরিপ্রেক্ষিতের অভাব।

আমাদের দেশে শিল্পকর্মের ধারা অত্যন্ত বিস্তৃত ও বিচিত্র। আমাদের সমস্ত দেশে ছড়িয়ে আছে অপেশাদারী গ্রামীণ শিল্প। সারা দেশে, শহরে ও গ্রামে ছড়িয়ে আছে অত্যন্ত উন্নত ও দক্ষ উপযোগিতামূলক শিল্প। আমাদের এখনো আছে কিছু ধর্ম-শিল্পকেন্দ্র, যেখানে বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রতিমানির্মাণ, মূর্তিনির্মাণ এবং মিনিয়েচার ও ম্যুরালজাতীয় দেওয়াল-চিত্র তৈরি হয়। আজকের আবহাওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানগুলির টিঁকে থাকা সত্যিই আশ্চর্যজনক। হিসেব নিলে দেখা যাবে এখনো এই শিল্পের অনুশীলনকারীর সংখ্যা লক্ষাধিক। এ ছাড়াও আছেন নতুন শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্রগুলির ফসল সমসাময়িক শিল্পীরা, যাঁরা বর্তমানকালের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন তাঁদের ছবি, মূর্তি বা নকশার মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে। শিল্পের এই বিশাল বিস্তার ও বৈচিত্র্য সংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ। এই ঐশ্বর্য শিল্পমাধ্যমের উপযোগিতাকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়, এবং এরই ফলে শিল্পের ভাষা লাভ করে অসামান্য গভীরতা।

শিল্পশিক্ষার প্রকৃতি, পরম্পরাগতভাবে কুশলতা জন্মিয়ে দেবার যে ধারাটি বহমান তার প্রকৃতি এবং যে-সব উপাদান শিল্পের পুষ্টিসাধন করে তাদের প্রকৃতি— শিল্পশিক্ষার বিভিন্ন স্তরে এদের মধ্যে অনেক তারতম্য ঘটে। যে-কোনো শিল্পশিক্ষাব্যবস্থায় এগুলিকে বিবেচনা করতে হবে এবং পরিকল্পনা করতে হবে পুনরুজ্জীবনের বীজ বপনের। একটা

উদাহরণ দেওয়া যাক। বাংলা, উড়িষ্যা, রাজস্থান বা গুজরাটের গ্রামীণ দেওয়ালচিত্র বা মেঝের আলপনা প্রধানত অপেশাদারী। তার জন্য বিশেষ কুশলতার প্রয়োজন হয় না, কেন-না তার উপাদানগুলি সরল। কিন্তু, এর গঠনরেখার জটিলতা নির্ভর করে গ্রামবাসীদের চোখে-দেখা জগতের বিস্তৃতির উপরে এবং সেই অভিজ্ঞতাকে সজীবভাবে রূপায়িত করার উপরে। এই কর্মধারায় স্থায়িত্বের জন্য এই বিষয়গুলির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যদি কেউ এই শিল্পের রূপ এবং বিষয়বস্তুকে (Form-Content) আরো জটিল করে তোলেন— যার জন্যে খুব বিশেষ ধরনের পাকা হাতের প্রয়োজন— তা হলে এর অনুশীলনকারীর সংখ্যা সীমিত হয়ে পড়বে। যদি কেউ একে অতিরিক্ত নকশা-সচেতন করে তোলেন, তা হলে এটি এর সজীব সাবলীলতা হারিয়ে যন্ত্রের মতো নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে (এইরকমই ঘটেছিল কলাভবনের আলপনা-চর্চার ক্ষেত্রে)। একই অবস্থা হবে আমাদের ঐতিহ্যবাহী কারু ও চারু -কলাগুলির ক্ষেত্রে, যার উপযোগিতার ক্ষেত্র সীমিত এবং গঠনপ্রণালী ও শিল্পভাষাও সীমিত। এই শিল্পগুলি যদিও বেড়ে উঠেছিল আমাদের থেকে ভিন্ন এক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায়, তা হলেও সমন্বয় ও প্রসারের ক্ষেত্রে এরা এখনো যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। অবশ্য যদি আমরা এদের রক্ষা করার পরিকল্পনার সময় এই প্রাথমিক শর্তগুলির সম্পর্কে সচেতন থাকি। অনেক সময়েই দেখা গিয়েছে, বহু ক্ষমতাশালী কারুশিল্পী বিস্তৃততর এবং অধিকতর সুযোগসম্পন্ন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করার ফলে সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁদের যথার্থ স্থানটি হারিয়ে ফেলেছেন।

আজকের শিল্পশিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে নিজেদের স্থান ও কাজের পরিধি স্থির করে নিতে হবে সঠিকভাবে। কি ধরনের ছাত্রদের এরা গ্রহণ করবে? কিভাবে নির্ণীত হবে তাদের উপযোগিতা? কি ধরনের কাজের জন্য তাদের প্রস্তুত করা হবে? এই প্রস্তুতির প্রকৃতি কি হবে? কি ধরনের সংগঠন একে নিয়ন্ত্রণ করবে? এই ধরনের শিক্ষার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কি? এগুলি অসংখ্য প্রশ্নের মধ্যে মাত্র কয়েকটি। নিজেকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। যদিও সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন।

এ কথা অবশ্যই ঠিক যে এই প্রশ্নগুলি নতুন নয়। প্রত্যেক শিক্ষাবিদই শুরুতে কতকগুলি লক্ষ্য সামনে রাখেন; কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছনো নির্ভর করে তাঁদের বাস্তববোধ ও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের উপর। ভারতবর্ষের প্রধান শিল্পশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

ভারতবর্ষের প্রথম আর্ট স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক শতাব্দীরও আগে। ডক্টর হান্টার নামে একজন চিকিৎসক এদেশের শিল্পের বৈচিত্র্য ও প্রসার দেখে বিস্মিত হয়ে ১৮৫০ সালে মাদ্রাজে কারু ও চারু -শিল্পের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি চেয়েছিলেন শিল্পের উন্নতির জন্য তাঁর পুরো সময় দিতে। যথেষ্ট অনুশীলন ও অনুসন্ধানের পরে তিনি এ কাজে প্রবৃত্ত হন। বোম্বাইতে ১৮৫২ সাল নাগাদ তাঁর উদ্যোগের কথা প্রচারিত হল। সেখানকার দুজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী— শেঠজী ফ্রামজী কাওয়াস ও শেঠ জামশেদজী জিজিবয়— আগে থেকেই এইরকম একটা ইচ্ছা মনে

মনে পোষণ করছিলেন। ১৮৫২ সালে ফ্রামজী মারা গেলেন, কিন্তু জামশেদজী এগিয়ে এলেন। তিনি বোম্বাই সরকারকে 'শিল্প ও উৎপাদনের' ('Art and Manufacture') একটি স্কুল খোলার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করলেন। কিছু পরিমাণ অনিশ্চয়তার সঙ্গে সরকার অনুদানটি গ্রহণ করলেন এবং সামান্য ইতস্তত করার পরে ১৮৫৭ সালে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। হান্টার এবং জামশেদজী উভয়েরই প্রধান দৃষ্টি ছিল দেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলির উপর, এবং উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল এগুলির পৃষ্ঠপোষকতা ও উন্নতিবিধান করা। এ কথা সকলেই জানেন যে ই. বি. হ্যাভেলের নেতৃত্বে ১৮৯৬ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে কলকাতার কারু ও চারু -কলা বিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করে একই ধরনের আন্দোলন গড়ে ওঠে। মাদ্রাজের পরীক্ষার অভিজ্ঞতা হ্যাভেলের ছিল। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল সাধু, পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে এঁদের জ্ঞানও ছিল গভীর। (হান্টার ও হ্যাভেল এই পারিপার্শ্বিককে জেনেছিলেন প্রচুর অনুশীলন করে, কিন্তু জামশেদজী নিজে বয়নশিল্পীর পুত্র ছিলেন বলে হস্তশিল্পের জগৎ ও হস্তশিল্প-ব্যবসায়ীদের চিনতেন সম্যকভাবে)। কিন্তু এত-সব সত্ত্বেও তাঁরা যে প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপন করেন, বা স্থাপন করতে উৎসাহ দেন বা পরিচালনা করেন, সেগুলো তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্য পূর্ণ করতে পারল না। সেগুলো বেড়ে উঠল সম্পূর্ণ বিপরীত পথে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কোনোটিই পারল না ঐতিহ্যবাহী চারু ও কারু -শিল্পের জগৎকে পুনরুজ্জীবিত করতে, পারল না ঐ শিল্পের প্রকৃত গঠন-কুশলতা উপলব্ধি করতে। এই-সব ক্ষেত্রে তাদের ছোটোখাটো উদ্যমগুলি বরঞ্চ বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করল।

এরকম হল কেন? আজকের অভিজ্ঞতার ভূমি থেকে তাকিয়ে দেখলে সেদিনের ব্যর্থতার কারণগুলি অনুমান করা কঠিন নয়।

১. ভারতের ঐতিহ্যবাহী চারু ও কারু -শিল্পগুলির ছিল নিজস্ব অন্তরঙ্গ শিক্ষাকেন্দ্র ও নিজস্ব সহজাত শিক্ষাপদ্ধতি। নবীন শিক্ষার্থীরা শিল্পটির সঙ্গে ক্রমান্বয়ে পরিচিত হতেন বহু বছর ধরে শিক্ষকের সঙ্গে কাজ করে। এই পরিচয়ের পর্যায়গুলি ছিল— উপাদান থেকে যন্ত্র, যন্ত্র থেকে সহায়ক প্রক্রিয়াগুলি, তার পর নির্মাণকৌশল ও নকশা— মোটামুটি ধাপগুলি ছিল এইরকম। বর্তমানকালে কোনো বিদ্যালয়ে এই পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রায় অসম্ভব। সেরকম প্রত্যাশাও অবাস্তব। কেন-না, সেকালের শিক্ষাপ্রণালী ছিল যথেষ্ট জটিল, শিক্ষানবিশীর পর্বটিও ছিল দীর্ঘ-বিলম্বিত, তদুপরি সেদিনের কারুকর্মের সজীব পারিপার্শ্বিকটিও ছিল অনন্য।

২. যে-সমস্ত শিক্ষকেরা এই-সব প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন, তাঁদের ভারতের কারুশিল্প সম্পর্কে হয়তো শ্রদ্ধার অভাব ছিল না, কিন্তু এই শিল্পের চরিত্র ও গঠন সম্পর্কে তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি ছিল কম। তাই এই শিল্পের বিশেষ গুণগুলিকেই অনেক সময় তাঁরা ত্রুটি মনে করতেন এবং অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের দ্বারা বরং ক্ষতিসাধনই করতেন।

৩. দেশে যে নতুন ঐতিহ্য-ছুট্ সমাজের উদ্ভব ঘটছিল শহরগুলিকে কেন্দ্র করে, সেই নতুন সমাজ নতুন নতুন শিল্প-চাহিদার জন্ম দিচ্ছিল, যেমন— কাহিনীচিত্রণ

(Illustration), খোদাই-কাজ (Engraving), ফোটোর কাজ, পোর্ট্রেট-অঙ্কন ইত্যাদি। ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পীর পক্ষে সে চাহিদা মেটানো সহজে সম্ভব হচ্ছিল না। যে ছাত্র-ছাত্রীরা এ-সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে এল, স্বভাবতই তারা প্রকাশ ও প্রণালীর নতুন মাধ্যম খুঁজতে লাগল।

সে যাই হোক এই স্কুলগুলি এক শতকের বেশি সময় ধরে দেশে বর্ধিত হয়েছে। নিজের নিজের মতো পথে ও পদ্ধতিতে আধুনিক ভারতের শিল্পজগতে তারা যা দান করেছে, সে দানের পরিমাণ খুব কম নয়। কিন্তু, এদের দানের মূল্যায়ন করতে হবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে— যে বিষয়গুলির কথা মুখবন্ধে আগেই বলা হয়েছে :

—তারা শিল্পকৌশলগুলিকে সজীব রাখতে পেরেছে কিনা, তার ধারাবাহিকতাকে পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত করে দিতে পেরেছে কিনা, তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে এবং তার উপযোগিতা বাড়াতে পেরেছে কিনা;

—তাদের কর্মসূচী দেশের সমগ্র শিল্প-জগতকে স্পর্শ করতে পেরেছে কিনা এবং দেশের শিল্পবোধের প্রসার ঘটাতে সাহায্য করতে পেরেছে কিনা;

—তারা আমাদের অস্তিত্বের উৎকর্ষসাধন করতে পেরেছে কিনা।

এই মানদণ্ডে বিচার করলে অধিকাংশ বিদ্যালয়ই অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এদের অধিকাংশের কর্মসূচীই কলাকৌশলের মান তেমন উন্নত করতে পারে নি, আমাদের অস্তিত্বের উৎকর্ষ-সাধনেও বিশেষ যত্নবান হয় নি। এদের অধিকাংশই পেশাদারী কাজের অত্যন্ত সংকীর্ণ এক পরিধিতে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছে। বৃহত্তর শিল্পজগতের সঙ্গে তাদের সংযোগ খুব কম। এমন-কি, তাদের অত্যন্ত নিকটবর্তী পারিপার্শ্বিকের সঙ্গেও তাদের যোগ যৎসামান্য। অধিকাংশ বিদ্যালয়ই তাদের ছাত্রদের মনে শিল্প ও প্রকাশের মূল সমস্যাগুলি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন জাগিয়ে তুলতে উৎসাহ দেয় না। তাদের উদ্যমের প্রধান অংশ ব্যয় হয় শিল্প-পণ্যের বাজারে কতকগুলি চতুর পেশাদারী ব্যক্তি তৈরির কাজে। এ কথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে এর মধ্যেও কিছু শ্রদ্ধেয় ব্যতিক্রম আছে।

একইভাবে আমরা শিল্পের ক্ষেত্রে অন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠানকে পরীক্ষা করতে পারি, বিশেষত যে বিকল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল ঠাকুরবাড়ির প্রভাবে। (বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আধুনিক চিত্রশিক্ষা' গ্রন্থে অত্যন্ত অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতি -সহকারে এর বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে অনেক তথ্যের জন্য আমি তাঁর উপরেই নির্ভর করেছি।) জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের এই বিকল্প খোঁজার প্রচেষ্টার পিছনে ছিল সমসাময়িক বিদ্যালয়গুলির সম্পর্কে তাঁদের অসন্তুষ্টি। কারু ও চারু -কলার যে বিদ্যালয়গুলির কথা বলা হল, তারা সকলেই ঝুঁকেছিল ইয়োরোপীয় বিধিবদ্ধ তাত্ত্বিকতার (Academicism) দিকে এবং তাদের শিক্ষাপ্রণালী হয়ে উঠেছিল অনমনীয় ও নৈর্ব্যক্তিক। দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতাও তাদের মধ্যে ক্রমশ কমে এসেছিল। ঐতিহ্যবাহী শিল্পের কেন্দ্রগুলি নিজেরাই ক্ষয়ে আসছিল এবং ক্রমশ অলংকরণ-বাহুল্যকে

প্রশ্রয় দিচ্ছিল। ঠাকুররা এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে বিকল্প হিসেবে কোনো একটা দেশজ কর্মধারা গড়ে তুলতে চাইলেন। সে কর্মের প্রকৃত রূপরেখা সম্পর্কে তাঁরা নিজেরাও খুব নিশ্চিত ছিলেন না। তাঁরা শুধুমাত্র একটি বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন— নতুন শিল্পীকে তাঁর দেশের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক অতীত সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং প্রয়োগকৌশল সম্বন্ধে তাঁর অতিরিক্ত মনোযোগী হওয়া চলবে না। এর থেকে বোঝা যায় কেন রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ দুজনের কেউই কোনো সুনির্দিষ্ট এবং বিধিবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী প্রস্তুত করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রমে শিল্পকে একটি বিশেষ স্থান দিতে চেয়েছিলেন, কেন-না তিনি বিশ্বাস করতেন শিল্প হল 'অসীম'কে জানার অন্যতম উপায়। সাধারণভাবেই তিনি ধ্যানের উপর এবং প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সংযোগের উপর খুব জোর দিয়েছেন। যদি আমরা তাঁর ছবি সম্বন্ধে তাঁর নিজের মতামত গ্রহণ করি তা হলে দেখব যে, তিনি মনে করতেন ছন্দ ও শৃঙ্খলা প্রত্যেক সৃজনশীল ব্যক্তির সহজাত ধর্ম এবং এর প্রকাশ ঘটে যখন পারিপার্শ্বিক তার সহায়ক হয়। শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে এইরকম পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি করতে হবে। অবনীন্দ্রনাথের মতামত এ ব্যাপারে আরো স্পষ্ট। তিনি মনে করেন, ঈশ্বরের ঐশ্বর্যে মানুষের মনে যে সাড়া জাগে তারই নাম শিল্প— শিল্প হল ঈশ্বরের মহিমার সংস্পর্শে মানুষের আপন মহিমার প্রকাশ। প্রত্যেক শিল্পীর পথ হবে নিজস্ব। নিয়মকানুন তার খুবই ছোটো একটা অংশ। শিল্পের বহিঃপ্রকাশ হল 'অবাধ সীমাহীন আনন্দ'। তিনি মনে করতেন, শিল্পীকে তাঁর কাজে এবং অভিজ্ঞতায় গভীরতা ও বোধ সঞ্চার করতে হলে তাঁকে তাঁর নিজের দেশের ঐতিহ্যকে জানতে হবে। তিনি তাঁর ছাত্রদের প্রাচীন মহাকাব্য ও সাহিত্য পাঠ করতে উৎসাহ দিতেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী ছিল না। তিনি তাঁর ছাত্রদের প্রেরণা দিতেন তাঁর বৈচিত্র্যময় ও বহুমুখী ব্যক্তিত্বের দ্বারা। কিন্তু তাদের সিদ্ধির মাপকাঠিকে তিনি সুনির্দিষ্ট করে বেঁধে দেন নি। সুতরাং, যদিও তাঁর প্রথম দিকের ছাত্রেরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিল্পবিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, মাপকাঠির এই অনির্দিষ্টতা তাদের প্রভাবকে কিছুটা দুর্বল করে দিয়েছিল।

যদিও রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ উভয়েই ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন, তা হলেও ভারতের শিল্প-ঐতিহ্যের বিষয়ে তাঁদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। ভারতের শিল্প-ঐতিহ্যের বহু ক্ষেত্র তাঁদের মনে নাড়া দেয় নি। বহু ক্ষেত্র সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন। অবশ্য এটা তাঁদের ক্ষেত্রে একটা বড়ো ত্রুটি হয়ে উঠতে পারে নি। তার কারণ তাঁরা শিল্পীর সততার উপর এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে তার সচেতনতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। সে সচেতনতা রোমান্টিক ধরনের হলেও আপত্তি নেই। ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্য সম্পর্ক যথার্থ সচেতনতার সৃষ্টি নন্দলাল বসুর থেকে। তখনকার শিল্পীদের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি আমাদের ঐতিহ্যের সমস্ত স্তর ও সমস্ত ধারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন এবং যথার্থ সংবেদনশীল। তিনিই সর্বপ্রথম যিনি

একটি বিকল্প শিল্প-শিক্ষাক্রম উদ্‌ভাবন করেন। যদিও তাঁর জীবনের শেষদিকে সে প্রণালী কিছুটা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এ কাজে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, কুমারস্বামী, ওকাকুরা ও গান্ধী তাঁর সামনে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন। এঁদের প্রথম দুজন সৃজনশীলতার সঙ্গে সৃজনশীল ব্যক্তির সম্পর্কের বিষয়ে তাঁর ধারণা স্পষ্ট করে দেন। কুমারস্বামী তাঁকে শিখিয়েছিলেন সৃষ্টিব্যাপারের সামগ্রিক রূপরহস্যকে ধ্যানদৃষ্টিতে ধারণ করতে। গান্ধী তাঁর উৎসাহ জাগিয়ে তোলেন বিভিন্ন গ্রামীণ শিল্পের ভাষাকে বুঝতে এবং সেই শিল্পকে চিনতে— প্রচলিত অর্থে যা শিল্প বলেই স্বীকৃত নয়। ওকাকুরা তাঁর কাছে উপস্থাপন করেন এমন এক শিক্ষাপ্রণালী যাতে ঐতিহ্য সম্পর্কে অনুশীলন, প্রকৃতির অনুশীলন এবং ব্যক্তিত্বের প্রকাশ একটি ত্রিভুজাকার সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত। নন্দবাবুর শিক্ষা-দর্শন ওকাকুরার কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তিনি ওকাকুরার মতোই বিশ্বাস করতেন, ঐতিহ্যের অনুশীলন ব্যতীত শিল্প অপরিপক্ব ও মূল্যহীন হবে; প্রকৃতির অনুশীলন ব্যতীত হবে একঘেয়ে ও অনুকরণ-প্রবণ; বিশ্বাস করতেন যে, শিল্পদৃষ্টির স্বকীয়তা ব্যতীত শিল্প তার মৌল সত্যতা থেকে ভ্রষ্ট হবে।

গোড়ার দিকে নন্দবাবুর দিগন্ত ছিল প্রসারিত। তিনি ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন তাদের নিজ নিজ প্রবণতা অনুযায়ী কাজ করতে। ত্রিশের দশকে তাঁর ছাত্র বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিঙ্কর বেইজ কলাভবনে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন। বিনোদবাবুর ছিল তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণধর্মী মননশক্তি এবং কিঙ্করবাবুর ছিল উত্তপ্ত রোমান্টিক উদ্‌বেজনা। এবং উভয়ে তাঁরা একত্রে কলাভবনের সুনামের প্রধান স্রষ্টা।

যে-সব জায়গায় অবনীন্দ্রনাথের ছাত্ররা শিল্প-শিক্ষক হিসেবে গেলেন, সেখানে কেন তাঁরা যথার্থ প্রভাবের ক্ষেত্র গড়ে তুলতে পারলেন না? তার বদলে সে-সব জায়গায় কেন তাঁরা ঢিলে-ঢালা অপেশাদারী কাঁচা রোমান্টিক ধরনের ছবির প্রচলন ঘটালেন? কলাভবনের শিক্ষাদর্শ ছিল নির্ভুল, তার শিক্ষাপরিবেশ ছিল উন্মুক্ত, এমন যা একালের যে-কোনো শিল্পশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গৌরবজনক বলে গণ্য হতে পারে, তা সত্ত্বেও কেন কলাভবন তার গৌরবময় দিনগুলোতেও নিজেকে একটি আদর্শ বিকল্প-প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুলতে পারল না— যদিও কিছু খ্যাতিমান ছাত্র এখান থেকে বেরিয়েছিল ঠিকই— এ-সব সত্ত্বেও কেন কলাভবন আদর্শ একটি বিকল্প-প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারল না? এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না। অবনীন্দ্রনাথের ছিল বহুমুখী প্রতিভা— তিনি ছিলেন ক্ষমতাবান লেখক, শিল্পী, অভিনেতা, চিন্তাশীল এবং মজলিশী ব্যক্তি। তা হলেও তিনি তাঁর ছাত্রদের কোনো নির্দিষ্ট পথ বাৎলে দিয়ে যান নি কাজ করার। তাঁর ছাত্রদের তাঁর মতো বহুমুখিতা ছিল না। তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিও ছিল তাঁর তুলনায় অনেক কম। তার ফলে যখন তাঁরা তাঁর প্রভাব থেকে দূরে গেলেন, তখন অবধারিত ভাবেই তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়লেন। নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য না থাকায় তাঁরা রোমান্টিক কল্পনাবিলাসের জগতে বিচরণ করতে লাগলেন। তাঁরা ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের

কোনো অংশের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখেন নি এবং স্বভাবতই এর ফলে তাঁরা বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে পারেন নি (ওকাকুরার সাবধান বাণী এ ক্ষেত্রে অতি সত্য)। যেহেতু তাঁদের অধিকাংশই কাজ করতেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে, তাঁরা অনেক সময় প্রভাবিত হতেন সেখানকার সুযোগ্য শিক্ষকদের দক্ষতার দ্বারা এবং ঐ-সব বিশেষ ক্ষেত্রে প্রবেশ করার খানিকটা চেষ্টাও তাঁরা করতেন। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী বা সমসাময়িক যাই হোক-না কেন, পেশাদারী শিল্পের জগতে তাঁদের অধিকার ছিল অত্যন্ত কম। কাজেই এ-সব ক্ষেত্রে তাঁদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত সীমিত।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব কিছুটা জটিল। শিল্পী হিসেবে নন্দলালবাবুর স্থান বিতর্কের ঊর্ধ্বে। স্বল্পভাষী হলেও তিনি ছিলেন গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, এবং অত্যন্ত সজীব একটি মনের অধিকারী। সরলই হোক আর জটিল হোক, শিল্পের সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে ছিল তাঁর অদম্য কৌতূহল, এবং প্রতিটি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ছিল তাঁর অসীম ক্ষমতা। এবং, আগেই বলা হয়েছে, তাঁর যোগাযোগ ছিল তৎকালীন পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল মানুষের সঙ্গে। যেমন— রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, কুমারস্বামী, ওকাকুরা ও গান্ধী। বিনোদবাবু নিশ্চয়ই মনে করতে পারেন যে, এই আপাত সুবিধাগুলি তাঁর পক্ষে অসুবিধাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁকে বিভক্ত হতে হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের আদর্শের টানে, বিভিন্ন ধরনের আদর্শের কাছে আনুগত্য স্বীকার করার ফলে, যেমন রবীন্দ্রনাথের, অবনীন্দ্রনাথের, কুমারস্বামীর ও গান্ধীর আদর্শ। তিনি আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন প্রথম দুজনের সর্বজনীন ও উদারনৈতিক আদর্শের কাছে, আবার আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন কুমারস্বামীর একান্তভাবে ঐতিহ্যবাদী আদর্শের কাছে, এবং সেইসঙ্গে গান্ধীর জাতীয়তাবাদী আদর্শের কাছেও। এগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী। নন্দলাল প্রতিটি মতকেই সমান আকর্ষণীয় মনে করতেন, এবং এগুলির উৎকর্ষের ক্রমনির্ণয় করতে গিয়ে নিজের স্বাভাবিক উদারদৃষ্টিকে খর্ব ও সীমিত করে আনেন। তাঁর শিক্ষাপ্রণালীতে প্রথম দিকে যে উন্মুক্ততা ছিল তা ক্রমে দেশজ কারু ও চারু -শিল্পের গতানুগতিক জপমালায় পরিণত হল।

এর একটি প্রধান কারণ নিহিত ছিল তাঁকে ও তাঁর সহকর্মীদের যে-ধরনের ছাত্রদের নিয়ে কাজ করতে হত, তারই মধ্যে। প্রথম দিকে শান্তিনিকেতন ছিল গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত, অতিমাত্রায় প্রচলিত রীতিনীতির বিরোধী, কবির কল্পনাপ্রসূত একটি প্রতিষ্ঠান। তা শুধু বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ছাত্রদেরই আকৃষ্ট করত, এরা হল সেই জাতের ছাত্র যারা অন্যান্য বিদ্যালয়ের নৈর্ব্যক্তিক শিক্ষাপ্রণালী যৎপরোনাস্তি অপছন্দ করত। যারা সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী চলতে চাইত। এরা এমন একটি স্থান খুঁজত যেখানে তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করবে এবং সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁদের বিভিন্ন ধরনের বিচিত্র প্রশ্নসমূহের সমাধান মিলবে। কিন্তু কলাভবনের সুনাম যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল, এবং ক্রমে যতই সকলে বুঝতে পারল যে, এটি ছিটগ্রস্ত তাত্ত্বিকদের একটি নিভৃত আখড়া নয়, ততই বিভিন্ন-রকমের ক্ষমতাসম্পন্ন ছাত্ররা

এখানে আকৃষ্ট হতে লাগল। নবীন শিক্ষার্থীরা এখানে এল এখানকার স্বাধীন, উন্মুক্ত পরিবেশকে উপভোগ করতে এবং সাধারণভাবে সংস্কৃতিসম্পন্ন হয়ে উঠবার আকাঙ্ক্ষায়। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে আগ্রহ, উদ্যম ও ক্ষমতার তারতম্য ছিল। যদিও কিছুসংখ্যক ছাত্রের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও দায়িত্ববোধ যথেষ্টই ছিল, তা হলেও অধিকাংশই ছিল অন্যের দ্বারা পরিচালিত হবার মতো। এর ফলে কার্যক্রমের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠল। আগেকার ব্যক্তিগত উন্মুক্ত কার্যক্রমের পরিবর্তে সৃষ্টি হল নৈর্ব্যক্তিক ছকে-বাঁধা শিক্ষাপ্রণালীর। এই সবকিছুর মূলে ছিল ছাত্রভর্তির ব্যাপারে কোনোরকম শিক্ষাগত যোগ্যতা পরীক্ষার অভাব। নন্দবাবুর কেমন একটা রোমান্টিক বিশ্বাস ছিল যে, শিক্ষিত ছাত্ররা শিল্পী হিসেবে ততটা ভালো হবে না, যতটা হবে অশিক্ষিতরা, কেননা শিক্ষিতরা— তিনি মনে করতেন— হয়তো ইতিমধ্যেই যান্ত্রিক চিন্তা ও তাত্ত্বিক জড়তার শিকার হয়ে পড়েছে। তাঁর এই বিশ্বাস যদি গ্রামীণ প্রতিভাকে আকৃষ্ট করে নিয়ে আসতে পারত, তা হলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু তা তো হলই না, উপরন্তু তিনি যে কারুশিল্প শিক্ষার কোর্স চালু করলেন, তাও দেশের সজীব কারুশিল্প ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারল না। সাধারণ মধ্যবিত্ত তার অবসর বিনোদনের জন্য যে ধরনের ও যে মানের কারুশিল্পের চর্চা করে, এই ছাত্রদের কাজের মান তার থেকে বিশেষ উঁচু হল না। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অবদমন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবের ফলে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে শিল্প-ঐতিহ্য ও শিল্প-সমস্যা সম্বন্ধে গভীর কৌতূহলের ও আগ্রহের উদ্রেক ঘটল না।

এ ছাড়া, সমস্ত রাবীন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানই প্রধানত ব্যাপৃত ছিল জ্ঞান ও তার আদান-প্রদানের চূড়ান্ত বিকাশের কাজে। এই আলোকে কলাভবনও প্রথমে গড়ে উঠেছিল সৃজনশীল শিল্পীর জন্য এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়ে। এখানে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও বিদ্যালয়ের সাহায্যে কালক্রমে যে নিজেকে খুঁজে নিতে পারবে। পেশাদারী শিল্পী হওয়াটা লক্ষ্য ছিল না। বিশ্বাস ছিল, যে-শিল্পী নিজেকে যথার্থ খুঁজে পেয়েছে, সে যে-কোনো পেশাদারী কাজ সন্তোষজনকভাবে করতে পারবে, বেশি অসুবিধা ঘটবে না। কিন্তু বিভিন্ন শিল্পের (Visual এবং Performing— দুরকমই) ব্যাপার এমনই যে সেখানে ব্যক্তিগত সৃজনশীলতা ও পেশাদারী দক্ষতা একত্রে মেলানো। নন্দবাবু এই সত্যটি জানতেন বলেই মনে হয়; তাঁর শিক্ষা-চিন্তায় কোথাও এর স্থান নিশ্চয়ই ছিল। তিনি একে কোনো পরিণতি দেন নি। খাঁটি পেশাদার যিনি, তাঁর তো কতকগুলি মৌল কুশলতা থাকতেই হবে, কাজের সম্পর্কে কতকগুলি শৃঙ্খলা ও বিধিবিধানও তাঁকে রাখতেই হবে। কলাভবনে এ ব্যাপারে কিছুই করা হল না। লক্ষ্য-সচেতন ছাত্ররা তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারাই সমস্ত প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হবে এই ভরসায় সব-কিছু তাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু সময়ের দ্বারা সীমিত একটি কার্যক্রমে লক্ষ্য-সচেতন ছাত্রদের পক্ষেও এটা খুব অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াল। এ ক্ষেত্রে যারা তেমন লক্ষ্য-সচেতন নয়, সেই-সব সাধারণ ছাত্রদের কাছ থেকে কি আর আশা করা যাবে?

এটি একটি দুঃখজনক পরিস্থিতি। নন্দবাবুর মৌলিক শিক্ষাভাবনা আজও সমান সজীব এবং সমান উপযোগী আছে। ডিগ্রি-ডিপ্লোমা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার কড়া নিয়মকানুনকে বাতিল করে দিয়ে যে স্বাধীন ও উন্মুক্ত পরিবেশ তিনি এখানে সৃষ্টি করেছিলেন, তা যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আজও আদর্শস্বরূপ।

যে ত্রুটিগুলির কথা বলা হল সে-সব সত্ত্বেও, ভারতীয় শিল্প-শিক্ষাজগতে কলাভবনের দান কম নয়। কলাভবন খুব বড়ো একটা কাজ করেছে— কতকগুলি রুদ্ধ দ্বার সে খুলে দিয়েছে। শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে কলাভবন এক বৃহত্তর দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছে। কলাভবন সৃজনশীল চিন্তাকে জাগ্রত করে দিয়েছে।

যে-সব ছাত্র ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা কলাভবনের পূর্বকথিত সীমাবদ্ধতাগুলিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল, তাদের উপর কলাভবনের প্রভাব ছিল অপরিসীম। সুতরাং ১৯৪৯ সালে যখন বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে কারু ও চারু কলাবিভাগ খোলার পরিকল্পনা করলেন, তখন তাঁর সামনে ছিল কলাভবনের উদাহরণ। ভারতবর্ষের একটি গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর মধ্যে একটি পেশাদারী শিল্প-শিক্ষার কর্মসূচী এই প্রথম চালু হল। এই কর্মসূচীর পরিকল্পনা করা হয়েছিল মৌলিক শিল্পকুশলতায় ছাত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার এবং পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্প-ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের পরিচিত করার লক্ষ্য সামনে রেখে। এই-সব শিল্প-ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা দেওয়া হত শিল্প-ইতিহাস ও শিল্প-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে। কিন্তু ছাত্রদের স্বাধীনতা দেওয়া হত তাদের ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুযায়ী নিজের নিজের পথ খুঁজে নিতে। আবার সেইসঙ্গে এও আশা করা হত যে, ছাত্ররা তাদের পথ-নির্বাচন সম্পর্কে যুক্তিসংগত কারণ দেখাতে পারবে। এই কর্মসূচীতে পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সচেতনতার উপর জোর দেওয়া হয় এবং চেষ্টা করা হয় যাতে প্রাচীন অর্থাৎ ঐতিহ্যবাহী শিল্পী এবং আধুনিক শিল্পী— এই দুই গোত্রের শিল্পীরাই বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে ফিল্ড সার্ভের মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে তাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ হিসেবে এই বিদ্যালয়ের গঠন ছিল গতানুগতিক। কিন্তু যাতে এর আসল কাজকর্মের দিকগুলি বেশ খোলামেলা ও স্থিতিস্থাপক থাকে, সে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। শিক্ষাসমিতি (Board of Studies) প্রতি বছর এর শিক্ষাক্রমগুলি (Courses) পর্যালোচনা করে তার উপযোগিতা নির্ণয় করত এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও নূতন প্রণালীর সঙ্গে পরিচয় ঘটাত। এই শিক্ষাসমিতি প্রত্যেক শিক্ষককে সুযোগ দিত নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে নিজের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রণালী স্থির করতে। ছাত্রভর্তির ব্যাপারে যোগ্যতা বাছাই করা হত। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে নিকট সম্পর্ক যাতে গড়ে ওঠে তার সুযোগ দেওয়া হত। ছাত্রদের পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল সহজ ও উদার এবং যথাসম্ভব নির্দোষ।

এই-সব ব্যবস্থা বা দৃষ্টিভঙ্গির কিছুই নতুন নয়। এর অধিকাংশই কলাভবনের প্রথম যুগে প্রবর্তিত হয়েছিল। যেমন, প্রাচীন ও সমসাময়িকের মধ্যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে

সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা। কলাভবনের সঙ্গে প্রধান পার্থক্য ছিল বোধ করি এইখানে যে, বরোদায় শিল্প-ইতিহাস ও শিল্প-প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দেওয়া হত এমন একটি কোর্সে, যেখানে পেশাদারী ও সৃজনশীল ধারা একই সঙ্গে প্রবহমান থাকবে (এই আশায় যে, সে ক্ষেত্রে পেশাদারী ধারাগুলি অতিরিক্ত সমস্যাকেন্দ্রিক হতে পারবে না। আবার সৃজনশীল ধারাগুলিও অতিরিক্ত ব্যক্তিগত ও কূপমণ্ডূক হয়ে উঠবে না); এবং এমন একটি শিক্ষা-পরিবেশ গড়ে উঠবে যা স্বাধীনতাকে দায়িত্ববোধের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবে।

এই প্রণালী কার্যকর হয়েছে এবং কিছু পরিমাণে সার্থকও হয়েছে; এবং বিশ্বভারতী সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চারু ও কারু -কলাবিভাগের কার্যক্রম-পরিকল্পনায় এর কিছুটা প্রভাবও পড়েছে।

কিন্তু প্রত্যেক ব্যবস্থারই ক্রমাগত সমীক্ষা ও পর্যালোচনা প্রয়োজন। শিল্পশিক্ষা সম্পর্কে এক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিনোদবাবু যে কথা বলেছেন তা তাঁর অস্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচয় দেয়। তিনি এ বিষয়ে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, বরোদায় যে-শিক্ষাপ্রণালী সার্থক হয়েছে, অন্যত্র চালু হলে তা সহজেই কঠিন ও অনমনীয় হয়ে পড়তে পারে।

এরকম অবশ্যই ঘটতে পারে। সব ব্যবস্থাই ফল-কেন্দ্রিক (Result-oriented) হয়ে পড়তে চায় সময় ও কার্যসূচীর চাপে। আজকের দিনের প্রতিযোগিতামূলক শিল্পজগৎ এই প্রবণতাকেই প্রশ্রয় দেয়। আজকের প্রতিযোগিতামূলক শিল্পজগতে যথার্থ অনুসন্ধান ও আন্তরিক প্রচেষ্টার চেয়ে বস্তুর চমক-লাগানো নতুনত্বকেই বেশি বাহবা দেওয়া হয়। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই শিক্ষকরা নতুন পথ অনুসন্ধানের চেয়ে ছাত্রদের গতানুগতিক পথে চলতেই বেশি উৎসাহ দিয়ে থাকেন। অধিকাংশ ছাত্রই অপরের কাছ থেকে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করাকেই সহজতর পথ বলে মনে করে। যে-কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই সতর্ক হতে হয় যাতে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এই নিষ্ক্রিয়তা গজিয়ে উঠতে না পারে। বিশেষত শিল্পশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, যেখানে ব্যক্তিগত সচেতনতা ও সৃজনশীলতার স্থান এত বেশি, সেইখানেই এটা বিশেষ জরুরি। এটা করার সর্বাপেক্ষা কার্যকর উপায় হল শিক্ষাদান ও বিদ্যাকে যতদূর সম্ভব ব্যক্তিকেন্দ্রিক করা এবং এইভাবে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই উদ্যোগ ও কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা। একই সঙ্গে নজর রাখা যাতে ছাত্ররা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কুশলতাও অর্জন করে। যথাযথ ফল পেতে হলে এর জন্য প্রয়োজন হবে আরো সুচিন্তিত শিক্ষাদান-পরিকল্পনা, গবেষণার ক্ষেত্রে এবং শিল্পশিক্ষার হাতে-কলমে কাজ শেখার ক্ষেত্রে বিস্তৃততর সুযোগ-সুবিধা।

কিন্তু সমস্ত কিছুর আগে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল (যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে) সমাজে সৃজনশীলতার বীজ বপন করা, যাতে সমাজের সমস্ত কর্মকাণ্ড সজীব ও বর্ধিত হয় গুণে ও পরিমাণে। এর জন্য দরকার এমন একটি বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতের যার মধ্যে গোটা অবস্থা এবং প্রতিটি বিভাগের চেহারা একসঙ্গে ধরা পড়ে। সমস্ত কর্মকাণ্ড যদি সরাসরি এই শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় না পড়ে তা

হলেও এটা দরকার। আজকের দিনে শিল্পের পরিধির মধ্যে পড়ে সেই-সব পেশাদারী ক্ষেত্র, যেগুলি সব উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রেই কারু ও চারু -কলার শিক্ষাক্রমে বর্তমান। যেমন, ১. সৃজনশীল শিল্প (চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, গ্রাফিক-শিল্প এবং এদের বিভিন্ন উপ-বিভাগ); ২. নকশা ও যোগাযোগের শিল্প (গ্রাফিক-নক্‌শা, বই-নক্‌শা, দৃষ্টিনির্ভর যোগাযোগের নক্‌শা, ফিল্ম, উৎপাদনের নক্‌শা, পরিবেশ-নক্‌শা ইত্যাদি) এবং এ ছাড়াও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নক্‌শা; ৩. কারুশিল্প, হস্তশিল্প ও ঐতিহ্যগত শিল্প, এবং ৪. গ্রামীণ ও উপজাতির শিল্প। আমাদের মতো যে দেশ নিতান্ত আংশিকভাবেই যন্ত্র-সভ্যতার আওতায় পড়ে, সে দেশে শেষ দুটির উপস্থিতি যে উল্লেখযোগ্য হবে এটা স্বাভাবিক। বস্তুত এটা সন্তোষজনকও। কেননা এগুলির মধ্যে থেকেই জন্মায় দক্ষ কারিগরি কুশলতা, যা হল সমস্ত শিল্পের একেবারে গোড়ার ধাপ, এবং যা শিল্পের ভাষাকে দান করে গাম্ভীর্য ও গভীরতা। বর্তমানকালের আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মসূচীতে হয়তো সরাসরিভাবে এগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। (কি কারণে তা আগেই বলা হয়েছে)। কিন্তু এগুলির সঙ্গে সংযোগ রাখলে তাদের প্রভূত উপকার হবে। এই সংযোগ গড়ে তোলা যাবে পর্যবেক্ষণ, ডকুমেন্ট-রচনার কাজ, স্থানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওয়ার্কশপ-পরিকল্পনা এবং গবেষণার সাহায্যে। গবেষণা করতে হবে এদের কর্মপ্রণালী, সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং সহনশীলতা সম্বন্ধে। এর ফলে শুধুমাত্র বর্তমান শিক্ষার্থীরাই উপকৃত হবেন না, উপকৃত হবেন এই-সব শিল্পের কারিগররাও এবং শিল্পের কেন্দ্রসমূহও, বজায় থাকবে এদের গুণগত বৈশিষ্ট্য, অটুট থাকবে এদের মৌল সত্যতা। প্রথম দুটি বিভাগ আজকাল অধিকাংশ শিল্প-বিদ্যালয়েই শিক্ষা-ক্রমে স্থান পেয়েছে (যদিও এখনো নিতান্ত আংশিকভাবেই)। এ ছাড়া, শিল্প-শিক্ষাদান— অথবা ছোটোদের, যুবক-যুবতীদের ও সাধারণ মানুষকে শিল্প-প্রক্রিয়ায় দীক্ষিত করা ও শিল্পবোধ সম্পর্কে সচেতন করা— এই হবে কাজের প্রধান ক্ষেত্র। শিল্প-ইতিহাস ও বিশ্লেষণ হবে এই ব্যবস্থার সাহায্যকারী হিসেবে প্রত্যেক বিভাগের পক্ষে সহগামী শিক্ষণীয় বিষয়।

যে-কোনো সঠিক শিল্পশিক্ষা-পরিকল্পনাকে এই সমস্ত বিভাগের প্রত্যেকটিকেই যথাসম্ভব সংযুক্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। এ অন্তর্ভুক্তি স্থানীয় অবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে।

পরিকল্পনাটি এইভাবে করা যেতে পারে :

সৃজনশীল শিল্পের যে-কোনো কর্মসূচীতে থাকবে—

ক. পূর্ববর্তী শিল্পকলা সম্পর্কে শিক্ষা;

খ. পারিপার্শ্বিক থেকে শিক্ষা;

গ. শিল্প-মাধ্যম সম্পর্কে শিক্ষা।

এদের প্রত্যেকটিকেই যুক্ত করতে হবে ছাত্রদের ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতার সঙ্গে, এবং এ-সমস্তকে সম্পূরণ করবে শিল্প-ইতিহাস ও বিশ্লেষণ, সাধারণ শিল্প-পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে অনুশীলন ও জ্ঞান। একইভাবে, যোগাযোগের শিল্প-শাখাগুলির (Communication Arts) কর্মসূচীতে থাকবে—

ক. দৃষ্টির ভাষা সম্পর্কে শিক্ষা;

খ. পারিপার্শ্বিক থেকে শিক্ষা;

গ. মাধ্যম-নক্‌শা (Media Design) ও মাধ্যম-কারিগরি (Media Technique) সম্পর্কে শিক্ষা।

এই কর্মসূচীর সম্পূরণ হবে শিল্প-ইতিহাস, শিল্প-পরিবেশ ও সৃজনশীল শিল্প সম্পর্কে শিক্ষার দ্বারা। নক্‌শা-সংক্রান্ত যে-কোনো কর্মসূচীতে থাকবে—

ক. পারিপার্শ্বিক থেকে শিক্ষা;

খ. ব্যবহারিকতা-বিশ্লেষণ (Function-analysis), কর্মপ্রণালী, কর্মসংগঠন, প্রযুক্তি ও কারিগরি কুশলতার বিশ্লেষণ ও তৎসম্পর্কিত জ্ঞানলাভ;

গ. শিল্প-বিষয়ে আমাদের চাওয়া এবং তার পরিতৃপ্তির সম্পর্কে জ্ঞানলাভ।

এই কর্মসূচীর সম্পূরণ হবে সৃজনশীল শিল্প, শিল্প-ইতিহাস ও শিল্প-পরিবেশ সম্বন্ধে অনুশীলনের দ্বারা।

ছাত্রদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকেও উৎসাহ দিয়ে তাদের রুচি ও প্রবণতাকে স্থান দেবার জন্য এই কর্মসূচীগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে :

১. মূল বা কেন্দ্রীয় কর্মসূচী (The Core Project)— এর জন্য ছাত্রকে তার শিক্ষকের সঙ্গে বসে নিজের পছন্দমতো পথ বেছে নিতে হবে এবং সে পথে চলবার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কুশলতা অর্জন করে নিতে হবে। এর ফলে যে কাজের সৃষ্টি হবে, সেটাই হবে তার শিক্ষার ভিত বা আকর। এরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে তার নিজের মৌলিক সৃষ্টি কর্ম ও তৎসহ ঐতিহ্যবাহী আদর্শ বা পরম্পরাগত মডেল থেকে শিক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ ও কারিগরি-কুশলতা সম্পর্কে অনুশীলন।

২. আনুষঙ্গিক বিষয়ের কুশলতা-শিক্ষা— এগুলির উদ্দেশ্য হল ছাত্রদের কাজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার বাড়িয়ে তোলা এবং তাদের পেশাদারী দক্ষতার উন্নতিসাধন করা। এর মধ্যে কতকগুলি হয়তো কেন্দ্রীয় কর্মসূচী থেকে উদ্‌ভূত হতে পারবে। যদি তা নাও হয়, তা হলেও ছাত্রদের গড়ে তুলতে হবে বিভিন্নরকম গ্রাফিক, কারিগরি ও দৃষ্টিকেন্দ্রিক কাজের দক্ষতা।

৩. উপাদান-উপকরণ সম্পর্কিত শিক্ষা— এগুলির উদ্দেশ্য ছাত্রদের দৃষ্টির, তাদের পরিপ্রেক্ষিতের প্রসার সাধন এবং শিল্প পরিবেশ সম্পর্কে, কি ঐতিহ্যবাহী শিল্প, কি সমসাময়িক শিল্প— দুয়েরই উপাদান-উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান বাড়িয়ে তোলা। এর মধ্যে থাকবে— সাধারণ শিক্ষা, শিল্প-ইতিহাস শিক্ষা, শিল্পের মৌল প্রত্যয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞান, হাতে-কলমে কাজের মধ্যে দিয়ে গবেষণা, লেখার অভ্যাস, আলোচনা, এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পরিচিতি।

এর পূর্বশর্ত হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, আজকের শিল্পশিক্ষার্থী দুই রাজ্যের মধ্যবর্তী একটি প্রদেশে অবস্থান করছে। তার এক দিকে আছে গত কালের শিল্প-পরিবেশ (ঐতিহ্যবাহী ধারণা, প্রণালী, প্রযুক্তি) এবং অন্য দিকে আছে আজকের

দিনের শিল্প-পরিবেশ (আজকের কর্মকাণ্ড এবং অন্যান্য সংযুক্ত বিষয়)। এই দুইটিকে তার সমান ভালো করে জানা প্রয়োজন। তার হয়ে-ওঠা এবং তার সৃজনশীলতা, দুইই নির্ভর করবে তার খোলা মনের গ্রহণশীলতার উপর, রূপজগৎ এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সম্পর্কে তার সচেতনতার উপর। আরো নির্ভর করবে, কি পরিমাণে, কতখানি দক্ষতা ও বুদ্ধির সঙ্গে সে এগুলির সদ্‌ব্যবহার করতে পারছে, তার উপর।

এই ধরনের কর্মসূচী স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের উপরেই অধিকতর দায়িত্ব ন্যস্ত করবে। এর কার্যকারিতার জন্য বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামোর কিছু পরিবর্তন ঘটাতে হবে। শিল্প-শাখাকে সৌভ্রাত্রের বন্ধনে আবদ্ধ একটি ঘন-সান্নিধ্য সংস্থায় পরিণত হতে হবে— বিশেষীকরণের ক্ষেত্রে অথবা হাতে-কলমে কাজের ক্ষেত্রে যতই ভাগাভাগি থাকুক না কেন? আজকের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগগুলি বিচ্ছিন্ন দুর্গের মতো হয়ে যায়, তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো সম্পর্কই থাকে না। প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঘন-সন্নিবদ্ধ করতে হলে তার জন্য প্রয়োজন উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা ও কৃতিত্ব-পরীক্ষার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি, এবং এমন শিক্ষক যাঁরা সচেতন ও বহুমুখী কর্মক্ষমতাসম্পন্ন। তার জন্য আরো প্রয়োজন বৃহত্তর গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা এবং ধারাবাহিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের সুযোগ-সুবিধা।

কিন্তু প্রতিষ্ঠানই হোক আর শিক্ষাপ্রণালীই হোক, এ-সবই শিক্ষাব্যবস্থার বাহ্যিক অবলম্বন। এগুলি জীবন্ত হয় তখনই, যখন এর চার দিকে থাকে সজীব মানুষ। যে-কোনো সুপরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষাক্রমের প্রধান গুণই হল এই সজীবতা। এই ধরনের সজীব মানুষেরা যখন কোনো প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে থাকেন, তখন তা আপনা থেকেই সেই প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে কাজ করতে সাহায্য করে এবং তা আপনা থেকেই গড়ে তোলে এমন একটি পরিবেশ যা অনেক সময় তাঁদের অবর্তমানেও কিছুকাল বজায় থেকে যায় (এবং এইভাবে তা এই ব্যবস্থার আয়ু বাড়ায়)। যথার্থ পরিকল্পনাহীন অথবা কুপরিকল্পিত কোনো প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষাক্রম অত্যন্ত সজীব মানুষদের আন্তরিক প্রচেষ্টাকেও বিনষ্ট করতে পারে, সমস্ত প্রয়াসকে নিষ্ফল করে দিতে পারে (অবশ্য দু-একটি বৃহদায়তন বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হয়তো এর কিছুটা ব্যতিক্রম হতেও পারে)। কিন্তু, এমন-কি, সুপরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানেরও অনেক অভাব থাকে; ঠিক যেমনটি দরকার, সব তেমনটি থাকে না— তারও দরকার হয় উদারতা ও স্থিতিস্থাপকতার; দরকার হয় আদর্শ ও লক্ষ্যের পরিবর্তন অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতার; দরকার হয়— কাজ যখন ঠিকমতো চলছে তখন নিজেকে সম্পূর্ণ নেপথ্যে সরিয়ে রাখবার ক্ষমতার। কোনো প্রতিষ্ঠানে যখন এই গুণগুলির অভাব ঘটে, বুঝতে হবে তখন নতুন করে ভাববার, নতুন করে গড়বার সময় এসেছে।

অনুবাদ : মহাশ্বেতা সিংহ ও সত্যেন্দ্রনাথ রায়

১৩৮৪ বৈশাখ

রবীন্দ্রসংগীতের রূপকল্পনা : একটি দিক

অনন্তকুমার চক্রবর্তী

> In my young days, I owed everything to models : without constant contact with admired examples I scarcely ventured on a single step; and yet with time I have come to feel that the whole essence of art is in their deliberate abandonment, in the leap in the dark, the possibility of achieving the new.
> —Thomas Mann, *A Sketch of My Life*, London, 1961, pp. 67-68.

> হিন্দুস্থানী গানকে আচারের শিকলে যাঁরা অচল করে বেঁধেছেন, সেই ডিক্‌টেটার্‌দের আমি মানি নে। যাঁরা বলেন ভারতীয় গানের বিরাট ভূমিকার উপরে নব নব যুগের নব নব যে সৃষ্টি স্বপ্রকাশ তার স্থান নেই— ঐখানে হাতকড়ি-পরা বন্দীদের পুনঃ পুনঃ আবর্তনের অনতিক্রমণীয় চক্রপথ আছে মাত্র এমনতর নিন্দোক্তি যাঁরা স্পর্ধা-সহকারে ঘোষণা করে থাকেন তাঁদেরই প্রতিবাদ করবার জন্যই আমার মতো বিদ্রোহীদের জন্ম।'
> —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সুর ও সংগতি', সংগীতচিন্তা, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯২, পৃ. ১৩০

'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো', প্রার্থনা জানিয়েছিলেন কবি। কিন্তু আমাদের এই খিন্ন জীবনে যখন সকল মাধুরী লিপ্ত হয়ে আসে তখন তাঁর অনুপম গানগুলিই সেই করুণাধারা। তথাপি যা-কিছু আমাদের আনন্দ দেয়, আমাদের আত্মসংবিৎকে জাগিয়ে তোলে, তাকে নিয়ে কোনো বিচার চলে না এই মনোভঙ্গি বোধ হয় খুব শ্রদ্ধেয় নয়। বরং আনন্দের প্রাথমিক উপলব্ধি যেখানে পরবর্তী বিচারের দ্বারা পুষ্ট সেখানে সৌন্দর্যের এমন সব নতুন নতুন অভিব্যক্তি উন্মোচিত হতে পারে যা ইতিপূর্বে অনাবিষ্কৃতই ছিল। হয়তো তার পরেও কিছু রহস্য রহস্যই থেকে যায়। তখন নতুন বিচার ও নতুন উপলব্ধির পালা।

সুখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর সৃষ্টিরহস্যের কিছু কিছু সন্ধান আমাদের দিয়ে গেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার রায়ের আলোচনাও আমাদের কিছুদূর পথ দেখায়। কিন্তু পথের শেষ কোথায়? আর ধূর্জটিপ্রসাদের এ-আক্ষেপ তো আজও অনেকাংশে সত্য যে 'ভারতীয় সংগীতে musical criticism নেই বললেই হয়।' আধুনিক সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, 'রবীন্দ্রসংগীত গবেষণায় অরুণ ভট্টাচার্য, সন্‌জীদা খাতুন রূপের দিকে যতটা অভিনিবিষ্ট হলেন, এই শিল্পের ভাবাত্মার দিকে ততটা ঘনিষ্ঠ হন নি। পক্ষান্তরে শঙ্খ ঘোষ বা অলোকরঞ্জন এর ভাবাত্মার সন্নিহিত হতে যতটা ব্যগ্র এর সাংগীতিক রূপ বিচারে

ততোটা অগ্রসর নন। এই দুটো কাজ এখনো ভাগ হয়েই রয়েছে।'[১] এখানে খুব সীমাবদ্ধভাবে হলেও একটা প্রাথমিক ঐক্যসাধনের চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে স্মরণ করতেই হয় যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দুই খণ্ডের 'গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী' রবীন্দ্রসংগীতের পর্ব-বিভাগে আমাদের দারুণভাবে সাহায্য করে এবং তারও আগে শান্তিদেব ঘোষের বিখ্যাত গ্রন্থটি থেকে আমরা জেনে গেছি, রবীন্দ্রসংগীতের সামাজিক ও সাংগীতিক পটভূমিটি কী, তার বিভিন্ন দেশি-বিদেশী, ক্লাসিক্যাল ও লৌকিক উপাদানের গঠনগত বৈচিত্র্যই বা কোথায়। সর্বোপরি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দুটি পথনির্দেশ, অন্তত বর্তমান প্রসঙ্গে, বিশেষভাবে স্মরণীয় :

১. '...সমস্ত বদল হবে তার আদিপ্রকৃতির উপর ভর দিয়ে।
গান সম্বন্ধে এই কথাই খাটে। ভারতবর্ষের বহু-যুগের-সৃষ্টি-করা যে সংগীতের মহাদেশ, তাকে অস্বীকার করলে দাঁড়াব কোথায়?' (সংগীতচিন্তা, পৃ. ১৩০)।
২. '...সংগীতে আমি নির্মমভাবে আধুনিক, অর্থাৎ জাত বাঁচিয়ে আচার মেনে চলি নে। কিন্তু একেবারেই ঠাট বজায় না রাখি যদি তবে সেটা পাগলামি হয়ে দাঁড়ায়' (সংগীতচিন্তা, পৃ. ১২৯)। অন্যত্র : 'দেখিলাম তাদের [রাগরাগিণীর] খাঁচাটা এড়ানো চলে, কিন্তু বাসাটা তাদেরই বজায় থাকে।' (সংগীতচিন্তা, পৃ. ৫৫)

এদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারি ধূর্জটিপ্রসাদের এই অসামান্য উক্তিটি যে 'একজন বড়ো শিল্পী নিজের শিল্পীজীবনে শিল্পের গোটা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটান, আবার তাকে বিকাশের পরবর্তী স্তরেও এগিয়ে দেন।' (*Rabindranath Tagore, A Centenary Volume : 1861-1941*, Sahitya Academy, 1961, অনুবাদ লেখকের)।

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত স্বরবিতানের ১৯টি খণ্ডে রবীন্দ্রসংগীতের রাগ ও তালের নির্দেশ আছে। খণ্ডগুলি হল ৪, ৮, ৯, ১০, ২০, ২২-২৯, ৩২-৩৫-৩৮ ও ৪৫। বাকিগুলিতে রাগ-তালের নির্দেশ প্রায়শ নেই। স্বামী-প্রজ্ঞানানন্দের 'সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান' বইয়ের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে (লেখক বীরেন্দ্রনাথ সরকার) উক্ত খণ্ডসমূহের অন্তর্ভুক্ত ৫৪৬টি গানের বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে রবীন্দ্র-ব্যবহৃত রাগরাগিণীর সংখ্যা ১১৬। অবশ্য এর মধ্যে কীর্তন, বাউল, ভজন, ধুন, মিশ্র ইত্যাদিকেও ধরা হয়েছে এবং ১৩৪টি গান আবার মিশ্র রাগে। মোট ১১৬টি রাগের মধ্যে ৫২টি ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র একটি করে গানে, ১০টি ব্যবহৃত হয়েছে দুটি করে গানে এবং ১২টি ব্যবহার করা হয়েছে তিনটি করে গানে। অপর পক্ষে 'ভৈরবী, বেহাগ, ইমন-কল্যাণ, খাম্বাজ, বাহার— এই কয়টি রাগরাগিণীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্ব ছিল। দেশ, রামকেলি, কেদারা, ছায়ানট, বিভাস, যোগীয়া, সাহানা, সিন্ধুও বেশ প্রাধান্য লাভ করেছে। বাংলার নিজস্ব সম্পদ বাউল ও কীর্তনও রবীন্দ্রনাথের গানে যথেষ্ট প্রভাব

১. সন্‌জীদা খাতুন সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যে আমার একটু আপত্তি আছে। বস্তুত সন্‌জীদা খাতুনের আলোচ্য বিষয়ই হল 'রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ'।

বিস্তার করেছে।' রবীন্দ্রসংগীতের সাধারণ শ্রোতাদের কাছে উপরি-উক্ত সংখ্যাগুলি পরিচিত না হলেও মূল ঝোঁকগুলির কথা বোধ হয় অজ্ঞাত নয়। লক্ষ করতে হবে, এই বিশেষ রাগগুলির নামোল্লেখের মধ্যে 'কাফি' রাগটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, যদিও তালিকায় আছে কাফি রাগে গানের সংখ্যা ৮, কাফি-সিন্ধুতে ৭ এবং সিন্ধুতে ৯। তৎসহ কাফি-কানাড়া, সিন্ধু-খাম্বাজ, সিন্ধু-বাঁরোয়া এবং সিন্ধুড়ার স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে কাফি রাগটিকে আশ্রয় করে আলোচনাকে কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। রবীন্দ্রসংগীত কতটা রাগাশ্রিত এটা দেখানো এখানে উদ্দেশ্য নয়। মুখ্য উদ্দেশ্য দেখানো, রাগ-বিশেষের স্বর-সমন্বয়কে মোটের ওপর মেনে নিয়েও কীভাবে রবীন্দ্রনাথ অবলীলাক্রমে রাগবহির্ভূত স্বরকেও ব্যবহার করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত যা 'হয়ে উঠেছে' তা রাগরাগিণীর সামান্যীকৃত রূপমাত্র নয়, তা নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে থেকেও বিশিষ্ট, একক ও স্বতন্ত্র। ইতিপূর্বে ভৈরবী বেহাগ ইমন ইত্যাদি নিয়ে কেউ কেউ কিছু কথা বলেছেন, কাফি নিয়ে বিশেষ আলোচনা কোথাও নজরে আসে নি। এখানে লেখকের বিশেষ নিবেদন এই যে সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য দেখাতে হলে কোনো একটা পয়েন্ট অব রেফারেন্স দরকার হয়। কাফি রাগ এখানে সেই পয়েন্ট অফ রেফারেন্স। অন্যথা রবীন্দ্রসংগীত যে রাগ-সংগীত এটা প্রতিপন্ন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কেন-না সেটা সত্য নয়— বিশেষ করে তাঁর উত্তর-জীবনের গানগুলি।

কিন্তু সর্বাগ্রে কাফি রাগের একটু বিস্তৃত পরিচয় নেওয়া উচিত। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে তাঁর 'হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি'-র দ্বিতীয় খণ্ডে (বাংলা সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯৭) কাফি রাগের স্বরূপ-প্রকাশক কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে, তার মধ্যে 'রাগচন্দ্রিকা'র শ্লোকটি বেশ সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য। সেটি এই :

মৃদু গমৌ রিধৌ তীব্রাবুভৌ নী পঞ্চমোহংশকঃ।
যত্র ষড়্‌জস্তু সম্বাদী কাফী সা নিশি গীয়তে॥

এর অর্থ, গা ও মা মৃদু অর্থাৎ কোমল; মা কোমল বলার অর্থ তীব্র নয়, কাজেই শুদ্ধ; দুই নি— কোমল ও শুদ্ধ; পঞ্চম (পা) স্বরটি অংশ অর্থাৎ বাদী, আর ষড়জ সম্বাদী। রাগটি রাত্রিকালে গেয়। ভাতখণ্ডে-নির্দেশিত দশ ঠাটের অন্যতম হচ্ছে কাফি, যার স্বর-সমন্বয় স র জ্ঞ ম প ধ ণ র্স। এই ঠাটের অন্তর্ভুক্ত যতগুলি রাগ আছে, বোধ হয় অন্য কোনো ঠাটেই তা নেই। তা ছাড়া রাগ হিসেবেও কাফি অত্যন্ত বিস্তৃত রাগ। এই রাগে ধ্রুপদ শোনা গেলেও খেয়াল প্রায় শোনাই যায় না, আর এর সবচেয়ে ব্যাপক প্রয়োগ টপ্পা ও ঠুংরিতে এবং পুরোনো বাংলা গানে। সেখানে রাগের বিশুদ্ধতা নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না, তবু সাধারণ ভাবটা থেকেই যায়। কাফির সঙ্গে শৃঙ্গার-রসের একটা সংস্কার জড়িয়ে আছে। ভাতখণ্ডেজীর আলোচনা থেকে আরো জানা যায় :

১. কাফি রাগটি কাফি ঠাট থেকে উৎপন্ন 'ঠাট রাগ', বা 'আশ্রয় রাগ' বা 'জনক রাগ'; এই রাগে গান্ধার ও নিষাদ কোমল, বাকি স্বরগুলি শুদ্ধ।

২. এর বাদী স্বর পঞ্চম ও সম্বাদী ষড়্জ। কোনো কোনো গুণীজন গান্ধার ও নিষাদকে সম্বাদী বলে মানেন। (রবীন্দ্রলাল রায়ের ['রাগ-নির্ণয়'] মতে, 'রি বাদী ও প সম্বাদী'।)
৩. এর জাতি সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ।
৪. আরোহে তীব্র (শুদ্ধ) গান্ধার ও তীব্র (শুদ্ধ) নিষাদ অনেকবার প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এই স্বরগুলির যথার্থ প্রয়োগে রাগের বৈচিত্র্য অনেক বেড়ে যায়, তবে এগুলি রাগের নিয়মিত স্বর নয়।
(পণ্ডিত বিনায়ক পটবর্ধনের মতে, ['রাগ-বিজ্ঞান' তৃতীয় খণ্ড] 'শুদ্ধ গান্ধার ঔর শুদ্ধ নিষাদ কা প্রয়োগ অবরোহ মে হী বক্ররূপ সে কিয়া জাতা হৈ। কাফী সে ইস স্বরূপ কো মিশ্র কাফী কহতে হৈ।')
৫. কখনো কখনো কোমল ধৈবত প্রয়োগ করেও নিপুণ গায়ক রাগ হানি হতে দেন না, কিন্তু এর প্রয়োগ গায়কের (রচয়িতারও) কুশলতার ওপর নির্ভর করে।
৬. সাধারণ শ্রোতাগণ সাসা, রারা, জ্ঞাজ্ঞা, মামা, পা এই বিশিষ্ট স্বরসমাবেশ (পকড়) থেকে মুহূর্তের মধ্যে এই রাগটিকে চিনে নিয়ে থাকেন। (রবীন্দ্রলাল রায় 'বিশেষ তান' হিসেবে দেখিয়েছেন রা জ্ঞা সা রা পা এই সুন্দর বিন্যাসটি।)

দেখা যাচ্ছে, কাফি রাগটির পরিচয় নিয়ে খুব বেশি মতপার্থক্য নেই। প্রধান কথা হল দুটি : ক. এই সম্পূর্ণ জাতির রাগটির গান্ধার ও নিষাদ কোমল, অন্য স্বরগুলি শুদ্ধ, আর খ. মাঝে মাঝে শুদ্ধ গান্ধার শুদ্ধ নিষাদও ব্যবহৃত হয়ে থাকে বৈচিত্র্যসাধনের জন্যে।

কিন্তু মুশকিল বাধে যখন এইসঙ্গে 'সিন্ধু' রাগটিকেও স্মরণ করি। কারণ 'রাগ-নির্ণয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রলাল রায় মহাশয় জানাচ্ছেন : 'অনেকে একে [কাফি রাগকে] সিন্ধু বলেন। সম্ভবত 'সৈন্ধবী' নাম থেকে 'সিন্ধু' এসেছে। আসলে বর্তমান কাফিকে 'সিন্ধু' অথবা 'সৈন্ধবী' বলাই ঠিক কারণ শাস্ত্রোক্ত সৈন্ধবী রাগের সঙ্গে বর্তমান কাফি মেলে।' অপর পক্ষে ভাতখণ্ডেজী 'সিন্ধ' নামে এক 'ক্ষুদ্রগীতিক' রাগের উল্লেখ করেছেন যাতে দুই গান্ধার প্রযুক্ত হয় এবং ঋষভও হয় প্রবল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর 'রাগ-রূপায়ণ' গ্রন্থে ভাতখণ্ডেজীর উল্লেখ করে লিখছেন 'পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বলেছেন, তিনি সেতারে বোম্বাই অঞ্চলে প্রচলিত সিন্ধ্ নামক রাগের একখানি গৎ লিখেছিলেন, এর সরগমও তিনি দিয়েছেন। আমরা জানি এই ধরনের গৎ ইমদাদখানি সেতার ঘরাণায় প্রচলিত আছে, কিন্তু তার নাম সিন্ধু নয়, সিন্ধু-খাম্বাজ। এইটেই সিন্ধু ভৈরবী কিনা জোর করে বলা যায় না।' এই সিন্ধু-ভৈরবীর পরিচয় দিতে গিয়ে সুরেশ চক্রবর্তী মহাশয় বলছেন, 'সিন্ধু বা সিন্ধুড়া আর ভৈরবী মিলিয়ে এই রাগ কল্পিত।' কাজেই তাঁর মতে 'সিন্ধু' আর 'সিন্ধুড়া' একই রাগ। কিন্তু ভাতখণ্ডেজীর গ্রন্থ অনুযায়ী 'সিন্ধ' আর 'সিন্দুরা' স্বতন্ত্র রাগ, স্বতন্ত্রভাবে তাদের পরিচয় দেওয়া আছে, এবং 'সিন্দুরা'র অপর নাম 'সৈন্ধবী' : এটি একটি কাফি-ঠাট-ভুক্ত ঔড়ব-সম্পূর্ণ-রাগ, এর

আরোহে গান্ধার ও নিষাদ বর্জ্য, যদিও নিষাদ বর্জিত রাখার বিষয়ে মতভেদ আছে, আর অবরোহ সম্পূর্ণ, অর্থাৎ কাফির মতোই। পটবর্ধনজী 'সিন্দুরা' সম্বন্ধে প্রায় একই কথা বলেছেন, শুধু যোগ করেছেন এইটুকু যে 'ঋষভ পর অবরোহমে কম ঠাহরানা চাহিয়ে। অধিক ঠাহরনে সে কাফী হী হো জায়েগা।' তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম :

রবীন্দ্রলাল রায়ের মতে	:	কাফি = সিন্ধু = সৈন্ধবী;
সুরেশ চক্রবর্তীর মতে	:	সিন্ধু = সিন্ধুরা;
ভাতখণ্ডের মতে	:	ক. সৈন্ধবী = সিন্দুরা, কিন্তু
		খ. সিন্ধ একটু স্বতন্ত্র রাগ, আর
		গ. কাফি তো আলাদা রাগ বটেই।

এ থেকে আমার মতো স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন লেখকের পক্ষে সিদ্ধান্তে আসা খুবই কঠিন। শুধু মিলের ক্ষেত্র আছে দুটি : ক. কাফির রাগ-পরিচয় সম্বন্ধে সকল মহাজনের সিদ্ধান্ত প্রায় এক, এবং খ. সিন্ধুড়া সম্পর্কেও সকল মহাজনের সিদ্ধান্ত মোটামুটি এক। রবীন্দ্রসংগীতে যাকে 'সিন্ধু' বলে ধরা হয়েছে তা কি আসলে ঐ সিন্ধুড়া? এরকম সিদ্ধান্তের বিপক্ষে যুক্তি আছে দুটি। প্রথমত, রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন আলোচনায়, বিশেষ করে ইন্দিরা দেবীর 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম' বইয়ে, সিন্ধু ও সিন্ধুড়ার স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে, কাফির দৃষ্টান্ত আরো স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়ত, সিন্ধু-রাগে সুপরিচিত রবীন্দ্রসংগীত 'চরণধ্বনি শুনি তব নাথ'-এর সঙ্গে সিন্ধুড়ার কিছুটা মিল থাকলেও পুরোপুরি মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য ধ্রুপদ-খেয়াল ছাড়া অন্য যে-কোনো গানে (বা ধুনে) শাস্ত্রীয় রাগলক্ষণ সর্বদা অবিকৃত রাখতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, রবীন্দ্রসংগীতে তো অবশ্যই নেই। তথাপি, সকলেই জানেন, 'চরণধ্বনি শুনি তব নাথ' গানটি একটি 'ভাঙা গান', এর পুরোবর্তী আদর্শ 'মূরলীধুনি শুনি'। ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম' অনুযায়ী এর রাগ ও তাল যথাক্রমে সিন্ধু ও ঝাঁপতাল। এই মূল গানটি সম্পর্কে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের কাছে শুনেছি, এটি রাগ সিন্ধুড়ায় গাওয়া হয়। কিন্তু বিজয় কিচলু মহাশয়ের মুখে গানটি যেভাবে ক্যাসেটে ধরা আছে (ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠী : 'রূপান্তরী'— এইচ. এম. ভি. ক্যাসেট) সেটি পুরোপুরি সিন্ধুড়া কিনা সন্দেহ, যদিও মিল আছে যথেষ্ট। সিন্ধুড়া ছাড়া সিন্ধু-রাগের অন্য কোনো 'স্বতন্ত্র' শাস্ত্রীয় রূপ থাকলে বর্তমান লেখকের তা অজ্ঞাত— শুধু ভাতখণ্ডের বইয়েতেই 'সিন্ধ' রাগের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে, যার কথা আগেই বলা হয়েছে। তবে কাফি, সিন্ধু, সিন্ধুড়া— সবই কাফি ঠাটের অন্তর্ভুক্ত, এবং শেষোক্ত দুটি রাগ ভিন্ন হোক বা অভিন্ন হোক, মূল আশ্রয় রাগ (কাফি) থেকে খুব দূরবর্তী নয়, এ-কথা বোধ হয় নিঃসংকোচে বলা যায়। অতএব বর্তমান আলোচনার বিশেষ ক্ষেত্রে :

১. 'স্বরবিতান'-এর নির্দেশকেই অনুসরণ করা হচ্ছে। সেখানে গানগুলিকে কাফি ও সিন্ধুরাগের গান বলে যেভাবে চিহ্নিত করা আছে তাদের সেই পরিচয়েই গ্রহণ করা হচ্ছে, এবং সিন্ধু রাগের গানগুলিকে বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্র থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।
২. যে গানগুলি রাগ-চিহ্নিত নয় তাদের ক্ষেত্রে কাফির অনুরূপ স্বরবিন্যাস পেলে তাদের কাফি বলেই ধরা হবে। সে ক্ষেত্রে কাফি ও সিন্ধুর স্বতন্ত্র শাস্ত্রগত পরিচয় ধর্তব্য হবে না।

নীচে আমরা কাফি-রাগাশ্রিত রবীন্দ্রসংগীতের একটি তালিকা দিচ্ছি। এই তালিকা দুটি অংশে বিভক্ত : ক ও খ। ক-অংশে আছে কবির ৪৮ বছর বয়স পর্যন্ত কালের রচনা, খ-অংশে পরবর্তীকালের। এই বিভাজনের কারণ : ৪৮ বছর বয়স পর্যন্ত কালের রচনাগুলিতে সাধারণ রাগ-তালের নির্দেশ পাওয়া যায়, বাকিগুলিতে সাধারণত তা নেই। মোটের ওপর বলা যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কালানুক্রমিক সূচী'র দুটি খণ্ডকেই (প্রথম : ১৩৮০, দ্বিতীয় : ১৩৮৫) দুই বিভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে— মাত্র ৫টি 'খ'-শ্রেণীভুক্ত গান প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত।

	গান	স্বরবিতান-খণ্ড	বয়স
	(ক)		
১.	তুই রে বসন্ত সমীরণ	... ২০ ...	২০
২.	কেহ কারো মন বুঝে না (সিন্ধু কাফি)	... ৩২ ..	২২
৩.	মাঝে মাঝে তব দেখা পাই	... ২৩ ...	২৩
৪.	তারো তারো হরি দীন জনে	... ২৫ ...	২৪
৫.	কেন চেয়ে আছ গো মা	... ৪৭ ...	২৫
৬.	আছ অন্তরে চিরদিন	... ২২ ...	২৬
৭.	কাছে আছে দেখিতে না পাও	... ৪৮ ...	২৭
৮.	ভালোবেসে যদি সুখ নাহি	... ৪৮ ...	২৭
৯.	সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল	... ৪৮ ...	২৭
১০.	মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি	... ১০ ...	৩৬
১১.	প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী	... ২৬ ...	৩৯
১২.	শূন্য হাতে ফিরি হে, নাথ, পথে পথে	... ৪ ...	৪১
১৩.	যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ	... ২২ ...	৪৩
১৪.	যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু	... ৩৮ ...	৪৮
	(খ)		
১৫.	মম চিত্তে নিতি নৃত্যে	... ৪২ ...	৪৯
১৬.	আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা	... ৪২ ...	৪৯
১৭.	তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে	... ৫২ ...	৫০

১৮. ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে ... ৫২ ... ৫০
১৯. হার-মানা হার ... ৩৯ ... ৫১
২০. আমার ব্যথা যখন আনে আমায় ... ৩৯ ... ৫২
২১. বসন্তে আজ ধরার চিত্ত ... ৩৯ ... ৫২
২২. তোমার পূজার ছলে তোমায় ... ৪১ ... ৫২
২৩. তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে ... ৪১ ... ৫২
২৪. কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না ... ৪১ ... ৫২
২৫. আমার হিয়ার মাঝে ... ৪১ ... ৫২
২৬. এই কথাটাই ছিলেম ভুলে ... ৭ ... ৫৩
২৭. পথ দিয়ে কে যায় গো চলে ... ৭ ... ৫৩
২৮. তুমি কি কেবলই ছবি ... ৩০ ... ৫৩
২৯. এরে ভিখারি সাজায়ে ... ৪০ ... ৫৩
৩০. যখন তুমি বাঁধছিলে তার ... ৪৩ ... ৫৩
৩১. হৃদয় আমার প্রকাশ হল ... ৪৩ ... ৫৩
৩২. একদা তুমি প্রিয়ে ... ১৬ ... ৫৬
৩৩. সে যে বাহির হল আমি জানি ... ৩৪ ... ৫৭
৩৪. অকারণে অকালে মোর ... ৩৪ ... ৫৭
৩৫. সময় আমার নাই যে বাকি ... ৩৩ ... ৫৮
৩৬. আমার অভিমানের বদলে আজ ... ৪২ .. ৫৮
৩৭. ওগো আমার শ্রাবণমেঘের ... ১৪ ... ৬০
৩৮. আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার ... ১৫ ... ৬১
৩৯. আজ আকাশের মনের কথা ... ১৫ ... ৬১
৪০. বাদলধারা হল সারা ... ১৫ ... ৬১
৪১. পুব-সাগরের পার হতে ... ১৫ ... ৬১
৪২. না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো ... ৬ ... ৬১
৪৩. যদি তারে নাই চিনি গো ... ৬ ... ৬১
৪৪. তোমায় গান শোনাব ... ৩০ ... ৬১
৪৫. আমার ভুবন তো আজ হল কাঙাল ... ১ ... ৬২
৪৬. আঁধার রাতে একলা পাগল ... ১ ... ৬২
৪৭. ও আমার ধ্যানেরই ধন ... ২ ... ৬২
৪৮. আজি সাঁঝের যমুনায় গো ... ৩ ... ৬২
৪৯. যখন এসেছিলে অন্ধকারে ... ৩০ ... ৬২
৫০. যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় ... ৩০ ... ৬২
৫১. ছায়া ঘনাইছে বনে বনে ... ৩০ ... ৬২
৫২. পুব-হাওয়াতে দেয় দোলা ... ৩০ ... ৬২
৫৩. ভেবেছিলেম আসবে ফিরে ... ৩১ ... ৬২
৫৪. ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার ... ১ ... ৬৩

আর-একটি গান আছে 'চরণধ্বনি শুনি তব নাথ'। 'ব্রহ্মসংগীত-স্বরলিপি ৫' (বৈশাখ ১৩১৬)-এ উল্লেখ ছিল এর রাগ সিন্ধু-কাফি, কিন্তু 'স্বরবিতান' (২৫)-এ গানটির রাগ উল্লেখ আছে সিন্ধু, তাই গানটিকে বর্তমান তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'চিরকুমার-সভা'তে একটি গান আছে 'নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ' (স্বরবিতান ৩৩ দ্রষ্টব্য), রচনাকালে কবির বয়স ছিল ৩৯। যদিও গানটির রাগ-তালের উল্লেখ নেই, তবু গানটিকে বর্তমান তালিকার অন্তর্ভুক্ত ধরে নেওয়াই সমীচীন মনে হয়। সেই হিসেবে তালিকাভুক্ত গানের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৬। তালিকাটি প্রমাদশূন্য এমন দাবি লেখকের নেই। ভ্রান্তি আসতে পারে দু দিক থেকে : ১. এমন গান এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল না, এবং ২. এমন গান বাদ গেছে যা অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। লেখক সমগ্র তালিকাটিকে একটি প্রাথমিক খসড়া হিসেবে ধরে নিচ্ছেন, অবশ্যই তা সংশোধনযোগ্য। যোগ্যতর ব্যক্তির হাত দিয়ে কাজটি সম্পন্ন হলে তালিকা নিশ্চয়ই আরো ত্রুটিশূন্য হত। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সংশোধন সর্বতোভাবে কাম্য। আপাতত সংখ্যাটিকে যদি সঠিক ধরে নিই এবং রবীন্দ্রনাথের গানের মোট সংখ্যা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হিসেব অনুসারে যদি ধরে নিই ২২৩২, তা হলে বর্তমান গণনানুযায়ী কাফিরাগাশ্রিত গান হল মোট গানের শতকরা ৪.৩ ভাগ। এটি মোটেই নগণ্য নয়।

পরবর্তী আলোচনায় যাবার আগে রবীন্দ্রসংগীতের, বিশেষত তাঁর উত্তরজীবনের (বিশেষ করে 'গীতাঞ্জলি' ও তৎপরবর্তী কালের), গানগুলির সাধারণ কাঠামোটিকে একটু পর্যালোচনা করে নেওয়া উচিত। দুঃখের বিষয়, এখানে লেখককে তাঁর অন্যত্র আলোচিত কয়েকটি প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখ করতে হচ্ছে, অন্যথা বর্তমান প্রবন্ধটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যাবে না। রবীন্দ্রজীবনের গোড়ার দিকেই তৈরি হয়ে উঠেছিল একটি ধ্রুপদী সংস্কার, এ-কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন। এখান থেকে তিনি যে শুধু রাগ-তালের ঐশ্বর্যই অর্জন করেছিলেন তা নয়। তাঁর উত্তরপর্বের গানে একদিকে গড়ে উঠেছিল লোকসংগীত-সুলভ সারল্য ও খোলামেলা মেজাজ, অন্য দিকে মিশেছিল ধ্রুপদ গানের যেটা চরম শিক্ষা— তার বিপুলতা ও গভীরতা, সঙ্গে সঙ্গে তার 'আত্মদমন', সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা'— যা 'দুর্বল রসমুগ্ধতা থেকে আমাদের পরিত্রাণ' করে। তাঁর অধিকাংশ গানেই তৈরি হয়ে উঠেছিল একটি চার-তুকে বিভক্ত ধ্রুপদী ছক, যাকে আবার মোটের ওপর দুই সমান অংশে ভাগ করেও দেখানো যায় : প্রথম অংশে আস্থায়ী-অন্তরা, দ্বিতীয় অংশে সঞ্চারী-আভোগ। এতে একটা

চমৎকার কাঠামোগত ভারসাম্যও ধরা পড়ে। রবীন্দ্রসংগীতে এটাই প্রধান আদল বা 'মডেল'। রবীন্দ্রনাথের আগে বা পরে অন্য কেউ এ 'মডেল ব্যবহার করেন নি তা নয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে এটা ক্রমশ একটা প্রধান রীতিতে পরিণত হওয়ার পরেই পরবর্তীরা সাধারণত তাকে অনুসরণ করেছেন— পূর্বসুরীদের মধ্যে এই রীতি অনেকটা কম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও পূর্বজীবনে ধ্রুপদের সঙ্গে সংযোগ যখন আরো প্রত্যক্ষ ছিল তখন বরং এই 'মডেল' সর্বত্র অনুসৃত হয় নি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে, ধ্রুপদের প্রভাব যখন অনেক কম প্রত্যক্ষ, তখনই এই 'মডেল' আরো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। কাজেই এটাকে বলতে পারি তাঁর ধ্রুপদী শিক্ষার অপ্রত্যক্ষ কিন্তু দীর্ঘ-মেয়াদি ফল।

এখন, এই চারটি তুককে (স্তবককে) ধ্রুপদী সংগীতে কীভাবে ব্যবহার করা হয় দেখা যাক। আমরা এখানে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'গীতসূত্রসার'কেই প্রধানত অনুসরণ করছি। আস্থায়ীই সুরের (রাগের) আরম্ভ, স্থিতি ও পুনরাবৃত্তির স্থান। এখানেই সুরের মূল রূপ, মেজাজ ও চালটা তৈরি হয়ে যায়। এইজন্যেই সাধারণত মধ্য-সপ্তকেই তার কাজ— কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক গতি সেইখানেই প্রকটিত। এর পর অন্তরায় সুর মধ্য-সপ্তকের মাঝামাঝি জায়গা থেকে শুরু হয়ে তার-সপ্তকের সা পর্যন্ত আরোহণ করে। হয়তো সেখানে কিছুটা বিশ্রামও করে, তার পর সুর-বিশেষে আরো উপরে উঠে ক্রমশ নেমে আসে, শেষ পর্যন্ত মধ্য-সপ্তকে এসে আস্থায়ীর সুরের সঙ্গে মিশে যায়। সঞ্চারীতে সুর আবার মধ্য-সপ্তকে শুরু হয়, মন্দ্র (খাদ বা উদারা)-সপ্তকের দিকে অবরোহণ করে, তার পর কিছুটা আরোহণ ক'রে মধ্য-সপ্তকে শেষ হয়। আভোগ অনেকটা অন্তরার মতো, এখানে সুর আরোহণ-গতি নিয়ে কিছুদূর বিচরণ করার পর অবরোহণ-গতি নিয়ে মধ্য-সপ্তকে শেষ হয় এবং আবার আস্থায়ীর সঙ্গে মিশে যায়। এটা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। ব্যতিক্রম থাকতেই পারে। মোটের ওপর তিনটে জিনিস এখানে স্পষ্ট। প্রথমত, সুরের সর্বপ্রধান অংশ আস্থায়ী। দ্বিতীয়ত, আভোগ সহজেই অন্তরার পুনরাবৃত্তি হয়ে উঠতে পারে, কেন-না উভয়েরই গতি তার-সপ্তকের দিকে। তৃতীয়ত, একমাত্র সঞ্চারীরই গতি মন্দ্র-সপ্তকের দিকে অর্থাৎ খাদের দিকে এবং এইজন্যেই তার পুনরাবৃত্তি নেই। এইখানেই তার বৈশিষ্ট্য। আস্থায়ীর বৈশিষ্ট্য তার পুনরাবৃত্তির সুযোগে, সঞ্চারীর বৈশিষ্ট্য তার পুনরাবৃত্তির অভাবে। উভয়ের মধ্যেই প্রস্তুতি চলতে থাকে পরবর্তী আরোহণ-গতির। স্পষ্টত, আস্থায়ীর স্থান প্রধান হলেও সঞ্চারী হল দ্বিতীয় প্রধান স্থান। ধ্রুপদী সংগঠন ছাড়া সঞ্চারীর কোনো অস্তিত্বই নেই, গুরুত্ব পাওয়া তো দূরের কথা। ধ্রুপদী আঙ্গিক অনুসরণ করাতেই সঞ্চারীতে নতুন বিস্ময়-সৃষ্টির সুযোগ এসে গেল এবং রবীন্দ্রনাথও তার পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করে নিলেন— কখনো প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসরণ করে, কখনো তাকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, 'রবীন্দ্রনাথের "সঞ্চারী" এক অতুলনীয় সৃষ্টি।' (রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'বাংলার গীতিকার' ১৩৬৩, পৃ. ৫২)।

সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতে অন্ত্যমিলের পরিকল্পনাটিও লক্ষণীয়। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক একটি গান : 'গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে'। প্রথম তুকে মিল হচ্ছে 'টুটে', 'উঠে'। এর সঙ্গে মিল হচ্ছে দ্বিতীয় তুকের শেষে 'লুটে' এবং চতুর্থ তুকের শেষে 'ছুটে'। কিন্তু তৃতীয় তুকের সঙ্গে এর মিল নেই, যদিও সেখানে একটা আলাদা অভ্যন্তরীণ মিল আছে : 'প্রাণে', 'তানে'। এই পরিকল্পনা যে আকস্মিক নয় তার প্রমাণ 'গীতবিতান'-এর পাতায় পাতায়; সম্ভবত অধিকাংশ গানে, ঐ একই পরিকল্পনা। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'র যে-সব কবিতায় সুর নেই সেখানেও প্রায়শ ঐ একই পরিকল্পনা কাজ করেছে। কিন্তু এগুলির বাইরে এ-রকম মিলের ব্যবস্থা রবীন্দ্রকাব্যে আর বিশেষ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবশ্য, আমাদের দৃষ্টান্তটিতে আর-একটু বিশেষ মিলেরও ব্যবস্থা আছে : অন্তরায় 'চিত্তমাঝে' ও 'যেথায় বাজে', আর আভোগে 'বিষম বাধা' ও 'সেই তো ধাঁধা'; কিন্তু এটি সাধারণ নিয়মের বাইরে অতিরিক্ত মিল; সাধারণ নিয়মটি হল : প্রথম ও দ্বিতীয় তুকে মিল, এবং তৃতীয়কে বাদ দিয়ে, আবার চতুর্থ তুকের সঙ্গে মিল। কেন এমনটা ঘটছে? এর সম্ভবপর কারণ একটিই : কবিতাটি ধ্রুপদের প্রচলিত গায়ন-পদ্ধতি অনুসরণ করছে। সেই পদ্ধতিটি কী? আবার কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণ নেওয়া যাক। তিনি বলছেন, 'চারি কলি গাওয়ার নিয়ম এই : আস্থায়ী বার বার গাইতে হয়; তৎপরে অন্তরা গাইয়া আবার আস্থায়ী গাইতে হয়; তৎপরে আস্থায়ী সমাপ্ত করিতে হয়; সঞ্চারী গাওয়ার পর আস্থায়ী গাওয়ার রীতি নাই; সঞ্চারীর পরই আভোগ গাইতে হয়' ('গীতসূত্রসার', চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮২, পৃ. ৯৫)। অর্থাৎ প্রথমে আস্থায়ী, তার পর অন্তরা, অন্তরার পর আবার আস্থায়ী, আস্থায়ীর পর সঞ্চারী, সঞ্চারীর পর আর আস্থায়ী নয়, একেবারে আভোগ, আভোগের পর আবার আস্থায়ীতে প্রত্যাবর্তন ও সমাপ্তি। সঞ্চারী গাওয়ার পর আস্থায়ী গাওয়ার রীতি নেই, তাই কথার মিল রাখার প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু অন্তরা ও আভোগ গাওয়ার পর আস্থায়ী গাওয়া রীতি, তাই প্রত্যেকটি জায়গায় অন্ত্যমিলের ব্যবস্থা। কাজেই মিলের সাধারণ পরিকল্পনা হুবহু গাওয়ার রীতিকেই অনুসরণ করছে, অথবা বলা যায়, তার দিক নির্দেশ করছে। এই কারণেও এটি গানের কবিতা, নিছক কবিতা নয়।

আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রসংগীতে গানের কাঠামোটা ধ্রুপদী। কিন্তু শুধু কাঠামোটাই ধ্রুপদী, তার রাগরূপও নয়, মেজাজও নয়, যদিও রাগবিশেষের স্বর-সন্নিবেশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষাও করা হয় নি। আমরা এখানে বিশ্লেষণের জন্য রবীন্দ্রজীবনের উত্তরপর্বের পাঁচটি গান বেছে নিচ্ছি যাদের স্বর-সন্নিবেশ মোটামুটি কাফি রাগের অথবা তার সমীপবর্তী, কিন্তু মেজাজে তারা প্রত্যেকে এক-একটি স্বতন্ত্র সত্তা। ধূর্জটিপ্রসাদ সুন্দর একটি ইঙ্গিত রেখে গেছেন ('মনে এলো' ১৭.১.৫৬) : 'রবীন্দ্র-সংগীতের প্রাণ কথার মাধুর্য নয়, কথা ও সুরের সংগতিও ততটা নয়, যতটা গানটির ডিজাইন।... রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি গান এক-একটি "ডিজাইন", সেইটিই কাঠামো, সেইটিই এক্সপ্রেশন।' রবীন্দ্রনাথ একেই বোধ হয় বলতেন 'রূপ'।

এই 'রূপ' বা 'ডিজাইন'টিকে বিশদ আলোচনায় ধরা যাবে কিনা জোর করে বলা যায় না। তবে চেষ্টা করায় দোষ নেই। শুধু অনুরোধ, আলোচনাটিকে অনুসরণ করার আগে প্রত্যেকটি গান ভালো করে পড়ে নিলে এবং কোনো ভালো গায়ক বা গায়িকা মুখে শুনে নিলে ভালো হয়। স্বরলিপিটির ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে পারলে আরো ভালো।

আমাদের প্রথম গান সুপরিচিত 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে'। এর চারটি তুক নিম্নরূপ :

১.	আস্থায়ী	:	'তুমি ডাক দিয়েছ...	কেউ তা মানে না॥'
২.	অন্তরা	:	'ফিরি আমি উদাস...	কেউ তো টানে না॥'
৩.	সঞ্চারী	:	'বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর...	কেউ তো হানে না।'
৪.	আভোগ	:	'আকাশে কার...	কেউ তো আনে না॥'

এটি 'অচলায়তন' নাটকের গান। নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে, ১৯১১ খৃস্টাব্দে, কবির বয়স তখন ৫০। স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ('স্বরবিতান-৫২' দ্রষ্টব্য)। নাটকের শুরুতে পঞ্চকের মুখে এটি গীত। 'অচলায়তন' ভেঙে বেরিয়ে আসার ডাক পৌঁচেছে পঞ্চকের কাছে, তাকে এক অনির্দেশ্য বেদনায় চঞ্চল করে তুলেছে; গানটি একদিক থেকে যেন নাটকের 'থিম মিউজিক'। এই গানটি সম্পর্কে প্রথমেই যেটা মনে আসে তা হল এর অত্যাশ্চর্য সারল্য। বোধ হয় সরল বলেই এমন অন্তরঙ্গ অথচ তীব্র। কিন্তু এই সারল্য বড়ো প্রবঞ্চক, তা অসামান্য কলাকৌশলকে ঢেকে রেখে দেয়। লক্ষ করতে হবে যে গানটির মধ্যে একটা অদ্ভুত অনির্দিষ্টতা আছে। আরম্ভেই যাকে 'তুমি' বলা হল সে বেশ অনির্দিষ্ট— পঞ্চকের কাছে, দর্শক-শ্রোতাদের কাছেও— তবু সে বড়ো অন্তরঙ্গ। তার পর আছে 'কোন্ সকালে', 'কার ব্যাকুলতা', 'কার বারতা'— এবং 'কেউ তা জানে না' ইত্যাদি। এই 'কেউ' কথাটি একটা ছোটো গানের মধ্যে এসেছে পাঁচ বার— আস্থায়ীতে দুবার এবং অন্তরা সঞ্চারী আভোগ একবার করে— যেমন 'কেউ তা জানে না', 'কেউ তা মানে না', 'কেউ তো টানে না', 'কেউ তো হানে না', 'কেউ তো আনে না' আর শুধু 'কেউ' এই কথাটিই নয়, অথবা শুধু অন্ত্যমিলের ব্যাপারও নয়, গোটা শব্দসমষ্টির ধ্বনি-সামঞ্জস্যও লক্ষণীয়। এখানেই হয়তো রয়েছে গানটির 'প্রাণকেন্দ্র', 'যার ওপর সমস্ত মাধুর্য নির্ভর করে' (শৈলজারঞ্জন মজুমদার)। রবীন্দ্রনাথের গানে সাধারণত প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবকে মিল থাকে, তৃতীয় স্তবকে থাকে না। কিন্তু এখানে যে ব্যতিক্রম ঘটানো হল তা এসেছে ঐ ধ্বনিসামঞ্জস্যের টানে। কেনেথ বার্ক * তাঁর psychology of form-এর ধারণার মধ্যে যে দুটি কথার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন তা হল repetition আর eloquence। তিনি বলেছেন যে অন্য আর্ট ফর্মের তুলনায় সংগীতে পুনরাবৃত্তির সুযোগ সবচেয়ে

* Kenneth Burke, *Psychology and Form in Literary Opinion in America*, Vol. II, New York, 1962, pp. 667-76.

বেশি এবং এই দুটি গুণই psychology of form-কে psychology of information থেকে আলাদা করে তোলে। Psychology of information থেকে সংগীতের দূরত্ব সবচেয়ে বেশি। রবীন্দ্রসংগীতেও তা-ই।

কিন্তু কথার পুনরাবৃত্তি মানেই সুরের পুনরাবৃত্তি নয়। অন্তরা ও আভোগ অংশে (দ্বিতীয় ও চতুর্থ তুকে) অবশ্য সুর একই রকম : 'কেউ তো' = পা -ধা -পা। কিন্তু প্রথম লাইনে আছে 'কেউ তা' সা র্সা র্সা— মধ্য-সপ্তকের সা থেকে তার-সপ্তকের সা। প্রথমেই তীব্র আর্তধ্বনি, তার পর দ্বিতীয় লাইনে গভীর হতাশা : 'কেউ তা মানে না' = রা -মা জ্ঞরা। সা -ন্া ন্া। সা -া -া। সা -া -া। সঞ্চারীতে আছে 'কেউ তো' = রা -পা মা। যেন বিভিন্ন স্থানে আবেগের তথা উচ্চারণের ওঠানামার সঙ্গে মিল রেখেই এই স্বর-সন্নিবেশ। অবশ্য একটা কথা এখানে মনে রাখা উচিত : একটি সুর একবার চলতে আরম্ভ করলে সে তার নিজস্ব নিয়মেই চলে, কথার অনুবাদমাত্র সে নয়। যান্ত্রিক সমান্তরাল টানার অভ্যাস সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তবু কথা ও সুরের এই সামঞ্জস্য গানের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করে যেটা কথা ও সুরের অতিরিক্ত। কেন-না কথা চলেছে কথার নিয়মে, সুর চলেছে সুরের নিয়মে, তবু তাদের গতি একই দিকে।

গানের শুরুতে আছে 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে।' এখানে স্বরসমাবেশ পুরোপুরি কাফি রাগের। কাফি রাগ শাস্ত্রমতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে গেয়। কিন্তু এখানে দেখছি 'কোন্ সকালে'। ব্যাপারটি নিশ্চয়ই শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তবু পর্দাগুলো কাফির। আবার যেই এসে গেল 'কেউ তা জানে না' অমনি কাফি রাগের সমস্ত পুরোনো সংস্কার ভেঙে পড়ল একটি ছোটো চকিত 'মুভমেন্টে'— সা থেকে র্সা। 'আমার মন যে কাঁদে'— জাতীয় পদসমষ্টি পুরোনো বাংলা টপ্পা গানে সহজলভ্য, কিন্তু 'মন যে কাঁদে আপন মনে' বাঙালি হয়েও রাবীন্দ্রিক। তুলনীয় 'আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী' অথবা 'কত যে তুমি মনোহর মনই তাহা জানে'। এইভাবে একটা রাবীন্দ্রিক সংস্কার গড়ে উঠেছে। সুরের দিক থেকেও লক্ষণীয় এখানে শুদ্ধ গান্ধারের ব্যবহার। এটিকে আর 'নিয়মিত স্বর নয়' বলে ছেড়ে দেওয়া যাবে না, বরং এ-ও আর-এক রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য, এবং অন্য গানগুলিতেও এই শুদ্ধ গান্ধারের ব্যাপক ও মোক্ষম প্রয়োগ আমরা বার বার লক্ষ করব যেখানে মেজাজটা মোটেই প্রথাসিদ্ধ নয়। সঞ্চারীতে যা 'বেজে ওঠে' সেটা কোমল গান্ধার, কিন্তু 'কেঁপে ওঠে' শুদ্ধ গান্ধারে, আবার পরের লাইনে এসে হতাশার ক্লেশ ফুটে ওঠে কোমল গান্ধারেই। অন্তরা ও আভোগের আরোহ-গতিতে তেমনি শুদ্ধ নিষাদই প্রাধান্য পেয়েছে, অন্যত্র সাধারণত কোমল নিষাদ। 'উদাস প্রাণে' বা 'ব্যাকুলতা'য় শুদ্ধ নিষাদ ছাড়া আর-কিছু ভাবাই যায় না, কেন-না তাতে প্রাণ উদাসও হত না, আকাশে ব্যাকুলতাও জাগত না।

কিছু কিছু অভ্যন্তরীণ অলংকরণও বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যদিও তারা একান্তই বাহুল্যবর্জিত, এবং সেটাই এখানে 'প্যাটার্ন'। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক 'তুমি' কথাটির

ব্যবহার। সহজ ত্রিমাত্রিক তালের (৩+৩=৬ মাত্রা অর্থাৎ দাদরা তাল) এই গানে প্রথম 'তুমি' কথাটি আছে মাত্রা-গণনার বাইরে এবং স্বরের দিক থেকেও কেবল সা সা। কিন্তু প্রথম লাইন শেষ করার পর সেটি হয়ে গেল ধা পা— অনেকটা পূর্ববর্তী কোমল নিষাদের টানে। কিন্তু অন্তরা বা আভোগের শেষে যে 'তুমি' সে এতক্ষণের সুর-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের, তার মানে শুধু পঞ্চকের নয়, দর্শক-শ্রোতাদের, আরো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে, তাই তার রূপ হল জ্ঞরা সন্া। 'জানে না', 'মানে না', 'টানে না', 'আনে না', অংশে প্রথম আ-কারটির ব্যবহার যেমন উচ্চারণ-সম্মত তেমনি সুরতাল-সম্মতও বটে, অথচ কত সহজ। আর সঞ্চারী অংশের রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে বিশেষ করে 'হানে না' এই দুটি কথার ওপর সুরের বিশিষ্ট অলংকরণে : রজ্ঞা -রমা জ্ঞরা। সা -া -া। গোটা সঞ্চারীর গতিই প্রত্যাশানুযায়ী নিচু পর্দায় রাখা হয়েছে, যেন কান পেতে 'পঞ্চম' স্বরটি শুনতে চাইছি, তাই স্বরের বিস্তার মাত্র মন্দ্র-সপ্তকের নিষাদ থেকে মধ্য-সপ্তকের পঞ্চম পর্যন্ত, কেন-না এর পরেই জেগে উঠবে 'আকাশে কার ব্যাকুলতা'। সেখানেও থাকে 'গোপন' কথাটি শোনার প্রতীক্ষা, তাই 'গোপন' হয়ে ওঠে পা পধা -ণর্সা। -া, যার সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় অন্তরার 'এমন' কথাটি। কাফি রাগের শাস্ত্রসম্মত পর্দাগুলি থেকে সুর কোথাও বিচ্যুত হয় নি, কিন্তু এ কোন্ কাফি?

দ্বিতীয় গানটি হল 'আজি সাঁঝের যমুনায় গো'। গানটি হয়তো খুব সুপরিচিত নয়, কিন্তু এক কথায় অসামান্য এবং এর গঠনবৈশিষ্ট্যও সম্পূর্ণ আলাদা। এর রচনাকাল আশ্বিন ১৩৩০ অর্থাৎ ১৯২৩ খৃস্টাব্দ, কবির বয়স তখন ৬২। স্বরলিপিকার পুনশ্চ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ('স্বরবিতান-৩' দ্রষ্টব্য) 'গীতবিতানে' এটি 'প্রেম পর্যায়ের গান'। এর চারটি তুক নিম্নরূপ :

১.	আস্থায়ী	:	'আজি সাঁঝের	...	ভেসে যায় গো॥'
২.	অন্তরা	:	'তারি সুদূর	...	করুণায় গো॥'
৩.	সঞ্চারী	:	'আজ মনে মোর	...	দিন যায় কি।'
৪.	আভোগ	:	'যায় যাবে, সে	...	বেদনায় গো॥'

এই সাজানোর পরিকল্পনাটি বড়ো অদ্ভুত। প্রথম স্তবকে আছে কিরণতরীর ভেসে চলা। দ্বিতীয় স্তবকে সেই ভেসে-চলার সারিগান বেয়ে দুটি উতল আঁখির বিদায়স্মৃতি। তৃতীয় স্তবকে আছে স্মৃতির গহন থেকে জেগে-ওঠা সুরে একলা-প্রাণের কথা। আর চতুর্থ স্তবকে আছে সেই সুরের বেদনাকে কেউ লুকিয়ে তুলে নিয়ে আপন বেদনার মধ্যে গ্রহণ করল কিনা তাই নিয়ে কিছু সংশয়-জড়িত প্রত্যাশা। অথচ আয়তন কত সংক্ষিপ্ত, শব্দব্যবহার কত পরিমিত— সুর যেন সর্বদাই কথার সীমা পেরিয়ে যেতে চায়, আবার ফিরে ফিরে আসে— হয়তো 'যায় যাবে, সে ফিরে ফিরে' শব্দগুচ্ছকে সম্মান দেখাবার জন্যেই। এই রহস্যময়তার যেন শেষ নেই। কী নেই এই ছোটো গানটিতে? আছে

তরী ভেসে যাওয়ার ছবি, আছে স্মৃতির জাগরণ, দুটি চোখের করুণা, মনের মধ্যে সুর জেগে ওঠা, প্রাণের কথা, তার বেদনা। সব-কিছুই আছে, নেই শুধু তার স্পষ্ট কোনো অর্থ। কেন-না তরীটি এখানে 'কিরণতরী', স্মৃতি এখানে 'বিদায়স্মৃতি', দুটি চোখ 'উতল' আবার করুণায় 'উছল', সুরটিও কেউ শুনেছে কিনা সংশয় আছে, প্রাণের কথাটি একান্তই 'একলা প্রাণের কথা', আর বেদনাও 'পরম বেদনা'। তার ওপর আবার 'কোথায় ভেসে যায় গো', 'কেউ তা শোনে নাই কি', 'একলা এ দিন যায় কি', 'লুকিয়ে তুলে নেয় নি কি রে', জাতীয় সংশয়িত প্রশ্ন, যার উত্তর 'হ্যাঁ'-ও হতে পারে, 'না'-ও হতে পারে। এরকম 'অর্থহীনতা কবির অন্য গানেও আছে, যেমন 'কারণ শুধায়ো না, অর্থ নাহি তার'— সেখানেও পাব শুধু পুঞ্জীভূত বেদনার সুর-সংকেত ('আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে' গানটি স্মর্তব্য)। এ-রকম সুরময় ভাষা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো গানে আছে বলে জানি না। কোনো কোনো সমালোচক একে বলেছেন 'সন্ধ্যা-ভাষা'; কিন্তু এ-ভাষা কেবল গানের জন্যেই তৈরি, সাধারণ কবিতার ভাষা এটি নয়। 'গো' শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার এক ঘনিষ্ঠ সম্ভাষণকেই সূচিত করে, সে সম্ভাষণ হয়তো নিজেকেই। একদিকে এই ঘনিষ্ঠতা, অন্যদিকে ভেসে-যাওয়া দিনের দূরাগত স্মৃতি— মাঝখানে যে বিচ্ছেদের বেদনা তা-ই গানটিকে মেদুর করে তুলেছে।

আরো কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'স্মৃতি' এই একটিমাত্র সুপরিচিত শব্দ ছাড়া আর কোথাও যুক্তব্যঞ্জনের কোনো ব্যবহার নেই। কিন্তু কেন? এ কি কিরণতরীর ভেসে চলাকে বাধাহীন করার জন্যেই?— হয়তো তাই, কেন-না 'কোথায় ভেসে যায় গো' এটাই বোধ হয় এ-গানের প্রাণকেন্দ্র— গানের প্রত্যেকটি স্তবকেই এই ভেসে যাওয়ার অনুষঙ্গটি রয়ে গেছে— প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে। এর পর স্বরলিপির ওপর একটু নজর বুলিয়ে নিলেই ধরা পড়বে, সারা গানটির অবয়বে অনেকগুলি (সংখ্যায় ২৫টি) জায়গায় ছোটো-বড়ো মীড়ের কাজ নির্দেশিত হয়েছে— সবই সুরকে প্রবহমান অথচ আন্দোলিত রাখার উদ্দেশ্যে, যদিও উদ্দেশ্যটা কখনোই স্পষ্ট নয়। তবে ছোটো ছোটো মীড়গুলি ঠিক তরঙ্গ নয়— ripples মাত্র। সমস্ত আয়োজন কত সহজ, স্বাভাবিক, অনায়াস— এবং সমগ্রের সঙ্গে একান্তভাবে লিপ্ত। ফলে গানের গোটা কাঠামোটিকেই এমন যত্নে ও সন্তর্পণে গড়ে তোলা হয়েছে যে মনে হবে সামান্য একটু বাড়তি বোঝাতেই সমগ্র আয়তনটি ভেঙে পড়বে। এইখানেই শ্রেষ্ঠ 'কম্পোজার'-এর রূপদক্ষতা— সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা। দ্বিতীয়ত, 'সারি গান' শব্দটিও বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। যদিও 'কিরণতরী'র সূত্র ধরেই কথাটি এসেছে তবু পুরো শব্দগুচ্ছটি হল : 'তারি সুদূর সারি গানে'— এখানে তিনটি 'র'-এর বিশিষ্ট প্রয়োগ সুদূরের আবহই রচনা করে, এবং নিছক অর্থ নয়, ধ্বনি-ব্যঞ্জনাই এখানে প্রধান বিবেচ্য। এই 'সারি গানে'র অনুরূপ প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের অন্য গানেও আছে, যেমন 'তাই তোমারি সারি গানে / সেই আঁখি তার মনে আনে' ('ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের' গানটি স্মরণীয়), সেখানেও আছে 'রি'-ধ্বনির দ্বিত্ব।

কাজেই এগুলি একান্তই বিশিষ্ট রাবীন্দ্রিক প্রয়োগ, যা নতুন সাংগীতিক অনুষঙ্গ রচনা করে। তা ছাড়া এই 'সুদূরে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এক বিশেষ সাংগীতিক তত্ত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটি এই যে, 'গানেতে মনের মধ্যে এনে দেয় একটা দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণী। বিষয়টা যত কাছেরই হোক সুরে হয় তার রথযাত্রা'। ('সংগীতচিন্তা', পৃ. ২০২)।

এর পর চারটি তুকের সুরবিন্যাস একটু আলাদাভাবে লক্ষ করা যাক। প্রথম তুকের (আস্থায়ীর) আরম্ভ : 'আজি সাঁঝের যমুনায় গো'— এর স্বর-সমাবেশ কাফির পর্দাগুলিকেই আশ্রয় করে আছে, যদিও 'যমুনায়' কথাটির শেষাংশে মীড়যুক্ত সা -জ্ঞা -া -রা এবং 'গো'-এর ওপর সা -া রা ন্‌া ভারি একটা অন্তরঙ্গতার ভাবও সৃষ্টি করে। 'তরুণ চাঁদের' অংশে শুদ্ধ নিষাদ এবং 'কিরণতরী' অংশে কোমল নিষাদ সুরের চমৎকার একটা ওঠা-নামা দেখায়। এর পর পঞ্চম পর্দাটির শেষে 'কোথায়' কথাটির ওপর শুদ্ধ গান্ধারের প্রয়োগ সহজেই হয়ে ওঠে অব্যর্থ। তার পর 'যায় গো' অংশে একটু দীর্ঘমীড়যুক্ত ধপা -গা -ণা -ধা। পমজ্ঞা -া -া -রা যেন ভেসে যাওয়াটাকেই প্রত্যক্ষগোচর করে তুলছে। এখানে সংগীতের চিত্রগুণও বিশেষভাবে লক্ষণীয়— সেটা শুধু ভাষার কারণে নয়, সঙ্গে আছে 'যায়' শব্দের অন্তর্গত আ-কারের দীর্ঘায়িত উচ্চারণ।

অন্তরা শুরু হয়েছে তার-সপ্তকের সা থেকে। তার পর কোমল গান্ধারে দীর্ঘকালীন স্থিতি, শুধু মাঝখানে একবার ঋষভকে স্পর্শ করে যাওয়া— এইভাবে 'সুদূরের' ইঙ্গিতটি আভাসিত হয়েছে। কিন্তু সুরের দিক থেকে সবচেয়ে বড়ো চমক দেখা দিয়েছে 'বিদায়স্মৃতি জাগায় প্রাণে' অংশে। এখানে ঋষভ স্বরটি কোমল এবং এই কোমল ঋষভ ঐ সামান্য কয়েকটি কথার ওপর পুরো চার বার ব্যবহার করা হয়েছে আশ্চর্য কৌশলে, অথচ কাফি রাগের কোনো শাস্ত্রগত অনুশাসনেই তার অনুমোদন নেই। এইজন্যে মনে হয় গানটি কাফি রাগাশ্রিত না বলাই হয়তো উচিত ছিল। কাফি রাগকে রক্ষা করতে হলে এখানে সুরভ্রষ্ট হতে হয়, তাই স্রষ্টা তাঁর নিজের পথেই চলেছেন, তবু এই বিশিষ্ট musical phrase-টি সমগ্র অবয়বের সঙ্গে কেমন বেমালুম মিশে গেছে। এইখানেই সুরকারের আসল প্রতিভার স্পর্শ— তাঁর 'বিদ্রোহী' সত্তার যথার্থ পরিচয়। পরের গোটা পঙ্‌ক্তিটিতেও সুরের কাজ অসামান্য, বিশেষ করে 'উতল আঁখি' অংশে। কিন্তু আরো লক্ষণীয় যে এই গোটা পঙ্‌ক্তিটিকেও সুরে দেখানো হয়েছে দুবার, এবং দুবার দুরকমভাবে— হয়তো এই কারণে যে এই উতল আঁখির স্মৃতিই সঞ্চারীতে এসে নতুন সুরের ও নতুন কথার জন্ম দেবে। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় 'আঁখি'তে এসে হঠাৎ একটা তীব্র মধ্যমও প্রয়োগ করা হয়েছে আশ্চর্যজনকভাবে, হয়তো 'আঁখি'কে আরো 'উতল' করে তোলার জন্যেই। 'আঁখি'তে ব্যবহৃত পঞ্চমের পর 'উছল করুণায়' অংশে সা-তে ফিরে আসায় অদ্ভুত এক করুণার সঞ্চার হয়েছে। রূপে ও রূপকৌশলে এই স্তবকটি সত্যি সত্যিই অতুলনীয়।

এর পর সঞ্চারী। সঞ্চারীতে রবীন্দ্রনাথ শুধু অপরকে নয়, নিজেকেও বার বার অতিক্রম করে গেছেন। তার মানে, এখানে কোনো কিছুই যেন প্রতিষ্ঠিত নয়, প্রায়

সবটাই স্রষ্টার, এবং তাঁর গান-বিশেষের, নিজস্ব। সঞ্চারীটি আরম্ভ হয়েছে মধ্য-সপ্তকের পঞ্চম থেকে, চড়েছে তার-সপ্তকের ঋষভ পর্যন্ত। তার পর 'শোনে নাই কি' অংশে পঞ্চম, মধ্যম ও কোমল গান্ধারের ব্যবহার একটু মল্লার রাগের আভাস এনে দেয় এবং এটিও একটি চমৎকার কিন্তু বিশিষ্ট রাবীন্দ্রিক প্রয়োগ, যা বহু গানে বার বার ফিরে এসেছে। কিন্তু এই মল্লার কাফি ঠাটের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই অসামান্য সৌন্দর্য ও গভীরতা সত্ত্বেও হয়তো বিস্ময়ের তেমন কিছু নেই। 'একলা প্রাণের কথা নিয়ে' দুবার উচ্চারিত হয়েছে কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন সুরে, হয়তো এই কারণে যে এটা কবির 'প্রাণের কথা'। কিন্তু 'একলা এ দিন যায় কি' অংশে 'দিন' এবং 'যায় কি' বোধ হয় একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব। পা থেকে তার-সপ্তকের সা পর্যন্ত একটা দীর্ঘ মীড়, তার পর মধ্য-সপ্তকের ঋষভ ছুঁয়ে মজ্ঞা -রা সা -া —এর বৈচিত্র্য আর সৌন্দর্য ব্যাখ্যার অতীত। অথচ একাকিত্বের যে বেদনা এখানে প্রকাশ পেয়েছে তা একেবারে মর্মদেশ স্পর্শ করে।

আভোগ অংশ সুরের দিক থেকে অনেকটা অন্তরারই অনুরূপ এবং এখানেও সেই কোমল ঋষভের রাগ-বহির্ভূত কিন্তু অমোঘ প্রয়োগ, এবং আগের মতোই এক-আধবার নয়, চার-চার বার ('ফিরে ফিরে / লুকিয়ে তুলে নেয় নি কি রে' অংশে)। কিন্তু আরো আশ্চর্যের বিষয় হল 'নেয় নি কি রে'-র শেষাংশ; 'কি রে' = ণা দা পা -া। অপ্রত্যাশিত এই কোমল ধৈবতের চকিত কিন্তু অব্যর্থ প্রয়োগ সহজেই মনে করিয়ে দেয় ভাতখণ্ডেজীর পূর্বোল্লিখিত উক্তিটি, যে কাফিতে 'কখনো কখনো কোমল ধৈবত প্রয়োগ করেও নিপুণ গায়ক রাগ হানি হতে দেন না, কিন্তু এর প্রয়োগ গায়কের কুশলতার ওপর নির্ভর করে থাকে।' আমরা এখানে 'গায়ক' শব্দটির জায়গায় 'সুরকার' শব্দটি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারি। এর পর শেষের পঙ্‌ক্তিটি দুবার গাওয়ার ব্যবস্থা আছে, দুবার দুই ভিন্ন সুরে। কিন্তু দ্বিতীয় সুরটিতে এসে আর-এক বিচিত্র বিস্ময়। সেটি হল : 'পরম বেদনখানি।' এখানে 'বেদনখানি' = পা -া পা হ্মা। পা -হ্মা ধপা -া। পুনর্বার এই তীব্র মধ্যমটি উঠে এসেছে সৃষ্টির কোনো অজ্ঞাত রহস্যলোক থেকে, ব্যবহৃত হয়েছে দুবার— ঠিক যেমন আগে দেখা দিয়েছিল কোমল ঋষভের ব্যবহার। আমরা শুধু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি যে এই গানে শেষ পর্যন্ত তিন-তিনটি সপ্তক এবং শুদ্ধ-বিকৃত মিলিয়ে পুরো বারোটি স্বরই ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এ-ও স্বীকার করতে হয় যে কাফির মতো একটি অতি বিস্তৃত রাগের মূল আশ্রয় ছাড়া হয়তো এটা সম্ভব হত না, প্রতিভার স্পর্শ তো অবিসংবাদিত। সমগ্র 'মুড্'-টি বড়ো একান্ত, বড়ো স্পর্শকাতর, এবং বিশিষ্ট— তাই অবিস্মরণীয়।

তৃতীয় গানটি হল 'বিরস দিন, বিরল কাজ'। এটিও 'প্রেম' পর্যায়ের গান, কিন্তু 'সেন্টিমেন্ট' সম্পূর্ণ আলাদা। এটি হল প্রেমের সমারোহের গান, বিদ্রোহের গান, শুদ্ধ দ্বার ভাঙার গান— প্রেম এখানে অপরাজিত, সে সমস্ত মোহনিদ্রাকে ছিন্নভিন্ন করে

দেয়। এটির রচনাকাল বৈশাখ ১৩৩৩ (১৯২৬ খৃ), কবির বয়স যখন ৬৪— ভাবাই কঠিন এই বয়সে এই গান রচিত হচ্ছে। গানটি 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের 'বিজয়ী' কবিতার পরিবর্তিত রূপ। আমরা স্বাভাবিক কারণেই এখানে 'গীতবিতান'-এর রূপটি বিবেচনা করব, 'মহুয়া'র রূপটি নয়। স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ('স্বরবিতান-৫' দ্রষ্টব্য)। গানটির স্তবক-বিন্যাস নিম্নরূপ :

১.	আস্থায়ী	:	'বিরস দিন	...	মহা সমারোহে'॥
২.	অন্তরা	:	'একেলা রই	...	অপরাজিত ওহে'
৩.	সঞ্চারী	:	'কানন-' পর	...	ধূর্জটির জটা।'
৪.	আভোগ	:	'যেথা যে রয়	...	ঘনঘমের মোহে'

আমরা প্রতিটি তুকের স্বতন্ত্র বিশ্লেষণে যাবার আগে কয়েকটি সাধারণ ঝোঁকের দিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চাই। প্রথমত, গানটির প্রথম লাইনেই আছে 'প্রবল বিদ্রোহ', আর দ্বিতীয় লাইনে 'কী মহা সমারোহে'। কিন্তু 'বিদ্রোহ' মানে তো প্রচলিত সংস্কারকে না-মানা। সেই না-মানার সঙ্গে সংগতি রেখে তাল-প্রয়োগটাও হয়েছে প্রচলিত রীতির বাইরে— ৩। ২ ছন্দে। এই তাল একদিকে অসমমাত্রিক, অন্য দিকে প্রচলিত ঝাঁপতালের ২। ৩ ছন্দ থেকেও আলাদা। রবীন্দ্রসংগীতে অবশ্য এ-রকম তাল আরো কয়েকটি গানে ব্যবহৃত হয়েছে, তবু তালটি (ঝম্পক) যে খুব সুপ্রচলিত নয়, এটা স্বীকার করতেই হবে। দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহ হচ্ছে কোনো একটা কিছুর বিরুদ্ধে— যেমন এখানে বিরসতার বিরুদ্ধে, কর্মহীনতার বিরুদ্ধে, জড়তার বিরুদ্ধে, রুদ্ধদ্বারের নিষেধের বিরুদ্ধে। তাই গানের ফর্মেও আনা হয়েছে এক অদ্ভুত ধরনের বিরোধিতা, অথবা বৈপরীত্য— একদিকে শব্দ-প্রয়োগের 'ঘনঘটা' ও ব্যঞ্জনধ্বনির বাহুল্য, অন্য দিকে সুরের আপেক্ষিক সরলতা ও চলনগত স্থৈর্য— ঠিক যেন উপলখণ্ডের বাধার ওপর দিয়ে স্রোতের স্থির প্রবহমানতা— উভয়ের সংঘাতেই জেগে উঠছে নতুন সংগীত। তৃতীয়ত, প্রেমের 'মহা সমারোহ' দেখাবার জন্যেই হয়তো আনা হয়েছে মিলের পরিকল্পনায় আর-এক অসামান্য সমারোহ। রবীন্দ্রসংগীতের স্বাভাবিক যে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবকের অন্ত্যমিল সে তো এখানে আছেই, আছে তৃতীয় স্তবকের স্বতন্ত্র অন্ত্যমিলের ব্যবস্থাও, কিন্তু তা ছাড়াও রয়েছে আরো অনেকগুলি অভ্যন্তরীণ মিল, এবং সেটাও সম্পূর্ণ পরিকল্পনামাফিক। যেমন, প্রথম ও তৃতীয় স্তবকে আছে আরো দুটি করে শব্দগুচ্ছের মিল, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবকে আছে আরো তিনটি করে শব্দগুচ্ছের মিল। প্রথম স্তবকে 'বিরস দিন, বিরল কাজ' ও 'এসেছ প্রেম, এসেছ আজ'। তৃতীয় স্তবকে 'কানন-'পর ছায়া বুলায়' ও 'গঙ্গা যেন হেসে দুলায়'। তেমনি দ্বিতীয় স্তবকে 'একেলা রইল অলস মন', 'নীরব এই ভবনকোণ' ও 'ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ'। আর চতুর্থ স্তবকে 'যেথা যে রয় ছাড়িল পথ', 'ছুটালে ঐ বিজয়রথ' এবং 'আঁখি তোমার তড়িতবৎ'। সত্যিই এ এক রাজকীয়

সমারোহ, এবং ফলে কাঠামোগত ভারসাম্যটিও তৈরি হয়েছে রাজকীয়— যেন পাথর কুঁদে নির্মাণ করা, অথচ অকৃত্রিমতা কোথাও নেই। এই সযত্নরচিত কাঠামো আশ্রয় করে কাফি রাগের পর্দাগুলিকে অনেকটা সরলভাবেই সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে গানের মধ্যে। এবার আমরা প্রতিটি তুককে একটু স্বতন্ত্রভাবেই খুঁটিয়ে দেখতে পারি।

আস্থায়ীর প্রথমেই আছে 'বিরস দিন'। বিরস দিন বড়ো দীর্ঘ হয়, তাই 'দিন' কথাটির আরম্ভের কোমল নিষাদ সোজা টেনে রাখা হয়েছে ৭ মাত্রা ধরে। 'বিরল কাজে'ও স্বরসংখ্যা বিরল, মাত্র দুটি— ধা ও পা। 'প্রবল' শব্দের প্রতিটি অক্ষরে একটি করে স্বর— পা ধা ণা, কিন্তু 'বিদ্রোহে' শব্দের উচ্চারণ দীর্ঘায়িত এবং তার-সপ্তকের ঋষভ ছুঁয়ে সামান্য একটু ঘুরে ষড়্‌জে এসে স্থিত। পুনরায় 'প্রেম' শব্দটিতে এসে সুরকে চড়িয়ে তার-সপ্তকের ঋষভে পৌঁছে দেওয়া হল, কেননা, 'প্রেম' এখানে শুধু একটি শব্দ নয়, সে নিজেই গানের 'থিম' এবং স্বতন্ত্র একটি সম্বোধন— আসলে প্রেম এখানে ব্যক্তিস্বরূপান্বিত (পার্সোনিফায়েড)। সুরটি এখানেও বেশ সরল; যা-কিছু অলংকরণ তা হল 'বিদ্রোহে' আর 'মহা সমারোহে'— ব্যাপারটা খুবই বোধগম্য। স্বর-সমাবেশ নিয়ে এতটা চিন্তা ও ক্ল্যাসিক সংযম সচেতন কিনা বলা কঠিন। হয়তো মহাশিল্পীর হাতে এ-সব আপনার থেকেই এসে যায়। তবু সব মিলিয়ে কী অসামান্য ঐশ্বর্য!

দ্বিতীয় তুকে অর্থাৎ অন্তরায় গানের দুটি জায়গায় কথার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে : এক. 'একেলা রই' আর দুই. 'ভাঙিলে দ্বার'। এই 'ভাঙিলে দ্বার'টাই এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাই এই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু যে রুদ্ধদ্বার একাকিত্বের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ তাকে গুরুত্ব না দিলে দ্বার ভাঙা কোনো তাৎপর্য পায় না, তাই সেখানেও একটি পুনরাবৃত্তি। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে সুরের কাজেও আর-একটি ছোটোখাটো পুনরাবৃত্তি আছে : সেটি হল 'ভাঙিলে দ্বার' এবং 'কোন্ সে ক্ষণ', কেন-না উভয় ক্ষেত্রেই সুর তার-সপ্তকের ঋষভ থেকে মধ্যমে চড়েছে এবং একটু ভিন্নভাবে হলেও কোমল গান্ধারকে ব্যবহার করেছে। সংগত কারণে সুর এই জায়গাতেই সবচেয়ে উঁচুতে। এর পর সামান্য অলংকরণের কাজ আছে 'অপরাজিত ওহে' অংশে। এরও কারণটা খুবই সহজবোধ্য, বিশেষত এইজন্যে যে প্রথম স্তবকে যে প্রেমকে সম্বোধন করা হয়েছে সে-ই এই 'অপরাজিত'। ('সমারোহে' শব্দটির সঙ্গে 'অপরাজিত ওহে'-র মিলটিও অত্যাশ্চর্য, এর ধ্বনিগত সংগতি বিস্ময়কর, এবং সুরেও তা আশ্চর্যভাবে মিশে যায়— দুটি প্রকরণ যেন একই বিন্দুতে সংহত।)

সঞ্চারীতে এসে আমরা গানটির সামান্য একটু গতি-পরিবর্তন লক্ষ করি— কী 'থিম্'-এর দিক থেকে, কী সুরের দিক থেকে। পরিবর্তনটা অবশ্য খুব বড়ো ধরনের নয়, কেন-না বড়ো পরিবর্তনে গানটির গোটা স্ট্রাক্‌চারটাই নষ্ট হয়ে যায়। তবু সামান্য পরিবর্তনটাও এখানে লক্ষণীয়, কেন-না এর তাৎপর্য বলা যেতে পারে দুটি : এক. আগের বিদ্রোহকে একটু সংহত করে নেওয়া, আর দুই. পরবর্তী বিস্ফোরণের জন্যে

ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। 'থিম'-এর দিক থেকে বলা যায়, এতক্ষণে আমরা প্রেমের বিদ্রোহ ও সমারোহকেই দেখেছি, এখন দেখব প্রেমের হাসি এবং তার অশান্ত লীলা। মহাপ্রাণ বর্ণের জমকালো অনুপ্রাসের ('ঘনায় ঘনঘটা') সঙ্গে যুক্তব্যঞ্জনের ধ্বনিগৌরব, অরণ্যশীর্ষে ছায়া-সঞ্চরণের সঙ্গে গঙ্গা ও ধূর্জটির প্রণয়লীলার ক্ল্যাসিক উপমা— এ-রকম চিত্রধ্বনিময় ঐশ্বর্যকে বোধ হয় অসমমাত্রিক তাল ছাড়া সামলানোই যেত না ('eloquence of form')। কিন্তু ঠিক এরই সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে সুরেও এসেছে নতুন গতি। সঞ্চারীর প্রত্যাশিত মন্দ্র-সপ্তক ছেড়ে এখানে সুর আরম্ভ হয়েছে তার-সপ্তকের সা থেকে অবরোহ গতিতে, চলেছে কার্যত কাফি রাগের পুরো অবরোহণ অবলম্বন ক'রে। তা মানে, 'কানন-'পর ছায়া বুলায়' হয়েছে কার্যত র্সা ণা ধা। পা -া। মা জ্ঞা রা। সা ন্া (মাত্র একটি স্পর্শস্বর বাদ দেওয়া হয়েছে)। 'ঘনায় ঘনঘটা'তে সামান্য একটু অলংকর আছে— খুব স্বাভাবিক কারণে। 'হেসে দুলায়'-তে এসে পা ধা ণা-র গতিকে একটু বক্র করে দেওয়া হয়েছে (পণা ণা ধা। ণা -া)— তা না হলে 'হাসি'ই বা কীসের, আর 'দোলানো'ই বা কীসের! এর পর 'ধূর্জটির' কথাটির শেষ অক্ষরটিই একমাত্র অক্ষর যেখানে তিনটি স্বরকে (পধপা) একমাত্রায় রাখা হয়েছে, আর 'জটা'র প্রথম অক্ষরে মগা ব্যবহার করা হয়েছে। এই অলংকরণগুলি সামান্য বলেই অসামান্য মনে হয়।

আভোগ সুরের দিক থেকে অনেকটা অন্তরার পুনরাবৃত্তি। এখানেও কথার পুনরাবৃত্তি দেখানো হয়েছে দু জায়গায় : 'যেথা যে রয়' এবং 'আঁখি তোমার' ('টেক্সট'-এ কিন্তু কোথাও কোনো পুনরাবৃত্তি নেই)। যেখানে যে 'রয়' সেখানে তো সে দীর্ঘকাল ধরেই বসে বা দাঁড়িয়ে থাকে, তাই এই কথাগুচ্ছকে প্রথমেই সাতমাত্রায় দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। তেমনি 'আঁখি তোমার'। এবং এই 'আঁখি' যেহেতু এখানে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, তাই প্রথমত এর উচ্চারণ দীর্ঘায়িত; দ্বিতীয়ত, এখানেই স্বর-সমাবেশটি সবচেয়ে তীব্র। এর পর দ্বিতীয় বার যখন 'আঁখি তোমার' কথাটি উচ্চারণ করা হয়েছে তখন আবার সেই তার-সপ্তকের ঋষভ থেকে মধ্যমে উল্লম্ফন, এবং সুরেও কার্যত পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে 'তড়িতবৎ' কথাটির ওপর— একেই আমরা আগের অনুচ্ছেদে বলেছি বিস্ফোরণ। 'তড়িতবৎ' শব্দটিও একটু লক্ষ করবার মতো। গানে এ-রকম হলন্ত শব্দের ব্যবহার কদাচিৎ ঘটে, কিন্তু ব্যাকরণসম্মতভাবে 'তড়িৎবৎ' রাখা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া 'তড়িত' শব্দকে অ-কারান্ত রাখায় তিন মাত্রার র্রা র্রর্মা র্রা এই স্বর-বিন্যাস সহজ হয়েছে, শোভনও হয়েছে, অন্যথায় জবরদস্তি করতে হত।

আমাদের চতুর্থ গানটি হল : 'শুভ কর্মপথে ধর' নির্ভয় গান।' এটি কবির একেবারে শেষ বয়সের রচনা। রচনাকাল ১০ মাঘ ১৩৪৩ (২৪ জানুয়ারি ১৯৩৭), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে রচিত, কবির বয়স তখন ৭৫। স্বরলিপিকার শান্তিদেব ঘোষ। 'গীতবিতানে' এটি 'স্বদেশ' পর্যায়ের গান বলে চিহ্নিত এবং

'স্বরবিতান'-এর ৪৭-নম্বর খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ' পর্যায়ের গানগুলিকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা যায় : ক. ১৯০৫ সালের আগে, খ. ১৯০৫ সালে এবং গ. ১৯০৫ সালের পরে। প্রথম পর্বের গানগুলি প্রায় সবই রাগভিত্তিক এবং তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে স্বদেশের দুঃখে মনোবেদনা, ক্ষোভ, গ্লানিবোধ, যথা : 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না', 'কেন চেয়ে আছ গো মা', 'আজি এ ভারত লজ্জিত হে' ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্বের অর্থাৎ ১৯০৫ খৃস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের সময়কার গানগুলি প্রাণোন্মাদনাকারী, এবং অধিকাংশই লোকসুরের ভিত্তিতে রচিত, তবে সবগুলি নয়, যেমন 'সার্থক জনম আমার'। তৃতীয় পর্বে গ্লানি উন্মাদনা কিছুই নেই, আছে আদর্শের ও ত্যাগব্রতের সংযত উদ্‌বোধন, মানবমিলনের উদার আহ্বান; সুরবয়নে রাগরাগিণী থাকলেও কিছুটা যেন অন্তরালে, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রূপকর্মের যথার্থ রাবীন্দ্রিক কুশলতা, সংযম ও গঠনসৌষ্ঠব। বর্তমান গান এই তৃতীয় শ্রেণীর গান; এবং এখানে দেশাভিমানের কোনো স্থান নেই— এরা স্বদেশীও বটে, বিশ্বজনীনও বটে।

গানটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কাব্যছন্দে কলাবৃত্তের অসামান্য ব্যবহার এবং দীর্ঘস্বর ও যুক্তব্যঞ্জনকে সংগীতের চতুর্মাত্রিক তাল-বিভাজনে যথাযথ প্রয়োগ। কবিতার ছন্দ-বহির্ভূত শব্দগুলিকেও (যথা 'শুভ', 'সব', 'চির' ইত্যাদি) চমৎকার কৌশলে তালের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। গানের মধ্যে যে উদার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে, ছন্দ ও তালের ওঠা-নামার মধ্য দিয়েই তা সার্থক, অথচ ব্যাপারটা যেন খুবই সহজ। (বিশেষ করে 'রেফ'-এর চমৎকার পৌনঃপুনিক ব্যবহার গানটিকে প্রায় আগাগোড়া এক অদ্ভুত মর্যাদা দান করে।) সুরে কাফি রাগের মধ্যে অনেক সময় টপ্পা-ঠুংরির যে প্রথাগত সংস্কার জড়িয়ে থাকে এখানে তার চিহ্নমাত্র নেই, বরং ধ্রুপদ-ধামারের সঙ্গেই এর কিছুটা আত্মীয়তা। কিন্তু শেষ বিচারে এটি রবীন্দ্রসংগীত, যদিও এক বিশেষ ধরনের রবীন্দ্রসংগীত। সম্মিলিত কণ্ঠে গাওয়ার পক্ষে গানটি বিশেষ উপযোগী। গানের স্তবক-বিন্যাস নিম্নরূপ :

১.	আস্থায়ী	:	'শুভ কর্মপথে	...	হোক অবসান॥'
২.	অন্তরা	:	'চির-শক্তির	...	বিত্ত মহান॥'
৩.	সঞ্চারী	:	'চল' যাত্রী	...	অনুসন্ধান।'
৪.	আভোগ	:	'জড়তাতামস	...	কর' স্নান॥'

আস্থায়ীর প্রথম লাইনেই সুরটি তার-সপ্তকের সা থেকে শুরু হয়েছে, তার পর সহজ কয়েকটি অগ্র-মধ্যমকেও জুড়ে নিতে হয়েছে। দ্বিতীয় লাইনে মাত্র মধ্যম ও পঞ্চমে অল্প নড়াচড়ার পর 'অবসান' কথাটির শেষে একটি ছোট্ট মীড়-যুক্ত পা -র্সা-এর ধাক্কা লাগানো হয়েছে— হয়তো এই কারণে যে-সব দুর্বলতা ও সংশয়ের অবসানই এখানে কাম্য লক্ষ্য।

অন্তরায় 'শক্তির' শব্দটিতে আছে শুধু দু মাত্রার মা ও দু মাত্রার পা। এ শুধু চতুর্মাত্রিক তালকে অনুসরণ করার জন্যেই নয়, শক্তির আন্তরিক ঋজুতাও এতে প্রকাশিত। 'নির্ঝর' শব্দটিতে আছে পঞ্চমের মধ্যস্থতায় দুই নিষাদ (ণা ও না) এবং 'নিত্য ঝরে'-তে কেবল শুদ্ধ না ও র্সা। এই ক্রমিক ঊর্ধ্বগতি সর্বাধিক তীক্ষ্ণতা অর্জন করেছে 'ললাট-'পরে' শব্দটিতে এসে ('ললাট-'পরে' = র্রা। র্মা -র্জ্ঞা র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞর্মা। র্রা -া)— সম্ভবত এই কারণে যে ললাট-স্পর্শনেরই দ্বারাই অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এখানে সুরের যৎসামান্য অলংকরণও লক্ষণীয়। তার পর সুর ক্রমশ নেমে এসেছে মধ্য-সপ্তকের পঞ্চম পর্যন্ত, যেখান থেকে নতুন 'দীক্ষা' ও 'শিক্ষা'র সূত্রপাত। লক্ষ করতে হবে যে 'ত্যাগব্রতে নিক দীক্ষা' ও 'বিঘ্ন হতে নিক শিক্ষা' একই স্বর-সমন্বয়ে গঠিত, যেন একই ধরনের মঙ্গল-কামনা দু-বার উচ্চারিত হল, শুধু প্রথম উচ্চারণের শেষ দিকে পা থেকে একটা অতিরিক্ত মীড়-যুক্ত ণা যুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় উচ্চারণটিকে সহজসাধ্য করার জন্যে, সঙ্গে সঙ্গে সামান্য বৈচিত্র্যেরও সৃষ্টি হয় এর ফলে। এর পর কেবল 'নিষ্ঠুর' শব্দটিকে তার-সপ্তকের সা-এর ওপর দাঁড় করিয়ে সুর ক্রমশ নেমে আসে কোমল গান্ধারের মধ্য দিয়ে মধ্য-সপ্তকের সা-এর প্রশান্তিতে, যেখানে দুঃখই হয়ে উঠবে মানুষের পরম বিত্ত।

সঞ্চারীতে এসে রবীন্দ্র-সৃষ্টি আবার দেখা দিয়েছে বিশিষ্ট মূর্তিতে। এখানে 'যাত্রী'কে দিবারাত্র এগিয়ে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে, কিন্তু যেহেতু এই যাত্রী অমৃতলোকের পথ অনুসন্ধান করছে সেহেতু তার যাত্রার সংকল্পকে হতে হবে অবিচল। তাই প্রথম লাইনের প্রথম চারমাত্রায় কেবল সা, দ্বিতীয় চারমাত্রায় কেবল রা, তৃতীয় চারমাত্রায় কেবল সা ও রা, চতুর্থ চার মাত্রায় কেবল মা ও জ্ঞা— এই নিয়েই 'চলো যাত্রী, চলো দিনরাত্রি'; 'করো' এরই অনুসৃতি; তার পর 'অমৃতলোকে'-তে মধ্যমই প্রবল; অতঃপর সুর ধীরে ধীরে নামতে নামতে সামান্য একবার মন্দ্র-সপ্তকের শুদ্ধ নিষাদকে স্পর্শ করে সা-তে এসেই স্থিতি। শৈলজারঞ্জন মজুমদার আমাদের জানিয়েছেন (শান্তিদেব ঘোষও অনেকটা একই কথা উল্লেখ করেছেন) যে এভাবে 'একই সুরের ওপর কিছুক্ষণ থেমে থাকা' রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'অন্য কোনও গানে এত অতিমাত্রায়, যাকে বলে austerity বা ভোগসংযম বোধ হয় নেই।' গানের বিশিষ্ট 'মুড'-এর প্রকাশেই এই austerity বিশেষ তাৎপর্য পায়। সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতায় কবি অনেক আগেই বুঝে নিয়েছিলেন যে, 'দরকার নেই "প্রভূত" কারুকৌশলের। যথার্থ আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্ণতায়— অতি সূক্ষ্ম, অতি সহজ ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে।' যদি আনন্দ পাওয়া যায় তা হলে 'তার মধ্যে উপাদানের যতই স্বল্পতা থাকবে ততই তার গৌরব।' ('সংগীতচিন্তা', পৃ. ১১২)। আলোচ্য গানটি, বিশেষ করে তার সঞ্চারী, এ কথার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আভোগ অংশ অবশ্যই কিছুটা পরিমাণে অন্তরার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু পুরোপুরি নয়। যেখানে ক্লান্তিজালকে 'দীর্ণ বিদীর্ণ' করা হচ্ছে সুর সেখানেই সবচেয়ে তীক্ষ্ণতা পাবে

('বিদীর্ণ' = র্রা। র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা -া), এটা প্রত্যাশিত কিন্তু ঠিক তার পরের 'দিন-অন্তে' কথাটির ওপর তার-সপ্তকের মধ্যম বরং আরো দীর্ঘকালীন স্থিতি লাভ করেছে— হয়তো এই কারণে যে শিল্পীর কাছে মানুষের 'অপরাজিত' চিত্তই শেষ পর্যন্ত 'মৃত্যুতরণ তীর্থে' স্নান করার অধিকারী।

বর্তমান আলোচনার শেষ গান 'ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার'। এটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গান— এবং অতুলনীয় গান, এর 'সেন্টিমেন্ট' আগেকার গানগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর রূপ আলাদা, চলন আলাদা, সত্তাই আলাদা, এর সঙ্গে তুলনীয় সম্ভবত অন্য কোনো গানই নেই, অথচ কাফি রাগের শাস্ত্রসম্মত স্বর-নির্বাচন থেকে কোথাও বিচ্যুতিও নেই। গানটি শোনা গেছে 'রক্তকরবী' নাটকে বিশু পাগলের মুখে, কিন্তু সে কেবল আস্থায়ী-অন্তরা, সামান্য একটু পাঠভেদও আছে; 'গীতবিতান'-এর পাঠে সঞ্চারী ও আভোগ যুক্ত হয়েছে, কিন্তু নাটকের মূল মেজাজটি তো নষ্ট হয়-ই নি, বরং তাতে আরো গভীরতর রঙ লেগেছে। নায়িকা নন্দিনী মুখোমুখি হয়েছে প্রধানত তিন জন পুরুষের— একজন যক্ষপুরীর রাজা, থাকেন জালের আড়ালে, প্রচণ্ড তার শক্তি, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে ক্লান্ত, রিক্ত, বিরক্ত। দ্বিতীয় রঞ্জন, আছে সম্পূর্ণ নেপথ্যে, তবু তারই মধ্যে নন্দিনী দেখেছে যৌবনের দুর্জয় সাহস— প্রাণ নিয়ে সর্বস্বপণ খেলায় সে নন্দিনীকে জিতে নিয়েছে। আর তৃতীয় জন হচ্ছে বিশু পাগল— সে একান্তই প্রত্যক্ষ, সে গান গায়, কিন্তু যে-দুঃখের গান সে গায় তার খবর নন্দিনী এই যক্ষপুরীর জমাট-বাঁধা অন্ধকার প্রত্যক্ষ করার আগে কোনোদিন টেরই পায় নি। রাজা এখানে প্রাণের রিক্ততার দিক, রঞ্জন প্রাণের স্ফূর্তির দিক, আর বিশু প্রাণের বেদনার দিক। আলোচ্য গানটি হল এক অতলস্পর্শ বেদনার মর্মান্তিক গান। 'রক্তকরবী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালে (ডিসেম্বর ১৯২৬), কিন্তু গানটি 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসে, কবির বয়স তখন ৬৩ বছর। গানের স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ('স্বরবিতান' প্রথম খণ্ড)।

গানটির রহস্যময়তার যেন শেষ নেই। আরম্ভে আছে চাঁদের আলোয় চোখের জলের জোয়ার, শেষে আছে 'হাসে অন্ধকারে', আর মাঝখানে আছে 'আকুল আলোয় দিশাহারা রাতে'— গানের প্রাণকেন্দ্র হয়তো এখানেই, এবং এখানেই যেন চেনা কূলের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেছে। এখানে কবিতার অর্থের চেয়ে গানের ব্যঞ্জনাটাই প্রধান, এবং সেই ব্যঞ্জনাটি প্রকাশ পাচ্ছে বিশেষ কয়েকটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। প্রথমত, সব শেষের 'অন্ধকারে' শব্দটি ছাড়া সমগ্র গানে আর কোথাও যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ নেই, ভাষা অত্যন্ত সরল, কথাগুলি খুবই সাধারণ, ফলে শ্রোতার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হওয়ার কোনো সুযোগই রাখেন নি কবি। দ্বিতীয়ত, সঙ্গে রয়েছে দীর্ঘ স্বরের, বিশেষত এ-কার ও আ-কারের বাহুল্য। তরী চেনা কূলের বাঁধন খুলে অচেনার ধারে ভেসে চলেছে— তাই 'এ'-কারের বাহুল্য। আর পারাবারের কানায় কানায় কানাকানির মধ্যে আকুল

আলোর দিশাহারা রাত— তাই 'আ'-কারের প্রাধান্য। লক্ষ করতে হবে, এই এ-কার, বিশেষত আ-কারকে, আশ্রয় করেই সুর বিশেষভাবে দীর্ঘায়িত, লীলায়িত হয়ে উঠছে। অন্য স্বরবর্ণও নেই তা নয়, কিন্তু তারাও প্রায়শ দীর্ঘ— অন্তত তাদের আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘ-স্বরের মতো। এই দীর্ঘায়িত চলনকে সাহায্য করেছে বিলম্বিত লয়ের চতুর্মাত্রিক তাল। বোধ হয় তাল ছাড়া গাইলেও খুব একটা ক্ষতি নেই, তবু তালের যে একেবারে প্রয়োজন নেই তা-ও নয়, কেন-না প্রত্যেকটি musical phrase-ই ৪ + ৪ অর্থাৎ ৮ মাত্রায় প্রসারিত। মাঝে মাঝে আছে সামান্য কয়েকটি অক্ষর বা কিছু ঘননিবদ্ধ কথা, তার পরেই দীর্ঘ একটি সরল টান বা অলংকৃত স্বরগুচ্ছ— এই প্রকরণই সারা গানে অনুসৃত। এখন আমরা গানের স্তবক-বিন্যাসটি লক্ষ করি :

১.	আস্থায়ী	:	'ও চাঁদ, চোখের	...	এ পারে ওই পারে'॥
২.	অন্তরা	:	'আমার তরী ছিল	...	অচেনার ধারে'॥
৩.	সঞ্চারী	:	'পথিক সবাই	...	দিশাহারা রাতে'।
৪.	আভোগ	:	'সেই পথ-হারানোর	...	হাসে অন্ধকারে'॥

প্রথম তুকের আরম্ভেই আছে 'ও চাঁদ' এই দুটি কথা। কিন্তু সুর আরম্ভ হয়েছে 'চোখের জলে' থেকে, 'ও চাঁদ' এসেছে গোটা পঙ্‌ক্তির শেষে— তা না হলে বোধ হয় চাঁদের অমোঘ টানটি ঠিক প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না। তার পর ঐ একই কথার একই সুরে পুনরাবৃত্তি হয়েছে আস্থায়ী, অন্তরা ও আভোগের শেষে, এবং সর্বত্রই 'ও চাঁদ' = ন্‌সা -রজ্ঞা -মজ্ঞা -া। রা -া। এই শেষের শুদ্ধ ঋষভটি শাস্ত্রীয় ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে 'ন্যাস'-স্বর, অর্থাৎ সেই স্বর যেখানে রাগের রূপ পূর্ণতা লাভ ক'রে বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়। রবীন্দ্রলাল রায় ঋষভকেই বলেছেন, কাফি রাগের 'অংশ' বা বাদী স্বর, এ কথা আমরা আগেই দেখেছি। 'অংশ' স্বরের ন্যাস-স্বর হতে শাস্ত্রীয় কোনো বাধা নেই। কিন্তু শ্রোতার কানে ঋষভটি সত্যি সত্যিই হয়ে ওঠে একটি প্রত্যাশিত ও প্রতীক্ষিত বিশ্রামস্থান।... কিন্তু, এই 'চাঁদ'টি এখানে কে? হয়তো অংশত বিশু পাগলের অতীত প্রেমের স্মৃতি, যার টানে বিশু যক্ষপুরীর সুড়ঙ্গ খোদাইয়ের কাজে নেমে এসেছে, কিন্তু নাট্যমঞ্চে প্রত্যক্ষত আছে নন্দিনী, তার 'দুখজাগানিয়া' তার 'সমুদ্রের অগম পারের দূতী'। সুরে 'চোখের' কথাটি আছে টানা ৬ মাত্রায় সা-এর ওপর দাঁড়িয়ে, 'জলের' কথাটিতে কেবল দু মাত্রার সা রা, 'লাগল'-তে মন্দ্র-সপ্তকের কোমল নিষাদ এসেছে, কিন্তু তার পরেই 'জোয়ার' কথাটিতে এসেছে বিশেষ যত্নকৃত একটি অলংকার (সা। ন্‌সা -রজ্ঞা রা -া)। এই রকম অলংকার আছে 'পারাবার' কথাটিতেও (পধা ^ধ^পা। মা -া -পধপা -মপা। ^জ্ঞ^মা -া, -জ্ঞরা -সা)— রচয়িতার উদ্দেশ্য বুঝতে খুব অসুবিধে হয় না। পুনরায় অলংকৃত হয়েছে 'কানাকানি' (মা পা -মর্সা র্সা। র্সা -া -ণর্সর্রা -ণা) এবং 'এই পারে ওই পারে' (ধা -র্সা ^র্স^ণা -া। -া -া ধা পধপা। ^প^মা -া -পধপা -মপা। মজ্ঞা -া -জ্ঞরা -সা)। প্রথম 'পারে'র 'পা'-তে আছে কোমল

নিষাদের কিছুটা দীর্ঘ একটি টান, কিন্তু দ্বিতীয় 'পারে'র 'পা'-তে এবং 'রে'-তে এসেছে ঐ অসামান্য দুটি অলংকরণ— অসামান্য, কিন্তু বড়োই অন্তরঙ্গ— অন্তরঙ্গ না হলে কানাকানি হয় কী করে, এবং তার পরেই 'ও চাঁদ' এই সম্বোধন এবং প্রথম লাইনে প্রত্যাবর্তন।

অন্তরাতে 'আমার তরী'র যাত্রা শুরু হয়েছে শুদ্ধ মধ্যম থেকে। 'তরী ছিল'-তে যেভাবে মধ্যম থেকে কোমল নিষাদ, শুদ্ধ ধৈবত ও শুদ্ধ নিষাদের সমাবেশ হয়েছে তাতে কেউ কেউ হয়তো কিছুটা বাহার রাগের আভাস পেতে পারেন। কিন্তু এই বাহার কাফি ঠাটেরই অন্তর্ভুক্ত, কাজেই একেবারে শাস্ত্র-বহির্ভূত নয়, অথচ আশ্চর্য সুন্দর। 'তরী'র শেষে কোমল নিষাদ (তৎসহ শুদ্ধ ধৈবত) কিছুটা দীর্ঘায়িত না হলে তরীর অকূল যাত্রা ধরা পড়ত না। কিন্তু পরিত্যক্ত চেনা কূলের আকর্ষণও তো কিছু কম ছিল না, তাই 'চেনার' কথাটির ওপরও এসেছে এতটা অন্তরঙ্গ অলংকরণ, সঙ্গে সঙ্গে এতটা তীক্ষ্ণতা ('চেনার' = না র্সনা -ধনা -র্সর্রর্সা)। 'বাঁধন যে তার' অংশে প্রথমেই পা থেকে তার-ষড়্‌জের ধাক্কা, তার পর দীর্ঘ ৭ মাত্রা জুড়ে ঋষভে স্থিতি— বুঝিয়ে দিচ্ছে যে চেনা বিশ্বের কঠিন বন্ধনটি আর নেই, 'গেল খুলে'-তেও সেই বাঁধন-ছেঁড়া যাত্রারম্ভের ইঙ্গিত। কিন্তু সুরটি যখন কিছু পথ ঘুরে পঞ্চমে ফিরে আসে তখনই আভাসে বুঝিয়ে দেয় দিক-হারানোর বেদনা। তাই 'হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল'-তে আর-একবার ধরা পড়ে বেদনার তীব্রতা, বিহ্বলতা। প্রথম 'হাওয়ায়' কথাটি দীর্ঘায়িত, দ্বিতীয় 'হাওয়ায়' কেবলমাত্র দু মাত্রার ধা ণা। 'কোন্ অচেনার ধারে' অংশের 'কোন্' কথাটির ওপর আছে মা থেকে ণা-এর ওপর ছোট্ট একটি মীড়, এটা 'কোন্'-এর অনির্দেশ্যতাকে বুঝিয়ে দেয়। আর 'ধারে' কথাটির ওপর আছে ৮ মাত্রা ব্যাপী আর-এক অসামান্য অলংকরণ— কিছুটা টপ্পা-আঙ্গিকে— কেন-না এই 'ধারে' কোনো কিনারায় নয়, এ আছে 'অচেনার' প্রান্ত ছুঁয়ে।

সঞ্চারীতে এসে বর্তমান লেখককে একটু থমকে দাঁড়াতেই হয়, স্বীকার করতেই হয় যে এর সৌন্দর্য, এর বেদনা বিশ্লেষণ করা তার সাধ্যের অতীত। 'পথিক সবাই'-এর প্রথম দুই অক্ষরকে দু মাত্রায় মজ্ঞা জ্ঞা-তে রেখে ঐ কোমল গান্ধারকে আরো চারমাত্রায় টেনে 'পথিক' কথাটিকে সম্পূর্ণ করা হল, 'সবাই' = দুমাত্রার রা সা; 'পেরিয়ে গেল'-তে রা পা প্রাধান্য পেয়েছে, তার পর ধৈবত ছুঁয়ে মধ্যম। 'ঘাটের কিনারাতে' এসে পঞ্চম থেকে কোমল নিষাদ পর্যন্ত ছোট্ট একটি মীড়, এবং ঐ নিষাদকেই টেনে যাওয়া; 'কিনারাতে' কথাটিকেও আস্তে আস্তে লীলায়িত ও দীর্ঘায়িত করা হয়েছে ১০ মাত্রা জুড়ে। 'আমি সে কোন্' অংশে এক মাত্রার ঋষভ সহ কোমল গান্ধারকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, এবং তার পরেই আছে 'আকুল আলোয় দিশাহারা রাতে'। 'আকুল আলো' এবং 'দিশাহারা রাতে'র অর্থ কী? আলংকারিক দৃষ্টিতে এরা হয়তো transferred epithet-এর দৃষ্টান্ত, কিন্তু তাতে কিছুই বোঝানো হয় না। 'আকুল' কথাটির

ওপর আছে রা রজ্ঞা -মজ্ঞা -রজ্ঞা, অর্থাৎ কোমল গান্ধারের প্রাধান্য, কিন্তু এর পরেই যে 'আলোয়' শব্দটি এসেছে সেটি কোন্ আলো? কেন-না, এখানে এসেই প্রথম দেখছি শুদ্ধ গান্ধারের প্রয়োগ এবং তার পর 'দিশাহারা রাতে' অংশেও গান্ধার মানেই শুদ্ধ গান্ধার। এই শুদ্ধ গান্ধারটির স্পর্শ পাওয়া মাত্রই শ্রোতাকে বিহ্বল হয়ে পড়তে হয়; তখন এর অতলস্পর্শ গভীরতাকে শুধু অনুভব করাই যায়, বুঝে নিতে হয় যে এ-কাজ মহাশিল্পীর কাজ— বাক্য বিচার এখানে অর্থহীন। 'দিশাহারা' = গা গা মা পা, অর্থাৎ চার মাত্রা— এখানে আছে তিনটি আ-কার; এবং এর শেষ আ-কারটিকে অনুসরণ করে আরো চার মাত্রার একটি ছোটো কিন্তু অসামান্য তান : -পধাপা -মগা -রগা -মপা; 'রাতে' কথাটিতে আছে মাত্র গা মা, কিন্তু এই মধ্যম আরো ৬ মাত্রা জুড়ে প্রসারিত।... এর পরে কেবলই মনে হচ্ছে, এই বেদনা তো কেবল 'সহৃদয়জনবেদ্য', তা হলে এত কথার দরকার কী! বর্তমান আলোচকের ব্যর্থতা নতমস্তকে স্বীকার করতেই হয়।

আভোগ অংশটি অবশ্য এখানেও কিয়ৎপরিমাণে অন্তরারই পুনরাবৃত্তি। তবু এখানেও একেবারে শুরুতেই কিন্তু নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। আগের সঞ্চারীতে মধ্যমের দীর্ঘায়িত টানে যে বেদনার স্তব্ধতা নেমে এসেছিল তাকে মর্যাদা দিয়ে আভোগের ছন্দ-বহির্ভূত 'সেই' কথাটিকে আর কোনোভাবেই সঞ্চারীর অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নি; তাই ঐ কথাটিকে আভোগের প্রারম্ভে এক মাত্রায় রেখে তবে সুরকে অগ্রসর হতে হয়েছে। প্রয়োজনীয় ছোটোখাটো পরিবর্তনকে উল্লেখ না করলেও চলে। তবু 'দিক্-ভোলাবার' কথাটির বিশিষ্ট স্বর-সমাবেশ, 'আমার' কথাটি নিয়ে অল্প কিন্তু অন্তরঙ্গ খেলা আর 'হাসে অন্ধকারে' কথাগুচ্ছের ওপর উচ্চারণ ও স্বর-বিন্যাসের বিচিত্র প্রয়োগ কোনোক্রমেই অন্তরার পুনরাবৃত্তি নয়, হওয়া উচিতও ছিল না— বোধ হয় সম্ভবও ছিল না। এর অর্থ, প্রতিটি কথাগুচ্ছকে কবি গভীর মমতায় বিশিষ্ট সুর-সজ্জায় সজ্জিত করেছেন— মূল সুরটিকে পটভূমিতে রেখেই।

১৪০২ বৈশাখ

কালিদাস-কাব্যের কলারূপ

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী

গ্রিক দেবকন্যা মিউজদের যে-জন সাহিত্যের প্রেরণাদাত্রী, তাঁর সঙ্গে রূপকলার উদ্‌ভাবিনী ভগিনীটির বিরোধ নেই। কাব্য ও রূপবিদ্যা একে অপরকে নিয়ে চলতে বোধ হয় ভালোবাসে। তাই বেলা অবেলা কিংবা কালবেলায় সাহিত্য-নিছনি শিল্প তৈরি হয় দেশে দেশে। অনুরাগ-জনিত সাহিত্য-প্রভাবে রূপদক্ষ ও চিত্রকর সর্বদেশে সর্বকালে তাঁদের শিল্পকে শ্রীময় করেছেন— এ উদাহরণও নিতান্ত কম নয়। সে-প্রভাব অবশ্যই প্রবল আকর্ষণের ফল। ভারতীয় সাহিত্যে একালে যেমন রবীন্দ্রনাথ ; সেকালে তেমনি কালিদাস শিল্পীকুলের কাছে অমোঘ আকর্ষণের দুই কেন্দ্রবিন্দু। এক্ষেত্রে বোধ হয় কালিদাসের পাল্লাটি কিছুটা ভারি।

আরোপিত কয়েকটি রচনা বাদ দিলে কালিদাসের সাহিত্যসৃজন বলতে তিনটি নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয় এবং অভিজ্ঞানশকুন্তল ; এবং তিনটি কাব্য— কুমারসম্ভব, রঘুবংশ এবং মেঘদূত। শেষেরটি আগের দুটি থেকে স্বতন্ত্র। মূলত এক গীতিকাব্য।

সাহিত্যের পাঠক এক মনোময়-রূপের উপলব্ধি করেন সেটিই তাঁর রসাস্বাদন। কিন্তু সেই রচনার দৃশ্যরূপ যখন তাঁর গোচরে আসে তখন তাঁর রূপতৃষ্ণা প্রতিস্পর্শাতুর হয়ে ওঠে। সাহিত্যের রসবেদ্য অনুভূতি তখন নিরীক্ষণের সুযোগ দেয় তাঁকে। লেখা ছবি হয়ে উঠলে, উৎসুকতা জাগে। কবি চিত্তের অরূপ-লেখা দৃশ্য-ঐশ্বর্যের মায়াময় পথে উন্নীত হয় রূপলোকে।

কালিদাস সেই সৃজনশিল্পী যাঁর কাব্য ও নাটক যুগে যুগে ভাস্কর-চিত্রকরদের প্রলুব্ধ করেছে রূপানুবাদের তাগিদে। এমনই কয়েকটি ভাস্কর্য ও চিত্রনিদর্শনের পর্যালোচনা করছি এই নিবন্ধে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তপোবনে দুষ্যন্তের রাজকীয় আবির্ভাব ক্ষণকাল পরেই প্রণয়ীসুলভ পদচারণায় পর্যবসিত হল— এ ঘটনাটি অনেকটা মেঘ গর্জনের অব্যবহিত বারিবর্ষণের মতো। নাটকের উন্মোচন পর্বের এই প্রেক্ষাপটটি শিল্পী ভাস্করদের কাছে বিষয়-গৌরবেই লোভনীয়। সপ্ত অঙ্কের এই নাটকের প্রথম দৃশ্যতেই কবি যে-ছবি এঁকেছেন চিত্রী কিংবা রূপদক্ষ সেটিকে তাদের 'স্বক্ষেত্র' মনে করে নিজের শিল্পমাধ্যমে রূপায়িত করেছেন। সেটি উত্তরপ্রদেশের প্রত্নক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত পোড়ামাটির ফলক কিংবা ওড়িশার উদয়গিরির পর্বতগাত্রে খোদিত প্যানেল অথবা রবিবর্মার তপোবনের শকুন্তলা চিত্রটি যাই হোক।

প্রথমেই বলে রাখি কালিদাসের কাল নিয়ে পণ্ডিতি বিচার-বিসম্বাদ আজও আছে। তিনি খৃস্টপূর্ব যুগের মানুষ, না গুপ্তকালের স্বর্ণযুগের তার মীমাংসা হয় নি এখনো। তবে ভিটা থেকে আবিষ্কৃত মৃৎফলক এবং রানীগুম্ফার পাথুরে কপালে উৎকীর্ণ শকুন্তলা নাটকের দৃশ্য দুই শিল্পশৈলীর দিক থেকে যে খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রত্ননিদর্শন প্রাচীন কলাবেত্তারা মোটামুটি একমত।

এবার দেখা যাক কালিদাস প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আমাদের আলোচ্য অংশে কী লিখছেন—

'ততঃ প্রবিশতি মৃগানুসারী সশরচাপহস্তো রাজা রথেন সূতশ্চ।... রাজা— সূত! দূরমুনা সারঙ্গেণ বয়মাকৃষ্টাঃ। অয়ং পুনরিদানীমপি। গ্রীবা-ভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ।... সূত! পশ্যৈনং ব্যাপাদ্যমানম্ (শর-সন্ধানং নাটয়তি)।... (নেপথ্যে) ভো ভো রাজন্! আশ্রম-মৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।... ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্/মৃদুনি মৃগশরীরে তুলরাশাবিবাগ্নিঃ।... প্রমাণানুরূপৈঃ সেচনঘটৈঃ বালপাদপেভ্যঃ পয়ো দাতুমিত এবাভিবর্তন্তে। অহো মধুরমাসাং দর্শনম্।... হলা সউন্দলে!... জেণ ণোমলিআ-কুসুম-পেলবা বি তুমং এদাণং আলবালপূরণে নিউত্তা।'

এই গদ্য ও পদ্যাংশটির বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত করছি—'তার পর ধনুর্বাণ হাতে হরিণের অনুসরণকারী রাজা রথে আরোহণ করে সারথিকে নিয়ে প্রবেশ করলেন।... রাজা বললেন— সারথি এই কৃষ্ণসার হরিণ আমাকে বহুদূরে টেনে এনেছে। এখনো ঐ হরিণটি তার গ্রীবা সুন্দরভাবে বাঁকিয়ে পেছনের রথের দিকে বারে বারে তাকাচ্ছে।... সারথি, দেখো এবার কেমন করে এই হরিণটাকে মারি (ধনুকে শর যোজনা করলেন)। (নেপথ্যে) হে রাজন্! এটি আশ্রমের মৃগ। একে হত্যা করা উচিত নয়। হনন করা সংগত নয়।' এর পরের বাক্যটি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে তুলে দিচ্ছি—

মৃদু এ মৃগদেহে মেরো না শর!
আগুন দেবে কে গো ফুলের পর।

পরবর্তী উদ্ধৃত বাক্যক'টির অনুবাদ এইরকম—

'আরে এই যে তপস্বীকন্যারা নিজেরা যেমন বহন করতে পারে তেমন ঝারি কলস দিয়ে ছোটো ছোটো চারাগাছে জল সিঞ্চন করার জন্য এদিকে আসছে। আহা কী সুন্দর তাদের চেহারা!... আশ্রমপিতা কশ্যপ নবমল্লিকার মতো কোমল তোমাকে আলবালে জলসিঞ্চনের কাজ দিয়েছেন!

এবার দেখা যাক ভিটার মৃৎফলকটি ঐ দৃশ্যকে কেমনভাবে উপস্থাপিত করেছে। ১৯০৯-১০ খৃস্টাব্দে এলাহাবাদের কাছে ভিটায় এক প্রত্ন-উৎখনন করেন স্যার জন মার্শাল, ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের তৎকালীন প্রধান। টেরাকোটার একটি গোল চাক্‌তি উঠে আসে খননের সময়। এর দুপিঠেই একই দৃশ্য। তিন ইঞ্চি ব্যাসের এই ফলকের নিচের ডানদিকে চারঘোড়ার রথে এক রথী এবং সারথি। ঘোড়ার পেছনে

অন্য একজন। অশ্বগুলোর পথ আটকে দাঁড়িয়ে বারণ মুদ্রায় হাত তুলেছে একজন। বাঁদিকে এক কুটির। তাঁর সামনে পেছনে এক পুকুর। জলপদ্ম সরিয়ে জল তুলছে কে যেন? ডানকোণে নিচের দিকে এক পেখমমেলা ময়ূর। তার কাছেই দুটি হরিণ। আর ফলকের ওপর অংশে আঁকা বাঁকা বেষ্টনী, নাকি নদীরেখা(?)র ওপাশে দুটি মানুষ।

চার ঘোড়ার রথে কী তবে রাজা দুষ্যন্ত ও তাঁর সারথি আর অশ্বসংলগ্ন মানুষটি রাজার বিদূষক! হাত তুলে কী সেই শার্ঙ্গরব বা শারদ্বত যে বলেছিল— 'মৃদু এ মৃগদেহে মেরো না শর'! হরিণেরা তো আছেই। আছে আশ্রম-শিখী। বেষ্টনী বা নদীর ওপরে কী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা আর জলভরণে শকুন্তলা? সেই যে রাজা বলেছিলেন না— 'আরে! এই তপস্বিকন্যারা সিঞ্চনঘট নিয়ে গাছের চারায় জল দিতে দিতে এখানে এসে পড়েছে।'

পোড়ামাটির ফলক রেখে এবার ভুবনেশ্বরের কাছে উদয়গিরি পাহাড়ে রানীগুম্ফার পাথুরে দেওয়ালে চোখ রাখি। পাহাড়ি গুহার ওপর তলার বারান্দায় কার্নিশের নীচে আটটি দরজার মাঝে সাতটি ঈষৎ খোদাই করা রিলিফ আছে। এর মধ্যে চতুর্থ রিলিফটিতে এক রাজার শিকার করার দৃশ্যটি খোদিত। রিলিফটির তিনটে ভাগ। প্রথম অংশে তিনজন— সম্ভবত রাজা, তাঁর বয়স্য এবং সারথি। সামনে চলমান ঘোড়া। মধ্যে ধনুকে টংকার দিচ্ছেন রাজা, এক পরিচারক ছত্র ধরে আছে তাঁর মাথায়। সামনে কয়েকটি হরিণ। মাঝে এক ফুল্লকুসুমিত বৃক্ষ। প্রান্তিক অংশে রাজার ধনুক বাণ যেন অবসর যাপন করছে। সমুখপানে গাছের আড়ালে এক যুবতী। শকুন্তলা নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের পটভূমি। কেউ কেউ এই দৃশ্যটি শামা জাতকের কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। কেউ বলেছেন, মহাভারতের আদি পর্বে যে দুষ্যন্ত-শকুন্তলা কাহিনী আছে তার প্রতিচ্ছবি এটি। আমাদের তো মনে হয়, কালিদাস-রচনার ভাস্কর্য রূপটিই রানীগুম্ফা রিলিফের বিষয়বস্তু।

এর অন্য একটি কারণও আছে। ভিটা এবং উদয়গিরির মৃৎফলক এবং গুহাভাস্কর্য প্রায় সমসাময়িক অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দীর যে-যুগে ভারতশিল্পে শুঙ্গকালীন শিল্পশৈলীর রমরমা।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের আরো একটি দৃশ্য ধরা পড়েছে ভাস্কর্যে। সেটিরও প্রাপ্তিস্থান উত্তরপ্রদেশের ভিটা। ১৯১১-১২ খৃস্টাব্দের খননে উঠে আসে ৬³/৮ ইঞ্চি একটি শ্লেটপাথরের ছোট্ট ফলক। স্যার জন মার্শাল এটির বর্ণনা দিয়েছেন এইরকম— ডান কনুইয়ের ওপর ভর দেওয়া হাতে মাথা রেখে এক নারী শুয়ে আছে। তার পেছনে একটি থালায় কিছু ফল এবং পাতা। মহিলাটির ডানদিকে এক পুরুষ। তার ডান হাতে একটি ঢালের মতো জিনিস, বাঁ হাত মেয়েটির পায়ের ওপর রাখা। মার্শালের ধারণা, নারীটি বুদ্ধদেবের মা মায়া, সন্তান-জন্মের শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করছেন। আনন্দকুমারস্বামী একটু অন্যমত পোষণ করে ফলকের ছবির ব্যাখ্যা করে বলেছেন— শায়িতা মহিলাকে

পাখার বাতাস করছে ঐ পুরুষ। হাতে ধরা গোলাকার বস্তুটি ঢাল নয়। প্রখ্যাত প্রত্নবিদ এবং সংস্কৃত-সাহিত্যের পণ্ডিত বাহাদুরচাঁদ ছাবরা এর যথার্থ পরিচয়টি তুলে ধরেছেন অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের তৃতীয় অঙ্কের উনিশ সংখ্যক শ্লোকটিকে উদ্ধৃত করে ; যেখানে দুষ্যন্ত বলছেন, 'অঙ্কে নিধায় করভোরু যথাসুখং তে / সংবাহয়ামি চরণাবুত পদ্মতাম্রৌ?'— ও শোভন উরুর মেয়ে! তোমার পদ্মতামা রঙ্ চরণযুগল কোলে নিয়ে যথাসুখে পরিচর্যা করব, নাকি জলে ভেজা শীতল পদ্মপাতার পাখা দুলিয়ে তোমার ক্লান্তি দূর করব বাতাস করে?— 'কিং শীকরৈঃ ক্লমবিনোদিভিরার্দ্রবাতং / সঞ্চালয়ামি নলিনীদলতালবৃন্তম্।'

মনে রাখতে হবে, এই স্লেট পাথরের ফলকটিও শৈলী এবং কালবিচারে খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর। ভিটার দুটি শিল্পবস্তুই সম্ভবত ঘরসাজানোর উপকরণ। সুখী গৃহকোণের সজ্জাবিলাস। গোল চাক্‌তিটিতে তো দুদিকেই দৃশ্য খোদাই করা। তা ছাড়া ওপরের দিকে একটি ছিদ্র আছে যার মধ্যে সুতো বেঁধে ঝোলানো হত বলে অনুমান করা যেতে পারে। এর অর্থ, সেই খৃস্টপূর্ব যুগে শকুন্তলা-কাহিনীর জনপ্রিয়তা, যার মূলে আছে এক নাটকীয় চিত্রময়তা। কালিদাস চিত্রের বিষয়বস্তু হিসেবে শকুন্তলা চরিত্রের সুখ্যাতিও করেছেন নানাভাবে। দ্বিতীয় অঙ্কের নবম শ্লোকে কবি বলছেন— বিধাতা এঁকে চিত্রপটে অঙ্কন করে পরে প্রাণদান করেছেন। (চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা-রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।) চতুর্থ অঙ্কে আবার প্রিয়ংবদা শকুন্তলার ভাব ও অভিব্যক্তিতে চিত্রের সৌন্দর্য লক্ষ্য করেছে (বামহত্থোবহিদ-বঅণা আলিহিদা বিঅ পিঅসহী)। বাঁ হাতের ভরে মুখ রেখে আঁকা ছবির (আলিখিতা ইব) মতো বসে আছে শকুন্তলা। এমন কথাই বলেছিল অনসূয়াকে প্রিয়ংবদা।

২

পরবর্তী কাব্য-সাহিত্যে কালিদাসের প্রভাব যেমন বিপুল ; তেমনি যুগান্তরের শিল্পমাধ্যম তথা স্থাপত্য ভাস্কর্যেও কবির কাব্যানুষঙ্গের রূপানুকৃতি নজর করার মতো। সেকালে বৃক্ষদেবতারা মানুষদের নানা ধরনের আবরণ ও আভরণ উপহার দিত এমন কয়েকটি পুরাকথা (myth) প্রচলিত ছিল। মধ্যপ্রদেশের ভারহুত স্তূপের উষ্ণীষপট্টে (coping stone) বনদেবতারা বৃক্ষের আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে লাক্ষারস, বস্ত্র, ফল-মূল ও জল দিচ্ছে প্রার্থীকে। এমন দৃশ্য মনে করিয়ে দেয় অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম শ্লোকটিকে— ক্ষৌমং কেনচিৎ ইন্দুপাণ্ডু তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতম্/নিষ্ঠ্যূতশ্চরণো-পভোগসুভগো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ। / অন্যেভ্যো বনদেবতা- করতলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈঃ / দত্তান্যাভরণানি তৎকিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ॥

ভারতীয় শিল্পের কয়েকটি মোটিফ এক কথায় অনন্য। প্রসাধনরতা 'দর্পণিকা' ; উৎকণ্ঠিতা নায়িকার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা জানালায় অপেক্ষা করার দৃশ্য

'বাতায়নবর্তিনী'; 'স্তম্ভপুত্তলিকা'; 'শালভঞ্জিকা'; তোরণদ্বারে শঙ্খ পদ্ম কিংবা গঙ্গা যমুনার মূর্তি কিংবা শুকপাখি কোলে নিয়ে নায়িকা।

কালিদাসের কাব্যে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে এই মোটিফের বর্ণনাবহুল রূপচিন্তা। যেমন 'দর্পণেষু পরিভোগদর্শিনী'র (রঘুবংশ-১৯/২৮) তুলনা মথুরার কুষাণশিল্পে কিংবা খাজুরাহোর চন্দেল্লশিল্পে অথবা কোনারকের কলিঙ্গশিল্পের দর্পণধারিণী ; থামের গায়ে ছোটো ছোটো পুতুল খোদাই করার রেওয়াজ যা আমরা ভারহুত তোরণের স্তম্ভের মাথায় দেখতে পাই রঘুবংশে তারও উল্লেখ রয়েছে— 'স্তম্ভেষু যোষিৎ প্রতিয়াতনানাম্' (রঘু ১৬/১৭)। দ্বারশাখায় গঙ্গা ও যমুনার মূর্তিদর্শন মন্দির প্রবেশের আবশ্যিক কর্তব্য। বক্সার থেকে পাওয়া গুপ্তযুগের দ্বারশাখার এই দুই নদীমূর্তি মনে করিয়ে দেয় কুমারসম্ভবের কবিকে। 'মূর্তে চ গঙ্গাযমুনে তদানীং সচামরে দেবমসেবিষাতাম্' (কুমার ৭/৪২)। মেঘদূতে আবার শঙ্খ-পদ্ম আঁকার কথা বলেছেন কবি— 'দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খ-পদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা' (মেঘদূত ২/২০)। দক্ষিণ ভারতের অনেক মন্দিরে বিশেষ করে চালুক্য স্থাপত্যে যক্ষমূর্তির পাশাপাশি নিধি হিসেবে শঙ্খ ও পদ্মের অবস্থানও লক্ষণীয়। প্রেমের বার্তা বয়ে নিয়ে যায় পাখিরা এমন কবিপ্রসিদ্ধি ভারতীয় সাহিত্যে এখনো বর্তমান। 'যাও পাখি বোলো তারে'— প্রেমাস্পদের দূতিয়ালিতে শুক-শারী, পারাবতপ্রিয়ারা সিদ্ধহস্ত। মথুরার শিল্পে এমন যক্ষিণীমূর্তি সচরাচর দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে খাঁচা থেকে উড়িয়ে দেওয়া শুকপাখিকে কাঁধের কাছে বসিয়ে দয়িতের প্রেমবার্তা শুনেছে। ভূতেশ্বরের এই পিঞ্জরধারিণী মূর্তির কথা ভেবেই কি কালিদাস লিখেছিলেন মেঘদূতের এই শ্লোক—

পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং শারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি॥

(মেঘদূত-২/২৪)

শিল্পসমালোচকেরা মনে করেন, কুমারসম্ভব কাব্যের একাদশ স্র্গের দুটি শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে কাঠমাণ্ডুর কাঠেশিম্ভুর কঙ্কেশ্বরী ঘাটের প্রস্তর ফলকে শিব-পার্বতীর মাঝখানে বালক কার্তিকের রূপ সৃষ্টি করেছিলেন সপ্তম-অষ্টম শতকের কোনো ভাস্কর। এই রিলিফে স্বামী ও স্ত্রীর হাতে পুষ্পপাত্র মধ্যে অঞ্জলিবদ্ধ হাত কার্তিক সঙ্গে ময়ূর। আর-একটি রিলিফে বস্ত্রাঞ্চল খুলে ঊর্দ্ধাবরণ-মুক্ত এক নারী, তার পাশে ডান হাত তুলে বসে আছেন এক পুরুষ। তবে কী সম্ভোগপূর্ব পার্বতী ও শিব এই পাথুরে প্যানেলের বিষয়বস্তু না কি নারী আসলে, গঙ্গাদেবী পার্বতীর সপত্নী? প্যানেল দুটির বিষয় নির্ধারণ নিয়ে অবশ্য পণ্ডিতমহলে মতান্তর আছে। কেউ মনে করেন মৎস্যপুরাণের শিব-পার্বতী উপাখ্যানটি প্রভাবিত করেছে এই দৃশ্য দুটিকে।

মধ্যযুগের রাজস্থানের সোলাঙ্কি শৈলীর একটি মর্মরপাথরের ভাস্কর্যের বিষয় কন্দুকক্রীড়া বা বলখেলা। এক সুরসুন্দরী পদবিক্ষেপে ধাপ খেয়ে বলটি পৌঁছোতে চাইছে তার অধরের দিকে এমন বর্ণনা দিয়েছেন কবি—

বনিতাকরতামরসাভিহতঃ পতিতঃ পতিতঃ পুনরুৎপতসি।
বিদিতং ননু কন্দুক তে হৃদয়ং বনিতাধর-সঙ্গম-লুব্ধমিব॥

৩

ভাস্কর্যের আঙিনা ছেড়ে এবার প্রবেশ করি কালিদাস-প্রভাবিত চিত্রকল্পনার রাজ্যে। কাকতালীয় হলেও ঘটনাটি কৌতূহল-উদ্দীপক। ১৭৮৮ খৃস্টাব্দের ১৭ অগস্ট স্যার উইলিয়াম জোনস শেষ করলেন অভিজ্ঞানশকুন্তলের অনুবাদ। আর ঠিক সেই বছরেই বিক্রম সংবৎ ১৮৪৫ (=১৭৮৮-৮৯ খৃস্টাব্দে) কবি নিওয়াজা তাঁর সচিত্র হিন্দি অনুবাদ রচনা করলেন। নাগপুরের ভোঁসলে পরিবারের জন্য লিখিত শকুন্তলার এই পুথির ছবি আঁকা হয়েছিল সম্ভবত পুণেতে। শিল্পীর নাম পাওয়া যায় নি। ১৯.৫ x ১২ সেন্টিমিটার পুথির পাতা সর্বসাকুল্যে উনপঞ্চাশ। আর ছবির সংখ্যা একুশ। রাজস্থানী এবং দক্ষিণী চিত্ররীতির সমন্বয়ের নিদর্শন এই ছবিগুলোকে প্রখ্যাত শিল্পসমালোচক কার্ল খান্ডালাওয়ালা—'সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং মারাঠা রীতির মিশ্রশৈলী' বলে উল্লেখ করেছেন। চতুর্ভুজ গণেশ, নারায়ণ এবং লক্ষ্মীর বন্দনাচিত্র দিয়ে পুথির শুরু। দ্বিতীয় ছবিতে ঋষি বিশ্বামিত্র এবং অপ্সরা মেনকার পরিচয় পর্ব। আর-এক ছবিতে কণ্বমুনি পিতামাতা-পরিত্যক্তা শকুন্তলাকে সযত্নে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন আশ্রমের কুটিরে। শকুন্তলা-দুষ্যন্তের প্রথম পরিচয়, সখীসহ শকুন্তলার বৃক্ষপরিচর্যা, দুর্বাসার অভিশাপ, অনসূয়া-প্রিয়ংবদার ক্ষমা-প্রার্থনা। এ ছাড়া আরো কয়েকটি ছবির বিষয়— তাত কণ্ব, সখীদ্বয়, শকুন্তলা ও সর্বদমন এবং অবশেষে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা। কালিদাস রচনার গীতিময়তা, চরিত্রচিত্রণ, মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের খুঁটিনাটি ধরতে পেরেছেন এই অনামা শিল্পী।

শকুন্তলা আখ্যানের চিত্রায়নে উনবিংশ-শতাব্দীর মহারাষ্ট্র, কেরল এবং বাংলার শিল্পীরাই অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। ত্রিবাঙ্কুর দরবারের শিল্পী রামস্বামী নাইডু 'শকুন্তলার প্রেমপত্র' ছবিতে তিন বন্ধুকে নায়ার মেয়েদের আদলে এঁকেছেন। একটি তালপাতায় চিঠি লিখছে শকুন্তলা আর তার সঙ্গিনীরা উপভোগ করছে সেই লিখনকর্ম। ছবিটি সম্ভবত ১৮৫০ থেকে ১৮৭০-এর মধ্যে আঁকা। দক্ষিণী চিত্রকরদের মধ্যে অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক নিয়ে সবচেয়ে বেশি ছবি এঁকেছেন রবি বর্মা (১৮৪৮-১৯০৬)। ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে আঁকা 'শকুন্তলাস এপিস্‌ল টু হার রয়াল লাভার' মাদ্রাজের প্রর্দশনীতে স্বর্ণপদক লাভ করে। শকুন্তলার চিঠিকে বিষয় করে শিল্পী অনেক তৈলচিত্র এঁকেছেন এর পর। কালিদাসের কাব্যের প্রতি এমন নিষ্ঠা আর-কোনো শিল্পীর ছবিতে তেমন দেখতে পাওয়া যায় নি। শকুন্তলার প্রেমপত্র প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। রাজার জন্য প্রণয়লিপি লিখতে উৎসাহিত করেছিল প্রিয়ংবদা। অথচ লেখবার সরঞ্জাম (কালিদাসের ভাষায় 'লিখনসাধনানি') কালিকলম কোথায় পাওয়া যাবে এই তপোবনে? তাই প্রিয়ংবদার উপদেশ— 'ইমস্সিং সুওদর-সিণিদ্ধে ণলিনীপত্তে ণহেহিং ণিখিতবণ্ণং

করেছি।' এই টিয়াপাখির পেটের মতো নরম পদ্মপাতায় বর্ণনিক্ষেপ করো শকুন্তলা। রবি বর্মা কম করে আধ ডজনেরও বেশি শকুন্তলার প্রেমপত্রের ছবি এঁকেছেন। কোনোটি ডিউক অব বাকিংহাম কিনেছিলেন ; কোনো ছবি বরোদার মহারাজা ১৮৮০ সালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটকে দান করেছেন ; ১৮৮৭ সালের এক ছবি থেকে রঙিন রিপ্রোডাকশন প্রকাশিত হয়েছে মনিয়ার উইলিয়ামসের অনুবাদ গ্রন্থের মুখ-ছবি হিসেবে। বরোদার মহারাজ ফতে সিং মিউজিয়াম, কোচিনের এম এন এফ গ্যালারিতে যে ছবি আছে সবেতেই শিল্পী দেখিয়েছেন শকুন্তলা পদ্মপাতায় আখর ফুটিয়ে তুলছে। এই-সব ছবির অধিকাংশতেই একখণ্ড পাথরের বেদিতে বসে তিন সখী পত্রচর্চা করছে। শুধু ডিউকের সংগৃহীত ছবিতে শকুন্তলা মাটিতে আধোশোয়া অবস্থায় পদ্মপাতায় কলম ছুঁইয়ে ভাবে বিভোর হয়ে আছে। প্রায় সব ছবিতেই তাপসকুমারীদের সাথী এক হরিণ। রবি বর্মার সর্বদমন ভরত ছবিটিতে শিশুর সারল্য ও দৃপ্তভঙ্গিটি একাকার হয়ে গিয়েছে।

রবি বর্মার দ্বিতীয় পুত্র রাজা রাম বর্মার (১৮৭৯-১৯৭০) শকুন্তলার দুটি ছবি বিখ্যাত। একটি অবশ্য 'পত্রলিখন', দ্বিতীয়টি কণ্বমুনির কাছ থেকে 'শকুন্তলার বিদায়'। তেল, জল এবং টেম্পেরা এই তিন মাধ্যমেই তিনি ছবি এঁকেছেন।

মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাত শিল্পী মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর (১৮৭১-১৯৪৪) রবি বর্মার চিত্রকলায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। কালিদাস-সাহিত্য তাঁকে আকর্ষণ করে। বিশেষ করে অভিজ্ঞানশকুন্তল এবং মেঘদূত। শকুন্তলা নাটকের চারটি ছবির জন্য তাঁর বিশেষ প্রসিদ্ধি। 'শকুন্তলা', 'শকুন্তলার পুত্র রাজা ভরত', 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা', এবং 'রাজা দুষ্যন্তের সভায় শকুন্তলা'। মেঘদূতের ছবি এঁকেছিলেন অন্যসূত্রে। ১৯১০ খৃস্টাব্দে পুরুষোত্তম ভি মাওজির 'মেঘদূত অর ক্লাউড মেসেঞ্জার' বইটি চিত্রিত করেন ধুরন্ধর। তাঁর রেখার টান, বর্ণজ্ঞান এবং সংস্থিতি-পরিকল্পনা অনবদ্য।

কালিদাসের অপেক্ষাকৃত কম-পরিচিত কাব্য 'ঋতুসংহার' অবলম্বনে বোধ হয় প্রথম ছবি আঁকলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)। ১৮৯২ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের আদিপর্বের শিল্পকর্মের মধ্যে 'অভিসারিকা', 'বসন্ত', 'পদ্ম ও পরিব্রাজক', 'গ্রীষ্ম' ঋতুসংহারের বিচিত্র বিষয় দ্বারা অনুপ্রাণিত। মেঘদূত অবলম্বনে 'অন্তরীক্ষে সিদ্ধদম্পতি' এই সময়ের সৃষ্টি। ১৩০২ বাংলা সনে তিনি ছোটোদের জন্য লেখেন শকুন্তলার চিত্রিত আখ্যান।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১-১৯৭৫) তাঁর শিল্পীজীবনের সূচনাপর্বে শকুন্তলার চিত্রায়নে আগ্রহী হন। ১৯১১ খৃস্টাব্দে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর প্রদর্শনী সূত্রে তাঁর 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা' ছবিটি কেনেন তৎকালীন বাংলার গভর্নরের পত্নী লেডি হার্ডিঞ্জ। এ ছাড়া ১৯১৩ এবং ১৯২০ সালে আঁকা তাঁর দুটি 'শকুন্তলা' চিত্র মনোরম রঙে রেখায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রথম ছবিটিতে এক ভ্রমরের

থেকে আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত শকুন্তলা মনে করিয়ে দেয় কালিদাসের সেই পংক্তি— 'হলা পরিত্তাঅহ পরিত্তাঅহ মং ইমিণা দুব্বি ণীদেণ দুট্ঠ মহুঅরেণ অহিহয়মাণং।' ১৯২০ খৃস্টাব্দের ছবিতে শকুন্তলা জলসিঞ্চন করছে তরুমূলে। প্রদর্শনীর পরে ছবিটি কিনে নিয়েছিলেন ডব্লিউ আর গুরলে। শকুন্তলা তার সখীদের কাছে বিদায় নিচ্ছে পতিগৃহে অগ্রসরমানা অবস্থায়। আর তার সেই প্রিয় হরিণশিশুটি শাড়ির একটি কোণা ধরে রেখেছে যেতে নাহি দিব ভঙ্গিমায়।

সতীন্দ্রনাথ লাহা (১৯১১-১৯৬৯)-র ঝোঁক ছিল পৌরাণিক বিষয় চিত্রণে। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'শকুন্তলা' আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয় ১৩৫৭ সনে। এই গ্রন্থের জন্য তিনি এঁকেছিলেন কুড়িটি ছবি। এ ছাড়া তপোবনে দুষ্যন্ত এবং রাজসভায় শকুন্তলা তাঁর গ্রন্থ বহির্ভূত চিত্র।

যাঁর যক্ষিণী ছবিটি দেখে অবনীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন 'কৌচে শুয়ে বিরহ দ্বিজবাবুর গানে চলে, কালিদাসে নয়। মানুষের চেয়ে যক্ষরা আরো রম্য দেখতে। সৌন্দর্যের মধ্যে কৃশতা দিয়ে লিখো।'— সেই গুরুর আদেশ শিরোধার্য করেই এঁকেছিলেন মেঘদূতের পঁচিশখানি ছবি। অবনীন্দ্র-শিষ্য এই শিল্পীর নাম শৈলেন্দ্রনাথ দে (... ১৯৭২) ১৯১৬ থেকে বছর দুয়েক ধরে কাশীর প্রখ্যাত শিল্পসংগ্রাহক এক সমালোচক রামকৃষ্ণ দাসের অনুরোধে শৈলেন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন মেঘদূত চিত্রাবলী। বর্তমানে ভারতকলা ভবনের সংগ্রহ। শকুন্তলাকেও এঁকেছেন শিল্পী আর সকলের মতোই।

অন্যান্য কাব্য, নাটকের তুলনায় অভিজ্ঞানশকুন্তল যে শিল্পী ও চিত্রকরদের বিশেষ প্রীতিভাজন একথা অনস্বীকার্য। নীচের তালিকা এই সিদ্ধান্তের পক্ষে অনুকূল বলেই মনে করি।

বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯৩১)— দুর্বাসার অভিশাপ

নরেন্দ্রনাথ সরকার (১৮৮১-১৯৪৩)— শকুন্তলা ও দুষ্যন্ত

মতিলাল পাল— শকুন্তলা থেকে একটি দৃশ্য

গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৬-১৯২৮)— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'শকুন্তলা'র চিত্রণ (১৯১০)

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৫-১৯৪৯)— শকুন্তলা

আর্যকুমার চৌধুরী (১৮৮৭-১৯৩৫)— শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা

সতীশচন্দ্র সিংহ (১৮৯৩-১৯৬৫)— দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা

মুকুলচন্দ্র দে (১৮৯৫-১৯৮৯)— শকুন্তলা

সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৬-১৯৮৯)— তাত কণ্ব

ললিতমোহন সেন (১৮৯৮-১৯৬৫)— শকুন্তলা

রণদাচরণ উকিল (১৯০০-১৯৭০)— শকুন্তলা

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯০২-১৯৫৫)— শকুন্তলা

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৫৫)— শকুন্তলা
কালিপদ ঘোষাল (১৯০৫-)— শকুন্তলা
বিজয় চন্দ্র— দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা
রাধাচরণ বাগচি (১৯১০-১৯৭৭)— অভিজ্ঞানশকুন্তলা
কল্যাণী চক্রবর্তী (১৯৩৩-১৯৬৬)— দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা

তালিকাটি স্বাভাবিকভাবেই অসম্পূর্ণ। এ ছাড়া কয়েকজন শিল্পীর জন্ম-মৃত্যুর সময় উল্লেখ করা গেল না নানা কারণে।

উপসংহারে একটি মজার কাহিনী বলি। শিল্পীর কাছেই শোনা। ভারতবর্ষ পত্রিকায় অবনীন্দ্র-রীতিতে চিন্তামণি কর আঁকলেন রঘুবংশ কাব্যের এক বিয়োগ-বিধুর দৃশ্য— 'ইন্দুমতির মৃত্যুতে অজের শোক'। নাম দিলেন 'অজবিলাপ'। ছবিটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্ত দাস লিখলেন— 'ছবিটির নাম অজবিলাপ না হইয়া ছাগবিলাপ হইলে ঠিক হইত।' ক্ষুব্ধ শিল্পী পত্রিকার সম্পাদকীয় দফতরে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলেন— ছবির নাম ছাগবিলাপ কেন হবে? সম্পাদক হেসে বললেন, 'কৈফিয়ৎ কি দেবো? আপনাকে যে ফেমাস করে দিলাম, সেকথাটা কি বুঝতে পেরেছেন। মশাই, ছবিটা আমাদের ভালো লেগেছে লিখ্‌লে কোনো পাঠক উল্টেও দেখত না আপনার ছবি। এই 'ছাগবিলাপ' লেখাতে দেখুন গিয়ে যাদের 'ভারতবর্ষ' কেনার পয়সা নেই তারাও কেমন পরের কাছে থেকে পত্রিকা ধার করে এনে আপনার ছবি দেখছে।'

চিন্তামণি (১৯১৬) করের প্রিয় বিষয় মেঘদূত। মেঘকে তিনি তাঁর ছবিতে মোহময়ী নারী হিসেবে দেখেছেন। একাধিক ভাস্কর্য ও ছবি সৃষ্টি করে নাম দিয়েছেন 'ক্লাউড মেসেঞ্জার'। তাঁর মেঘনারীকে ঘিরে রেখেছে কয়েকটি মেঘবলয়। ভাস্কর্যের মেঘদূতকে তিনি ব্যালে নৃত্যের আদলে ভাসিয়ে রেখেছেন শূন্যে। মহাশূন্যের কলা-কুতূহলে।

উল্লেখপঞ্জি

Marshall, J. M— *Excavations at Bhita* in ASIAR— 1911-1912, Published in 1915

Annual Report— A.S.I— 1911-1912

Coomaraswamy, A. K.— *History of India and Indonesian Art*, 1927

Chhabra, B.C.— *Sakuntala in Sunga Sculptures* in Roopalekha, Vol. XXXCIII, Nos. 1-2

Agrawala V. S.— Journal of Indian Society of Oriental Art Vol. XIV, 1945

Sivaramamurti, C— (i) *Sculptures inspired by Kalidasa,* Madras, 1942, (ii) *Sanskrit Literature and Art— Mirrors of Indian Culture*, New Delhi, 1970 Memoirs of the Archaeological Survey of India— No. 73.

Chakravarti, Shyamalkanti— (i) *Patralekha— Romance of Letters in Indian Art and Literature*, Calcutta, 1996, (ii) *Sakuntala : echoes and images in Indian art* in Essence of Art and Culture ed Biswas, Roy, Das and Mukherjee, Delhi, 2002.

Banerjee, N.R— *'Parvati's penance as revealed by the eloquent stones of Nepal'*, Ancient Nepal, 2, pp 27ff

Pal Pratapaditya— The Art of Nepal, Part-I, pp 147-151

কমল সরকার— ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী, কলকাতা, ১৯৮৪

১৪১২ শ্রাবণ

সম্পর্ক চিত্রকলা

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচার বিশ্লেষণ করে মা যেমন ছেলেকে ভালোবাসে না, আমাদের ছবি আঁকার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ঠিক সেই রকম। হয়তো বিচার বিশ্লেষণ তার তত্ত্বের সমারোহে শিল্প রচনায় ব্রতী হতে পারলে আরো কিছু পাওয়া যায়। যে-সব থেকে সত্যিই আমার শিল্প জীবন একেবারে বঞ্চিত। প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত ছবিই আঁকি। সেই সঙ্গে যা সাবলীলভাবে আমার মধ্যে আসে তাকেই পটে ফেলি, নয় সে নিজেই এসে বসে। এটা তো ঠিক সবার সব-কিছু ভালো লাগবে এমন তো হয় না, তাহলে তো মন্দ বা ভালো না লাগে শব্দ বা বোধটাই থাকত না।

আমার আলাদা করে শিল্প সম্পর্কে কিছু লেখা সম্ভব নয়, আর পারিও না। তাই যা আমায় ভালো লাগায়— মনে বিশেষ অনুভবের সৃষ্টি করে তাকে নিয়েই আমার ছবির সংসারে আঁকা, কথা বলা, সবই। এমন রোজের কথা বলা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলা, জানতে চাওয়া, বুঝতে চাওয়া আমার মতো তাদের মধ্যেও সুখ বা দুঃখরা কেমন করে খেলা করে। যাদের কথা বলছি তারা সবাই আমার ভোর বেলার স্বজনরা— আলো আঁধারি পরিমণ্ডলে যখন বেড়াতে বের হই এদের সঙ্গেই আমার দেখা একেবারে উষালগ্নে। এরা কোনো মন্ত্র পাঠ, পূজা পাঠের মাঝ দিয়ে দিন আরম্ভ করে না। এরা সকাল মানে ভোর বোঝে। আর কাঁধের বোঝা নামিয়ে সন্ধে বোঝে। এরা ভিখিরিও নয় নিজের পায়ে চলে উপায় করে যতটুকু করে তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে আবার পরের ভোরে বের হবার জন্যে শুয়ে পড়ে। এদের এই উদয়াস্ত জীবনের অনুভব সব আমায় আমার শিল্পচর্চায় আশ্চর্যভাবে প্রেরণা দেয়। ভোরের পাখির ডাক, রাতজাগা কুকুরদের রাস্তায় ধারে শুয়ে থাকা— দূর থেকে কারুর ঘরের জানলা দিয়ে ভেসে আসা দেহতত্ত্বের কিছু কলি যেমন ভালো লাগায়, ভোরে সূর্যোদয় যেমন দ্যুতি ছড়ায়— এদের টুকরো টুকরো অনুভব আলেখ্যও আমায় উৎসাহিত করে যেমন, তেমন সত্যি সত্যকে বুঝতে, জানতে সাহায্য করে। কী পাই এদের কাছ থেকে। এদের কাছ থেকে অমূল্য কিছু বোধের স্পর্শ পাই। যা তারা নিজেরাও জানে না। এরা কেউ অসুখি নয়। বিরাট সুখের পেছনে আমাদের মতো দৌড় দেয় না। এদের সঞ্চয় বলে কিছু নেই। এরা জীবন চালায় ঠিক একটি নদীর মতো। নদীর যেমন ঋতু অনুযায়ী জলের কমা বাড়া শুকিয়ে যাওয়া আছে এদেরও ঠিক তেমনই আছে— এই-সব মানুষদের সঙ্গেই আমার প্রথম দেখা— ভগীরথ খুব অসুস্থ— সুগারের অসুখ,

রাস্তা পার হওয়ার সময় এক যুবকের উড়ন্ত মটর বাইকের ধাক্কায় হাড়, পাঁজর ভেঙে ঐ ময়লা কাগজের স্তূপের মধ্যেই শুয়ে আছে। ভোরবেলায় দেখতে গেলুম। ভগীরথ কথা বলতে পারছে না— যন্ত্রণায় অস্থির তবু সঙ্গীসাথীদের বলে ওর কোমর থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে এটাতে বাইকের নম্বর নেওয়া আছে। থানায় ডাইরি করলে কিছু হবে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। আর ভাবি— ভগীরথ তুমি কি জানো এ-সব ভাবনা একেবারে অন্যায়। ভুলেও ভেবো না তোমার রোজ থানায় যাওয়া আসা বেড়ে যাবে। জানো না রাত পাহারার পুলিশরা তোমাদের সঞ্চয় ঐ ভোরবেলায় কীভাবে কেড়ে নেয়— না দিতে পারলে— থানায় চালান করে দেয় নানান দোষারোপ দিয়ে। এমনই ভাবে ভগীরথ ঐ খানেই আছে। আজ জিজ্ঞেস করলুম— হ্যাঁ হে, তোমাদের ভগীরথের কি খবর? তিনচার জন সহযাত্রী বললে— ওর কালীঘাটে নাম লেখানো হয়ে গেছে কাকাবাবু।

এইখানেই আমার ছবির মূল সুরের পাওয়া। কত কম কথায় একটি নিশ্চিত সত্যকে জানিয়ে দিলে। ছবিও তাই। আমার কাছে মনে হয় ছবিকে এমনভাবেই পটে বসাতে পারলে— রসিকের আর তার ভেতর প্রবেশ করতে বাধা পেতে হয় না। নিজেদের ছবির সামনে হাতড়ে হাতড়ে বোকা হতে হয় না। চিত্রকর ভাষ্যকারের ভূমিকায় আমার কিরকম সংকোচ লাগে। চিত্র রচনা একটা দিক, আবার তাকে জনে জনে বোঝানো এক ভিন্ন কাজ। আমার নিজের অনেক সময় মনে হয়, আর সেই মনে হওয়া আমায় ভরসা জোগায়। কত হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা শিল্প রচনা করে গেলেন— তাদের শিল্পকর্মের সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দরকে দেখতে জানতে পাঠ তো নিতে হয় না। তাকে জানানোর জন্যে ঐ শিল্পীকুল তো সশরীরে উপস্থিত নেই। আসলে সূর্য ওঠা, চাঁদ ডোবা— জলে মাছেদের সাঁতার— এ-সব অসংখ্য ছবিকে বোঝাতে হয় না। শিল্পের বেলায় আমাদের এত আয়োজন কীভাবে জায়গা করলে। কোনো ছবি আখ্যানধর্মী হতেই পারে কিন্তু ছবি হিসেবে তার একটা ভালো লাগার দিক আছে। আখ্যান বুঝছি না কিন্তু শিল্পকর্মের মহিমার সঙ্গে যুক্ত হতে কোথাও আটকে যাচ্ছি না।

অজন্তাগুহায় বুদ্ধ তাঁর জাতক নিয়ে আমরা অনেকেই জানতে না পারি— কিন্তু ছবি হিসেবে অজন্তার ঐ দেওয়াল রসিককে এত উন্মনা করে দেয় কেন? কেন ঐ ছবি রসিকের হাত ধরে অন্য ব্রহ্মাণ্ডে পৌঁছে দেয়। আমার কাছে শিল্পের প্রথম শর্ত— একটি হৃদয়কে দ্রবীভূত করা। যুক্তি ছবি নয়। আগে ছবি। তার পিছু পিছু তো যুক্তির পদচারণা। ছবি বেহিসেবের মধ্যেই হিসেবের জ্ঞানেই চলে। তার আসা যাওয়া ছকবাঁধা সাজানো রাস্তার ওপর দিয়ে নয়। উত্তীর্ণ সব সৃষ্টিই হিসেবকে উতরিয়ে গেছে। হিসেব তার গণ্ডীর মধ্যেই চলাফেরা করে। শিল্প তো তার কোনো আমল দেয় না এমন তো নয়। কিন্তু সে কোনো দিনই বশ্যতা মেনে নেয় নি। এ তার নিজস্ব বন্যতা। শিল্পকে কোথাও কষে বাঁধা যায় নি। যে শিল্প সারাক্ষণ প্রকৃতির লীলায় মুগ্ধ সেখানেও প্রকৃতির

সব মুগ্ধতার মধ্যে নিজের ভালোলাগার অনুভবকে যুক্ত করেছি বৈকি। সেই যুক্তিকরণের ফলেই তো এমন সব কালজয়ী সৃষ্টি আমাদের নিত্যজীবনের বাঁকে বাঁকে দেখতে পাই। ঘোড়াকে তুমি দেখলে আমি দেখলুম। সে দেখলে তবু রাঢ়ের শিল্পীরা একভাবে দেখলে— দক্ষিণের শিল্পীরা ভিন্নভাবে দেখলে— কিন্তু সবাই নিজের নিজের মতো করেই আসল ঘোড়ার সামনে নিজের ঘোড়াটিকে গড়ে তুললে। হুবহু ঘোড়ার সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেই বোঝা যাবে— শিল্পী কতটুকু বাদ আর গ্রহণের ভেতর তার ঘোড়াটি রূপ দিলে। ঘরে ঘরে সে ঘোড়া মানুষ আদর করে অন্দর মহলে নিয়ে বসালে। বার দুয়োরের সিংহ দরজা সাজালে আবার সে ঘোড়ার আকার নিয়েই মনসা তলায় মানত করলে। এ ঘোড়ার বাজি জেতার জন্যে নয়— এ ঘোড়া হৃদয় জয় করার জন্যে গড়ে উঠল। সারা বিশ্বময় এমন সব শিল্পই মানুষকে তার মনকে তার হৃদয়কে দ্রবীভূত করে রেখেছে।

শিল্প নিয়ে কত বাকবিতণ্ডাই তো হল এবং হচ্ছেও। তবু যা চিরকালের বলে সৃষ্ট হল তাকে হাজারো শব্দের ভিড়ে মুছে দেওয়া গেল না। আবার যা চিরকালের মতো সৃষ্টি শিল্পসম্পদ বলে গ্রহণীয় হল না তাকে শব্দের হাজারো বাঁধনে ধরে রাখা গেল না। বলে না কালোত্তীর্ণ। এই কালকে অতিক্রম করে উপস্থিত থাকার শিল্পের শৌর্য, লাবণ্য, নন্দনময়তাই আলাদা। বলি না যুক্তি দিয়ে কিছু দূর চলা যায়— সবটা নয়। যুক্তিকেও সরে দাঁড়াতে হয় ঐ-সব শিক্ষা চৈতন্যের রূপের কাছে। এত তর্ক, এত সমসাময়িক, এত আজকের অরণ্যে পারা গেল কি আর-একটি শিবলিঙ্গ গড়ে দিতে। শিল্পীর কোন্ সে দৃষ্টি, সে কোন্ অন্তরনয়ন— যার ক্ষমতায় এমন একটি নরনারীর চিত্র চিত্রন করা সম্ভব হয়েছে। কত অহেতুক সাজসজ্জা বাদ দিয়ে তার আত্মাকে এক অনবদ্য রূপ উপহার দেওয়া হল। নিজেই আশ্চর্য হয়ে ভাবি আর গর্ববোধ করি এমন একটি সৃষ্টির সৃষ্টভূমি এই দেশ, এই ভারতবর্ষ— এই আমারই দেশ। তবু আমরা শিল্প বিবাদে লিপ্তই থেকে যাচ্ছি। শিল্পকে আমার ভূমি এক ভিন্নমাত্রায় দেখেছে। শিল্প সংগীত সাহিত্য এ-সবকে কেবল স্থূল ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে অসীমের অংশ হিসেবেই দেখার অভ্যাসে, সত্যকে জানতে চেয়েছে। আমাদের এই চর্চা ভাবনা অনুভব কারিগরী উদ্ভাবন সবই অঞ্জলীর উৎসর্গে পূর্ণ। আমাদের পূর্ণকে আত্মস্থ করার সাধনাই সাধনা। শিল্প আমাদের সেই অপার্থিব সম্পদ। শিল্প যে আমাদের বিনোদনের চর্চা নয় এ সত্যই বার বার ধ্বনিত হয়েছে। আমরা অনেকে সে অনুভবের কাছাকাছি যেতে চাই নি।

আমাদের হুবহু থেকে গ্রহণ করা কি রকম, আমার নিজের মনে হয়— ডালকেই বেটে ফেটাতে ফেটাতে এমন এক স্তরে পৌঁছয় যখন তাকে জলে ফেললে আর ডোবে না। দুধ থেকেও যে মাখন বের হয়ে আসে তাকে দুধে ফেললে সে ভাসতেই থাকে। জলের ফেনা— সেই জলে তৈরি হয়েই জলে ভাসে। আমরাও তেমনভাবেই ভাসার সত্য নিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেছি— যার ডুবে যাবার কোনো শঙ্কা নেই।

এমনভাবেই তো আমরা সকলচর্চার মূলকে বুঝতে চেয়েছি জানতে চেয়েছি।

শিল্পীর শিল্পগুণের সঙ্গেই তো জড়িয়ে আছে চরিত্রগুণ। আমরা তো অনেক ক্ষেত্রে সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্ক দেখার চোখ তৈরি করতে চাই না। এত যুক্তি দিয়ে চলে না। নিজের কাছে নিজেই ধরা পড়ে যাই। শিল্পীর অনেক গুণাবলীর মধ্যে একটি অসম্ভব জরুরি, তা হল শিল্পীর ছলনা চলে না। ছলনা শিল্পীকে আশ্রয় করলে সে ছায়ায় শিল্প থাকে না। আমরা তো দিনের পর দিন অনেকেই ছবির সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ও করে চলেছি। এও বাঞ্ছিত নয়। শিল্পী হবে শিল্পের মতো। পিতল বা তামার পাত্রে যেমন টক রাখা যায় না ঐ ঠিক তেমনই। একজন শিল্পীকে মনে রাখতে হবে সে কিসের সঙ্গে কোন্ অনুভবের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছেন। শিল্পীকেও ব্রত পালনের অনুসরণ করতে হয়। তপস্যা শব্দটি আমাদের কাছে বড়ো ভারী মনে হয়। এই শব্দের সঙ্গে অধ্যাত্ম প্রক্রিয়া জুড়ে দিয়ে আলাদা করে রাখতে চেয়েছি। আর সেই রাখাকেই অনেক ঝরঝরে মনে করতে চেয়েছি। শিল্পের সঙ্গে শিল্পী একমাত্র সম্পর্কিত এ ভাবনাও তো পূর্ণ নয়। সম্পর্ক তখনোই পূর্ণ যখন সে সঞ্চয়নে ছন্দোময় হয়ে ওঠে। গান গাইতে গাইতে রসিককে হাত ধরে তাতে সামিল হওয়ার হাঁক দেয়। কীর্তনও তো তাই। শিল্পের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক জন্ম থেকেই। শিল্পের পট তো কেবল বিশেষ কিছুর ওপর গড়ে ওঠায় নির্ভর করে না। শিল্প সৃষ্ট হয়ে আবার তার বিলীন হয়ে যাওয়ার আশ্চর্য দিকটাও শিল্পেরই অন্তর্গত। রোজ সন্ধে হয়, রোজ ভোর হয়— রোজ সন্ধেকে আহ্বান করে শাঁখ বাজাই প্রদীপ জ্বালি— ঊষালগ্নে আহ্বানের কৃত্য সম্পন্ন করি কিন্তু সে কেবলমাত্র একটি দিনের মতো করে পূর্ণ। রোজ শিল্প এমনভাবেই এসে আমাদের সম্পর্ক যেমন গড়ে দিয়ে আবার আসার আর দেখার অপেক্ষাও দিয়ে যায়।

প্রতিদিন আলপনা— প্রতিদিনের জন্যে। অথচ তাকে ক্ষণস্থায়ী বলা যাবে না। তার আসা যাওয়ার মধ্যে উভয়ের সম্পর্ক গড়ে দেওয়ার এ এক অসাধারণ শৈলী। প্রতিদিনের এই চারুদৃষ্টি এক ভিন্ন রুচিকে গেঁথে দিয়ে যায়, হৃদয়ে— এই সম্পর্কই হল সত্যিকারের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক ভুলে যাওয়া নেই। এ সম্পর্ক প্রতিদিন নিজেকে চেনার এক আশ্চর্য কষ্টিপাথর। এই সম্পর্কি শিক্ষাই তো একদিন জীবনকে শেখালে এ জলপাত্রের সৌন্দর্যকে এর প্রথম আয়োজন। প্রয়োজনে, —প্রয়োজনের কারণেই কেবল চুপ করে থাকা হল না। প্রয়োজনে পাত্র গড়ে উঠল। সেখানেও চুপ করে থাকা গেল না। পাত্রের গায়ে নকসা জায়গা নিলে। চারিপাশের নিত্যজীবনের জীবনকে অবলম্বন করে যে মানুষটি কেবল মাত্র পাত্রে জলপানে তুষ্ট হত সেই একদিন চিত্রিত পাত্র ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে বললে— বাঃ। এই বাঃ এর সঙ্গে আমাদের ভেতরের যোগ। আমরা বলি— কেউ শিল্প বোঝে কেউ বোঝে না। আসলে তা নয়, প্রত্যেকেই শিল্প বোঝে তার নিজের মতো করে। বোঝার তারতম্য থাকতেই পারে। তারতম্য কোথায় নেই? প্রতিটি ক্ষেত্রে এই তারতম্যের নৃত্য বর্তমান। আমরা যদি আরম্ভের সময় থেকে দেখি— আরম্ভ বলতে সভ্যতার প্রথম পর্ব থেকেই ধরি, দেখব শিল্প তার প্রকাশের

আশ্চর্য উদ্ভাস ঘটিয়েছে এই আমাদের মানুষের সম্পর্কের ভেতর দিয়েই। শিল্পই মানুষকে মানুষের সঙ্গে যোগ ঘটিয়েছে— শিল্পের সম্পর্কই এ বিশ্বপ্রকৃতির লীলার অপরূপকে তুলে ধরেছে। শিল্পই তো কালোত্তীর্ণ ইতিহাসের কথকথা। শিল্পই মানুষের রুচির চোখ গড়ে দিয়েছে কালের পর্যায়ে পর্যায়ে। চিত্রকলা এমন এক সম্পর্ক যা আত্মার মতো অবিচ্ছেদ্য। দেখেন না একান্ত জনের বিয়োগ ব্যথায় নতজানু হয়ে শিল্প মণ্ডপে মণ্ডিত বেদির পাদমূলে প্রদীপ ফুল বা করজোড়ে প্রার্থনা জানাচ্ছে। এই হৃদয়ের সম্পর্কই তো আজ থেকে যত ফেলে আসা পথের দিকে অগ্রসর হই দেখব, শিল্প আমাদের সংসারের পরিবারের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিল্প সম্পর্কই তো ধর্ম। ধর্ম বলতে আমাদের ভাবনার মধ্যে এক অদ্ভুত আচরণ দেখা যায়। ধর্ম শব্দটির ব্যাপ্তি আরো বৃহত্তর বুদ্ধির দিক দর্শায় তা তো বুঝতেই চাই না। আমার বেশ মনে পড়ছে শিল্পী বিনোদবিহারীকে বেদনার সঙ্গে জানিয়েছিলুম শান্তিনিকেতনের বুকে আপনাদের গড়ে দেওয়া শিল্পকৃতি সব কেমন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেখলে কষ্ট পাই। খুব সুন্দর একটি উত্তর পাঠিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, "বড়ো সহজের প্রাপ্তিকে আরো সহজে হারাতে হয়।" আমার নিজের মনে হয়— দেশের বহু এমন সম্পর্কীয় চিত্রকলা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে কেবলমাত্র ধর্মীয় অজ্ঞতায়— সেদিনও তো প্রত্যক্ষ করেছি বামিয়ানের বুদ্ধের পরিণতির লীলাকে কিন্তু শান্তিনিকেতনের এ শিল্পকর্মের নষ্ট হওয়ার পেছনে কোনো ধর্মীয় অন্ধতা কাজ করে নি। কেবল অবহেলা, অবহেলা আর অবহেলা। যে সম্পর্কের আদরে ভালোবাসায় শিল্প তার বসতি গড়লে সেই ভালোবাসার ঘাটতি হতে হতে যবে অবহেলায় দাঁড়ালে তবে থেকেই সম্পর্কের মুছে যাওয়া।

জনজীবনের সঙ্গে চিত্রকলার এ এক অমোঘ সম্পর্ক। উঠতে বসতে আমরা একসঙ্গে ধাক্কা খাই। যদি ভালো করে চারিপাশ চেয়ে দেখি ঘরে কিংবা বাইরে সর্বত্র এই সম্পর্কের লীলাতেই পূর্ণ। একটি গাছকে অবলম্বন করে একটি লতা যেমন তার বেড়ে ওঠার ছন্দে পূর্ণ হয় তেমনই মানুষকেই অবলম্বন করে চিত্রকলা তার পূর্ণতায় স্বচ্ছন্দ হয়। চিত্রকলার আর-কোনো বাইরের দোসর থাকে না, সে হয় অন্তরের গভীরতম অনুভূতির চেনা বিশেষ। "এই সম্পর্কের কথাতেই চুঁচূড়ার সেই ছোট্ট ফুটফুটে কন্যাকে মনে পড়ছে। একটি প্রদর্শনী উপলক্ষে গেছি— হঠাৎ ছোট্ট কন্যা আমায় জিজ্ঞেস করলে তুমি ছবি আঁকো? বলি, হ্যাঁ তো। সে বললে— ছবির সঙ্গে কথা বলতে পারো? আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললে আমি কিন্তু আমার পুতুলদের সঙ্গে কথা বলি। নিজের মনেই বলি আমিও তো ছবির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছি, পারছি কোথায়?

প্রসঙ্গত আমার নিজের মনে হয় চিত্রও মানুষের উত্তাপ চায়— যেমন আলমারিতে রাখা বইসব সজীব হাতের ছোঁয়া চায়। ঠিক গৃহিণী যেমন আলমারিতে তার জিনিসপত্র স্পর্শ করেন। আসলে চিত্রকলা কোনো বাঁকা বস্তু বা সৃষ্টি নয় যাকে কেবলই ঘুরপথে জানতে হবে। চিত্রকলার সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক তেমনই যেমন সূর্য আলো দেয়, বাতাস

হিল্লোল তোলে, বর্ষা জলের কথা বলে যায়। এই সম্পর্কের দিকটার প্রতি চিত্রকরেরও বেশ কিছু করণীয় থাকে। এটা তো আজ বুঝতে পারি চিত্রকলা ছবির ব্যাকরণে আবদ্ধ নয়। ছবির কাজ আরম্ভ তখনোই হয় যখন তাতে ব্যাকরণের আবরণ জড়িয়ে থাকে না। যখন একটি ফুলকে ভালো লাগে— এই ভালো লাগার আগে তার পাপড়ি গোনায় মন দিই না। আগে তার ভালোলাগার পূর্ণতাকে চোখ ভরে মন ভরে গ্রহণে তৃপ্ত হই। তবে তার আর-কিছু দেখা। নীল আকাশের গায়ে একঝাঁক পাখির উড়ে যাওয়ার ছন্দলীলার দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকার তন্ময়তায় কটি পাখি ডানা মেলে ভেসে যাচ্ছে তা তো গুনি না। ঠিক এমনটিই সম্পর্ক গড়ে ওঠে ঐ চিত্রমালার সঙ্গে।

শিল্পকলার সঙ্গে মানুষের বসবাস— কেমনটি ছিল— তারো মনোলোভা হৃদয়-পূরণ সামগ্রী আজও আমাদের সামনে বিরাজ করছে। ভাবি কোনো সম্পর্কের তাগিদে গভীর অরণ্যে পাথরের গায়ে মানুষ আঁচড় কেটে জানাতে চাইলে তার অন্তরকে। তার ভালো লাগাকে? এ-সবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে প্রত্যয় হয়। আহার, নিদ্রা, মৈথুনই একমাত্র জীবন নয়— এর পরেও কিছু আছে— যা নিত্য আনন্দে পূর্ণ রাখতে সমর্থ হয়। দুলে দুলে মানুষ মাদলে তাল দিলে, তালের ছন্দে নরনারী ছন্দে ছন্দে দুলতে দুলতে তাকে গ্রহণ করলে। এই ছন্দ তালের সঙ্গে সুর সঙ্গী হলে— রসিক তা দেখে ভুলে গেল না তাকেই, পাথরকে পট করে এঁকে চিরস্থায়ী করলে। শিল্পের সঙ্গে এমন লীলার সম্পর্ক মানুষের। চিত্রকলা কেবলমাত্র যা দেখছি তাই নয়—, প্রকাশে সংযুক্ত হলুম সেটাই বড়ো কথা।

যা দেখছি তাই নয়। যা দেখে আমার অন্তর দৃষ্টির উন্মোচন ঘটল, তারই প্রকাশ। আর সেই কারণেই তো আমাদের সর্বত্র এমন শিল্পসম্ভারের ছড়াছড়ি, বিস্তার। প্রতিটি মুহূর্ত আমরা ধনী নির্ধন কোনো দিন শিল্প ছাড়া হই নি। কোনো দিন।

চিত্রকলার সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে, কোনো লক্ষণ রেখার আঁচড় নেই। এ সম্পর্কে কোনো জাত নির্ভর নয়, কোনো সীমানার মধ্যে ঘোরা ফেরায় সে অভ্যস্ত নয়। সে মুক্ত।

পালাপার্বণের মহোৎসব থেকে শুরু করে গৃহকোণে একটি কুলুঙ্গীর মধ্যে ধীরে জ্বলে থাকা প্রদীপদানীতে যে টলটলে আলো, তার দিকে তাকালেই বুঝতে পারব, চিত্রকলার পটের কি বিস্তার। সব গৃহকোণই তাঁর গৃহ। তাই তো মন্দির গড়ে ওঠার পর— সম্রাট বলছেন— প্রভু, বিশ্ব তোমার গৃহ তবু আমার এই গড়ে তোলা ছোট্ট আলয়ে অধিষ্ঠান করে আমাদের কৃতার্থ কর। এই প্রার্থনা তোমার কাছে।

উৎসর্গের আচার আচরণ আহ্বানের আচার আচরণের মধ্যে সুন্দরের এক অসাধারণ পার্থক্যের মাঝেই সমন্বয়কে দেখতে পাই।

আমি যে জায়গায় বসে চিত্রাভ্যাস করি, সে-পথ দিয়ে নানান মানুষের আসা যাওয়া। সারাক্ষণ আসা যাওয়ার মানুষদের মধ্যে ফেরিওয়ালার ঘোরা ফেরা অনেকটা এই ডেকে যাওয়া হেঁকে যাওয়ার জানানের মধ্যেই তাদের কর্মের ধর্মকে বুঝতে পারি।

একটি ডাকের ধরন আমায় তার জীবিকা তার চেহারাকে বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করে। এরাই আমার নিত্যদিনের চিত্রকল্পের বিষয় হয়ে ঘোরা ফেরা করে। একটি ধুনুরীকে সমঝে দিতে তার তাঁতের আওয়াজই যথেষ্ট। এরা সর্বক্ষণ আমায় শিল্প বাতাবরণে বাঁচিয়ে রাখে। এদের পদচারণের মধ্যেই কোনো কৌতূহলী হাঁক দেওয়া মানুষ খানিক দাঁড়িয়ে আমার চিত্রচর্চা নিরীক্ষণ করে। সব বেচাকেনা ভুলে ঠায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। কেউ খুব হালকা— ধীর শব্দে জানলার ওপার থেকে শুধোয়— বাবু একটা কথা জিজ্ঞেস করব—? বলি— বল। আচ্ছা, তুমি কি কেবলই পট আঁকো। হ্যাঁগো আমি কেবল পটই আঁকি। এ-সব কি মন থেকে ফুটোও? না গো— তোমরা যে হাঁক দিয়ে আমার জানলা বেয়ে চলে যাও, আবার আমার সামনে খোলা জমিতে যে ফুল ফোটে, যে পাখিরা গান গায়, আবার তাদের ধরার জন্যে যে বেড়াল সতৃষ্ণ নয়নে ডালের ওপর বসে থাকা পাখির দিকে তাকিয়ে থাকে, এরা তোমরা সবাই আমার পট গড়তে সাহায্য করো। তোমরা না থাকলে, না হাঁকলে না এসে দাঁড়ালে একজন চিত্রকরের কি সাধ্য যে রচনায় মন ডোবায়। সে জানলা ছেড়ে যায় না— আবারও জিজ্ঞেস করে বাবু তুমি একাজ করতে করতে থকে যাও না। না গো। আমাদের থকে যাওয়া হয়ে ওঠে না। আসলে যাকে ভালোবাসি তার জন্যে থকে যাওয়া জায়গা করতে পারে না। আরো কিছুক্ষণ দেখে সে তার পসরা তুলে হাঁকতে হাঁকতে মিলিয়ে গেল। এমনভাবেই রোজ এসে এমন সম্পর্কের মানুষরাই আমায় চিত্রকলার পাঠ দেয়। তারাই বলে যায় চিত্রকর— ভালোবাসায় গড়ে ওঠায় সচেষ্ট হও। ভালোবাসায় গড়তে পারলে হারবার শঙ্কা কাজ করে না। ভাঙেও না। আরো বলে চিত্রকর, যে রচনায় তোমার হৃদয় বেজে ওঠে জানবে আমাদের হৃদয়ও তাতে হিন্দোলিত হয়। মন ভালো লাগা ছুঁয়ে যায়। অনেক সময় মনে হয়— চিত্র ক্রমশ নেসফিলড ব্যাকরণ বই-এর মতো হয়ে যাচ্ছে না তো। ব্যাকরণে সব ঠিক আছে— তবু মনে হয় তার মধ্যে রস নেই। এ সত্য চিত্রজীবনে ঘটতে থাকলে—, যে সম্পর্ক নিয়ে এত ভাবনা তা শুকিয়ে যেতে বাধ্য।

চিত্রকলা— সব হিসেব মতো মেপে মেপে চলে না— এই হিসেবের কঠিন গরাদ ভেঙে সে বাইরে এসে বলে তো নিয়মের মাপে আমার থাকা নেই। বেহিসেবের হিসেবেই আমার আনন্দ। সেখানেই আমার আমি। একদিন আমার এক ছাত্র দেখলে— গাছের গোড়ায় রাখা কিছু নুড়ির ওপর ভক্তিভরে একজন জল ঢালছে। তা দেখে তার হাসি আসায় ঐ জল ঢালতে থাকা মানুষটি বললে— খোকাবাবু, তুমি হাসছ? জানো কি এই পাথরের টুকরো পাহাড়ের গা থেকে যখন খসে পড়লে তখন তার সারা শরীর ছিল নানান খোঁচায় কোণে কোণে পূর্ণ। কতকাল কতবছর অন্তহীন চলতে চলতে কোনো জন তাকে তুলে নিলে— তুলে নিয়ে রাখলে গাছের গোড়ায়। দেবতাজ্ঞানে মানুষ তার শরীরে জল ফুল দিয়ে অঞ্জলি দিলে— বুঝেছ বাবু— পুজো পেতে গেলে নিজেকে এমনভাবে গডতে হয়— একেই আমরা বলি তপস্যা।

এমনভাবেই হাজারো সম্পর্কের কথা চারিপাশ ভিড় করে আছে। যাকে অবলম্বন করেই চিত্রকর চিত্রকল্পের। রসদ পেলে এমন অনেক কথাই থেকে যাবে কেন-না এ সম্পর্ক নিত্যনতুনভাবে যুক্ত হয়ে চিত্রকরের সামনে উপস্থিত হয়। এদেরই আবার প্রতিষ্ঠা দেওয়ার কাজেই চিত্রকর নিমগ্ন হন। তবু বলি, চিত্রকল্প, সে চিত্রে হোক সংগীতে হোক, সাহিত্যে বা নৃত্যে হোক, আসল হল এ সম্পর্ক রস পরিবেশনের। এ-সবই যে রসবৈশব বোধের এক একটি অঙ্গ, একথা যেমন চিত্রকরকে বুঝতে হবে, তেমন সে বার্তা পরিবেশনে যথাযোগ্য হওয়ার কথাও ভুললে চলবে না।

এই চিত্রকলার সঙ্গে চিত্রকর আলাদা নয়। এর সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে যে শিল্পীর মূল সম্পর্ক সে কথাও যেন ভুলে না যায়। একজন শিল্পীকে এমন সম্পর্ক লালনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করার চেতনারও একান্ত প্রয়োজন। আমি একজন চিত্রকর হয়েই বলতে আটকে যাচ্ছি না— এই সম্পর্কতেই আমাদের পট পূর্ণ হয়ে ওঠে। একটি তেমন পটের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো রসিক দেখতে থাকার ছবিই আমার সবচেয়ে বড়ো পাওয়া। বলি, অর্থ, প্রশংসা কোনো খাটো করে দেখার বস্তু নয়, তবু এর বাইরেও কিছু আছে, যাকে ছোঁয়ার দুর্লভতা এই চিত্রের মধ্যেই বিরাজ করছে। চিত্রকর এও যেন ভুলে না যান এই সম্পর্কের ভেতরই তার বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা। এই সম্পর্কের মধ্যেই তার চিত্র ও চিত্রকর নিত্য খেলা করছে।

এই সম্পর্কের কথাতেই বলি— আমার ছবির কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে আমার মনে পড়ে দুমকার পটচিত্রীকে। তখন চারপাশ পায়ে হেঁটে ঘুরি— তখন লোকশিল্প লোকশিল্প ও শিল্পী বলে এত রব ছিল না। আজ যত রব বাড়ছে ততই দেখছি সংস্কৃতির দুনিয়াটা কিরকম স্তরে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ভালোবাসার উচ্ছ্বাসে এই লোকশিল্পীদের শিল্প রচনাগুলিকে খোলা মাঠের ভিড়ে আসন পেতে দিলুম আর নিজেরা রইলুম চারদেওয়ালে ঘেরা রোশনাই-এর মধ্যে। নন্দলাল কিন্তু ঐ মেলার উৎসবেই মাটিতে নিজের ছবি বিছিয়ে মানুষের সামনে মেলে ধরেছিলেন। আমার এমন কথা সব মনে হচ্ছে কেন? মনে তো হয়ই— আমার ছবি আঁকার পাঠশালায় তো এমন ফারাক দেখি নি। বলতে পারি আমাদের সে সময়ে এত ফারাক তৈরি হয় নি। তাই লোকশিল্পীদের নিয়ে কোনো ছলনা ছিল না। কলাভবন প্রাঙ্গণে তো পটুয়ারা অনায়াসে নিজেদের জায়গা বলেই যাওয়া আসা করেছেন, তখন পৌষমেলাতেও পটুয়াদের পট বিছিয়ে বেচাকেনার এত চল ছিল না। ছিল শিল্পের আরো সব রচনার। আরম্ভেই এমন-সব কথা বলছি কেন? ঐ যে আরম্ভেই দুমকার পটুয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলুম— ঠিক এমনভাবেই তুমি পট আঁকো কি করে? যখন পটে ছবি বসাও তখন কি ভাবো কি ধরনের রঙ মানাবে। কেমনভাবে সাজাবে এমন সব কথা। মাটির দাওয়ায় বসে তার পেছনে দেওয়ালে ছবি— খড়ের চালার রঙের সঙ্গে ঐ মাটির দেওয়ালের রঙের মিল আর তার মাঝে ছবি যে কি সুন্দর লাগছে। এই দেখতে দেখতে তখন মনে হচ্ছিল এরা কত সহজে দেওয়ালে ছবি আঁকে। কখনো ভাবে না একে

চিরদিনের করে রাখা যাবে কিনা। এ যেন ঋতু পরিবর্তনের ছন্দের মতো। বর্ষায় ধুয়ে তো যাবেই আবার দেওয়ালে ছবি হবে। এ যে তাদের জীবনের ভালো লাগার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে। তাই এরা শিল্প রচনার দিকটাকে আলাদা মাত্রায় দেখে না তো।

ঐ জিজ্ঞাসার উত্তরে গ্রামীণ পটুয়া বললে আমি কি বলব। তুমি বলবে আমি শুনব। এ-সব ছবি তো আপনা আপনিই ফুটেছে। খানিক থেকে ঐ বয়স্ক চিত্রকর আমাকে অবাক করে দিয়ে সামনের ফুটে ওঠা ফুল ভর্তি গাছ দেখিয়ে বললে— উরা কি করে ফুটে— উরা যেমনভাবে ফুটে আমার ছবিও তেমন করেই ফুটে। এর বেশি আর জানিই না। তোমরা কত জানো। তোমরা কত শিখিছ— গড় গড় করে কথা বল। আমরা তা পারব কেনো।

ঠিক আমারই স্বগোত্রীয় ঐ গ্রামীণ পুটিয়ার কথাতেই তো বলতে হয়— আমাদেরও বহুমানুষ এমনভাবেই জিজ্ঞেস করে। কেমনই কি (কখন) সত্যিই তো কেমন, কি, কখনোর কোনো উত্তর হয় না। আসলে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই কৌতূহল কাজ করে। জানার ইচ্ছে হয়। ঠিক তেমনভাবেই সাধারণভাবে জিজ্ঞেস তো করেই। নিজের শিল্পকলার সম্পর্কে নিজে বলার একটা বাধা সংকোচ তৈরি হয় বৈকি। ভিন্ন কোনো মানুষ আমার পট নিয়ে বলছেন তাতে একটা সোয়াস্তি থাকে। আসলে ছবিতে যত সহজে নিজেকে মেলে ধরায় সহজ মনে হয়, তা ভাষায় বা ব্যাখ্যায় ততটা মনে হয় না। নিজের শিল্প ভাবনার কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় সংযম কাজ করে না। সবসময়েই মনে হয় মাত্রাতিরিক্ত কিছু বলা হয়ে যাচ্ছে না তো। আসলে শিল্পকথা বলায় দুটি জিনিস আমার অসম্ভব মনে হয়— এক কতটুকু প্রকাশে সবটা বলা যায়। আর যা জরুরি তা হল কাউকে কোনো প্রসঙ্গেই তুচ্ছ না করা।

গুরু নন্দলালের সঙ্গে দীর্ঘ সময়যাপনের মাঝে আমার পরম পাওয়া— অবশ্যই এ আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতায়, তা হল কোনো কারণেই কোনো শিল্পীকে ছোটো করে দেখেন নি বা তুচ্ছ করে বলেছেন সে জানে। অনেক সময় আমার কম বয়েসের কারণে কারুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে শুনতে হয়েছে উনি ঐরকমই করেন। শিল্পপাঠের জীবনে এ এক মস্ত অধ্যায়। তাই আমি তো বলি যত সময় যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি— আমার গুরুদের শিল্পকলার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হিসেবে তাঁদের উত্তরণ।

কলাভবনে থাকতে থাকতেই তো জেনেছি শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। যাঁরা এ কথা মানতে চান না, সে মানতে না চাওয়া একান্তই তাঁদের। শিল্পীকলার সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক নেই একথা বলায় আমার দ্বিধা আছে। দুটি মিলেই শিল্পের পূর্ণতা। শান্তিনিকেতনের শিল্প পাঠশালায় দীক্ষাগ্রহণে আর সেখানে শিল্প শিক্ষায় বেড়ে ওঠার ভেতর আমি আর আমার শিল্পকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার দৃষ্টি গড়ে ওঠে নি। আমায় যখন কেউ আমারই শিল্পকলা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তখন সে প্রশ্নের জবাবে তো আপনা

থেকেই কথা বেরিয়ে এসে বলে— শান্তিনিকেতনের এই পরিজন পরিবেশ তার নিত্যদিনের দিনযাপনের এক অসামান্য রুচি ছবিকে বুঝতে ধরতে সহায় ছিল। কোনোদিন শিল্প শিক্ষায় তোমার হবে না তুমি পারবে না এ শব্দের ব্যবহার ছিলই না। প্রথমেই বলেছি— আমার ছবির কথা বলার কথা।

ব্রত শব্দের আজ আর-কোনো অর্থবহন করে কিনা জানি না— তবে চিত্রকরের ব্রত নিয়েই তো চেয়েছি ছবি আঁকতে— এই ব্রতের কথা মনে হলে আমার মা প্রতিভাদেবীর কথা বার বার মনে হয়। একটা সময়ে পুরাণের উপনিষদের রামায়ণ-মহাভারতের ছবি আঁকতে গিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের কথা মনে পড়ে। তিনি নানান বিষয়ের কাহিনী বলতেন— ছবির বিষয় হিসেবে— নিজে ছিলেন শিল্পরুচির মস্ত সমজদার। তিনিই "মদালসার" কাহিনী শুনিয়েছিলেন— যেখানে মা সন্তানকে দোল খাওয়াতে খাওয়াতে বার বার বলছিলেন— "তত্ত্বমসি"। সেই সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার কারণে আজ আমার মাকেও সেই সূত্রেই মনে হয়। যখন আমার শিল্প সম্পর্কে সম্যক কোনো বোধ হয় নি— শিশুকালে আঁচড় দিই তা রঙ দিয়ে প্রলেপে পূর্ণ করি— সেই তখন থেকে আমার মা আমার কানের কাছে বার বার শোনাতেন— তোমায় শিল্পী হতেই হবে— এমনভাবেই আমার মা তার সন্তানকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

সেই ইচ্ছার কারণেই আমার শান্তিনিকেতনের শিল্প পাঠশালা কলাভবনে হাজির হওয়া। এই হাজির হওয়ার পিছনে আর-একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, সংগীতজ্ঞ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। এই ভাবেই হাজির হয়েছিলুম কলাভবনে— এ যেন এক বিস্ময়ের জগতে এসে উপস্থিত হওয়া। কেবল দেখা আর দেখা। শিল্পের করণ কৌশল কৌলিন্য নিয়ে কোনো কিছু জানা নেই। কেবল চিত্রকরের অদম্য ইচ্ছা আমায় আর-কোনো দিকে মুখ ফেরাতে দেয় নি। এই মুখ না ফেরানোর কারণে আর কতটা আমার দেখা হল না জানা হল না তা তো জানি না, তবে যেটুকু জানার মধ্যে নিতে পেরেছি মনে হচ্ছে ঐটুকুতেই আমার পথ চলায় কোনো অভাব ঘটবে না এটা বুঝি। এখানে এসেই ধীরে ধীরে জানতে পারলুম ছবির জন্যে অসম্ভব কঠিন কিছুকে না ভাবলেও চলে। প্রথমে পাঠের দিন গুরু বললেন ছবি আঁকো। নিজের নিজের মতো করে আঁকো। এখন বুঝি শিল্পের এই স্বাধীন বিচরণের অমৃতকে। আমার প্রথম ছবি গড়ে উঠল একটি কলকে ফুলকে কেন্দ্র করে। এই হল আমার প্রথম চিত্রাঞ্জলি। ঐ কলকে ফুল ফুটিয়ে তোলার পেছনে যে মনন আর বিশ্বাস কাজ করেছিল তার উত্তাপ আজও তো অনুভব করি।

সময়ের ব্যবধানে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাই। তাই যখন আমায় আজ অনেকে প্রশ্ন করেন চিত্রশিল্পের এই ঢং আপনি কোথা থেকে কেমন করে পেলেন। আমি বলি একি কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার ভেতর দিয়ে বলা যায়। এ তো নিত্যদিনের চর্চার ভেতর দিয়েই আপনার থেকে চিত্রকরের অগোচরে এসে পাশে ফুটে ওঠে— যাকে

দেখলে— যার মধ্যে শিল্পী প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়। আসলে আমরা ফ্যাশন আর স্টাইলের পার্থক্য দেখলেই বুঝতে সক্ষম হব। ফ্যাশন আসে জানান দিয়ে আর স্টাইল জমায় আপনা থেকে। আমার আজকের কাজের মধ্যে যদি কোনো অবয়ব গড়ে উঠে থাকে তাহলে ঐ যে ব্রতের কথা বলেছি, ঐ চিত্রকর হওয়ার ব্রত উদ্‌যাপনের প্রক্রিয়ার প্রতি নিষ্ঠার দিক আছে। কলাভবনের শিক্ষাব্যবস্থায় কোথাও বাধ্য করার হিসেব কাজ করে নি। শিল্প যে সহজাত সে কথা প্রতিটি শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। তবে ঐ আশ্রম আশ্রয়ে কখনো ভবিষ্যত নিয়ে হতাশার জাল বুনতে হয় নি আবার কোনো ঐশ্বর্যের ইমারত গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্নও দানা বাঁধে নি। তবে চিত্রকর হওয়ার জন্যে যা কিছুর প্রয়োজন তার অঢেল ব্যবস্থা ছিল। শিল্প আমাদের কাছে ব্যয়বহুল ব্যবস্থা ছিল না। ঐ অঢেল ব্যবস্থার মধ্যে নিজের রঙ নিজে খুঁজে নেওয়ার দিক ছিল। খুব বেশির আয়োজন তো ছিল না। কিন্তু একজন শিক্ষার্থী তার শিল্পজীবনকে গড়ে তোলার পক্ষে যেমন সরল করণকৌশলের জানার দিক ছিল, সেই সঙ্গে মানুষ হিসেবে শিল্পীসুলভ মানসিকতায় তৈরি হওয়ারও পথ ছিল। ওখানেই গুরুদের জীবনযাত্রায় শিল্প আর শিল্পীর সমান্তরাল লাবণ্যের স্পর্শ পেয়েছি। বুঝেছি কেবল ছবি আঁকা নয় সেই সঙ্গে ছবি হওয়ারও পাঠের সন্ধান চাই। ঐ শিল্প পাঠশালায় রুচির সঙ্গে দেখা হল— ওখানেই আমার চোখের মধ্যেই আর-একটি চোখ ফোটানো হল, ওখানেই তো গাছ-ফুল ফলকে কেবলই গাছ কেবল ফুল কিংবা আকাশ কেবলই নীলের শূন্যতা বা ভেসে চলা মেঘের দল, কেবল ভাসা মেঘ রূপেই দেখলুম না, আমার চোখে শান্তিনিকেতন আরো ভিন্ন কিছু দেখার চিক সরিয়ে দিলে। আমরা কেবল হিসেব কষা চিত্রকর আর ব্যাকরণ সর্বস্ব চিত্রকর হয়ে ওঠার জন্যে তৈরি হলুম না— সেই সঙ্গে সহজ প্রবাহের সাবলীলতাকে ছুঁতে চেয়েছি— স্বাধীনতা বল্গা ছাড়া কোনো প্রক্রিয়ার প্রবাহ নয়। আমরা শিল্পে জীবনের সঙ্গে গ্রহণের সমন্বয়কে দেখার দৃষ্টি পেতে সক্ষম হলুম। আমাদের চোখের সামনে গাছের মরা ডালকে কেবলই—"শুষ্কাং কাষ্ঠাং দৃষ্ঠতি অগ্রে" নয়। ঐ শান্তিনিকেতনের লাবণ্য ভালোবাসার একান্তে একই শুকনো গাছের ডালকে "নিরস তরুবর পুরত ভাগে" বলে বুঝতে জানলুম। আজ তো বুঝতে পারি— রস প্রকাশই শিল্পের একমাত্র আর প্রধান দিক। তাই তো শান্তিনিকেতনের পথে ঘাটে কেবলই কলাভবনকেই দেখি। এ শিক্ষার সুবাস সমগ্র পরিবেশকে এক আনন্দ সমৃদ্ধতায় ভরে তুলেছে। আমার কাজের মধ্যে ঐ সহজ সরল আর সমন্বয়কেই পেতে চেয়েছি। শান্তিনিকেতনের দিকে বার বার চেয়ে দেখি আর ঐ সমন্বয়ের ছবি বার বার ফুটে ওঠে। সমস্ত আশ্রম জুড়ে এক সংযমকে দেখতে পাই। প্রশ্ন তো আসতেই পারে কিসের সংযম দেখো তুমি— দেখি তো গাছের সঙ্গে বাড়ির মিশে যাওয়া, বাড়ির সঙ্গে শিল্পকলার মিশে যাওয়া, এ-সবের সঙ্গে বসতির মানুষজনের মিশে যাওয়া— কেন হাঁটতে হাঁটতে রামকিঙ্করের মূর্তিগুলিকে কি আলাদা সাজানো মনে হয়? মনে কি হয় লাইব্রেরির বারান্দার দেওয়ালে চিত্রিত চিত্রগুলি ভিন্ন কিছু? চৈতির সামনে

দাঁড়ালে কি মনে হয় বিশেষ বিচ্ছিন্ন কোনো কিছুর সঙ্গে আছি? সর্বত্র এমনই সংযমের প্রতিপালন। একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষায় বেড়ে ওঠারও এ এক মস্ত দিক। এমনভাবেই তো দেখতে দেখতে কবে যে অমনভাবেই শিল্প রচনার সঙ্গে এক হয়ে গেলুম বোঝা গেলো না। আমার কাজের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তো বলি শহরে বসে থাকলে কি হবে— ঐ সহজ সরল জীবনের চলাফেরার সহজতা আমায় তো ছেড়ে যায় নি, ওদের সঙ্গে ওঠাবসায় আমার বড়ো আরাম। কিন্তু ঐ অবয়ব গড়ে ওঠার কথা যখন মনে করি তখন স্বদেশবোধের সঙ্গে দেশের শিল্পরচনা সবই ভাসতে থাকে। বুঝতে তো পারি ছবি টুকরো টুকরো জোড়া দিয়ে দেখতে হয় না, সে পূর্ণ হয়ে গোটা হয়েই রসিকের চোখে ভাসে, আর তা তার ভালো লাগলে চোখের ভেতর দিয়েই অন্তরে পৌঁছনোর পথ তৈরি করে নেয়। নন্দলাল তো সবসময়ই বলতেন— বিষয়ের সঙ্গে মিশে যেতে না পারলে চিত্রের প্রাণকে ধরা সম্ভব হয় না।

নিয়মমাফিক কলাভবনের পাঠ শেষ হওয়ার পরও সেখানেই থেকেছি। এই সময়েই আমরা দু বন্ধু মিলে পায়ে হেঁটে বাংলার টেরাকোটা মন্দির দেখার কারণে ঘোরা শুরু করলুম। এই টেরাকোটা মন্দিরগুলি দেখতে দেখতে মনের মধ্যে অবয়বের একটি আদল দাগ ধরালে। ওখানেই লক্ষ করলুম একটি সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যেই কীভাবে বিষয়কে বেছানো সম্ভব। এই মন্দির দেখার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ জনজীবনের সঙ্গেও যুক্ত হতে থাকলুম। তাঁদের শিষ্টাচারের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যদিনের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মধ্যে শিল্পের রুচি আমাদের দৃষ্টির আর-এক দরজা খুলে দিলে। ওখানেই ঘুচল মনের সংশয় চারুকলা আর কারুকলার। একই তুলি যখন তৈজসপত্রের গায়ে বুলোচ্ছি তখন সে হয়ে পড়ছে কারুকাজ— সেই রঙ সেই তুলি সেই জল যখন পটের ওপর পড়লে তখন হল চারুকাজ। এদের সঙ্গে ওঠাবসায় সে ধন্ধ ঘুচে গেল। ঐ নির্জন প্রত্যন্ত গ্রামের মাটির দাওয়ায় বসেই কলাভবনের শিল্প সংগ্রহের বস্তুগুলির ছবি চোখে ভাসতে থাকল। সে সংগ্রহ তো এমনই সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের ব্যবহৃত জিনিসপত্রেরই সমারোহ। প্রতিটি ব্যবহারের মধ্যে কেমন শিল্পী মনটি মাখা হয়ে আছে। আমি তো বলি সোনা খুবই মূল্যবান কিন্তু সে তখনোই অমূল্য হয় যখন নকসা তাকে জড়িয়ে ধরে। কলাভবনের প্রাঙ্গণে এই-সব সাধারণ থেকে অতিসাধারণ বস্তুর সঙ্গে শিল্পের রুচির যে নাড়ির সম্পর্ক, তাকেই জানতে পারা যায়। সুন্দর কিছু গড়ার জন্যে অনেক কিছুর যে সবসময় প্রয়োজন পড়ে না— এ তো শান্তিনিকেতন আশ্রমের পরিবেশ পরিজনের মধ্যেই বর্তমান। কোনো প্রকাশের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত বাহুল্য নেই। শিল্প এখানে তার প্রকাশে এমন কিছু দিয়েছে যেখানে সমস্ত কিছুর সঙ্গে সে মিশে যেতে পারে। এই শিল্প প্রাঙ্গণেই জীবনের প্রতিটি বাঁকে শিল্পের সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। শিল্প যে জীবনের বিলাস নয়— আলাদা কোনো কিছুতে ঘেরা নয় এটুকুই আমার শিল্পজীবনের একটি বিশেষ বোধ। এই প্রাঙ্গণেই কোনোকিছু তুচ্ছ নয় সবের মধ্যেই শিল্পের সুষমা বর্তমান। তাকে দেখা আর প্রকাশে পূর্ণ হওয়ার চর্চাই শিল্পের বড়ো দিক।

আজ যখন চিত্ররচনায় বৃত হই তখন বেশ বুঝতে পারি— শিল্পের সব দিকগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে মূল চিত্ররচনায় তা সহায় হয়। এটা আমার নয় আর ওটা ওর জন্যে একথা শিল্পীর ভাবনায় মানায় কিনা তা শিল্পীকেই ভাবতে হবে। শিল্পচর্চার আর তাকে রসের মধ্যে পাওয়ার জন্যে আলাদা আলাদা কুঠুরির প্রয়োজন পড়ে না। শিল্প যে ভূমারই সব-কিছু দিয়ে লালিত এ কথা তো শিল্পীই মনে রাখবে। শান্তিনিকেতন আশ্রমের বুকে চারদেওয়ালে আটকে যাওয়া ঘরের মধ্যে ছবিকে জানার চেয়ে খোলা প্রকৃতির পাঠের সঙ্গে তাকে জানার এক মস্ত পাঠ ছিল। প্রত্যক্ষ কথপোকথনের এ বিস্তার গড়ে উঠত তাই বিষয়ের কারণে আমাদের অনেক কিছু ভাবার থেকে মুক্তি তো ছিলই। আমাদের শিল্প পাঠশালার শিল্পকাজগুলি সারা আশ্রম জুড়ে মাখা হয়ে আছে, তার কোথাও কষ্ট করে করতে হয়েছে বলে মনে হয় না। কেবল ছবি কেন মূর্তির ক্ষেত্রেও তো তাই। এ-সব কথা বলার কারণ আমার জীবনে শিল্পকলা কেমনভাবে কোনো মাত্রায় মননে সঞ্চিত হয়েছে এ তারই পথকথা। আমার চিত্রকরের জীবনের আলোচনায় অনেকেই বলেন আর যথার্থই বলেন— আমার পটের মানুষজন সবাই কি রকম খুশি সুখি। যথার্থই তো। আমরা সবসময় যা-কিছু করছি তা তো ঐ আনন্দ আর সুখকে পাওয়ার কারণে। আমরা তো জানি এই সুখ আমাদের জীবনপথ চলার মস্ত আরাম। তবে প্রবৃত্তির সুখের আনন্দই আলাদা। আমি বলি না আমি গ্রামদেশের মানুষ, শহরে বসবাস করতে এসে দেখছি গ্রামের আত্মজনরা আমায় শহরে ভরসা করে ছেড়ে দিতে পারে নি। তাই তারা আজও আমার মনে-পটে ভাবনায় মাখা হয়ে আছে। আসলে আমি এদের নিয়েই তো স্বোয়াস্তিতে আছি। অকারণ উদ্বেগ যেমন আমায় ব্যস্ত করে না, আর অভাববোধ এসেও বাসা বাঁধার সুযোগ পায় না। আমার সামনেই তো অহরহ দেখি একজন বাউল একটি গুপিযন্ত্র নিয়েই মশগুল হয়ে আছে— সেই রসের আনন্দ তাকে আর-কোনোদিকে বাঁক নেওয়া উস্কে তো দেয় না। আমার চিত্র আর চিত্রকরের জীবনটাও তো তেমনই— আমার তো চিত্ররচনা করার সময় অনেক কিছু হয়ে যাবার বাসনার ইচ্ছে তো হয় না। আজ দীর্ঘদিন ছবি আঁকতে আঁকতে একটি প্রশান্তি তো মনকে অনেক ছায়া দেয়— তাহলে সব কি করা যায়? সব কি জানা যায়? যাঁরা তা পারেন তাদের সঙ্গে তো আমায় মেলাতে গেলে চলবে কেন। আমার চিত্র আর চিত্রকরের ভাবনায় এক ভিন্ন চিন্তা কাজ করে। আমি তো বলেছি আমি শিল্প তত্ত্বজ্ঞ নই— চিত্র বিচারেও আমার পারঙ্গমতা নেই। আমি কেবল চিত্ররচনার বিষয়েই যুক্ত থাকার চর্চা করে এসেছি। আজ দীর্ঘ সময় ধরে শিল্পের অনুসঙ্গে এইটুকু বোধের মধ্যে পেতে সচেষ্ট থাকি। এই অনন্ত ভূমার প্রতিটি পদক্ষেপে চিত্রসম্ভাবনা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, তাকে গ্রহণ করার একাগ্রতায় নিজেকে সবসময় যুক্ত রাখার সত্যও এক বড়ো দিক। আর এও বুঝতে পারি আমি যে গাছকে আমার পটে বসাতে চাই— সেই গাছের মধ্যে আমি আর আমাতে গাছের সেতু রচনা করতে না পারলে গাছকে জানা সম্ভব নয়। আজ আচার্য নন্দলালের ঐ বনে যাওয়ার

কথা অনুভব করি। তিনিও তো বলেছিলেন মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে যখন দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং গিরিশচন্দ্র যখন জানলেন নন্দলাল চিত্রকর তখন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন তুমি কি হয়ে যেতে পারো? ষোলো বছরের নন্দলাল সে বয়েসে তার তাৎপর্য ধরতে পারেন নি— মহাকবি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন আমার যখন বেড়াল হতে ইচ্ছে হয় মনে হয় খাটের তলায় ঢুকে ঝগড়া করি।

এই এক হয়ে যাওয়ার দিকটাই হল শিল্পীর শিল্পজীবনের মস্ত বড়ো দিক।

আমার ছেলেবেলা গড়ে ওঠার পরিবেশ পরিজন ছিল খুবই সহজ সরল। আমি তো এখন নিশ্চিত বুঝি স্বাক্ষর মানুষেরা অনেকেই শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেন না, আমরা তো ভুলেই যাই স্বাক্ষর আর শিক্ষিতের ফারাকটুকু কিন্তু পল্লীজীবনে তো দেখেছি একজন নিরক্ষর মানুষ শিক্ষিত হয়ে ওঠায় কোনো বাধা নেই। শিক্ষিতের জীবনধারণ আর আচরণের প্রকাশই ভিন্ন। ছবির ক্ষেত্রেও সে তফাত তো ধরতে পারি না। আমার শিল্প শিক্ষার পাঠশালায় এর মহিমা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় নি। সেখানে সমস্ত কিছুর সঙ্গে যেমন সাবলীলভাবে ওঠাবসায় সহজ ছিলুম আজ এমন শহর কলকাতায় এসে তাতে মালিন্য পড়ে নি। আজও ঐ মানুষের মাঝেই খুঁজে পাই শিল্পশিক্ষার বহু কিছু। কেবল পট বর্ণ আর তুলিই ছবি আঁকে না— ছবি শিল্পীকেও ঠিক তার মতোই গড়ে তোলে। মাস্টারমশাই একদিন একটি গাছকে জানার জন্যে বললেন— "চাঁদনী রাতে গাছের দিকে তাকিয়ে দেখো কেবল আকারটা দেখতে পাবে, তাতেই তুমি গাছের চরিত্র বুঝতে পারবে। কেন-না প্রত্যেক গাছই তার নিজস্ব চরিত্রে অবয়বে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। তার পর সেই গাছকে সন্ধের দিকে তাকিয়ে দেখো দেখবে কেবল গুচ্ছ গুচ্ছ হিসেবে সে দাঁড়িয়ে আছে, তার পর তাকে দেখবে উজ্জ্বল দিনের আলোয় তখন সে গাছের সব-কিছুই তোমার চোখে ধরবে।" সেই ১৯৫৪ সালের এক সকালে নিজে করে দেখিয়ে ছিলেন। আমার ছবির আকারদের তো প্রথম একদিন লণ্ঠনের ছায়ায় দেখলুম। নিজের হাতের পাঞ্জাকেই নানানভাবে ভঙ্গি করে যখন ঐ আলোর সামনে ধরে তার কালো ছায়া দেওয়ালে দেখি— মনে হয় যেন আমার শিল্পচর্চার এক আলাদা জানলা খুলে গেল। ঐ পাঞ্জাতে আর আটকে থাকলুম না। সমস্ত কিছুকেই নানাভাবে নানান ভঙ্গিতে আলোর সামনে ধরলে দেওয়ালে নিত্য নতুন অবাক করা আকারকে খুঁজে পেতুম। এই পাওয়া আমার ছবির চর্চার এক জগত খুলে দিলে। আজ তো সূর্যের দিকে চাঁদের দিকে উড়ে চলা মেঘের দিকে তাকালে বুঝতে পারি কত সবল আকার নিয়ে তারা কত জীবন্ত।

ঐ সরল অবয়বের দিকে খানিক তাকিয়ে থাকলে বুঝতে তো পারি সহজ সরল আকারের প্রাণময়তাকে। সহজ সরল অবয়বের মধ্যেই তার নিজস্ব লাবণ্যমাখা হয়ে থাকে। আমার শিল্পজগতের পথকেও এমনই সহজে বইয়ে দিতে চাই। অনেক কিছু তো বুঝতে সক্ষম হই না তবে এটুকু তো কানের কাছে এসে আমায় বলে হাজারো তত্ত্ব-জানো আর শিল্পশাস্ত্রের তর্ক বিতর্কের মধ্যে সামিল হও— তা কিন্তু তোমায়

চিত্র রচনায় ব্রতী করতে সক্ষম হবে না। চিত্রকর তার শিল্পের জগত নিয়েই না থাকতে পারলে উত্তীর্ণ শিল্পরচনায় সিদ্ধ হওয়াও দুষ্কর। শিল্পের কথায় বলি পড়ে করা নয়, করে পড়া। করার মধ্যেই শিল্পীর পড়ার অধ্যায়টি অপেক্ষা করে। আমার এ-সব ভাবনার সঙ্গে কারুর কারুর তো মিল না থাকারই কথা— তবু আমার বোঝার সত্য এমনভাবেই কাজ করে আর সেই ভাবনাই তো আমার কাজের সহায়। শিল্পীর জপমালা তার চিত্রকলা। নিত্যচর্চার তো বিকল্প হতে পারে না। সেই তো কবেকার কথা অভ্যাস। এই অভ্যাস যখন চরিত্রে বাসা বাঁধবে তখন আর অভ্যাসের জন্যে আলাদা ভাবনার সময় দিতে হয় না। নিত্যশিল্পচর্চার সঙ্গে আমার একটা ছবি মনে হয় সবসময়। আমার পথ মাঠ কেটে মাটির ওপর দিয়ে আঁকা বাঁকা তার প্রবাহের চল— কিন্তু এ পথের সঙ্গে একটি বোধ মাখা হয়ে আছে। নিত্যদিন এ পথ দিয়ে হাঁটার চল না থাকলে একদিন দেখব ঘাসের ভিড়ে আমার পথ চিহ্নের মিলিয়ে যাওয়া। এই নিত্যচর্চার দীক্ষাও তো ঘটেছে আমার শিল্পপাঠশালার প্রাঙ্গণেই।

ঐ যে একজায়গায় বলেছি না— মানুষের সঙ্গে সঙ্গ করায় আমার ভালো লাগা সাধারণ মানুষ যারা প্রতিদিন অন্নের সন্ধানে ব্যস্ত থাকে, তাদের মধ্যে মানব বোধের আত্মকথা শুনতে পাই। তা না তো ঐ ভোরেরবেলায় একটি কাগজ কুড়ানো যুবক আমায় কি করে বলে আর কোন শক্তিতে সে বলে— "আমি চাকরও নই ভিখিরিও নই— আমি কাগজ কুড়িয়ে খাই।" কই এমন শক্তি আমার মধ্যেও সঞ্চিত হল না। এমন স্পষ্ট কথা বলায় আটকে যাই। ওদেরই তো ঐ ভোরে দেখেছি এক গ্লাস চা চারজনে চুমুক দিয়ে খাচ্ছে— অথচ কেউ মনে করছে না কেউ বেশি খেয়ে ফেললে। এ-সব ছবিই তো একজন শিল্পীকে ছবির সঙ্গে তাকে তৈরি করতে সহায় হয়। কেবল গাছ, ফুল পথ আরো বস্তুর সঙ্গে এদের ভেতরটিকে দেখতে সচেষ্ট থাকি। এমন একটি ভোরের ছবির কথা শুনি। একটি ছোটো ছেলে কাগজ কুড়োচ্ছে! দেখে জিজ্ঞেস করি— তুমি কাগজ কুড়োচ্ছো তোমার মা-বাবা? সে আমার দিকে তাকিয়ে বললে— "আমার বাবাও নেই মাও নেই। সেকি? বাবা মাকে ছেড়ে অন্যের সঙ্গে চলে গেছে আর মা আর-একজনকে বিয়ে করেছে— কিন্তু আসল ছবির রসটি আমার কাছে এমনভাবে ধরা দিলে— বললে মা মাঝে-মাঝে আমায় আদর করে যায়।

শিল্পীর কাছে এমনভাবেই ছবি এসে দাঁড়ায়। নিত্যদিনের এমন সব অসাধারণ বিষয়গুলিই তো তাকে প্রেরণা দেয়। এখন আমায় কেউ জিজ্ঞেস করলে তো বলি এখন যতটা বাদ দিয়ে বলা সম্ভব— ততটাই বাদ দিতে চাই। আমার চিত্রের পূর্ণতা রসিকরা ঘটাবে। তাতে কেবল দেখা নয় সেই ছবির রেখার পূর্ণতায় তাদেরও যোগদান থাকবে। চিত্রকর তো নয়ন দুটি দিয়েই স্বাদ, অবয়ব যা কিছু ভালো লাগা আর না লাগা সবই গ্রহণ করে। চোখের দরজা দিয়েই তো হৃদয়ে পৌঁছয়, মন তখন তা পটে ফেলার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়। আমরা তো বিচারের কাঠগড়ায় শিল্পকে দাঁড় করিয়ে করিয়ে তার যে দৃষ্টিনন্দন ঐ সবই ভুলতে বসেছি। আমি যা বলি তা অনেকের নাও মনে

হতে পারে। যে-কোনো বই গড়ে ওঠার পেছনে বহু মানুষের যোগদান থাকে। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রে একটি মানুষ সম্ভবত বই পড়ার আনন্দ গ্রহণে বঞ্চিত হয়েই থাকেন— তিনি হলেন প্রুফ রিডার। তার কাজের ধরন এমনই। ছবির ক্ষেত্রে একজন শিল্পী রসগ্রাহী হতে না পারলে রস বিতরণের অধিকারে অধিকারী হওয়ায় বাধা থাকে। শিল্পশিক্ষার এ রসসৃষ্টির মন্ত্রটি আমাদের গুরুদের কাজে ব্যবহারে— পরিবেশনায় পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করত। গুরু ধীরেনকৃষ্ণ সবসময় একটি শব্দ ব্যবহার করতেন— বলতেন সব দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে একটি "মজা" আছে। তাকে বোঝা ধরা আর প্রকাশ করাই চিত্রকরের কাজ। আসলে নবীনকাল থেকেই একজন শিল্পীকে ঐ দেখার চোখ তৈরির কাজে ব্রতী হতেই হয়। সর্বক্ষণের চর্চা না থাকলে তা প্রায় ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। নন্দলাল ছবির বিষয়ে বলছেন "একটা ছবি করতে থাকলে— সে ছবিই সারাক্ষণ আমায় ঘিরে থাকে। এমন-কি রাত্রে উঠেও তাকেই দেখতে থাকি।"

ছবির বিষয়ে জানার জন্যে সারাক্ষণই ঘুরেছি। সে যে কেবল শিল্পমণ্ডিত মন্দির প্রাঙ্গণে বা প্রদর্শনশালার ঘরেই নয়— এ শিল্পচর্চায় মানুষ কতটা অনুরক্ত— দেখায় আর প্রত্যক্ষ করায় তাও দেখতে চেয়েছি সবসময়। আমরা চিত্রকলা নিয়ে যতই আলোচনা করি— সব-কিছুকেই উত্তীর্ণ হতে হয় মানুষেরই দরবারে। আমার কাছে এঁরাই হলেন কষ্টিপাথর। শিল্পের কত গভীর কথা কত সহজে তারা বলে যা আমাদেরও নাড়িয়ে দেয়। এখানে বয়সের কোনো বেড়া নেই। স্বাক্ষর নিরক্ষরের কোনো প্রাচীরও নেই। ভোরের পথেই এমনই এক বৃদ্ধা মাসীর সঙ্গে দেখা। কবরখানায় ফুটে ওঠা নয়নতারা ফুল সংগ্রহ করে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলুম— তোমায় রোজ দেখি ফুল তুলে নিয়ে যাচ্ছ— কি কর? প্রশ্ন করা মাত্রই বৃদ্ধার দুচোখ ভরে জল। বিব্রত হয়ে পড়লুম। খানিক সামলে বললে— "আমার একমাত্র ছেলে গত হয়েছে। আমরা সংসারে তিনজন— আমি, বৌমা আর আমার নাতনী— এ ফুল রোজ তিনটি ঠাকুর বাড়িতে অঞ্জলি দিই— খানিক চুপ থেকে আমায় যে প্রশ্ন করলে তার কি কোনো উত্তর পাওয়া যায়। জিজ্ঞেস করলে আচ্ছা, এতে আমার বুকের কষ্ট যাবে? এ-সব ছবির মর্মকথার সঞ্চয়গুলি শিল্পীকে সঠিক বাঁকগুলি ধরিয়ে দিতে সহায় হয়। ঠিক এমনভাবেই আমার প্রতি ভোরে এমনই সাধারণ থেকে অতি সাধারণ প্রিয়জনরাই তাদের জীবনকথার প্রত্যক্ষ ছবি দিয়ে আমার চিত্রকর জীবনের সহায় হয়। কতদিন এমনই ঘটনার সামনাসামনি হচ্ছি। অনেক বলার পরিসর তো নেই। কিন্তু ওদের সঙ্গে মিশলে কথা বললে আমার কেন জানি না— নিজেকে উন্নত করার জন্যে আলাদা ধর্ম গ্রন্থ পড়ার দরকার নেই। আমি রোজ এমন-সব জীবনের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা তো লিখে রাখি। ভোরের আলো যেমন দেখার স্পষ্টতা এনে দেয়, এদের সঙ্গ তেমন একজন চিত্রকরকে আরো পথ দেখায়। এই আধো অন্ধকার ভোরেতেই তো দেখলুম ধর্ম সমন্বয়ের এক অসাধারণ ছবিকে। সব নিত্যদিন কাগজ শিশি বোতল কুড়োনো মানুষগুলি জটলা করে দাঁড়িয়ে— জিজ্ঞেস করি কাজে বের হও নি। না— আজ

আমাদের বিশ্বকর্মা পুজো। জিজ্ঞেস করি তা তোমাদের মূর্তি কোথায়? না না আমরা অনেক জাত মিলে এ পুজো করি। আমাদের মূর্তি তো চলবে না। আমরা ঘট বসিয়ে তাকেই বিশ্বকর্মা ভাবব। আমরা তো এত বাকবিতণ্ডার মধ্যেও ঐ ছোট্ট ঘটে সব দেবতাকে বসাতে পারছি না। ওরা পারে।

চিত্রকর হিসেবে এমন করেই আমার দিনযাপন। কোথাও নিজেকে নিঃস্ব মনে হয় না। কেউ এগিয়ে যাচ্ছে বলে আমি পিছিয়ে পড়েছি বলেও হতাশায় ভুগি না। চিত্র আমার এমন জীবনীটিই গড়ে তোলার সহায়। আমি রোজ শিল্পবোধের যে রোজনামচা লিখি আজকের ভোর আমায় যা দিলে তা দিয়েই চিত্রকলার সঙ্গে একজন চিত্রকরের সম্পর্কের কথাটা বলি—

৬ জুন ২০০৫

কতদিন যায় অনেক কিছুর অনুভবের সত্যে পৌঁছতে। শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রথম পাঠের প্রথম ছবি ছিল একটি কলকে ফুল। প্রথম কলকে ফুল আঁকলুম। তখন কেবল ভেবেছি— কলকে ফুলের চেহারাটা ঠিক হচ্ছে কিনা। তাকেই বিচার দিয়ে বার বার মেলাতে চেয়েছি। তখনো আমার কান গড়ে ওঠে নি— তাই কলকে ফুলের অন্তরকথা শুনতে পাই নি। সে যে তখন থেকে আমায় বলেই চলেছিল আমার রঙ দেখো, পাপড়ি দেখো, পাতা কুঁড়ি সব দেখো— কিন্তু আমায় দেখতে ভুলো না আমায় দেখার চেষ্টা করো। জানো তো আমিই মহাদেবের কানের গহনারূপে শোভা পাই। জানো কি আমার হৃদয়ে মধু আছে। লক্ষ করে দেখো মৌটুসি, ভ্রমর মৌমাছিরা আমার বুকে জমানো ঐ মধু পানে খুশি হয়। তাই বলি ওগো নবীন শিল্পী যাকেই তোমার পটে ধরো তাতে কেবলমাত্র তোমার কারিগরির দক্ষতা দিয়েই থেমে থেকো না। যে বিষয় পটে ফেলছ তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার দিকটা ভুলো না, সবচর্চার সঙ্গে এ চর্চাও ভোলার নয়। আর এ সম্পর্ক সঞ্চয় হলে জানবে তোমার পটে যাদের প্রতিষ্ঠা দিলে তারা প্রাণহীন হবে না। প্রাণসহ প্রতিষ্ঠার চর্চা তো এই নবীন জীবন থেকেই আরম্ভ করা খুবই জরুরি। আমার এ কথা মনে রেখো। আজ পঞ্চাশ বছর পরেও কলকের ঐ সচেতন করার মন্ত্র আমায় এখনো ভাবায় বৈকি। ভিন্নমাত্রায় ভাবায় বলেই তো মনে হয়— যখন গান শুনি গানের সুর আমার নয়নের উদ্বোধন ঘটায়— কণ্ঠের কথা সুর শ্রবণের ভেতর দিয়ে নয়নে উপস্থিত হয়ে চিত্র দেখতে শেখায়। গান তখন কেবলই গান থাকে না— গান তখন হৃদয় সমেত নয়নের আনন্দ। ছবি দেখলে কি সেও নয়নের ভেতর দিয়ে গিয়ে কণ্ঠে বসে! বসেই তো। এই ভূমার চিত্রপট দেখতে দেখতে সুরের ঝরনায় গেয়ে ওঠে। তখন সুর আর চিত্রপট আলাদা থাকে না তো।

আগে কখনো এমনভাবে মনে হয় নি তো! হবে কি করে? ভেতরটাই বলে ওঠে— এ-সব পাকার সময় দিতে হয়। এখনই তোমার সঠিক সময়। এমনভাবেই তো একের

পর এক পরদা সরতে থাকে। এই পরদা সরতে সরতে দেখবে— একদিন আসবে তখন আর পরদা নেই। আর ভাগ নেই। কেবল তুমি তোমার নয়ন আর সামনে মুক্ত আচ্ছাদন রোহিত সুরের সত্য। সুরের মধ্যে পট আর পটের মধ্যে সুর। এই মিলনই তো নিজেকে চিনিয়ে দেয়। আর-কোনো ফারাক খেলা করতে পারে না। এখন কেবল অনুভবে দোলা-প্রবাহ। আমার নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে বেয়ে চলা পানসি দেখলেও ঐ কথাই মনে হয়। একবার বাতাসের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে পারলে— তর তর করে জল কেটে এগিয়ে যাওয়া। দাঁড় আর কাজ করে না। কিন্তু দাঁড় ত্যাগেরও দরকার পড়ে না। চিত্রকরের জীবনেও ঐ বাতাসের ছোঁয়ার দিক আছে। সে একবার হৃদয় স্পর্শ করলে— সেই স্পর্শই সমস্ত জড়তা আলস্য কাটিয়ে তর তর করে বয়ে নিয়ে যাবে। এমনভাবেই বার বার প্রকৃতির দিকে যখন দেখি— একথাই সে শেখায় আমি শিখি। আবারও মনে হয় নয়নের উদ্বোধন বড়ো জরুরি। চোখ খোলা অবস্থাতেও তো না দেখার পর্যায়েই থেকে যেতে হচ্ছে। চোখ খুললে সব স্পষ্ট। আমি স্পষ্ট, আর সেও স্পষ্ট। আর-কোনো ধন্দ নেই— কেবল আলো আর আলো। এই ছবির আলোর চিত্রকরকে একবার ছুঁলে আর হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই।”

আসলে সম্পর্ক আর চিত্রকলা— এ দুইয়ের সমন্বয়ের এক বিশাল সংসারেই আমরা। যে সংসার অমলানন্দের লাবণ্যে পরিপূর্ণ। যে সংসার নিত্য প্রবহমান ছন্দোময়তার স্বচ্ছন্দে সজীব।

আমাদের সুকুমার চর্চার সঙ্গে যে পরমের যোগ আছে— এও যে অর্ঘ্য সে সত্যকে নেহাতই যুক্তির অহংকারে মুছে ফেলতে চাইছি। সম্পর্ক তো সেই অনুভবে সেই সত্যে। একে না মানায় বেশি সাহস কাজ করে কি না তো বলা যাবে না— তবে এ তো প্রকাশ্যে মানি, আর নাই মানি অর্ঘ্যের মধ্যে এক বিনয় এক লাবণ্যের শক্তি কাজ করে। আর সেটিই তো জীবন্ত পট।

১৪১২ শ্রাবণ

লেখক পরিচিতি

লেখক পরিচিতি

অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৭৪) চিত্রশিল্পী। আইন পাশ করে আইন ব্যবসা গ্রহণ করলেও ছবি ও গান তাঁর সাধনার বিষয় ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে বহির্ভারতের বহু স্থানে বক্তৃতা প্রদান। ললিতকলা একাডেমি, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মানিত। বাংলা ইংরেজি অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। 'ভারতের ভাস্কর্য' 'রূপশিক্ষা' 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা' উল্লেখযোগ্য বই।

অনন্তকুমার চক্রবর্তী (১৯২৭-২০০০) গবেষক ও অধ্যাপক। অর্থনীতি তাঁর অধ্যাপনার বিষয় হলেও মুখ্যত সংগীতই ছিল তাঁর চিন্তা ভাবনা গবেষণা ও চর্চার প্রধান বিষয়। রবীন্দ্রনাথের গানের তিনি হয়ে ওঠেন বিশিষ্ট ভাষ্যকার। লোকসংগীত ও গণসংগীতেও তাঁর রসসিক্ত বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় রয়েছে। উল্লেখযোগ্য বই 'সে অগ্নিতে দীপ্তগীতে' 'গানের ভেলায় বেলা অবেলায়' 'তোমার সুরের প্রতিধ্বনি'।

অনুপম গুপ্ত (১৯৩৮) প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক। বিশ্বভারতীর অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছবি ও শান্তিনিকেতনের চিত্রকলা নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন।

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) কবি প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক। দীর্ঘ সময় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসচিব। কবির জীবনের অন্তিমপর্বে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। গান্ধীজির সঙ্গে সংযোগ ঘটে। পৃথিবীর বহু দেশে আমন্ত্রিত বক্তা রূপে গিয়েছেন ও অধ্যাপনা করেছেন। 'পদ্মভূষণ' 'দেশিকোত্তম' উপাধি প্রাপ্ত। 'চলো যাই' গ্রন্থের জন্য ইউনেস্কো ও 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান।

অমিয়নাথ সান্যাল (১৮৯৫-১৯৭৮) সংগীতশাস্ত্রবিদ ও সংগীতজ্ঞ। ব্যবহারিক সংগীত অপেক্ষা সংগীতের গবেষণার দিকে এবং বিচার-বিশ্লেষণের দিকেই তাঁর আগ্রহ চর্চা বেশি ছিল। 'Raga and Raginis' এবং 'স্মৃতির অতলে' উল্লেখযোগ্য বই।

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী (১৮৭৩-১৯৬০) রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী। বিদুষী নারী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনার ইংরেজি অনুবাদ করেন। দেশী বিদেশী সুরে ও বাদ্যযন্ত্রে বিশেষ দক্ষতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের বহু গানের স্বরলিপি তিনি প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীতে অস্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। 'ভুবনমোহিনী

পদক' ও 'দেশিকোত্তম' উপাধি লাভ করেন। রচিত গ্রন্থ 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসঙ্গম' 'রবীন্দ্রস্মৃতি' 'স্মৃতিসম্পুট'।

কল্লাতি গণপতি সুব্রহ্মণ্যন্ (১৯২৪) চিত্রশিল্পী ও অধ্যাপক। শান্তিনিকেতন কলাভবনে চিত্রকলার পাঠ গ্রহণ। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ছাত্র। পরে কলাভবনের পেন্টিং ও ডিজাইনে অধ্যাপনা এবং অবসর গ্রহণের পর বিশ্বভারতীর এমেরিটাস অধ্যাপক। চিত্রাবলির বহু প্রদর্শনী হয়েছে দেশে ও বিদেশে। ললিতকলা অকাদেমির ফেলো। 'পদ্মশ্রী' ও 'কালিদাস সম্মান'-এ ভূষিত। বিশ্বভারতী থেকে পেয়েছেন 'অবন-গগন পুরস্কার', রবীন্দ্রভারতী থেকে সাম্মানিক ডি. লিট্.।

কাঞ্চন চক্রবর্তী (১৯৩০) শিল্পসমালোচক ও অধ্যাপক। বিশ্বভারতী কলাভবনের শিল্প-ইতিহাস বিভাগে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন।

কানাই সামন্ত (১৯০৪-১৯৯৫) রবীন্দ্রগবেষক ও কবি। চিত্রকলাতেও বিশেষ অনুরাগ ছিল। শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্র ও নন্দলাল বসুর বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে ও পরে রবীন্দ্রভবনে দীর্ঘকাল কর্মরত ছিলেন। 'রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্প'র সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য বই 'রূপমঞ্জরী' 'সন্ধ্যাতারা' 'উষসী' 'রবীন্দ্রপ্রতিভা' 'চিত্রদর্শন' 'ঝরাপাতা ঝরাপালক'।

ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০) সুপণ্ডিত গবেষক ও অধ্যাপক। সংস্কৃতে এম. এ. কাশীর এই পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন। বিশ্বভারতীর অস্থায়ী উপাচার্য ছিলেন। সন্তসাধক ও বাউল সংগীতের উপরে তাঁর গবেষণা মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের চিন ভ্রমণের সহযাত্রী। 'কবীর' 'দাদূ' 'বাংলার সাধনা' 'প্রাচীন ভারতে নারী' 'বাংলার বাউল' 'চিন্ময় বঙ্গ' উল্লেখযোগ্য বই।

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা (১৯০১-১৯৯৫) চিত্রশিল্পী ও অধ্যাপক। শান্তিনিকেতন কলাভবনে নন্দলাল বসুর ছাত্র। লণ্ডন কলেজ অব আর্ট-এ শিল্পী রোটেনস্টাইনের কাছে ড্রইং ও ম্যুরালে বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভ করেন। শান্তিনিকেতন কলাভবনে দীর্ঘকাল অধ্যক্ষের পদে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণ করেন। দেশে ও বিদেশে তাঁর ছবির বহু প্রদর্শনী হয়েছে। রবীন্দ্রভারতী থেকে ডি. লিট. উপাধি লাভ করেন। বিশ্বভারতী থেকে 'অবন-গগন পুরস্কারে' সম্মানিত।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৭-১৯৯৯) চিন্তাবিদ ও লেখক। সাহিত্য শিল্প সমাজ সংগীত নৃতত্ত্ব প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। 'শনিবারের চিঠি'র লেখক হিসাবে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম পরিচিতি ঘটে। ইংরাজি ভাষায় তাঁর খ্যাতি ও দক্ষতা সুবিদিত। 'The Autobiography of an Unknown Indian' তাঁর প্রথম গ্রন্থ। অক্সফোর্ডের ডি. লিট্.। পেয়েছেন বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম' ও 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার'। জীবনের শেষ তিরিশ বছর ইংলণ্ডপ্রবাসী। ইংলণ্ডের রাণী তাঁকে 'কমাণ্ডার অফ অর্ডার অফ ব্রিটিশ

এম্পায়ার' সম্মান প্রদান করেন। উল্লেখযোগ্য বই 'আত্মঘাতী বাঙালী' 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' 'আমার দেশ আমার শতক' 'দি ইস্ট ইজ ইস্ট অ্যাণ্ড দি ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট'।

পশুপতি শাশমল (১৯৩৬-১৯৯৭) গবেষক ও অধ্যাপক। বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় স্বর্ণকুমারী দেবী এবং গবেষণাগ্রন্থ 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য'—বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত। অপর গ্রন্থ 'পারিবারিক খাতায় রবীন্দ্ররচনা ও রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ'।

বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০) সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষক। ইতিহাস রাজনীতি সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি তাঁর আলোচনার পরিধি। উনিশ শতকের বাংলা ও বাংলার নবজাগরণ তাঁর আলোচনায় নূতন মাত্রা পেয়েছে। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পান। উল্লেখযোগ্য বই 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' 'সাময়িকপত্রে বাংলা সমাজচিত্র' 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত' 'জনসভার সাহিত্য'।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪-১৯৮০) চিত্রশিল্পী ও শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যাপক। জাপানে গিয়েছিলেন ও ভারতীয় শিল্পকলায় জাপানি ভাবধারা আনয়নে পথিকৃৎ। ছবি আঁকার সঙ্গে লেখালেখির কাজও করেছেন। তাঁর দুটি বিশিষ্ট গ্রন্থ 'চিত্রকর' ও 'কর্তাবাবা'। 'পদ্মভূষণ' ও 'দেশিকোত্তম' উপাধি লাভ করেন। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' অনেক দিন তাঁর আঁকা প্রচ্ছদে মুদ্রিত হয়েছিল।

বিমলকুমার দত্ত (১৯২০-১৯৯২) শিল্পসমালোচক ও গ্রন্থাগারিক। বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য বই 'ভারত-শিল্প' 'গ্রন্থসূচীকরণ' 'গ্রন্থাগারের রূপ ও বিকাশ' 'রবীন্দ্রসাহিত্যে গ্রন্থাগার'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) কবি। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ।

রাজ্যেশ্বর মিত্র (১৯১৭-১৯৯৫) সংগীতবিশেষজ্ঞ ও প্রাবন্ধিক। সংগীত বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা। বিশ্বভারতীতে আমন্ত্রিত অধ্যাপকরূপে কাজ করেছেন। দীর্ঘকাল 'দেশ' পত্রিকায় শার্ঙ্গদেব নামে সংগীত সমালোচনা করেন। কালীপদ পাঠকের কাছে পুরাতনী বাংলা গানের তালিম নেন। সুবিনয় রায়ের কাছে রবীন্দ্রসংগীত শেখেন। উল্লেখযোগ্য বই 'বাংলা সংগীত' 'মুঘল ভারতের সঙ্গীত চিন্তা' 'উত্তরভারতীয় সংগীত' 'বেদগানের প্রাকৃত রূপ' 'সংগীত সমীক্ষা'।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৬) চিত্রশিল্পী। কলাভবনে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মার ছাত্র। নন্দলাল বসুর কাছেও অঙ্কন শিক্ষা লাভ করেছেন। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে অঙ্কনশিক্ষকের কাজ করেন; পরে গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্‌টিটিউট অব কালচারের শিল্পশাখার অধ্যক্ষ ছিলেন। বহু একক প্রদর্শনী হয়েছে ও একাধিক চিত্র-অ্যালবামও প্রকাশিত হয়েছে।

শান্তিদেব ঘোষ (১৯১০-১৯৯৯) রবীন্দ্রসংগীতবিশেষজ্ঞ গবেষক ও অধ্যাপক। শিক্ষা শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে। শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে সংগীত নৃত্য ও অভিনয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। বিশ্বভারতী সংগীতভবনে অধ্যাপনা ও এক সময় অধ্যক্ষতা করেছিলেন। 'পদ্মভূষণ' ও 'দেশিকোত্তম' উপাধি লাভ করেন। উল্লেখযোগ্য বই 'রবীন্দ্রসংগীত' 'গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য' 'রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সংগীত ও নৃত্য' 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য' 'জীবনের ধ্রুবতারা' 'নৃত্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ'।

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী (১৯৪৪) গবেষক ও প্রাবন্ধিক। অধ্যয়নের মূল বিষয় সংস্কৃত। ভারতীয় সংগ্রহশালায় ও জাতীয় গ্রন্থাগারে অধিকর্তা রূপে কাজ করেন। উল্লেখযোগ্য বই 'অজানা বামিয়ান' 'পত্রবিলাস' 'যাচ্ছো কোথায় যাদুঘরে' 'বুদ্ধ দেশে দেশে' 'Patralekha : romance of letter writing in Indian art and literature' 'Descriptive catalogue of Prakrit and Sanskrit inscriptions in the Indian Museum'।

সত্যজিৎ চৌধুরী (১৯৩১) গবেষক ও অধ্যাপক। 'অবনীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব' বইয়ের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. ডিগ্রি লাভ করেন। নৈহাটির হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। অধুনা প্রকাশিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক। উল্লেখযোগ্য বই 'নন্দলাল' 'অবলোকন'।

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (১৯১৭-২০০৩) সাহিত্যসমালোচক ও অধ্যাপক। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-অধ্যাপক ছিলেন। সাহিত্য শিল্প সংগীত দর্শন নানা বিষয়ে ছিল তাঁর গভীর পঠন-পাঠন। উল্লেখযোগ্য বই 'সাহিত্যসমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ' 'সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ' 'শিল্প সাহিত্য দেশকাল' 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা' 'সৃষ্টি ও মননের নানাদিকে রবীন্দ্রনাথ' 'রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ'।

সুধীর চক্রবর্তী (১৯৩৪) গবেষক ও অধ্যাপক। তাঁর চর্চার মুখ্য বিষয় বাংলার গান এবং গ্রাম। উল্লেখযোগ্য বই 'গানের লীলার সেই কিনারে' 'নির্জন এককের গান রবীন্দ্রসংগীত' 'পশ্চিমবঙ্গের মেলা' 'গভীর নির্জন পথে' 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন' 'বাংলার গৌণধর্ম : সাহেবধনী ও বলাহাড়ি'।

স্টেলা ক্রাম্‌রিশ (১৮৯৫-১৯৯৩) শিল্পসমালোচক ও অধ্যাপিকা। বিশ্বভারতী কলাভবনে অধ্যাপনা করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও শিল্পবিভাগে অধ্যাপনা করেন; সেই সময় তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'জর্নাল অব্ দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট'। যাঁদের প্রযত্নে ভারতশিল্প বিশ্বশিল্পের আলোচনার দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করে এই অস্ট্রিয়ান মহিলা তাঁদের অন্যতম। বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন।